১ম বর্ষ—১ম খণ্ড

আষাঢ়—পৌষ ১৩৩৯

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত

মূল্য প্রতি সংখ্যা /০ — ভিঃ-পি বার্ষিক ৩৸৴০

কলিকাতায় বার্ষিক ৩।০ — মনিঅর্ডার ঐ ৩৸০

কথক সঙ্ঘ, ২ লায়ন্‌স্ রেঞ্জ, কলিকাতা

ছোট গল্প

১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—১৩৩৯

১ম—২৫শ সংখ্যা, শারদীয়া ও বিশেষ সংখ্যা সহ—ষাণ্মাসিক

সূচি-পত্র

১ম বর্ষ] ১লা আষাঢ়, ১৩৩৯ [১ম সংখ্যা

সেকেলে গল্প

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

এ গল্প আমি শুনেছি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু নীলাম্বর মজুমদারের কাছে। তিনি শুনেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছে। নীলাম্বরের বয়স যখন দশ, তখন তাঁর দিদিমার বয়স সত্তর. আর এই সময়ই দিদিমা নীলাম্বরকে এই গল্পটি বলেন। গল্পের ঘটনা যে সত্য, তার প্রমাণ নীলাম্বরের দিদিমা ছিলেন নিরক্ষর, অতএব কোন বই থেকে তিনি এ গল্প সংগ্রহ করেন নি। আর রামায়ণ মহাভারত

ছাড়া অন্য বিষয়ে ছেলেদের গল্প বলা সেকালে মেয়েদের অভ্যাস ছিল না। তবে যদি কোনও বিশেষ ঘটনা তাঁদের মনে গাঢ় ছাপ রেখে যেত, এমন যদি কিছু ঘটত যা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারতেন না, তাহলে কখনো কখনো সে কথা ছেলেদের বলতেন। এরকম ঘটনা এ কালে বোধহয় ঘটে না। কিন্তু আজ থেকে একশ' বছর আগে বাঙ্গালী সমাজে ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নীলাম্বরদের গ্রামে একটী প্রকাণ্ড ভিটে পড়ে' ছিল, তার অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা, আর একপাশে ছিল মস্ত একটি দীঘি। নীলাম্বর জানত যে তাদের মজুমদার বংশেরই একটী উচ্ছন্ন পরিবারের বাস্তুভিটের এগুলি ধ্বংশাবশেষ। এককালে নাকি ধনেজনে তারাই ছিল গ্রামের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বাড়ীর বুড়ো চাকরদের কাছে শিশুকাল হতে নীলাম্বর এই পরিবারের ঐশ্বর্য্য ও পূজাপার্ব্বণ ক্রিয়াকর্ম্মের জাঁকজমক ধূমধামের কথা শুনে এসেছে। কি কারণে তাদের এমন দুর্দ্দশা ঘট্‌ল ও বংশ-লোপ হল, তা জানবার জন্য নীলাম্বরের মহা কৌতূহল ছিল। সে একদিন তার দিদিমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন, "এ হচ্ছে ধর্ম্মের শাস্তির ফল।"

নীলাম্বর বল্‌লে, ব্যাপার কি হয়েছিল বলো।

২

দিদিমা বল্‌লেন,—

ঐ যে প'ড়ো ভিটে দেখছ, যা এমনি জঙ্গলে ভরে গেছে যে দিনের বেলায়ও বাঘের ভয়ে লোক সেদিক দিয়ে যায় না, আর যেখানে শুধু পাচ হাত লম্বা বন্দুক দিয়ে বুনোরা কখনো কখনো

শূয়োর শিকার করে, ঐ ছিল তোমাদের পরিবারের সব চাইতে বড় জমিদার স্বরূপনারায়ণের বাড়ী। তিনি নবাবসরকারে চাকরি করে অগাধ পয়সা করেছিলেন। তা ছাড়া লোককে বিচার করা ও তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও, গৌড়ের বাদ্‌শার সনন্দের বলে তাঁর ছিল বলে শুনেছি। যদিচ তাঁর রাজা খেতাব ছিল না, রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর ছিল, এমন কি মানুষকে কোতল করবারও। ঐ যে প্রকাণ্ড দীঘি দেখতে পাও, যা আজ পানায় বুজে গেছে, ওটি শুনতে পাই তাঁর কয়েদীদের দিয়ে কাটানো। আমি অবশ্য তোমাদের বাড়ীতে বিয়ে হয়ে এসে, বড় তরফের সৈন্যসামন্ত কিছুই দেখিনি, কারণ তখন আর নবাবের আমল নেই ; হয়েছে ইংরাজের আমল। জমিদারেরা সব হয়ে পড়েছে শুধু জমির মালিক, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নয়। তবে আমি যখন এ বাড়ীতে আসি তখনও বড়তরফের খুব রব্‌রবা সময়, দাসদাসী পাইকবরকন্দাজ গুরুপুরোহিত আত্মীয় স্বজন নিয়ে প্রায় শতাধিক লোক ও-বাড়ী সরগরম করে রেখেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় ওখানে পাশা খেলার আড্ডা বসৃত আর গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা বাবুর দল বড় বাড়িতে গিয়ে জুটৃত, আর রাত দুটো তিনটেয় আড্ডা ভাঙলে ওখানেই আহার করে বাড়ী ফিরত। তারপর হত বাড়ীর মেয়েদের ছুটি। এরি নাম নাকি সেকেলে জমিদারী চাল।

৩

সে যাই হোক, আজও এদের ভিটে বজায় থাকত আর ও-পরিবারের মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা থাকত, যেমন তোমাদের আছে, যদি-না ঐ বংশে একটি কুলাঙ্গার জন্মাত। ভৈরবনারায়ণ স্বরূপনারায়ণের প্রপৌত্র। প্রকাণ্ড শরীর, ছোট্ট মাথা, টিয়েপাখীর

মত ঠোঁট-ঢাকা নাক, বসা চোখ,—ভৈরবনারায়ণ ছিল মূর্ত্তিমান পাপ। সে ছেলেবেলা থেকে কুস্তি, লাঠিখেলা, তলওয়ারখেলা, সড়কি-চালানো ছাড়া আর কিছুই করেনি। ফলে তার শরীরে ছিল সুধু বল, আর ছিল না দয়ামায়ার লেশমাত্র। পূজোর সময় সে পাঁঠাবলি, মোষবলি নিজহাতেই দিত, আর মোষবলির পর সে যখন রক্তে নেয়ে উঠ্ত, তখন তার কি আনন্দ, কি উল্লাস! গরীব লোকের উপরে তার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। কারণে অকারণে সে লোককে মারপিট করত, যেন ভগবান তাকে হাত দিয়েছেন আর পাচ জনের মাথা ভাঙবার জন্য। গাঁ-সুদ্ধ লোক, গাঁ-সুদ্ধ কেন—দেশ-সুদ্ধ লোক, তাকে ভয় করত, কারণ তার, লোককে খুন করতেও বাধ্‌ত না। তার সঙ্গী ছিল লাল খাঁ, কালো খাঁ, সরিৎউল্লা ফকির, আর ময়নাল। চারজনেই নামজাদা লেঠেল, আর চারজনই বে-পরোয়া লোক। লাল খাঁ, কালো খাঁ ছিল জাত সিপাই, আর যার নুন খায় তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সরিৎউল্লা ফকির ছিল অদ্ভুত লোক। সে একবার সাত বৎসরের জন্য জেল খেটে বেরিয়ে হল ফকির। তার পরণে ছিল আলখাল্লা, আর গলায় ছিল নানা রঙের কাঁচের মালা। এদানিক কোথাও কাজিয়া বাধলেই সে ফকিরী সাজ ছেড়ে লেঠেলি বেশ ধরত। আর ফকির সাহেব সড়কি ধরলেই খুন। ময়নাল ছিল নেহাৎ ছোকরা। বছর আঠারো বয়েস, সরিৎউল্লার সাগরেদ, আর অদ্ভুত তীরন্দাজ। তার তীর যার রগে লাগত, তারই কর্ম্মশেষ। আর তাঁর মন্ত্রী ছিল জয়কান্ত চক্রবর্ত্তী, ও-বাড়ীর কুল-পুরোহিত। তিনি ভৈরবনারায়ণের সকলরকম দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা ছিল যে, মজুমদার বংশে এতকাল পরে একটি দিকপাল জন্মেছে ;—এই

ছোকরাটি বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। এই লেঠেল ও পুরোহিত ছিল তার ইয়ার-বক্সি। এত যথেচ্ছাচারের ফলে যে সে জেলে যায় নি, তার কারণ তখন এ অঞ্চলে বিশ ক্রোশের ভিতরও একটি থানা ছিল না।

৪

তার উপর তিনি ছিলেন মহা দুশ্চরিত্র। ভৈরবনারায়ণের দৌরাত্ম্যে গেরস্তর ঝি-বৌদের ধর্ম্ম রক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল,—অবশ্য তাদের দেহে যদি চোখ পড়বার মত রূপ থাকৃত। আর কামারকুমোর জেলেকৈবর্ত্তদের মেয়েদের গায়ে রঙ না থাক্, কখনো কখনো খাসা রূপ থাকে। তিনি কোথায় কার ঘরে সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, দিবারাত্র তার সন্ধান নিজে করতেন আর অপরকে দিয়ে খোঁজ করাতেন, এবং ছলেবলেকৌশলে তাকে হস্তগত করতেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ই ছিলেন তাঁর একসঙ্গে দূত আর মন্ত্রী। বাপের একমাত্র সন্তান, ছেলেবেলা থেকে যা-খুসী-তাই করেছেন, কেননা তাঁর যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেবার কেউ ছিল না, তারপর দেহে যখন যৌবন এসে জুটলো, তখন ভৈরবনারায়ণ হয়ে উঠলেন একটি ঘোর পাষণ্ড। ছেলের চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ভৈরবনারায়ণের মা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, ছেলের কখন কি বিপদ ঘটে। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় তাঁকে বোঝালেন যে, বনেদী ঘরের ছেলেদের এ বয়সে ওরকম ভোগতৃষ্ণা হয়েই থাকে, পরে সে আবার ধীর, শান্ত ও ঋষিতুল্য ধার্ম্মিক হয়ে উঠ্‌বে; যৌবনের চাঞ্চল্য যৌবনের সঙ্গেই চলে যাবে। তিনি কিন্তু এ কথায় বড় বেশী ভরসা পেলেন না, তাই খুঁজেপেতে একটি বছর চোদ্দ বয়সের ফুটগৌরবর্ণ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। মহালক্ষ্মীর

রূপের ভিতর ছিল রঙ্। ছোটখাট মানুষটি, নাক চাপা, চোখদুটি বড় বড়, কিন্তু রক্তমাংসের নয়—কাঁচের। তিনি ছিলেন গোঁসাইয়ের মেয়ে, জমিদারের নয়, নিতান্ত ভালমানুষ—যেন কাঠের পুতুল। আর তাঁর ভিতরটা ছিল কাঠের মতই অসাড়।

৫

এরকম স্ত্রীলোক দুর্দ্দান্ত স্বামীকে পোষ মানাতে পারে না, বরং নিরীহ স্বামীকেই বিগ্ড়ে দেয়। বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ভৈরবনারায়ণের পরস্ত্রীহরণ রোগের কিছু উপশম হয়েছিল। তাঁর মা মনে করলেন ওষুধ খেটেছে। কিন্তু মা'র মৃত্যুর পর থেকেই ভৈরবনারায়ণ আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। মহালক্ষ্মী তাঁর স্বামীর পরস্ত্রী-টানাটানির বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও আপত্তি করেন নি, এমন কি মুহূর্ত্তের জন্য অভিমানও করেন নি। তাঁর মহাগুণ ছিল তাঁর অসাধারণ ধৈর্য্য। তাঁর ঐ বড় বড় চোখ দিয়ে কখনও রাগে আগুনও বেরোয় নি, দুঃখে জলও পড়েনি। তিনি ছিলেন হয় দেবতা, নয় পাষাণ। তবে তাঁর শরীরে যে মানুষের রক্ত ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহালক্ষ্মী দিদি ছিলেন ঘোর ধার্ম্মিক, দিবারাত্র পূজা-আর্চ্চা নিয়েই থাকতেন। কত চরিত্রের কত নামের ঠাকুরদেবতাকে যে তিনি ধূপদীপনৈবেদ্য দিয়ে পূজো করতেন, তার আর লেখাজোখা নেই। তাঁর কারবারই ছিল দেবতাদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নয়। কে জানে দেবতা আছেন কি নেই, কিন্তু মানুষ যে আছে, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। সুধু দিদি জানতেন দেবতা আছে, আর মানুষ নেই। ফলে তাঁর স্বামীও হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে একটি জাগ্রত দেবতা।

যে লোককে পৃথিবীসুদ্ধ লোক ঘৃণা করত একমাত্র তিনি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। অবশ্য ভৈরবনারায়ণকে তিনি ধূপদীপ দিয়ে পূজো করতেন না, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাঁর স্ত্রীধর্ম্ম। স্বামীর সকল দুষ্কর্ম্মের তিনি নীরবে প্রশ্রয় দিতেন। অর্থাৎ তিনিও হয়ে উঠলেন সরিৎউল্লা ফকির ও পণ্ডিতমহাশয়ের দলের একজন। অবশ্য তিনি কখনো কোন বিষয়ে মতামত দেন নি, তার কারণ কেউ কখনো তাঁর মত চায়নি। তারপর যে ঘটনা ঘটল, তাতেই হল ও-পরিবারের সর্ব্বনাশ। সে ব্যাপার এতই অদ্ভুত, এতই ভয়ঙ্কর যে, আজও মনে করতে গায়ে কাঁটা দেয়।

৬

ভৈরবনারায়ণ একদিন বাড়ীর ভিতরে এসে দেখেন যে, পূজোর ঘরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে টাটে ফুল সাজাচ্ছে। তার বয়েস আন্দাজ ষোলো কি সতেরো। তার রূপের কথা আর কি বলব, যেন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। মেয়েটীকে দেখে ভৈরব নারায়ণ দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? দিদি উত্তর করলেন, "অতসীকে চেনো না? ও যে সম্পর্কে তোমারই ভগ্নী, সর্ব্বানন্দ মজুমদারের ছোট বোন। যার জন্য দেশেবিদেশে বর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু মনোমত কুলীন বর পাওয়া যাচ্ছে না। সর্ব্বানন্দ বলে অমন রত্ন যার-তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি টাটে ফুল সাজাবার জন্য। ও যেমন সুন্দর শিব গড়ে, তেমনি সুন্দর টাট সাজায়।" এ কথা শুনে ভৈরব

নারায়ণ বললেন, "তাহলে কাল ওকে আমার জন্য শিব গড়তে আর ফুল সাজাতে বোলো।" দিদি বললেন, "আচ্ছা।"

অতসী পরদিন সকালে এসে, অতি যত্ন করে, অতি সুন্দর করে ভৈরবনারায়ণের পূজোর সব আয়োজন করলে। তারপর সেই মূর্ত্তিমান পাপ এসে পূজোর ঘরে ঢুকে, ভিতর থেকে দুয়োর বন্ধ করে দিলে। মহালক্ষ্মী দিদি বাইরে পাহারা রইলেন। ভৈরবনারায়ণ যখন ঘণ্টাখানেক পরে পূজো শেষ করে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন দিদি ঘরে ঢুকে দেখেন যে অতসী বাসী ফুলের মত একদম শুকিয়ে গিয়েছে, আর শিব মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর ঘরময় টাটের ফুল নৈবেদ্য সব ছড়ানো রয়েছে। দিদিকে দেখে, অতসী অতি ক্ষীণস্বরে 'আমাকে ছুঁয়োনা" এই কথা বলে, ধীরে ধীরে বড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেল। আর সেখানে গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে বিছানা থেকে সে আর ওঠেনি। এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি। তিন দিন পরে অতসী মারা গেল। আর গ্রামের যেন আলো নিভে গেল। কারণ রূপে গুণে হাসিতে খেলাতে অতসী এ গ্রাম আলো করে রেখেছিল। সমস্ত মজুমদার পরিবারের মাথায় বজ্রাঘাত হলো, আর সকলের মনেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল, সুধু মহালক্ষ্মী দিদির পূজা-আর্চ্চা সমান চলতে লাগল। স্বর্গের লোভও বড় ভয়ঙ্কর লোভ। এই লোভেই তিনি ভীষণ পতিব্রতা স্ত্রী হয়েছিলেন। সকলেই কিন্তু চুপচাপ রইলেন, সর্ব্বানন্দ কি করে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝড় আসবার পূর্ব্বে আকাশবাতাসের যেমন থম্‌থমে ভাব হয়, এ গ্রামের ভাব সেইরকম হল।

৭

সর্ব্বানন্দ ছিলেন ভৈরবনারায়ণের ঠিক উল্টো প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ সাক্ষাৎ কার্ত্তিক; তার উপরে ঘোর সৌখীন। গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজ্ মুখ্ খি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রার তদ্বির করতেই তাঁর দিন কেটে যেত। তিনি শ্যামা পাখীকে ছোট এলাচের দানা ঘিয়ে ভেজে নিজহাতে খাওয়াতেন। এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে। তার উপরে তিনি দিবারাত্র গানবাজনা নিয়েই থাকতেন। আর নিজে চমৎকার সেতার বাজাতেন।

এর ফলে তিনি চারপাশের ছোটবড় সব জমিদারদের মহা প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। তিনি না থাকলে কারও নাচগানের মজ্‌লিস জমত না। বাই-খেমটা মহলে তাঁর পশার নাকি একচেটে ছিল। সর্ব্বানন্দের কিন্তু এ দুর্ঘটনায় বাইরের কোন বদল দেখা গেল না। সেই হাসিমুখ, সেই মিষ্টি কথা, সেই ভালমানুষী হালচাল। শুধু তিনি গানবাজনা ছেড়ে দিলেন। আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বড়নগরের বড় জমিদার কৃপানাথ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, থাকে প্রাণ যায় প্রাণ কবুল করে. দুই বন্ধুতে ভৈরবনারায়ণের ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন। যে রাগ সর্ব্বানন্দের বুকে এতদিন ধোঁয়াচ্ছিল, তার থেকে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনে ভৈরবনারায়ণের সর্ব্বস্ব জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেল।

৮

ক্রমে ভৈরবনারায়ণ ও সর্ব্বানন্দের লেঠেলরা কাজিয়া সুরু করলে। ফলে এ গ্রাম হয়ে উঠল ভদ্রলোকদের নয়, লেঠেলের

গ্রাম। গ্রামের সকলেই ছিলেন ভৈরবনারায়ণের বিপক্ষে, সুতরাং তাঁরা নানারকমে সর্ব্বানন্দের সাহায্য করতে লাগ্‌লেন। এমন কি আমাদের মেয়েদেরও কাজ হল সর্ব্বানন্দের জখ্‌মী লেঠেলদের শুশ্রূষা করা। আমি নিজের হাতেই কত না লেঠেলের সড়কির ঘায়ে ঘিয়ের সলৃতে পুরেছি। এইতো গেল আমাদের অবস্থা। আর প্রজাদের দুঃখের কথা কি বলব। যত টাকার টান হতে লাগল, তাদের উপর অত্যাচার তত বাড়তে লাগল। ভৈরব নারায়ণের প্রজারা জুলুম আর সহ্য করতে না পেরে সব বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন তিনি জমিদারী বন্ধক দিয়ে কেঁয়েদের কাছে ঋণ করতে সুরু করলেন। আর নিজে কাপ্তেন সেজে, লেঠেলদের দলপতি হয়ে লড়াই চালাতে লাগলেন।

তারপর একদিন রাত্তিরে সর্ব্বানন্দ ও কৃপানাথের লেঠেলরা ভৈরবনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করলে। তখন বর্ষাকাল; সমস্ত দিন ছিপ্‌ছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভৈরবনারায়ণ এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর দলবল সব গিয়েছিল সর্ব্বানন্দের মফঃস্বল কাছারি লুঠতে। তিনি বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চড়ে খিড়কির দুয়োর দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সর্ব্বানন্দের লেঠেলরা বড় বাড়ীর দরজাজানালা ভেঙে, বাড়ীতে ধনরত্ন যা ছিল সব লুঠে নিল।

বাড়ীর একজন লোক পূজোর আঙ্গিনা দিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল। সর্ব্বানন্দের হুকুমে তাকে ধরে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেওয়া হল। লোকে বলে এ বলি সর্ব্বানন্দ নিজহাতেই দিয়েছিলেন, লোকটাকে ভৈরবনারায়ণ বলে ভুল করে। এ কথা আমি বিশ্বাস করি; কারণ সর্ব্বানন্দ সৌখীন হলেও, তার বুকে ছিল পুরুষের তাজা রক্ত।

যে ব্যাপার সুরু হয়েছিল স্ত্রীহত্যায়, তার শেষ হল ব্রহ্মহত্যায়। এর পর ও-বংশ যে উচ্ছন্নে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বামীর অধর্ম্ম ও স্ত্রীর ধর্ম্ম—এ দুয়ের এই শাস্তি।

৯

দিদিমার এ গল্প শুনেও নীলাম্বরের কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না। সে জিজ্ঞাসা করলে,—এর পর ভৈরবনারায়ণ কি করলেন? দিদিমা বললেন,—এর পর ভৈরবনারায়ণ আর দেশে ফেরেন নি। লোকমুখে শুনেছি, তিনি কিছুদিন পরে এক ডাকাতের দলে ধরা পড়ে' চিরজীবনের জন্য দায়মাল হয়েছেন,—লালখাঁ কালোখাঁ সরিৎ উল্লা ফকির ও ময়নাল ছোকরা সমেত। দেশ যখন শান্ত হল, তখন আবার সর্ব্বানন্দ মনের সুখে সেতার বাজাতে লাগলেন। যদিচ এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, আর তাঁর রূপলাবণ্য সব ঝরে পড়েছিল,—যেন শরীরে কি বিষ ঢুকেছে।

ভৈরবনারায়ণও গেলেন, বড়বাড়ীর সুখের পায়রাও সব উড়ে গেল। ঐ পোড়ো বাড়ীতে পড়ে' রইলেন শুধু মহালক্ষ্মী দিদি আর একটি পুরাণো দাসী। আর দিদি ঐ রাবণের পুরীতে একা বসে একমনে দিবারাত্র তুলসীকাঠের মালা জপ করতে সুরু করলেন। যতদিন দিদি বেঁচেছিলেন, সর্ব্বানন্দের মনের আগুন একেবারে নেবেনি।

তবে সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মহত্যা করে যে আবার স্ত্রীহত্যা করেনি, সে সুধু তোমার ঠাকুরদাদার খাতিরে। মহালক্ষ্মীকে সকল বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তোমার ঠাকুরদাদার ধারণা ছিল

যে মহালক্ষ্মী পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল। দিদি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি হাতের শাঁখাও ভাঙেন নি, কপালের সিঁদুরও মোছেন নি, পাছে তাঁর স্বামীর অমঙ্গল হয়। ভৈরব-নারায়ণ যে কবে কোথায় মারা গেলেন, সে খবর আমাদের কেউ দেয় নি। তারপর মহালক্ষ্মী দিদি মারা যাবার পর যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাতেই এই পাঁচমহল বাড়ী একবারে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। আর সেখানে রয়েছে সুধু জঙ্গল, আর বাস করছে বাঘ ও শূয়োর। এরাই এখন ভৈরবনারায়ণের বংশরক্ষা করছে। ভাল কথা, আশা করি মহালক্ষ্মী দিদি মরে স্বর্গে যান নি, কেননা সেখানে গেলে যে অতসীর সঙ্গে দেখা হবে।

ছোট গল্প

বাংলার উপাখ্যান-সাহিত্যে ছোট গল্পের বয়স বেশী নয়। সে সকলের কনিষ্ঠ। ছোট ছেলেটির উপর মায়ের ভালবাসা বেশী করিয়া পড়ে। বুঝি সকলের ছোট বলিয়াই আজ ছোট গল্পের আদর এমন অসামান্য। সাজাইয়া গুজাইয়া, মুখ মুছাইয়া, অলঙ্কৃত করিয়া, সুন্দর পরিধান পরাইয়া. ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মা দেখে ছেলেকে কেমন করিয়া ভূষিত করিলে ভাল দেখাইবে। শৈশব কাটিয়া গেছে, কৈশোর আসিয়াছে, তবুও জননী বঙ্গভাষা এই কিশোর পুত্রটিকে নব নব বেশে সুসজ্জিত করিয়া মুগ্ধনয়নে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে, এ শক্তি এ সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইবার নয়, একদিন এ নিখিল চিত্ত জয় করিবে।

* * *

কৈশোর বলিলাম শুধু কালের হিসাবে। নহিলে বাংলা ভাষায় ছোট গল্প যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রতীচ্যের কোন কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যেও তাহার তুলনা মিলিবে না।

* * *

শুধু বঙ্গসাহিত্য কেন, সকল সাহিত্যেই ছোট গল্প কনিষ্ঠ রূপে সকলের শেষে আসিয়া রসপিপাসু হৃদয়গুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। সভ্যতার প্রথম যুগ সূচিত করে মহাকাব্য, আর শেষ দিকে রচিত হয় গীতিকাব্য। ছোট গল্প ও গীতিকবিতা যেন দুটি ভাই বোন, হাত ধরাধরি করিয়া চলে। পাশাপাশি দেখিলে মনে হয় ইহারা যেন একগোত্র একবংশের ছেলে মেয়ে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ের কোথায় মিল আছে।

তাই কি আধুনিক গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পের শ্রেষ্ঠ কথক ?

* * *

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের সমুদয় বিভাগ অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বিচিত্র রচনারাশির মধ্যে ছোট গল্পের বীজও নিহিত ছিল। ছোট গল্পের সূচনা খুঁজিতে গিয়া আমরা বৃথাই ইন্দিরা, রাধারাণী যুগলাঙ্গুরীয় হাতড়াইয়া মরি। তাঁহার ছোট ছোট রচনাগুলি খুঁজিলে সে বীজ মিলিতে পারে। 'লোকরহস্যে' হাসির গল্প আছে। হাস্যরসাত্মক হইলেও যে ছোট গল্প হইতে পারে, তাহার প্রমাণ 'পরশুরাম' ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা।

* * *

বঙ্কিমচন্দ্রের 'পুষ্পনাটক'কে আমি বাংলার প্রথম ছোট গল্প বলিয়া মনে করি। রূপে অপরিস্ফুট হইলেও কথাবার্ত্তার ছলে লেখা এই বিচিত্র রচনাটির মধ্যে প্রকৃত ছোট গল্পের প্রাণ আছে। প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়া ইহা 'কবিতাপুস্তকে' পুনর্মুদ্রিত হয়। কাব্যগ্রন্থের ভিতর গদ্যপ্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইল কেন তাহার উত্তর দিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী।" ছোট গল্প যেখানে গীতিকাব্যের ছায়ালোকের মায়া সৃষ্টি করে, এ গল্পটি সেই রাজ্যের।

* * *

শ্রোতাদের আলোচনায় গল্পের উপসংহার। Epilougeটুকু উদ্ধৃত করিলে বোঝা যাইবে, ইহা ছোট গল্প কেন।

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়. এ কি ছাই হইল ?

দ্বিতীয়। তাই ত একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোটা জল নায়ক। বড় ত drama !

তৃতীয়। হতে পারে কোন moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ। না হে—এক রকম tragedy.

পঞ্চম। Tragedy না একটা farce ?

ষষ্ঠ। Farce না – satire, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। 'বাসনা' বা 'তৃষ্ণা' নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয় গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব ?

প্রথম। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না, কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19th July, 1885, Sunday, and of which the writer was an eye-witness."

* * *

ভাল ছোট গল্পের মধ্যে এমনি একটা অনির্দ্দিষ্টতা আছে। একজন আধুনিক লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করি। গল্পটির নামই 'ছোট গল্প'। তর্ক উঠিয়াছে এই লইয়া, ছোট গল্পের প্রাণ কি ? উত্তরে কেহ বলিল—ট্রাজেডি, কেহ বলিল—কমেডি, কেহ

বলিল, "জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত্তই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তগুলোকেই একসঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক।" এককজন আপোষে মীমাংসা করিয়া দিয়া কহিল, "ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ।" প্রফেসর এতক্ষণ নীরবে একমনে আলোচনা শুনিতেছিলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

"জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করিনে, কমেডিও মনে করিনে, কারণ আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুই-ই। ও হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলতে যাচ্ছি। তোমরা দেখো, প্রথমে তা ছোট হয় কি না, আর দ্বিতীয়ত তা গল্প হয় কি না। ...... সে যাহোক এখন গল্প শোনো।"

("আহুতি"—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)

ইহা অবশ্য গল্পের epilouge নয়—prolouge.

* * *

গদ্যের আরো দুইচারিটি প্রধান বিভাগের মত বাংলায় ছোট গল্পেরও প্রথম প্রেরণা আসে অনুবাদের ভিতর দিয়া। আশ্চর্য্যের কথা এই, সে অনুবাদ ইংরেজীর নয়—ফরাসীর। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রথম ফরাসী গল্পের অনুবাদে হাত দেন আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে; তাহা বাহির হয়, বোধ হয়, 'সাহিত্যে'র দ্বিতীয় বর্ষে। 'সাহিত্যে'র আবির্ভাব ১২৯৭ সালে। দু'এক মাস মাত্র আগে পিছে সমসাময়িক আরো দুইজন ফরাসীসাহিত্যরসিক এই 'সাহিত্যে'ই

গী-দে-মোঁপাসার গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন। একজন শ্রীযুক্ত জ্ঞান গুপ্ত, আর একজন পরলোকগত নলিনী মুখোপাধ্যায়!

* * *

এমন সময় যৌবনের প্রথম উৎসাহ এবং দীপ্ত প্রতিভা লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় অবতীর্ণ হইলেন। ১২৯৮ সালের কথা। বঙ্গ সাহিত্যের সে এক পরম শুভক্ষণ। অবলীলাক্রমে মৌলিক ছোট গল্পের সৃষ্টি করিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে,—রূপে শ্রী, গড়নে ভঙ্গী, ভাষায় শক্তি, ভাবে সৌন্দর্য্য, অবয়বে মহিমা এবং সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণতা প্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পকে সাহিত্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

* * *

ছোট গল্পের প্রতিষ্ঠায়, সেদিনের 'ভারতী'র শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাহার পর এমন হইল, ছোট গল্প না হইলে বাংলা মাসিকপত্র চলে না। অনেকেই ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকবর্গ ছোট গল্পকে লোকের আদর ও আগ্রহের বস্তু করিয়া তুলিলেন।

* * *

প্রভাতকুমারের মত ছোট গল্পের যাদুকরকে হারাইয়া বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল বহু বৎসরেও তাহা পূর্ণ হইবার নয়। তাহার সম্বন্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আজকাল বাংলা দেশে অনেকেই ছোট গল্পে হাত দিয়াছেন, সেগুলি যে ছোট তাতে

সন্দেহ নেই—কিন্তু গল্প নয়। তোমার গল্পগুলি যেন ঝরণার মত ছোটে এবং ঝরণার মত ঝিকমিক করে ..... আর এমন একটি হাসবার কায়দা জানে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই হাসে।”

* * *

কথা ছিল, দ্বিতীয় সংখ্যার ‘ছোট গল্প’ প্রভাতকুমারের অতুলনীয় রচনাসম্ভার বুকে ধরিয়া ধন্য হইবে। কাল বাংলার রসিকসমাজকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিল। প্রভাতকুমারের পুত্রপরিজনের সহিত বাংলার সকল সাহিত্যামোদী সমব্যথায় ব্যথিত।

* * *

‘মন্দির’, ‘বড় দিদি’, ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’ আকারে বড় হইলেও বস্তুত ছোট গল্প। শরৎচন্দ্রের লেখনীস্পর্শে ছোট গল্প বড় হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

অনুবাদের ভিতর দিয়া আধুনিক ছোট-গল্পের প্রাথমিক প্রবর্ত্তনে যিনি প্রথম যৌবনে উদ্যোগী হন, এবং পরবর্ত্তী কালে যাঁহার অপূর্ব্ব ‘চারইয়ারী কথা’ বাঙালী পাঠকের অন্তরে বিস্ময়ের চমক লাগাইয়াছিল, আমরা প্রথমে তাঁহারই লেখা ছোট গল্প পাঠককে উপহার দিলাম।

* * *

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে ‘ছোট গল্প’ বাহির হইল। নূতন নূতন গল্প লইয়া সে প্রতি শনিবার দেখা দিবে। আজ বুধবার। অতএব আগামী সপ্তাহের শনিবারে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন

মুখোপাধ্যায়ের 'অনিন্দিতা'কে লইয়া 'ছোট গল্প' আপনাদের অভিবাদন করিবে।

* * *

আমাদের প্রচ্ছদপটখানি স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা।

* * *

জীবনসংগ্রাম তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। সময় অল্প। ধীরে-সুস্থে মহাকাব্য জাতীয় বিশাল উপন্যাস উপভোগ করিবার অবসর কোথায়? অথচ মানুষের রসপিপাসা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। পরিমাণে অল্প হইলেও অমৃত আমাদের সকল ক্ষুধা সকল তৃষ্ণা নিবৃত্ত করে। শ্রেষ্ঠ লেখকের রচিত ছোট গল্প সেই অমৃতকণা। আমরা তাহাই পরিবেশনের ভার গ্রহণ করিলাম।
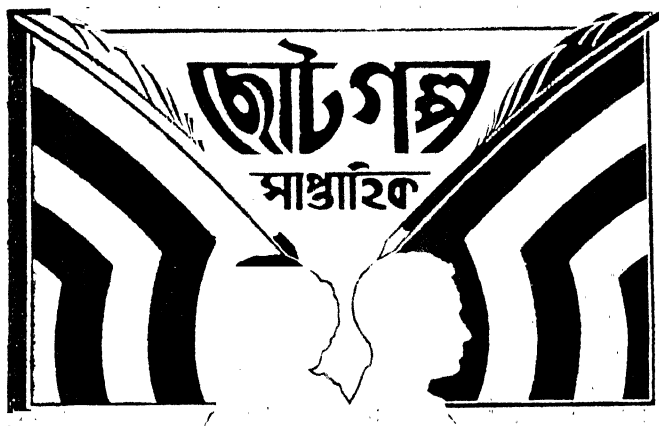
১ম বর্ষ] ১১ই আষাঢ় ১৩৩৯ [২য় সংখ্যা

অনিন্দিতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দু-দু'বার বি-এ ফেল করিলেও তৃতীয়-বার বি-এ পরীক্ষা দিবার উৎসাহ বঙ্কুর এক-তিল কমে নাই ; তার কারণ, বি-এ পরীক্ষা দেওয়া উপলক্ষ মাত্র—নহিলে কলিকাতায় নির্ব্বিবাদে বাস করিবার হেতু থাকে না ! তা ছাড়া আশার রাগিণী তখনো মিলায় নাই ! এবং দেবী বীণাপাণির চরণ-নূপুরের নিক্কণ তাকে রীতিমত দিকভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে ! তার মন ভারতের গণ্ডী ছাড়াইয়া রুশ, জার্ম্মান, ফরাশী, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান্ মুল্লুকে কাফে, মিউজিক হল প্রভৃতির আশে-পাশে রূপ-রসের পিয়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে !

বন্ধুর বাড়ী কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে ; থাকে সে কলিকাতায় মাতুলের গৃহে। এগজামিন চুকিলে এবার সে গৃহে ফিরিল না— সামনে তাদের 'ভাব-বন্যা সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশন। বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিল,—

পরীক্ষা তো চুকিয়াছে এবার রীতিমত তদ্বির করিব ; এগজামিনাররা এখন চায়, একটু মেলা-মেশা, একটু আনুগত্য ! এই ট্রেড-সিক্রেট জানা ছিল না বলিয়া দু-দু'বার মিথ্যা খাটিয়া এগজামিন দিয়াছি। এবার কাজ পাকা করিয়া দেশে ফিরিব ইত্যাদি।

বাড়ীতে এ কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন ছিল না—যেহেতু বিধবা মার চিত্ত পুত্র-স্নেহে বিগলিতপ্রায় এবং পুত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস প্রচুর ! তবু......

সেদিন ছিল বন্ধু হরশঙ্করের গৃহে ছোট মজলিশ্। হরশঙ্করের বাড়ী কালীঘাটে। সেখানে গল্প-গান হাসি-খুশীর মাত্রায় মনটা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি এগারোটা বাজিলে মজলিশ্ ছাড়িয়া বন্ধু আসিয়া দোতলা-বাসে চাপিয়া বসিল। খোলা ছাদ— আকাশে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না—তরুণ প্রাণ কত কি কুহক স্বপ্ন রচিতে সুরু করিল ! চৌরঙ্গীর একধারে বিস্তীর্ণ মাঠ—যেন সেই আরব রজনীর আলো-ছায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন !

প্লাজার সামনে বাস থামিল। বায়োস্কোপ ভাঙ্গিয়াছে—সাহেব মেমের জটলা। পথের বুকে রূপের বিদ্যুৎ! হাসির ঝর্ণা ! তার অপরূপ মোহ ! কি ভাবিয়া প্লাজার সাম্‌নে বন্ধু নামিয়া পড়িল ! রূপের রোশ্‌নি প্রাণে তার নেশা জাগাইয়াছিল !

নিমেষের জন্য সে যেন নিশ্চেতন! চেতনা ফিরিল একটা ফিটনওয়ালার আহ্বানে—আইয়ে বাবু।

খালি ফিটন। বিপুল জনতা রূপের ফিনিক্ ফুটাইয়া চকিতে অদৃশ্য হইতেছে! শেষে পথে সে একা—আর ঐ একটা পাহারওয়ালা, অদূরে সার্জেণ্ট।

বঙ্কু কহিল,—না, গাড়ী চাই না।

সে দ্রুত এস্‌প্লানেডের দিকে চলিল।

একটু আগে—এক তরুণী। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুগভীর দুশ্চিন্তায় কাকে যেন খুঁজিতেছে!

স্বপ্ন? না। বঙ্কু স্পষ্ট দেখিল, সত্যই তরুণী! পায়ে নাগরা, 'পরণে শিল্কের শাড়ী—এবং তরুণী একাকিনী!

গতির বেগ বাড়াইয়া সে তরুণীর সম্মুখে আসিল। তরুণীর দুই চোখে কাতর করুণ দৃষ্টি—বঙ্কুর বুকে তীক্ষ্ণ তীর বিঁধিল। এত বড় পথ—তরুণী একা! বিশ্ব-সাহিত্যের পৃষ্ঠা হইতে এ যেন জীবনের এক টুকরা খসিয়া চৌরঙ্গীর পথে পড়িয়াছে! বঙ্কুর বুক কাঁপিল—কি বলিবে? কোন্ কথা? সভয়ে পথের দিকে চাহিল—পুলিশ? ..কি জানি, কি কথার কি অর্থ তরুণী গ্রহণ করিবেন—এবং ঐ ভয়-চকিত মূর্ত্তি সহসা যদি তার কণ্ঠস্বরে আরো ভীতি-বিহ্বল হইয়া ওঠে! যদি ..যদি

এক হাজার প্রশ্ন বঙ্কুর বুকে ঝড়ের মত ফুঁশিয়া উঠিল। তরুণী থমকিয়া দাঁড়াইল তার চোখের দৃষ্টি ? বঙ্কু ভাবিল, কোন্ কবি হরিণ-নেত্রে তরুণীর চোখের উপমা দেখিয়াছিলেন! সার্থক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি! এ-চোখেও ঠিক তেমনি দৃষ্টি!

বঙ্কুর জীবনে চরম মুহূর্ত্ত! মিথ্যা সঙ্কোচে, লজ্জায় চিরদিনের জন্য নৈরাশ্য বুঝি-বা সার করিতে হয়! কণ্ঠকে সকল জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া বঙ্কু কহিল—আপনি কাকে খুঁজচেন?...

এ কথায় তরুণী যেন অকূলে কূল পাইল—ছুটিয়া বন্ধুর কাছে আসিয়া কহিল—আমি ভারী বিপন্ন ..

বিপন্ন! বন্ধুর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল! এ যে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর লেখা নূতন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে! পথ বিজন, নিশীথ সঘন, কামিনী একাকিনী —সেও দিক্‌ভ্রান্ত পথিক, বুকে তার কম্পন! বাকী পরিচ্ছেদগুলা চকিতে বিদ্যুতের শিখার মত মনকে ছুঁইয়া বহিয়া গেল।

বন্ধু কহিল—কি হয়েছে, বলুন তো? যদি কোনো সাহায্য

তরুণী কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল,—দাদার সঙ্গে এসেছিলুম বায়োস্কোপ দেখতে। সে যে কোথায় গেল ..

সে কি! বন্ধু কহিল,—কোন্ বায়োস্কোপে?

তরুণী কহিল—এম্পায়ারে।

—তিনি কোথায় গেলেন? হঠাৎ?

তরুণী কহিল—দাদা ভারী খেয়ালী। ছবি নিয়ে তর্ক হলো আমার সঙ্গে। মতের অমিল, অমনি রেগে উঠে গেল। তারপর বায়োস্কোপ ভাঙ্গতে কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না! লোকজন চলে গেছে...

তার দুই চোখ সজল, আর্দ্র; স্বরে একরাশ বেদনা।

বন্ধু কহিল– গাড়ী...?

তরুণী কহিল—ঘরের গাড়ীতে এসেছিলুম—গাড়ীও দেখতে পাচ্ছি না।

বন্ধু কহিল—তাইতো, আশ্চর্য্য কথা!...তা, আপনার বাড়ী কোথায়?

তরুণী কহিল—অনেক দূরে—মাণিকতলায়...

বন্ধু কহিল - একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবো ··?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী কহিল—একটু আগে পর্য্যন্ত সাহসের অন্ত ছিল না। এখন নির্জ্জন পথে ভয় হচ্ছে...

—ভয় !

তরুণী কহিল—তাই। নারী সত্যই অসহায়। দাদার সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। ছবি দেখতে দেখতে আমি বললুম—তোমরা আমাদের অসহায় ভেবো না—ভীরু ভেবো না। আমি একা বাড়ী যেতে পারি। দাদা বল্‌লে মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই ! মেয়েমানুষের যা কিছু সাহস,—মুখে ! যতক্ষণ ঐ পুরুষের পাশে নিরাপদে আছে, ততক্ষণ ! পুরুষের আশ্রয়ে আছে বলে বুঝতেও পারে না, সে-আশ্রয়-চ্যুত হলে আমাদের ভয়ের অন্ত থাকে না !

তরুণী থামিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—দাদার কথাই ঠিক, এখন দেখচি ! দাদা নেই—মনে হচ্ছে, সারা দুনিয়া যেন সেই রূপকথার দৈত্যের মত ভয়ানক মূর্ত্তি নিয়ে ছুটে আসচে আমাকে গ্রাস করবার জন্য ! কোথায় যেন লুকোতে চাই !... নারীর দর্প ভগবানও সহ্য করেন না,—নারী এত অসহায় !

তরুণীর চোখের কোলে অশ্রুর বিন্দু ! আকাশের চাঁদ সে অশ্রু দেখিয়া কাঁপিয়া কাতর চিত্তে একটা মেঘের আড়ালে লুকাইল !

বন্ধু কাঠ ! কি করিবে ? কি সে করিতে পারে ?

তরুণী কহিল - আপনার বাড়ী কোথায় ? মানে, আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

বন্ধু কহিল—শ্যামবাজার।

--ও, তাহলে দয়া করে যদি...মানে, এই ট্যাক্সিতেই আমায় পৌঁছে দিয়ে যান্। আপনার গাড়ীভাড়া অবশ্য ..

বন্ধু শিহরিয়া উঠিল।

তরুণী ভাবিতেছে, পাছে ট্যাক্সি-ভাড়া তাকে দিতে হয়, তাই এ-বিপদে নীরবে পাশে দাঁড়াইতে বন্ধু কুণ্ঠিত হইতেছে! সে কহিল,--ছি ছি ..গাড়ীভাড়ার কথা কি বলচেন!

তরুণী কহিল—ভাড়া আমিই দেবো। তরুণীর দৃষ্টিতে মিনতি!

বন্ধু কহিল,— কৃপা করে সে ভারটুকু...

তরুণী মৃদু হাসিল, কহিল,—আচ্ছা। একটা ট্যাক্সি ডাকুন তো ..

সামনেই ট্যাক্সি। তরুণী উঠিয়া বসিল। বন্ধু সসঙ্কোচে ড্রাইভারের পাশে বসিতে যাইতেছিল, তরুণী কহিল—ও কি! দয়া যদি করলেন তো কেন আমায় এতখানি হীন ভাবচেন! না, ভিতরে এসে বসুন!

এত নিশ্বাসও বন্ধুর বুকে জমিয়া ছিল! কম্পিত বুকে বন্ধু আসিয়া ভিতরে বসিল। তার পা টলিতেছিল! বুঝি, পড়িয়া যাইবে! ভাগ্যে তরুণী তার হাত ধরিয়া ফেলিল! তরুণী বলিল--কি বলে বাইরে বসছিলেন—বলুন তো? আপনি দরোয়ান? না বেয়ারা?

তরুণী মৃদু হাসিল। সে হাসি যেন রকেটের ফুল কাটিয়া রঙীন আলোয় তার প্রাণটাকে মাতাইয়া দিল!...

ট্যাক্সি চলিয়াছে ক্ষিপ্র বেগে – সার্কুলার রোড ধরিয়া

তরুণী কহিল—ঠিক যেন মাসিকপত্রের গল্প—না? আমার এই বিপদ! আপনি এলেন শীতের কুয়াশা ভেঙ্গে দিল-জাগানো ফাগুন-হাওয়ার মত ..

বন্ধুও তাই ভাবিতেছিল! মাঝে মাঝে তার চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল...

স্বপ্ন . এ স্বপ্ন ! কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীর দোলায় তরুণীর পরশ, শাড়ীর খশখশানি শব্দ, এসেন্সের সুবাস ! তার মনে হইতেছিল,—এ গাড়ী যদি এমনি ছুটিয়া চলে, বিরামহীন গতিতে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া ..একেবারে সেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি...! আঃ : তাহা হইলে দুনিয়ায় তার চাহিবার আর কি-বা থাকে !

তরুণী কহিল,—কিন্তু ভগবান সত্যই আছেন...নয় ? এ-বিপদে নাহলে আপনাকে কেন পাবো ?

বন্ধু কহিল, তা বটে !

সে চলিয়াছিল বাসে চড়িয়া...সহসা প্লাজার সামনে কি যে ঘটিল, কেন সে নামিল .. !

এ কল্পনাও সে করে নাই...না !

তরুণী কহিল—আপনিও বায়োস্কোপে গেছলেন ?

বন্ধু কহিল না।

—তবে ?

বন্ধু কহিল—কালীঘাট থেকে ফিরছিলুম। এক বন্ধুর বাড়ী আমাদের সাহিত্যের মজলিশ ছিল।

তরুণী কহিল সাহিত্যের মজলিশ !... থামিয়া সে বন্ধুর পানে চাহিল ; পরে কহিল,—আপনি লেখেন বুঝি...ঐ মাসিক পত্রে ?

বন্ধু কহিল—লিখি। আমাদের লেখা কিন্তু ছাপতে দিই না। এই সামনের আষাঢ় থেকে আমাদের কাগজ বেরুবে, 'ভাব-বন্যা'। বিজ্ঞাপন দেখেন নি ?

তরুণীর মুখ সস্মিত। তরুণী কহিল—'ভাব-বন্যা'! ও—হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন দেখেচি বটে ! তা সে আপনাদের কাগজ ?

—হ্যাঁ।

তরুণী কহিল—আমার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবেন। গ্রাহক হবো। কাগজ বেরুলেই ভি-পিতে পাঠাবেন। বার্ষিক মূল্য কত?

বঙ্কু কহিল—দু'টাকা ছ'আনা।

তরুণী কহিল—এত কম দাম করলেন কেন? সাড়ে-ছ'টাকা করলেই ঠিক হতো। কম দাম করলে লোকে ভাবে, ও কিছু নয়, বাজে কাগজ।

বঙ্কু কহিল—যা বলেছেন!..আচ্ছা, ভেবে দেখবো।

তরুণী কহিল—দেখবেন।..

তারপর চুপচাপ! স্বপ্নের চকিত দোলায় বঙ্কুর মন আরামে বিভোর! এ-নিমেষ না ফুরায়! না ফুরায়! ট্যাক্সি সবেগে ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে!

মাণিকতলার মোড় গাড়ী পূব-দিকে বাঁকিল।..নূতন পুল...। তরুণী কহিল,—হাঁ, নাম-ঠিকানাটা ভুলে যাবেন না যেন..! আমার নাম শ্রীঅনিন্দিতা দেবী, ১০ নম্বর ভৈরব বারিকের লেন। আচ্ছা, কার্ড দেবো'খন!..আপনি একটু বসবেন তো! না, আমায় নামিয়ে দিয়েই পালাবেন?

সমস্যা! পলানো! বলিলেই কি পলানো চলে? বঙ্কুর প্রাণ তো নড়িতে চায় না! কিন্তু কি পুণ্য করিয়াছে যে মাণিকতলায় ভৈরব বারিকের ১০ নম্বর গৃহে কায়েমিভাবে পড়িয়া থাকিবে!

জন-হীন পথ। পথের দুধারে বড় বড় বাগান।..খানিকটা আসিবার পর তরুণী বলিল—ডাইনে গলি।

গলির মুখে প্রথম বাড়ী। সামনে বাগান। বাগানের মধ্যে একতলা বাড়ী। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায়, ছোট বাড়ী হইলেও বেশ সৌখীন রুচি-বিশিষ্ট।

ফটক বন্ধ। তরুণী কহিল—আমার কাছে চাবি আছে। সে অগ্রসর হইল।

বন্ধু যেন চেতনাহীন!..তরুণী ফিরিল, কহিল,—গাড়ীতেই বসে থাকবেন! নামবেন না?...

বন্ধু গাড়ী হইতে নামিল। তরুণী দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—কিন্তু তাইতো! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনাকে এখন নামালে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে। এদিকে ট্যাক্সিও মেলে না—কি করে ফিরবেন! বাড়ীর লোক দেরী দেখে কত ভাবচেন! না! তার চেয়ে

বন্ধু মুষড়াইয়া পড়িল। সে তো কাতর নয় তরুণীর কৃতজ্ঞতা-টুকুকে সার্থক করিয়া তুলিতে! বাড়ীতে কে-বা ভাবিবে! রাত্রে না ফিরিলে কি-বা ক্ষতি! কিন্তু তরুণীর এমন কথার উপর বলিতেও পারে না যে, না—আমি এখানেই থাকিয়া যাইতে পারি! তাহাতে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না!

তরুণী অনিন্দিতা কহিল—ট্যাক্সির ভাড়া কত হলো..?

দুই হাত জোড় করিয়া বন্ধু কহিল,—সেটা ..

তরুণী কহিল,—ও—তা, আচ্ছা। কিন্তু দেখুন, একটু দয়া করতে হবে ..বলুন, করবেন

সে একেবারে বন্ধুর দুই হাত চাপিয়া ধরিল। বন্ধুর সারা দেহ কাঁপিল!

বন্ধু কহিল—কি করতে হবে, বলুন।

অনিন্দিতা কহিল - কাল সকালে . না। সকালে বেরুবো। সন্ধ্যায়। হ্যাঁ, দয়া করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনাকে আসতে হবে। বাবা-মা ভারী খুশী হবে ..আমি তাদের বলবো, আপনার এ করুণা, এ মহত্ত্বের কথা। আর ট্যাক্সির ভাড়া যা পড়ে, মানে, আপনার বাড়ী অবধি—আপনাকে বলতে হবে। ভাড়া আজ আপনি দিন। কিন্তু এ ভাড়াটুকু আমায় চুকিয়ে দেবার অনুমতি দিতেই হবে—তা না দিলে আমি রাগ করবো. আপনার সঙ্গে আর কখনো কথা কবো না। বলুন, এতে রাজী ?

বঙ্কুর দুই হাত তখনো তরুণীর হাতের বন্ধনে। বঙ্কু কহিল—রাজী ..

· আচ্ছা, আজ তবে Good Night...

স্খলিত স্বরে বঙ্কু কহিল—Good Night.

তরুণী ফটকের চাবি খুলিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া বঙ্কুর হাত ধরিয়া কহিল—সত্যি. কাল আসবেন ? সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ?

—আসবো।

নিশ্চয় আসবেন। আমার এমন ভালো লাগচে। সত্যি . ঠিক যেন নভেল! না ? শেষটা এর কি হয়—ভারী মজার—না ?—বলিয়া তরুণী ফিরিল, ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল—বঙ্কু ট্যাক্সিতে চড়িয়া ড্রাইভারকে কহিল—চালাও শ্যামবাজার .

ট্যাক্সি চড়িয়া বঙ্কু চক্ষু মুদিল ! ..

২

কি করিয়া বঙ্কুর রাত্রি কাটিল, তার বর্ণনায় কাহাকেও যাতনা দিবার বাসনা নাই ! ভুক্তভোগী ভিন্ন বঙ্কুর সে অবস্থা কেহ বুঝিতেও পারিবে না !

সকালেও সেই বিহ্বলতা! আকাশ-বাতাস এক রাত্রে যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর চাকা ক'খানা সহসা যেন বিগড়াইয়া থামিয়া গিয়াছে—বেলা আর বাড়িতে চায় না! কখন সকাল হইয়াছে! দুপুরের দিকে সূর্য্যকে যে মধ্যগগনে আসিয়া হাজিরা দিতে হইবে, সূর্য্য তা ভুলিয়া গিয়াছে! অলস মন্থরভাবে সে ঐ বড় নারিকেল গাছগুলাকে আঁকড়াইয়া পূবের আকাশেই দাঁড়াইয়া আছে!

বিরক্ত চিত্তে বঙ্কু গিয়া ছাদে উঠিল—পথের কলরব, চীৎকার যতখানি এড়ানো যায়!

ছাদের কোণে বসিয়া সে গত রাত্রির কথা ভাবিতে লাগিল। ঘটনা সত্য! ভুল নাই! ব্যাগ হইতে ট্যাক্সিওয়ালাকে নগদ পাঁচ টাকা চার আনা গণিয়া দিয়াছে!...কি নিষ্ঠুর! সকালেই কেন যাইতে বলিল না! হা অনিন্দিতা, সারা বেলা বঙ্কুর কি করিয়া কাটিবে, কি দারুণ অধৈর্য্য তার বুকে—তা বুঝিলে না!

প্রাণে তার ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল! কবিতার ছন্দে সে-ভাব বাধাহীন বিপুল স্রোতে নাচিয়া ভাসিতে চায়!...

ঠিক! ওবেলায় অনিন্দিতাকে দেখাইবে. সে বলিয়াছে যেন নভেলের মত!

নিঃশব্দে ছাদ হইতে নামিয়া বঙ্কু নিজের ঘরে আসিল। খাতা টানিয়া কবিতা লিখিতে বসিল,—

জোস্‌না রাত্রি, বিপুল পন্থ, পান্থ চলেছে একা—
বক্ষে তাহার শত শত ভাব ছায়ার আখরে লেখা!
স্বপন-মগ্ন ভাব-বিলগ্ন সহসা আচম্বিতে
করুণ নয়নে চাহি তার পানে দাঁড়ালে, অনিন্দিতে!

স্বপ্ন ? না, মায়া ? কুহকের ছায়া ? তারকা পড়িল খসি ?
চেতন মিলিতে চেয়ে দেখি, হাসে ভূতলে গগন-শশী !

উমাপদ আসিয়া ডাকিল—বঙ্কু ..

ভৃত্যকে দিয়া বঙ্কু বলিয়া পাঠাইল—বল্, বাড়ী নেই ..

ভৃত্য একটা স্লিপ দিয়া কহিল,—বাবু চিঠি দিয়ে গেলেন ..

বঙ্কু স্লিপ পড়িল। উমাপদ লিখিয়াছে,—

কামাখ্যা হালদারের কাছে দুপুর বেলায় যাওয়া চাই। তাঁকেই সভাপতি করা হবে। তুমি আমি আর নেপাল তিনজনে যাবো। বেলা বারোটায় গাড়ী নিয়ে আসবো। আজ সভাপতি ঠিক করতে না পারলে কার্ড ছাপতে দেবো কবে? বাড়ী থেকো।

বঙ্কু জ্বলিয়া উঠিল। সভাপতি! এতটুকু দয়া নাই! তিনজনে যাইবার কি প্রয়োজন? সব বাড়াবাড়ি! ..

দুপুর বেলায় উমাপদ আসিল গাড়ী লইয়া। বঙ্কু বাহির হইল। ঘরে পড়িয়া থাকা চলে না—এভাবে প্রহর গণা অসম্ভব! শেষে কি পাগল হইবে!

সভাপতি স্থির করিতে, প্রেশে ঘুরিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। উমাপদ কহিল,—একবার মার্ত্তণ্ডর কাছে যাবে না? তার কাগজে একটা advance notice...

বঙ্কু কহিল—আমায় ক্ষমা করো ভাই...আমার ভারী মাথা ধরেছে। তা ছাড়া ..

উমাপদ কহিল—তাছাড়া কি ?

বঙ্কু কহিল—একটা বিশেষ engagement আছে...পরে বলবো'খন। সমিতির পক্ষেও মস্ত acquisitionএর সম্ভাবনা .

উমাপদ নির্ব্বাক নেত্রে ক্ষণেক বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,—বেশ ..

৩

সাজ-সজ্জায় একটু বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিয়া বঙ্কু পথে বাহির হইল এবং শ্যামবাজারের মোড় হইতে ট্যাক্সি লইয়া চলিল মাণিকতলার বাগানে—কৃতজ্ঞতার পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিতে। ..

গলির মুখে সেই বাগান-বাড়ী। ফটকের সামনে গাড়ী হইতে নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বঙ্কু বাগানে প্রবেশ করিল। মালী সামনে ছিল, কহিল—আসুন

বঙ্কুর বুক কাঁপিতেছিল। তাকে আনিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়া মালী বিদায় লইল। বঙ্কু সপ্রতিভ দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল।

অল্প হইলেও সৌখীন আসবাব-পত্র। তবে গৃহে এতটুকু কলরব নাই! একধারে একটা শেল্‌ফ। শেল্‌ফে কতকগুলা বই। ঝকঝকে বাঁধানো। উঠিয়া বঙ্কু শেল্‌ফ হইতে একখানা বই টানিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি মিষ্ট বাণী—এই যে এসেছেন!

বঙ্কুর হাত কাঁপিল; বইখানা পড়িয়া গেল। বইখানি তুলিয়া শেল্‌ফে রাখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। সামনে অনিন্দিতা দেবী! রূপের প্রভা ঝলমল করিতেছে—বিজলী-বাতি সে রূপের পাশে ম্লান বোধ হইল।

অনিন্দিতা কহিল—বসুন...

বঙ্কু বসিল। অনিন্দিতা সামনের কৌচে বসিল, কহিল—আপনাকে disappoint করলুম। বাড়ীতে কেউ নেই। এক আত্মীয়ের বড় অসুখ। সকলে সেখানে। আমিও গেছলুম।

ঘণ্টাখানেক হলো ফিরেচি। আপনার সঙ্গে engagement, আপনাকে আসতে বলেছি, তাই।

কৃতজ্ঞতায় বঙ্কুর প্রাণ ভরিয়া উঠিল। অনিন্দিতা কহিল—চা খান—আনি।

অনিন্দিতা উঠিয়া গেল। বঙ্কু ভাবিল, চমৎকার হইয়াছে! একান্তে তরুণীর কাছে সে আপনার পরিচয় বিশদভাবে দিতে পারিবে...মন তার সাহিত্য-রসে কতখানি রসালো—নারীর প্রতি প্রীতি-প্রেমে প্রাণ কতখানি পরিপূর্ণ...নারী-প্রগতির দিকে তার উৎসাহ কত প্রচণ্ড...

অনিন্দিতা ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—ভালো কথা, কাল ট্যাক্সি ভাড়া কত দিলেন?

বঙ্কু কহিল—সে তো দেওয়া হয়ে গেছে।

—তা হোক। সে ভাড়া আমার দেওয়া উচিত...

বঙ্কু কহিল—না হয় এ সামান্য কাজটুকু . সেজন্য কতবার যে হাত জোড় করেছি ..তার স্বরে মিনতি।

অনিন্দিতা কহিল—না, না, সে কি...প্রথম আলাপেই আপনার কাছে...

করুণ মিনতি-ভরা স্বরে বঙ্কু কহিল,—আমি করজোড়ে প্রার্থনা করচি

—না, এ ভারী অন্যায় কিন্তু! আপনার কথায় 'না' বলতে পারবো না, জানেন! কিন্তু এমন অন্যায় অনুরোধ আর কখনো করবেন না তা বলে ..

বঙ্কু কহিল, বেশ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করবার সুযোগ দেবেন ..

তরুণীর চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! বন্ধুর প্রাণ পুলকে ভরিল।

চা আসিল,—সেই সঙ্গে টোষ্ট, ডিম, কেক...

তারপর কাব্য-লোকে উধাও যাত্রা!

অনিন্দিতা কহিল—আপনি লেখেন, বলছিলেন না?

বন্ধু কহিল—লিখি।...

—গল্প? না, কবিতা?

—দুই।

অনিন্দিতা কহিল—আমার বড্ড সখ, লিখি। লেখার সময় খুব—কিন্তু লিখতে পারি না।

বন্ধু কহিল—লিখতে পারেন না—ও কথাই নয়! লেখার ইচ্ছা যখন আছে, তখন লেখেন না কেন! না লেখা অপরাধ!

—এত লোক তো লিখচে। সব কি ভালো? জঞ্জালের সৃষ্টিও হচ্ছে! আমি আর জঞ্জাল বাড়াই কেন?

বন্ধু কহিল,—আপনার লেখা জঞ্জাল হতে পারে না।

—কেন?...

—কেন! —বন্ধু অনিন্দিতার পানে চাহিয়া কহিল—আপনার মুখে cultureএর সুস্পষ্ট রেখা! কথায়...

কথায় কি, বন্ধু ভাবিয়া পাইল না।

—যান! কি যে বলেন! মৃদু হাস্যে অনিন্দিতা জানালার দিকে মুখ ফিরাইল।

বন্ধু তার পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টি মুগ্ধ, বিহ্বল!

অনিন্দিতা কহিল,—কালকের কাহিনীটুকু লিখবো ভাবছিলুম। কিন্তু এই বাড়ী আসা অবধি—ব্যস্—তারপর কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না!

বন্ধু কহিল—হুঁ—

সেও তা ভাবিয়াছে। তারপর কি—কল্পনার তুলি লইয়া বহু ছবি আঁকিয়াছে! দুটী হৃদয়, তরুণ হৃদয়, একান্ত কাছাকাছি, পাশাপাশি,—হৃদয়ের আকুলতা—রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই বিশ্ব-ভুবন, চাঁদের আলো, বিহ্বল রাত্রি, বিরহ-বেদনা! শেষে...কিন্তু দুম করিয়া সে কথা বলা চলে না! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—আচ্ছা, আপনি লিখুন, আমিও লিখি। দেখা যাক্—কি হয়!

—তারপর কি লিখবো, একটু suggestion দিন্ না!

বন্ধু কহিল—ধরুন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন, আমি এসেচি, এবং নিত্য এই আসা-যাওয়া! বন্ধু থামিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—এই তো লেখবার জিনিষ পেলেন...

অনিন্দিতা কহিল,—তারপর?

বন্ধু কহিল,—এই থেকে ইচ্ছামত develop করে তুলবেন।

অনিন্দিতা কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল—আপনি লিখুন—আমি পারবো না...সত্যি পারবো না। তবে মনে হয়, এ তো ঠিক হচ্ছে ..এর পরে এই, তারপর তাই...কিছু নিজে থেকে লিখতে বসি যদি, ভেবে লেখার কিছু মেলে না!

বন্ধু কহিল,—হুঁ...

দুজনে আবার স্তব্ধ। অনিন্দিতা কহিল—লিখবেন তো?

—লিখবো।

—শীগ্‌গির লিখবেন। দেরী নয়।

বন্ধু কহিল—না।...

তারপর বাড়ীর পরিচয়—কে আছে, আত্মীয়-স্বজন, কোথায় বাড়ী—ভবিষ্যতের স্বপন-ছবি ..

শুনিয়া অনিন্দিতা কহিল—এখনো বিয়ে করেন নি! আশ্চর্য্য তো!

বন্ধু কহিল—আপনার বিবাহ হয়েছে?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর দৃষ্টি পড়িল অনিন্দিতার সীমন্তের দিকে! সিন্দূরের বিন্দু? অতি মৃদু রেখায় . ঐ না . ! হ্যাঁ।

অনিন্দিতা একটা নিশ্বাস ফেলিল,—নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বিয়ে ঐ নামে। স্বামী কি, জানি না ! একটা হৃদয়হীন দুর্ব্বৃত্ত ..! স্বামীর জন্য কোনো অভাবও বুঝি না! বেশ আছি। মা-বাপের আদরে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছি।...ভুল! বিয়ে করতেই হবে... কেন? স্বামী সহায় কেন? না। স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করে না আমাদের দেশে, তাই! কিন্তু যদি কোনো স্ত্রীলোকের সে অভাব না থাকে—স্বামীতে তার কি প্রয়োজন?

বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধু অনিন্দিতার পানে চাহিল, কহিল—শুধু আশ্রয়ই?

তার কথা বাধিয়া গেল। অনিন্দিতা কহিল—আপনি বলতে চান, ভালোবাসা ..?

বন্ধু ঘাড় নাড়িল, তাই!

অনিন্দিতা কহিল—ভালোবাসার অভাব কি? মা, বাপ, ভাই. বন্ধু...আমি তো পুরুষের সঙ্গে মিশি ..বেশ অসঙ্কোচে—কোনো দুর্ব্বলতা কখনো জাগে নি...অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত তো...

অনিন্দিতা মৃদু হাসিল।

বন্ধু তার পানে চাহিয়া চোখে তেমনি অনিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টি!

অনিন্দিতা বন্ধুর দিকে চাহিল, কহিল তর্ক থাক্। চলুন, গান শুনবেন।

—অনুগ্রহ !

অনিন্দিতা কহিল—আসুন...

অনিন্দিতা উঠিল,—বন্ধুও ! অনিন্দিতা হার্ম্মোনিয়মের পাশে বসিল ; বন্ধুকে কহিল,—বসুন...

বন্ধু বসিল। অনিন্দিতা হার্ম্মোনিয়মের সামনে বসিয়া গান ধরিল...

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ !
সে তো এলো না—যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ-মন দেহ !

বন্ধুর স্থূল শরীর চেয়ারে বসিয়া রহিল—মন গানের সুরে কোন্ ছায়াময়ী অমরার পথে উড়িয়া চলিল।

গান থামিলে বন্ধু কহিল— রবিবাবুর গান ?

অনিন্দিতা কহিল,—তাই। এমন প্রাণের কথা আর কেউ বলতে পারে ?

বন্ধু কহিল আজ-কাল অনেকেই বলচে। অনেকে কেন— আমরা বলতে সুরু করেচি, আরো স্পষ্ট করে, আরো জোরালো ভাষায় !

—বটে ! অনিন্দিতা কহিল,—আমায় পড়াবেন তো আপনার কবিতা !

৪

পরের দিন আবার আসিতে হইল অযাচিত, বিনা-নিমন্ত্রণে। না আসিয়া থাকা যায় না ! গৃহে অনিন্দিতা একা। বন্ধু কহিল—খপর নিতে এলুম—আপনার সেই আত্মীয়ের অসুখ...কেমন আছেন ?

অনিন্দিতা কহিল,—ভালো আছে।

বন্ধু কহিল—আসি ..

অনিন্দিতা কহিল,—সে কি, এলেন—বসবেন না ?

বসিতে হইল। অনিন্দিতা কহিল,—একা এমন বিশ্রী লাগে! রাত্রেও তাই ..এমন নিঃসঙ্গ কখনো থাকিনি। তাছাড়া এ দু'দিন .. অনিন্দিতা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিল।

করুণ সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে বন্ধু তার পানে চাহিল, কহিল—আপনার বাবা-মা কবে ফিরবেন ?

অনিন্দিতা কহিল—একটু ভালো না দেখে তো ফিরতে পারেন না।

—আপনার সেই দাদা ?

—তাঁরই শ্বশুরের অসুখ। কাজেই বৌদি-দাদা সেখানে আছে। শ্বশুরের আর কেউ নেই। ঐ একটি মেয়ে—বৌদি ..

—ও !......

রাত্রে মন তেমনি আকুল! কিন্তু কি বলিয়া যায়! বন্ধু অধীর ভাবে একখানা নভেলের পাতা উল্টাইতে লাগিল ; এবং সেই অবসরে গভীর নিদ্রা ..

পরের দিন আবার মাণিকতলার বাগান ..

অনিন্দিতা কহিল—ভালো লাগে না। আমার বারণ সেখানে যাওয়া। টাইফয়েড্ কেশ্ কি না ..অথচ এমন একা ..

বন্ধু বসিল। অনিন্দিতা কহিল—আপনি আর আসবেন না বন্ধু বাবু ..সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস !

বন্ধু অবাক! অনিন্দিতা কহিল—আপনার সঙ্গে দু'দিন মাত্র আলাপ—তবু মনে হয়, যেন কত কালের পরিচয়! অনিন্দিতা

শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আপনার জন্য মন এমন অস্থির হয়...কখন আসবেন! চলে গেলে এমন ফাঁকা ঠেকে! এ দুর্ব্বলতা। এ-দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়...

একটা নিশ্বাস চাপিয়া বন্ধু কহিল—আমাকে চিরদিন পাশে স্থান দিতে আপত্তি আছে? বন্ধু বলে'...আত্মীয় বলে' ?

—বন্ধু! না—না—ভাবছি, আপনার কাছে একটু লিখতে শিখবো। শেখাবেন? ঐ লেখার মধ্যেই নিজের মহা-দুঃখ ডুবিয়ে দেবো...

—বেশ!...

আরো কথাবার্ত্তা—দেশের নারীর দুর্দ্দশার বিবিধ আলোচনা...

অনিন্দিতা কহিল—সন্ধ্যার পর আসবেন? এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন, তারপর বায়োস্কোপে যাবো। এমনি করে যতটা সময় কাটে! অনিন্দিতা বন্ধুর পানে চাহিল—তার চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়ার যত ব্যথা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

বন্ধু কহিল,—আসবো এলে যদি আপনি ভালো থাকেন আমার এ কর্ত্তব্য!

আনমনে অনিন্দিতা কহিল,—আসবেন।

৫

সন্ধ্যার পর সাজ-পোষাকে আরো ঘটা। বন্ধু শচীকান্তর সদ্য বিবাহ হইয়াছে। তার ঘড়ি, চেন, আংটি ধার লইতে বন্ধু দ্বিধা করে নাই...বায়োস্কোপে যাইবে—সঙ্গে তরুণী রূপসী সখী!

আহারাদির পর অনিন্দিতা কহিল—এখনো দেরী আছে। একটু বাগানে বেড়াবেন?

---চলুন ..

মালতীর ঝাড়ে ফুলের রাশ ..জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া বাগানের যা শোভা হইয়াছে, অপূর্ব্ব !

অদূরে শাণ-বাঁধানো ছোট পুকুর। দু'জনে গিয়া ঘাটে বসিল। দূরে এ্যামেচার থিয়েটারের আখড়া; সেখান হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল...

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান !

বঙ্কু ও অনিন্দিতা দুজনেই স্তব্ধ, মৌন ..বঙ্কুর মনে একরাশ বাসনা মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল।

সহসা একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অনিন্দিতা ডাকিল—বঙ্কুবাবু . কম্পিত স্বর !

বঙ্কু কহিল---কি বলচেন ? তার স্বর গাঢ় !

অনিন্দিতা একেবারে তার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কহিল—বিবাহের মন্ত্রই কি দুনিয়ায় সব-চেয়ে বড় ? প্রাণের এই আকুলতা ..মনের এই গভীর আবেগ ! এ-সবের কোনো দাম নেই ?

বঙ্কু কহিল—নিশ্চয় আছে। এই আবেগই মিলনের অমোঘ মন্ত্র...সে অনিন্দিতার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কহিল,—অনিন্দিতা, দেবি, আমি তোমায় ভালোবাসি...

অনিন্দিতার করুণ নয়নের দৃষ্টি ..ঐ আবেশ-ভরা মুখ...বঙ্কুর চিত্তে উন্মাদনা জাগাইল। সে ডাকিল,—অনিন্দিতা, দেবি...

হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় বাজ পড়িল...কি বিকট গর্জ্জন,—কে তুই !

চমকিয়া বন্ধু চাহিয়া দেখে, আকাশের বাজ নয়! একটা জুয়ান লোক...তার কণ্ঠে ঐ বজ্রস্বর! এক হাতে লোকটা বন্ধুর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, অপর হাতে পিস্তল! লোকটা কহিল—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোর কিসের আলাপ...

বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল—অনিন্দিতা ছুটিয়া পলাইল।

লোকটা বন্ধুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল - যদি পুলিশে দি?

এক-আকাশ জ্যোৎস্না ফাঁশিয়া চুর হইয়া গেল।...বন্ধুর সামনে আলোর দুনিয়া ভূমিকম্পে দুলিয়া কোন্ আঁধার পাতালে নামিয়া চলিল! এ কি সত্য...না...

সত্যই! কঠিন সত্য! লোকটা কহিল—যা কিছু আছে—দে... কোনো দয়া নয়। না দিস, পুলিশে যাবি ..

সারা পৃথিবী রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। মন্ত্র-চালিতের মত ঘড়ি চেন আংটি টাকা-কড়ি যা কিছু ছিল, বন্ধুকে সঁপিয়া দিতে হইল।

লোকটা বন্ধুর ঘাড় ধরিয়া বাগানের ফটক পার করিয়া দিল; কহিল—ফের যদি এ-মুখো হবি, জান যাবে! হুঁশিয়ার!

সিক্ত মার্জ্জারের মত নিঃশব্দে বন্ধু বাহির হইয়া গেল...

দুদিন পরের কথা। 'ভাব-বন্যা'র মিটিং। বন্ধু সে মিটিং তুচ্ছ করিয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। আর এখানে নয়! রোমান্সের পিছনে এত বড়...

ভৃত্য আসিয়া একখানা চিঠি দিল। ডাকে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া বঙ্কু দেখে, লেখা আছে—

কিছু মনে করিবেন না। প্রাণে দৌর্ব্বল্য জাগিতেছিল, ভগবান তাই রুদ্র মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। আবার দেখা হইবে কি না, জানি না। তবে একটা কথা,--যদি কোনো অসহায়া তরুণীকে বিপদে রক্ষা করিবার সুযোগ আবার কোনো দিন ঘটে, তার মন-হরণের চেষ্টা করিবেন না। নারী কৌতুকময়ী, নারী পাষাণী, নারী হেঁয়ালি—এ কথাগুলো বোধ হয় একদম্ মিথ্যা নয়।

অনিন্দিতা।

চিঠিখানা ছিঁড়িয়া বঙ্কু বিছানার মোট বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'গীতা'র ব্যাখ্যা চলিতেছে। গীতা ও যুক্তিবাদের সহিত উপনিষৎ, যোগ, সাংখ্য, অধি-বাদ. ওঙ্কারবাদ, অবতারতত্ত্ব—একে একে সকলেই সমুপস্থিত। ক্রমণীর সোপানে এবার চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আরোহণ করিয়াছে। পরা ও অপরার সম্বন্ধ নির্ণায়ক নিলে'খে সকল তত্ত্ব পুরুষোত্তমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

* * *

আষাঢ়ের 'পঞ্চপুষ্পে' শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ অশ্বঘোষ কৃত 'বুদ্ধচরিতে'র বঙ্গানুবাদে হাত দিয়াছেন। "যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রী ধারণ করিয়া বিধাতাকেও জয় করিয়াছেন, যিনি অন্ধকার বা অজ্ঞান নিরস্ত করিয়া সূর্য্যদেবকেও পরাভূত করিয়াছেন, যিনি তাপ বিনষ্ট করিয়া মনোহর শশাঙ্ককেও পরাজিত করিয়াছেন, এই জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধদেবকে আমি বন্দনা করি।"

* * *

'বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাট্য-শালার ইতিহাস' এখনও শেষ হয় নাই।

* * *

আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস সুরু হইল। 'শেষের পরিচয়ে' আগের শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলে পাঠকের আর সুখের সীমা থাকিবে না।

* * *

মানুষের দশ দশা। লোকেও বলে, সেক্ষপীয়রও সাক্ষী। 'বিচিত্রা'য় আমাদের একান্তপরিচিত প্রিয় 'শ্রীকান্ত' সবে মাত্র চতুর্থ দশায় উপনীত হইল জানিতে পারিয়া লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুস্থ হইবে ; সুস্থির হইতে পারিবে কি ?

* * *

কেমন বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, বাজারে যার অসম্ভব কাট্‌তি, অর্থাৎ যে বই best seller, সাহিত্য-হিসাবে তাহা কখনও উৎকৃষ্ট হয় না। এরিক্ ম্যারায়া রেমার্কে'র বিচিত্র কাহিনী, All Quiet on the Western Front আমার সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছে।

* * *

সাংবাদিক, বক্তা ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতাও যে একান্ত রসিক সাহিত্যিক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ রসজ্ঞ চিন্তাবীর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁহার পরলোকগমনে প্রবন্ধসাহিত্যের এক দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার জীবন-কথা জীবনস্মৃতিপরিচায়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে তাঁহার প্রীতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকেও অনুপ্রাণিত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিপিনচন্দ্রের মত দ্বিতীয় বাংলা বক্তা আমি আর দেখি নাই। উৎস-উচ্ছ্বসিত নির্ঝরধারার মত তাঁহার বক্তৃতা সভাস্থলে প্লাবিত করিয়া দিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠ তূরীর মত তীব্র-মধুর মন্দ্রে বাজিতে থাকিত।

* * *

জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত ক্রীড়াক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে প্রতিভার উদয় হয়। ফুটবল-ফিল্ডে পরলোকগত শিবদাস ভাদুড়ীর ছিল এমনি নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। সাহেব অথবা স্বদেশী কোনও খেলোয়াড়ের সহিত তাঁহার খেলা উপমিত হইতে পারে না। শিবদাসের তুলনা শিবদাস। বল কখনও তাঁহার পায়ে জড়াইয়া থাকিত না, সে যেন এই বিদ্যুৎগতি, শ্যেনচক্ষু, শ্যামবর্ণ কিঞ্চিৎআনতদেহ, দীর্ঘ, কৃশ মানুষটির যাদুমন্ত্রের নির্দ্দেশে সমুখে সমুখে ছুটিতে থাকিত। যাইতে যাইতে হঠাৎ যখন ভাদুড়ী পশ্চাদ্ধাবিত অপ্রতিভ প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে হাস্যপ্রদীপ্ত চোখ ফিরাইয়া সকৌতুকে চাহিত, তখন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকগণের সমবেত কণ্ঠ হইতে উত্থিত এক বিরাট জয়ধ্বনি সারা মাঠ জুড়িয়া অনুরণিত হইতে থাকিত, 'শিবদাস, শিবদাস।' বিলাতে গেলে ক্রিকেটের 'রঞ্জি'র মত ফুটবলের শিবদাস ভাদুড়ীর নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হইত। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়ানায়কের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকুক।

* * *

এবার আষাঢ়ের পূর্ণিমা ছিল চৈত্রপূর্ণিমার মত অম্লান। মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সিক্ত হইয়া যামিনী প্রতীক্ষাতুরা বিরহিণীর মত দণ্ড গণনা করে নাই। বৃষ্টির জলে ধুইয়া যুথিপরিমল সিক্ত মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। পঞ্চশরকে যিনি দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারই ললাটনেত্রোদ্গত বহ্নির একটু কণিকা কোথায় ঠিকরিয়া পড়িয়াছিল, তাই বাতাসে বহিতেছিল আগুনের হল্‌কা। আকাশের দু'এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ সভয়ে আসিয়া সহসা কোথায় সরিয়া গেল, কেহ তাহায় ঠিকানা পাইল না।

ধারাস্নানের অবসর আসিল না দেখিয়া জাগ্রত জগন্নাথ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া তিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। বর্ষারাত্রি নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে বিলীন হইয়া গেল।

*   *   *

এমনি নিদারুণ নিদাঘেই কি একদিন মেঘের আভাস পাইয়া সুদূর সাগরপারে শেলী গাহিয়াছিল, "সাগর আর স্রোতস্বতী হইতে বারি আহরণ করিয়া নবীনধারাবর্ষণে আমি তৃষার্ত্ত কুসুমের পিপাসা মিটাই, মধ্যাহ্নস্বপ্নাতুর বিশ্রান্ত পাতাগুলির উপর আমি লঘুচ্ছায়া বিস্তার করি।"—

I bring fresh showers for the thirsting flowers
From the seas and the streams ;
I bear light shade for the leaves when laid
In their noonday dreams.

ছোট গল্প

প্রতি শনিবার বাহির হইবে

১৩৩৯ সালের পয়লা আষাঢ় বর্ষারম্ভ

প্রতি সংখ্যা—এক আনা

—বার্ষিক মূল্য—

কলিকাতায় ৩।০ ভি-পি-যোগে ৩৸৵০

মনিঅর্ডারে ৩৸০

বিজ্ঞাপনের হার

—প্রতি সংখ্যা—

পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫৲ সিকি পৃষ্ঠা ৩।০

কণ্ট্রাক্ট ও কভারের জন্য স্বতন্ত্র পত্র লিখুন

নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ
সকল জ্ঞাতব্য অবগত হইবেন

কথক সঙ্ঘ

২, লায়ন্‌স্ রেঞ্জ, কলিকাতা
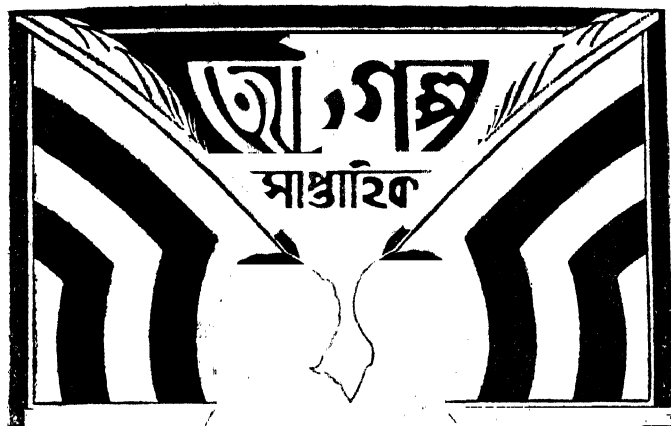
১ম বর্ষ] ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৯ [৩য় সংখ্যা

ছায়া

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

ইংরিজি-সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ছে, নাম উর্ম্মিলা, দেখতে বাঙালি মেয়ের পক্ষে সুন্দরীই বলতে হবে—যদি অবিশ্যি সৌন্দর্য্য রূপে না হ'য়ে রেখায় হয়, বর্ণে না হ'য়ে হয় লাবণ্যে—বেশ নম্র, মিতভাষী; কথায়-বার্ত্তায় উজ্জ্বলতা আছে, উগ্রতা নেই; এতোখানি লেখা-পড়া শেখা তা'র ব্যর্থ হয় নি।

ভাইয়ের জন্যে কল্‌কাতা থেকে মেয়ে দেখে এসে ব্রজেনবাবু মা ও স্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন। হিমাদ্রি পাশের ঘরে ব'সে কাণ খাড়া ক'রে শুনছিলো।

এক পিঠ ঘন চুলের ঢেউ, হ্রস্বতার লজ্জা ঢাকবার জন্যে খোঁপা বেঁধে কাঁটা গুঁজে আসে নি ; পাছে হাঁটিয়ে দেখাতে হয় সেই ভয়ে লম্বা বারান্দার একেবারে এক প্রান্তে মেয়ে দেখার জায়গা করা হয়েছিলো—নিজেই মেয়েকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ পা হেঁটে আসতে হয়েছে—বেশ সাবলীল অকুণ্ঠিত তার চলা ; গান গাইতে বলার পর সে আধুনিক বিকৃত রুচির গজল-ঠুংরি না গেয়ে দিব্যি স্বদেশী গান ধরলো দানাদার দরাজ গলায় ব্রজেনবাবু মেয়েটির করতল দু'টিও সম্পূর্ণ অনুভব ক'রে এসেছেন—কোথাও এতটুকু কর্কশ ঠেকলো না। চমৎকার মেয়ে, ফার্ষ্ট-রেট্ মেয়ে।

তার আরো কারণ ছিলো। তাঁরা জানেন প্রতিযোগিতার যা বাজার, বিয়ের পণ তাঁদের দিতেই হবে। এখন সকল ঘরেই মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, বাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য্যের যেটুকু স্বাভাবিক ত্রুটি, বিদ্যাচর্চ্চার রঙিন মোহ দিয়ে তা সাম্‌লে না নিলে চলছে না। সবায়েরই ঘরে যখন এই অবস্থা তখন টাকার কথা তেমনি এসে যাচ্ছে। সাপ্লাই-এর বাজারে তারতম্য ঘট্‌ছে না ব'লেই এটা আর উঠ্‌লো না। আপাততো ব্রজেনবাবুদের পক্ষে তা ভালোই—হিমাদ্রির বিলেত যাওয়ার খরচ দিতে তাঁরা রাজি। হিমাদ্রির একটা পি-এইচ-ডি হ'য়ে আস্‌তে-আস্‌তে উর্ম্মিলা এম-এ টা পাশ ক'রে নিতে পারবে। তার জন্যেও ব্রজেনবাবুদের ভাবতে হবে না।

আর এই তার হাতের লেখার নমুনা। হস্তলিপি যে কতো বড়ো চরিত্র-নির্ণেতা সেই বিষয়ে ব্রজেনবাবুর সন্দেহ নেই। প্রতিটি অক্ষর নিটোল, পরিস্ফুট—অক্ষরের প্রতিটি রেখায় চিত্তের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। বি-এ পড়ছে মেয়ে—বানান-ভুল হবে

কেন, কিন্তু প্রত্যেকটি সুগঠিত অক্ষরে, পারস্পরিক সমান্তরাল ব্যবধানে, সরল সুসম্বদ্ধ লাইনে, সর্ব্বোপরি নির্ম্মল পরিচ্ছন্নতায় তার উদারতা ও প্রসন্নতা, সেবা ও দাক্ষিণ্য সূচিত হচ্ছে। কবিতায় যেমন দেখতে হয় ছন্দ নয়, ভঙ্গি ; নাটকে যেমন দেখতে হয় ক্রিয়া নয়, আবহাওয়া ; গানে যেমন দেখতে হয় সুর নয়, প্রকাশ ; তেমনি মেয়ে-নির্ব্বাচনের বেলায় দেখতে হয় রূপ নয়, পরিবার। সে-দিক দিয়েও উর্ম্মিলা ফার্ষ্ট-রেট্।

বৌদিদি উর্ম্মিলার হাতের লেখার নমুনাটি হিমাদ্রির চোখের তলায় এনে ধরলেন। হিমাদ্রি কাগজের টুকরোটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দিলে। বৌদিদির সঙ্গে অন্য সব মামুলি রসিকতার ফাঁকে হিমাদ্রি যে-মতটা কঠিন গলায় জাহির করলে, বল্‌তে কি,—তার মধ্যেও কোনো মৌলিকতা নেই। গলায় জোর থাকলেই মতের মূল্য বাড়ে না। হিমাদ্রি বল্‌লে,—যে-মেয়ে বিজিত হবার অপেক্ষা না রেখে নিজে এসে সেধে বশ্যতা স্বীকার করে তার প্রতি আমার রুচি নেই। দাদাকে ব'লো বিনা দামে কোনো সম্পদই আমি লাভ করতে চাই না।

এমন কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল ছেলেই ব'লে থাকে এবং তারাই কালক্রমে স্ত্রীর কথায় ওঠ্-বোস্ করে—বৌদিদি অনেক দেখেছেন, আরো কত দেখবেন। তাই সারা শরীরে চাপা হাসির একটা ঢেউ তুলে বৌদিদি অন্তর্হিত হ'লেন,—কাগজের টুকরাটা হিমাদ্রির টেবিলের উপর তেমনি প'ড়ে রইলো।

অবিশ্যি কাগজের টুকরোটা তুলে মেয়েটির হাতের লেখায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বিবাহ-সম্বন্ধে হিমাদ্রির কঠিন মতটা ফিকে হ'য়ে যাবে না। যাই বলো, হাতের লেখাটি সুন্দরই বলতে

হবে—যদিও মুক্তোর সারের সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা বাড়াবাড়ি। দু'রকম নমুনা দেওয়া আছে—ইংরিজি আর বাঙলা। ইংরিজিতে হচ্ছে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার চারিটি লাইন—যেখানে প্রোটিসেলিয়াস্ তার স্ত্রীকে কামনাকুলতা সংযত করতে বলছে, কেন-না দেবতারা প্রেমের গভীরতা ভালো বাসেন, শরীরের উত্তাপকে নয়। কোটেশান্‌টা প'ড়ে হিমাদ্রি গোড়ায় প্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো, বিশেষ এই লাইন-চারটিকে উদ্ধৃত করার হেতু খুঁজে না পেয়ে; কিন্তু চট্ ক'রে তা'র মনে প'ড়ে গেলো ওয়ার্ডসোয়ার্থের ঐ কবিতাটা গেলো-বছরে আই-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিলো। একটা-কিছু কারণ তা হ'লে আছে। হিমাদ্রি মনে মনে হেসে কাগজটা উল্‌টোলো; দেখা যাক্ বাঙলায় সে কোন্ কবিকে ধন্য করেছে। ঈশ্বরগুপ্ত না রবীন্দ্রনাথ! (দুইই তাদের পাঠ্য।) পৃষ্ঠা উল্‌টে হিমাদ্রি অবাক হ'য়ে গেলো;—কোনো কবিতা থেকে উদ্ধৃত নয়, স্বরচিত কোনো ভাবগর্ভ বাণী নয়—টানা ডাগর অক্ষরে খালি নিজের নামটুকু—উর্ম্মিলা। নিতান্তই সে যে শ্রীমতী, বা নিতান্তই সে যে বিশেষ কোনো গোত্রান্তর্ভুক্তা তার এতটুকু পরিচয় নেই—শুধু সে উর্ম্মিলা।

অক্ষর থেকে হিমাদ্রি সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না। বাঁকা-চোরা রেখার প্রতিটি বঙ্কিমা অপরিস্ফুট ইঙ্গিতের মতো তার মনে হ'তে লাগলো। যেন ঐ অক্ষর তিনটিতে উর্ম্মিলার সমস্ত যৌবন অলক্ষ্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। বাঙলা লিখতে এসে সে আর প্রোটিসেলিয়াস্-এর উপদেশ মনে ক'রে সংযত স্তব্ধ থাকতে পারে নি, সামান্য তিনটি অক্ষরে তার কামনার সমুদ্রকে উদ্বেল উন্মুখর ক'রে দিয়েছে। বাঙলা লিখতে হবে মনে ক'রে

সে আর অপরিচয়ের দূরত্ব রাখলো না, গোপনে কখন হৃদয়ের প্রতিবেশিনী হ'য়ে উঠলো। সাদা প্রকাণ্ড পৃষ্ঠাটায় শুধু লেখা উর্ম্মিলা—যেন এইমাত্র দীর্ঘ চিঠি শেষ ক'রে ইতিতে সে শুধু তার নামটি লিখে দিয়েছে। চিঠির কী সে ভাষা হিমাদ্রি তা যেন এক নিমেষে প'ড়ে উঠলো।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চাকর ঘরে আলো দিয়ে যায়নি। অক্ষর আর স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু কাগজের থেকে চোখ তুলে চাইতেই হিমাদ্রি দেখতে পেলো অক্ষর তিনটি তার সামনে একটি প্রত্যক্ষ প্রাণবন্ত নারীমূর্ত্তিতে লীলান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। অথচ কী যে তার রূপ বা রঙ, বেশ বা বয়স কিছুই স্পষ্ট ধারণা হলো না—স্তিমিতগতি নদীধারার মতো কয়েকটি রেখার ঢেউ মুহূর্ত্তে আবার ভেঙে-ভেঙে ছিটিয়ে পড়লো,—ঘর জুড়ে অন্ধকার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

ঐ পর্য্যন্তই। তাই ব'লে সেই রেখার টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্র ক'রে উর্ম্মিলাকে স্থূল, মাংসল ক'রে তুলে একেবারে নিঃশেষ-আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে হিমাদ্রির রুচিতে তা বাধলো। প্রবলকণ্ঠে বিয়েতে সে অসম্মতি জানালে।

যুক্তিগুলোও তার আধুনিক কালের অনুকূল নয়। যে মেয়েকে সে বিয়ে করবে তাকে সে নিজে নির্ব্বাচন করবে, সৃষ্টি করবে,—রূপের রীতিবিচারটা তার কাছে আলাদা রকম। আর, বিলেত যদি সে যেতেই চায় তবে নিজেই যেতে পারে ইচ্ছা করলে—বাবা সেই জন্যে তার অংশে মোটা টাকা রেখে গেছেন। নিজের স্ত্রীর জন্যে অন্যের রুচির উপর নির্ভর করা ও বিলেত যাওয়ার জন্যে শ্বশুরের টাকার মুখাপেক্ষী হওয়া—দুটোই সমান অপমানকর।

এমন মূর্খও কি না কেউ আছে। বেশ ত', নিজেই হিমাদ্রি ঊর্ম্মিলাকে দেখে আস্থক না। ছি ছি, ভাবতেও ঘৃণায় হিমাদ্রির গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। শাখাপত্রবহুল অরণ্যের ফাঁকে চন্দ্রোদয়ের ভিতর রমণীয় একটি যাদু আছে, কিন্তু দিগন্ত-উন্মুক্ত উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ওপর নিরাবরণ পূর্ণিমায় আছে প্রগলভ নির্লজ্জতা। সেই যে ঊর্ম্মিলা বহুবসনে কুণ্ঠিতা হ'য়ে তার সামনে চোখ নামিয়ে বসবে—তার সেই উপস্থিতিটা অতিমাত্রায় স্থূল, অতিমাত্রায় শরীরী, অতিমাত্রায় অপরিচ্ছন্ন। যতক্ষণ হিমাদ্রি কিছু কথা না কইবে ততোক্ষণ সে মুখ তুলবে না—সেই কৃত্রিম কঠোর স্তব্ধতায় একটা আবরণহীন কদর্য্যতা থাকবে,—সে-স্তব্ধতা অতিমাত্রায় মুখর, তার অর্থ অতিমাত্রায় স্পষ্ট, রূঢ়, অবারিত। এই অপমান ঊর্ম্মিলাকে না করলেও হিমাদ্রিকে দংশন করছে। তার চেয়ে ভাঙা-ভাঙা পরিচয়ের ফাঁকে ঊর্ম্মিলাকে যদি সে দেখতে পেতো, তা হ'লে তার সেই অটল উলঙ্গ স্তব্ধতার ওপর চুপে চুপে নামতো একটি অসম্পূর্ণ হাসি, মুহূর্ত্তে সে কাঠিন্য হ'তো স্বচ্ছ, স্তব্ধতা তখন মাত্র শারীরিক উপস্থিতি হ'য়ে থাকতো না; তখন তা হ'তো গভীর হৃদয়ানুভূতির নামান্তর।

অতএব ঊর্ম্মিলাকে নিয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে হিমাদ্রির একটা বচসা হ'য়ে গেলো। এবং তারই ধাক্কায় হিমাদ্রি ছিট্‌কে পড়লো একেবারে বাইরে—নিরাত্মীয় লোকারণ্যের মাঝে। হাত-পা তাঁর ফাঁকা, কোথাও এতটুকু ঠেক্‌লো না। মা দাদার সংসার তদারক করছেন, তাঁর প্রতি দায়িত্ব হিমাদ্রির কম;—সঙ্গে খালি তার ব্যাঙ্কের দরকারী কাগজগুলি রইলো।

নিজের পয়সায় বিলেত সে অনায়াসে চ'লে যেতে পারে বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে হিমাদ্রির বিশেষ কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। উদ্দেশ্যহীন অভিযানে যে প্রখররো[illegible]ময় উচ্ছৃঙ্খলতা আছে হিমাদ্রির স্নায়ু তা সইতে পারে না—এই যে সে পরিবারের সঙ্গে সামান্য বিদ্রোহ করলো তাতেও কোথাও একটু ছন্দচ্যুতি ঘট্‌লো। তবুও কলহ-কোলাহলের বাইরে এই অপরিমিত নির্জ্জনতার মোহ হিমাদ্রিকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ধরলো। কিন্তু কী যে এখন সে করে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

এমন সময় তার কাণে এলো বহরমপুরে গঙ্গার ধারে সুন্দর একখানি বাড়ি বিক্রি হচ্চে। বাড়ি যদি করতেই হয় কল্‌কাতায়—লেক-পটিতে, তা না ক'রে কি না বহরমপুরে—জলজ্যান্ত ম্যালেরিয়ার জঙ্গলে! হিমাদ্রির রুচিই আলাদা—কল্‌কাতা তার ভালো লাগে না। শিরদাঁড়া খাড়া রেখে সব সময়ে সেই যে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকা—ঐ ভঙ্গিটাই তার কাছে বিশ্রী লাগে। মফঃস্বলের কোনো নিরিবিলি শহরে দিব্যি সে গা এলিয়ে বসে' বিশ্রাম নিতে পারবে। ছোটার ব্যস্ততা নেই, ভদ্র সাজবার উগ্র সমারোহ নেই, অনর্থক শ্রান্তি ও তার ক্লান্তিকর অপনোদনের প্রয়াস নেই—সেখানকার প্রতিটি মুহূর্ত্ত মন্থর, ঘন, স্পর্শ-সহিষ্ণু।

মোট কথা, হিমাদ্রি তখন বেলডাঙায় এক বন্ধুর বাড়িতে প্রাথমিক আশ্রয় নিতে এসেছিলো, এক ফাঁকে বহরমপুরে গিয়ে বাড়িখানা সে দেখে এলো। গোরাবাজার ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে ঠিক গঙ্গার ওপর ছোট একতলা একখানা বাড়ি, পেছনে প্রকাণ্ড বাগান এবং তার পরেই ঘন বন চ'লে গেছে। বাড়ীর মালিক

মোটে পাঁচ শো টাকায় তা ছেড়ে দিচ্ছেন। কল্‌কাতায় কোনো উঁচুদরের হোটেলে ছ'মাস কাটাতে গেলেই পাঁশ শো টাকা বোঁ করে বেরিয়ে যেতো। ধরা যাক্, এ-টাকাটা সে ব্যবসা ক'রে উড়িয়ে দিলে। এ টাকার জন্য কাউকে জবাবদিহি দিতে হবে না। এবং নিতান্তই এ-ব্যবসায় সে ঠকছে কি না তা কে বলতে পারে।

সেখানে ছুটি পুরো দিনও তার মন টি^কবে না—এই ব'লে বেলডাঙ্গায় বন্ধু তাকে নিরস্ত করতে চাইলো। না আছে একটা লোক, না বা একটা প্রতিষ্ঠান। উত্তরে হিমাদ্রি বললে, লোক বলতে সে একাই যথেষ্ট, আর প্রতিষ্ঠান বলতে উন্মুক্ত প্রান্তর ও নিঃশব্দচারিনী গঙ্গা আছে। সম্প্রতি এর বেশি কিছু আর সে চায় না। আর যেটুকু সে বন্ধুকে বল্‌লে না—তা হচ্ছে এই,—এই অসীম পরিব্যাপ্ত নির্জ্জনতায় ব'সে সে একমনে তার প্রথম প্রেমের প্রতীক্ষা করবে।

বাড়িটা পাকাপাকি হস্তান্তরিত হবার আগে দুয়েকজন শুভানুধ্যায়ী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে আনাগোনা সুরু করলে। তাদের বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে, বাড়িটা প্রেতগ্রস্ত—সাবেক যে মালিক ছিলো বাড়িটা বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ের জন্যে হাজার তিনেক টাকা ধার করে, বরপক্ষীয়দের দাবি উত্তরোত্তর এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো বন্ধকি কর্জ্জে তা কুলিয়ে উঠলো না। এখন উপায় ? উপায় অবিশ্যি একটা হলো।

হিমাদ্রি কৌতুহলী হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে ঃ কি ?

—বর্ষায় গঙ্গা তখন ভরা, এ পারে ও পারে উত্তাল জল। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন ঃ মেয়েটি সেই জলে এসে ডুব দিলে, আর উঠলো না।

—তার মানে, যখন উঠলো তখন সে ম'রে গেছে। আত্মহত্যা করলো। বাঙালী কুমারীর পক্ষে এটা আর এমন-কি অস্বাভাবিক? আত্মহত্যা করে কৌমার্য্য রক্ষা করলো! এতে বিচলিত হবার কী আছে?

—আছে। ভদ্রলোক চেয়ারে গ্যাঁট হ'য়ে বসলেন; বল্‌লেন, - সেই থেকে তার প্রেতাত্মা ও-বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—বলেন কি? হিমাদ্রি খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো: তাকে দেখা যায়?

—অনেকেই দেখেছে শুনেছি। মেয়েটির বাবা অবিশ্যি ধার শোধ ক'রে বাড়ি ছাড়াতে পারেন নি, যিনি বন্ধক নিয়েছিলেন তিনিই সপরিবারে এবাড়িতে বাসা তুলে আনলেন। দু'দিনও টিকতে পারলেন না। পরে বাড়ির জন্যে ভাড়াটে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। দু'একজন জুটলোও, কিন্তু কয়েক দিন থেকেই আবার পালালো। আজ বছর তিনেক ধ'রে বাড়িটা অমনি খালি প'ড়ে আছে খদ্দের একটাও জোটাতে পারে নি। কিছু গলদ না থাকলে অত সুন্দর বাড়ি কি আর কেউ পাঁচ শো টাকায় ছাড়ে?

হিমাদ্রি চিন্তিত হবার বিন্দুমাত্র ভাণ না ক'রে বল্‌লে,—সেই মেয়েটিকে আপনারা কেউ দেখেছেন? কেন আসে সে? বলে কী?

ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,- তা যান্, নিজে গিয়েই দেখুন না একবার।

ভদ্রলোকের সঙ্গীটী বল্‌লেন,—মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না ব'লে মনের দুঃখেই বলুন আর সমাজকে শিক্ষা দেবার জন্যেই বলুন আত্মহত্যা করে নি। মোট কথা ওর স্বভাবে কিছু দোষ

ছিল—কা'কে নাকি ভালোবাস্‌তো, তাকে পায় নি ব'লেই এই ঘোরতর পাপ ক'রে বস্‌লে—

হিমাদ্রি বল্‌লে,—যাই হোক্‌, সে যে আত্মহত্যা করেছে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'লাম। কেন সে তা করলো তা তার নিজের মুখের থেকেই শোনা যাবে। আপনারা ব্যস্ত হ'বেন না।

ভদ্রলোক যাবার মুখ ক'রে বল্‌লেন,—আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম।

হিমাদ্রি নির্লিপ্ত স্বরে বল্‌লে,—আর আপনাদের ভালোর জন্যেই ত' আপনাদের এখন চ'লে যেতে বলছি।

তারপর সত্যিসত্যিই যখন হিমাদ্রি নতুন বাসায় উঠে এলো, তখন স্থানীয় লোকেরা দল বেঁধে পালা ক'রে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে। হিমাদ্রি বল্‌লে,—বাড়ীটা যখন কিনেই ফেলেছি তখন ব্যবস্থা ত' একটা করতেই হ'বে। অদানে-অব্রাহ্মণে ত' যেতে দিতে পারি না।

—কিন্তু আপনি একা মানুষ, একলা এতো বড়ো বাড়িতে থাকবেন কী ক'রে?

—একলা থাকতেই তো এসেছিলাম, কিন্তু সারা দিন ধ'রে আপনারা এমনি ভিড় ক'রে থাকলে কী ক'রে আর একা থাকি বলুন।

—এখন কী, টের পাবেন রাত্তির বেলা।

গোরাবাজারের এক ছোক্‌রা উকিল শাসিয়ে উঠ্‌লো: সান্যালরাও খুব সাহস দেখিয়েছিলেন, পরে দু'দিন যেতে-না-যেতেই পালাবার পথ পান্ না।

হিমাদ্রি হেসে বল্‌লে,—রাত্তির বেলায়ও একা থাক্‌বো ব'লে মনে হচ্ছে না। সেই মেয়েটিই তো আসবে। আপনারা এতো সব তাকে ভয় দেখাচ্ছেন যে বেচারি এখন এলে হয়।

অনাহূত শুভানুধ্যায়ীদের বিদায় ক'রে হিমাদ্রি গৃহসংস্কারে মন দিলে। অশরীরী মেয়েটির জন্যে সে এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে সংস্কার শেষ ক'রে গৃহপ্রবেশ করতে তার তর সইছিলো না। একখানা ঘর অনায়াসে সে এখনই ব্যবহার করতে পারে, বাকিগুলি আস্তে আস্তে সারিয়ে নিলেই চলবে। সম্প্রতি একটা চাকর ও মালি রাখা গেল—ভূতের থেকে পেটের ভাবনাই তাদের বেশি।

শীত প'ড়ে এসেছে—গঙ্গা এখন শুক্‌নো, ম্রিয়মাণ। পাতার মর্ম্মর ছাড়া ধারে-পারে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই—চারিদিকের শূন্যতা বিরহী চিত্তের মতো সঙ্গীহীনতার অনুভূতিতে নিস্পন্দ হ'য়ে আছে। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ একটুখানি পথ—এক পাল ছাগল খেদিয়ে যদি একটা রাখাল-ছেলে এগিয়ে যায়, তা হ'লেই হিমাদ্রি যা-হোক্ একটা লোকের মুখ দেখতে পেলো। তা ছাড়া চোখ ফেলবার তার জায়গা নেই—বাইরে শীর্ণ নদীর ওপারে স্থির সবুজ গ্রাম আর কুণ্ঠিত আকাশের বিবর্ণ একঘেয়েমি।

ভেতরে তাকাবারো কিছু নেই। নোনা-পড়া নোংরা দেয়াল—জায়গায়-জায়গায় ইটের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে—আগা

গোড়া যেন একটা প্রতীক্ষার রিক্ততা আছে। হিমাদ্রির বিশেষ কিছু আসবাব নেই, একটি নীচু খাট, লেখবার ছোট একটি টেবিল, খানতিনেক চেয়ার, দুটো অতিকায় স্যুটকেস্—নদীর সমুখের ঘরখানা কোনোরকমে সে গুছিয়ে নিয়েছে। বাকি তিনখানি ঘর জীর্ণ, ধুলো-বালি আগাছা আর পাখীর বাসায় অপরিচ্ছন্ন। ও-গুলিতে পরে নজর দিলেও চলবে, আপাতত রান্নার সাজ-সরঞ্জাম চাই। হাঁড়ি-কুঁড়ি, চায়ের বাসন, শিল-নোড়া, চাকা-বেলুন্—চাকরটি যা-হোক্ খলিফা। এক কথায় মাথায় ক'রে প্রকাণ্ড বাজার এনে হাজির।

বিকেল বেলা সামনের ছোট বারান্দাটুকুতে ব'সে হিমাদ্রি চা খাচ্ছে—পট্ থেকে আর এক কাপ ঢেলে শেষ করবার আগেই বেলা প'ড়ে আসবে। তার পরেই আস্তে-আস্তে অন্ধকার—রাত্রি আর অন্তরের নির্জ্জনতাকে যখন আর আলাদা ক'রে দেখা যাবে না। কখন না-জানি সে আসবে! তাকে ঠিক দেখা যাবে তো? কী মূর্ত্তিতে তাকে দেখা যাবে? এই মর্ত্ত্যলোকের প্রতি কী তার আকর্ষণ যার মায়ায় আজো সে মাটিকে ভুলতে পারলো না? কী সে চায়, কী তার অভিযোগ!

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজা-জান্লা খুলে রেখে হিমাদ্রি সেই নিশাচারিণীর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। জোরে ঝাপটা দিয়ে উত্তরের হাওয়া বইছে, পুরোনো দেয়াল থেকে বালির চাপ খ'সে খ'সে পড়ছে—তারই পায়ের শব্দ বুঝি! কিন্তু সে কি শব্দ ক'রে আসবে নাকি? হাওয়া আবার হঠাৎ নিঃশব্দ হ'য়ে আসতেই হিমাদ্রি চমকে উঠলো। এইবার নিশ্চয় সে আসবে। হিমাদ্রি আলো নিভিয়ে দিলো, কিন্তু অন্ধকারে তাকে দেখা যাবে তো?

খালি আলো নেভালেই চল্‌বে না, তার বিশ্রামের ভঙ্গিটাও শ্লথ ক'রে আন্‌তে হ'বে। প্রতীক্ষায় রূঢ় চক্ষু মেলে চেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সে আসবে না—অপরিচিত পুরুষের পিপাসিত দৃষ্টিকে সে তা হ'লে ভয় করে বোধ হয়!—হিমাদ্রি বিছানায় শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজ্‌লো। এইবার সে আসুক্।

প্রখর প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি ক্লান্ত হ'তে লাগলো। অসংখ্য পাতার মর্ম্মর ছাড়া একটি শব্দও আর শোনা যায় না! ঘরের মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জিত নিদ্রার মতো গাঢ়। আবহাওয়াটা অতিমাত্রায় কঠিন—হিমাদ্রি ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লো; আলো জ্বালালো—আগে যা, পরেও তাই—কেউ কোথায় নেই।

দিনের পর দিন এমনি নিরানন্দ প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গুনে-গুনে হিমাদ্রির শরীর-মন জীর্ণ হ'তে সুরু করেছে। জায়গার স্বাস্থ্য ভালো নয় বললে চলবে না, তার মনেই নেই স্বস্তি। গঙ্গার পারে হঠাৎ সেই এক হিতৈষীর সঙ্গে দেখা—অল্প হেসে শুধোলেন: কী, কেমন উৎপাত বুঝ্‌ছেন?

হিমাদ্রি বল্‌লে,—উৎপাত করলেন তো আপনারা। কী বল্‌লেন যে রোজ রাত্রে গঙ্গা থেকে মেয়েটি উঠে আসে,—কোথায় সে! কতো আশা ক'রে চেয়ে আছি তার দেখা নেই।

—কিন্তু আপনার চেহারা তো দিব্যি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে দেখছি।

—আপনারা তো কতো কিছুই দেখলেন।

—সবুর করুন—ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন: এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আরো দু'দিন যাক্ না, টের পাবেন আস্তে আস্তে। এখন তাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন ক'দিন বাদে নিজেকেই আর ভালো ক'রে দেখতে পাবেন না।

হিমাদ্রি বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—তার মানে কী ?

—মানে আর কিছুই নয় দেখতে-দেখতে দেহখানা আদ্ধেক হ'য়ে যাবে শুকিয়ে। ডাইনির এমনিই বিষ-নজর।

হিমাদ্রি হেসে বললে,—তবে ডাইনি আপনাদের এই ম্যালেরিয়া! তার দেখা না পাবার জন্যে যথাসাধ্য সাবধানে আছি। শরীর বিশেষ খারাপ বুঝলে বাড়ি ছেড়ে দিলেই চলবে।

মাথা হেলিয়ে ভদ্রলোক বললেন,—তাই বলুন। বাড়ি ছাড়বেন বৈ কি। নইলে কি-আর রক্ষে আছে ? ও তেমন মেয়ে নয়, বাড়ি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে তবে ছাড়বে। দু'দিন আগে আর পরে।

তাই। শরীরটা হিমাদ্রির দিনে-দিনে কেমন মিইয়ে আসছে। এমনি একা-একা থাকতো, কোথাও কিছু ছন্দপতন হ'ত না। কিন্তু কেউ আসবে ব'লে সারা দিন-রাত্রি অনর্থক প্রতীক্ষা করবার পর তার অনুপস্থিতির আঘাত স্নায়ুগুলিকে নিস্তেজ ক'রে ফেলে—তীব্র মাদকতার পর বিস্বাদ অবসাদের মতো। কেনই বা সে আসবে— সে কে! কোনো কিছু উত্তর নেই, অথচ এই নিঃশব্দতায় হিমাদ্রি শান্তি পায় না।

বাইরের বারন্দায় চেয়ারে গা ছড়িয়ে ব'সে হিমাদ্রি বই পড়ছে। অন্ধকারে নদীর জল ভাল ক'রে চেনা যায় না, মনে হয় খানিকটা কালো শূন্যতা। চাকর জেনে গেলো হিমাদ্রির এ-বেলা আর খিদে নেই, দু'চার টুক্‌রো ফল পেলেই তার চলে। রাত আরো ঘন হ'তে লাগলো, ওপারের গ্রামের বাতিগুলি একেক ক'রে নিভ্‌ছে। এমন মরা নদী যে সামান্য একটা নৌকা চলে না, বাঁধের ওপর

একটা কোথাও লোক নেই। হিমাদ্রি বই বন্ধ ক'রে সেই নিঃশব্দতা শুন্‌তে লাগলো।

কিন্তু কতোক্ষণ আর জাগা যায়! ঘরের আলোটা মিট্‌মিট্ করছে, এক ফুঁয়ে সেটা নিবিয়ে পরিষ্কার গরম বিছানায় নরম তুলোর লেপটা গায়ে টেনে ঘুমিয়ে পড়বে এবার। অন্যমনস্ক হ'য়ে হিমাদ্রি শোবার ঘরের দরজাটায় ঠেলা দিলো, হাওয়ায় কখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু দরজা খুলেই সে চম্‌কে উঠ্‌লো।

তার বিছানায় কে-একটি মেয়ে শুয়ে আছে! তার এতো দিনকার বিবর্ণ স্বপ্ন! তার প্রথম প্রেমের অপরিপূর্ণ পিপাসা!

হিমাদ্রি দু'ধাপ এগিয়ে এলো। মেয়েটি নিমীলিত চোখে কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, এমন আলগোছে শুয়ে আছে যে বিছানাটা কোথাও এতটুকু কোঁচ্‌কায় নি—দিঘির জলে শাদা পদ্মকোরকের ওপর ছোট একটি পাখী বসেছে, জলে একটু চাঞ্চল্য নেই। পিঠে বেয়ে রুক্ষ বেণীটা একপাশে এলিয়ে আছে; একখানা হাত গালের তলায়, আরেকখানা বুকের কাছে প্রস্ফুটিত ফুলের একটি পাপড়ির মতো অকুণ্ঠিত। পরনে শাদা নরম একটি শাড়ি—হিমাদ্রির দুই চোখের অনিদ্রার মতো শাদা—এত পাতলা যে দেহের প্রতিটি রেখার ঢেউ স্পষ্ট উছ্‌লে উঠছে। দেহে তার যৌবনের পরিপূর্ণতা, মরণের এক বিন্দু কালিমা নেই।

হিমাদ্রি আরো এক ধাপ এগোলো। মেয়েটি তেমনি স্থির,—দু'জনের ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে এলো, তবু সে ঘনতর সান্নিধ্যের তাপ অনুভব ক'রে একটুও চঞ্চল হ'য়ে উঠলো না। হিমাদ্রি স্তব্ধ হ'য়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-রেখার ওঠা-নামা দেখতে লাগলো। মনে হ'ল এত কোমল, ভঙ্গুর সে-রেখা, হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই তা মুছে

যাবে। লজ্জার অতীত, লোভের অতীত, এমন-কি বিশ্বাসেরও অতীত এই ছায়া!

হিমাদ্রি ভয়ে ভয়ে ডাকলে: কে?

মেয়েটি উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে প'ড়ে রইল। নিটোল কনুইটি গোল হ'য়ে দুমড়ে আছে, আঙুলগুলি যেন অনুচ্চারিত সুর, পুরন্ত দুটি ঠোঁটে গভীর স্তব্ধতা। স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম দুটি ভুরুর তলায় নিমীলিত চোখের নীচে জীবনের রহস্য, জাগরণের রহস্য। ভয়ে ভয়ে হিমাদ্রি মেয়েটির আরো কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু মেয়েটি তেমনি ছবির মতো নিষ্প্রাণ। নিদারুণ আগ্রহে হিমাদ্রির স্নায়ুগুলি সাপের ফণার মতো অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো, মেয়েটির গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে: তুমি কে?

কোথায় কে—শূন্য বিছানা, কোথাও এতটুকু কোঁচ্‌কায় নি। বন্ধ ঘর যেন কা'র চ'লে-যাওয়ার রিক্ততায় হঠাৎ হাহাকার ক'রে উঠলো। জোরে হাওয়া দিয়েছে, গাছের পাতায় সর্‌-সর্‌ শব্দ—ক'ার বিদায় নেওয়ার কান্না। হিমাদ্রি বাইরে চ'লে এলো। কেউ কোথাও নেই—আকাশে মেঘ করেছে ব'লে নদীর শীর্ণ দেহে ঈষৎ রোমাঞ্চ জেগেছে। তারপর বাকি রাত আর সে এলো না।

পরের রাত্রে হিমাদ্রি ঢের আগে এসেই বিছানা নিলো। তার জন্যে এক পাশে জায়গা ক'রে রাখলে—মাঝ রাতে সে যদি ঘুমোতে আসে! ঠিক, আবার সে এসেছে। হিমাদ্রির কখন একটু তন্দ্রা এসেছিলো বুঝি, ঘরের আবহাওয়া কা'র সমীপবর্ত্তিতায় হঠাৎ তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তেই চোখ চেয়ে সে দেখতে পেলো সে এসেছে। আশ্চর্য্য, তার পাশে বিছানায় এসে শোয় নি, দেয়ালের আলোয় চেয়ারে ব'সে একখানি বই পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে,

তবু তার আজ ঘুমোবার নাম নেই। হিমাদ্রি বালিশের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে শরীরটাকে বিছানার এক প্রান্তে এগিয়ে আন্‌লে; বল্‌লে,—বলো না, তুমি কে?

মেয়েটি নিরুত্তর, বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুল্‌লো না। আজ তাকে হিমাদ্রি নতুন ভঙ্গিতে দেখলো, কিন্তু কী তার অপূর্ব্ব শ্রী! যেমন কঠিন পবিত্রতা, তেমনি দুঃস্পৃশ্য সৌন্দর্য্য। কে সে—সেই আত্মঘাতিনী মেয়ে, না আর কেউ! না তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন! হিমাদ্রি আবার বল্‌লে,—কোথায় তুমি থাক? কেন এত রাত ক'রে তুমি এলে?

মেয়েটির তবুও কোনো সাড়া নেই। ও যদি সেই আত্মঘাতিনী মেয়েই হবে বা তার ব্যর্থ কামনার প্রতিমা—তবে সে প্রতিবাদ না ক'রে এমনি নীরব ভঙ্গির সঙ্কেতে তাকে সস্নেহে সম্বোধন করে কেন? তাকে দেখে তার ভয় না হ'য়ে আশা হয় কেন? কেন মনে হয় এই মূর্ত্তি মৃত্যুতে মলিন হবার নয়, কামনায় একে কাতর, আবিল করা যায় না, এ এত পরিপূর্ণ যে পরিবর্ত্তনের এতে এতটুকু চিহ্ন পড়বে না? আজো বাইরে তার আগাগোড়া শুভ্রতা—ভেতরে সেই পূর্ণোচ্ছ্বসিত নগ্নতার আগুন! তার নৈকট্যে আনন্দ নয়, দীপ্তি; সে-দীপ্তিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তিমিত হ'য়ে আসে।

কিন্তু এতো কাছেই যখন এলো তখন সে কথা কয় না কেন? অন্তত কেন সে রাত ক'রে এখানে আসে তাও তো জানা দরকার। বাইরে এখনো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে—সহজে আর সে পালাতে পারছে না। হিমাদ্রি জোর-গলায় বল্‌লে,—কথা কও।

মেয়েটি কথা কইতে আসে নি—সে এসেছে শুধু তার নির্জ্জনতায় প্রাণসঞ্চার করতে। তেমনি চোখ নামিয়ে সে ব'সে

রইলো, বইয়ের পৃষ্ঠাটি পর্য্যন্ত উল্‌টোলো না। এই স্তব্ধতা হিমাদ্রির অসহ্য, বিছানায় আরো এগিয়ে সে মেয়েটির হাত চেপে ধর্‌লো ; বল্‌লে,—আমার কাছে তুমি কী চাও ?

অমনি কেউ কোথাও নেই, খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে মাত্র। হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে ক্ষিপ্র হাতে আলো জ্বালালো। বৃথা ; সে আবার চ'লে গেছে। আশ্চর্য্য, খাটের সামনে চেয়ার আছে বটে, কিন্তু বইটা কোথাও প'ড়ে নেই। আর বই এখানে কী ক'রেই বা আসবে ? তাক ভ'রে বই তার পরিপাটি ক'রে সাজানো। হাতের বইটা সে বিছানার একপাশে নিয়ে শুয়েছিলো—সেটাও নিশ্চয় খোয়া যায় নি।

হিমাদ্রি জোরে নিশ্বাস নিলো। ভিজা হাওয়ায় তার চলে-যাওয়ার গন্ধ লেগে আছে। এই এত ঝড়-জলের মধ্যে কোথায় সে অন্তর্ধান করলে ? হিমাদ্রি বাইরের বারন্দায় বেরিয়ে এলো, বৃষ্টির ঝাপটায় বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেলো না। বৃষ্টি থামবার জন্যে কেউ কোথায় বারন্দায় অপেক্ষা ক'রে নেই—নদী নতুন খুসিতে ছল্‌ছল্‌ করছে।

তারপর রোজ রাতেই সে আসে—এবং হিমাদ্রির এই ঘরটিতে, সে শুয়ে না থাকলে তার একাকী বিছানায়। একটিও সে কথা কয় না, খালি তার লঘু উপস্থিতি দিয়ে এই মৃত নির্জ্জনতায় প্রাণ সঞ্চার করে। হিমাদ্রি তার রহস্য এবার বুঝেছে। তাই ব্যস্ত হ'য়ে সে তাকে কোন প্রশ্ন করে না, সে জানে সে তার জীবনের অন্তরঙ্গতম মুহূর্ত্তের অবিনশ্বর প্রতীক ; তাকে স্পর্শ করতে আর সে হাত বাড়ায় না, জানে স্পর্শ করতে গেলেই তার ক্ষয়। হিমাদ্রি তাই তাকে নিবিষ্ট চোখে দেখে—অশরীরী রেখার

ঢেউ, ভাবময় ছায়া ! দিনের আলোর রুক্ষতায়, জীবিকা-নির্ব্বাহের আয়োজন-ব্যস্ততার মাঝে আর তাকে দেখা যায় না।

জীবনে এই তার নতুনতরো নেশা, প্রথমতম প্রেম।

এই শহরে অল্প দিনের মধ্যেই মাত্র এক জনের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হয়েছে, নাম অমূল্যরত্ন—খাগ্‌ড়ার দিকে বাসা—যার সঙ্গে ব'সে দু'ঘণ্টা আলাপ ক'রে সে সুখ পায়। অমূল্যরত্ন সেট্‌লমেণ্টের হাকিমি করে—এখনো বিয়ে করে নি। রবিবারের সকালবেলা হিমাদ্রি এসে হাজির। অমূল্যর বাড়ীতে তার চায়ের নেমতন্ন। অমূল্যরত্ন বল্‌লে,—কি, প্রেতিনীর দেখা পেলেন এত দিনে ?

হিমদ্রি গম্ভীর হ'য়ে বললে,—পেলাম। এতো প্রতীক্ষার ফল না-মিলে কি পারে ?

—পেলেন ? কেমন চেহারা ?

—অত্যন্ত সুন্দর। এতো রূপ আমি দেখি নি।

—বলেন কি ? অমূল্যরত্ন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো : কী বলে ?

—কিছুই বলে না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই তার কিছু-না-বলাটিই ভারি সুন্দর।

—খাসা ! অমূল্যরত্ন সোৎসাহে টেবিল চাপড়ালো : তার পর ?

—তার পর সে-বাড়ি আমি ছাড়ছি না। যে যাই বলুক।

—রোজ তাকে দেখেন ?

—রোজ।

—আমি গেলে আমিও দেখতে পাবো ?

এ-কথার উত্তর দেবার আগে চায়ের বাটি ও মিষ্টির থালা হাতে ক'রে ঘরে একটি মেয়ে ঢুকলো। তার উপস্থিতিতে ছোট ঘর যেন সহসা তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ চোখ মেলে হিমাদ্রি তার দিকে চেয়ে রইলো। উত্তেজনায় সে যেন এখুনি ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।

এ যে সেই—যে রোজ রাত ক'রে তার ঘরে আসে—নিঃশব্দ আকাশ থেকে নেমে, না নিরালা নদীর জল থেকে উঠে! সর্ব্বাঙ্গে সেই রেখার ঢেউ, সেই ভঙ্গির সুষমা! একেবারে অবিকল। পরনের শাড়িটি পর্য্যন্ত গরদ—গলিত জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র, তার অন্তরালে সেই উদ্বেল যৌবন! বেণীটি শুকনো, আঙ্গুলগুলি করুণ, চোখের দৃষ্টিটি স্তব্ধ, নির্লিপ্ত। সেই রেখা হঠাৎ রূপ নিয়ে উঠবে, এই উত্তেজনা সহ্য করবার মতো হিমাদ্রির স্নায়ু নেই।

টেবিলের উপর চায়ের বাটি আর মিষ্টির থালা রেখে মেয়েটি চ'লে গেলো। হিমাদ্রি তাকে নতুন ক'রে ফের দিনের বেলায় দেখছে না তো ? না, এ তার অবিকল প্রতিলিপি, তার চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের শূন্যতা বিরহের সুবাসে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করলে ঃ এ কে ?

অমূল্যরত্ন বললে,—আমার ভাই-ঝি। স্কটিশে বি-এ পড়ছে। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে এখানে।

—কী নাম ?

—কেন, কেমন দেখলেন ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক অনুধাবন করবার চেষ্টা না ক'রে অস্থির হ'য়ে হিমাদ্রি বললে,– বলুন, কী নাম ! আমার ভীষণ দরকার।

অমূল্যরত্ন ধীরে উচ্চারণ করলো ঃ উর্ম্মিলা।

—উর্ম্মিলা ? হিমাদ্রির সমস্ত স্নায়ু যেন এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। বললে,—আপনি কিছু মনে করবেন না, তাকে আরেকবারটি কোনো ছুতোয় এখেনে ডাকতে পারেন ?

তার আকস্মিক উৎসাহের কারণ ঠিক না বুঝতে পারলেও অমূল্যরত্ন মনে-মনে খুব খুসি হলো। ঠোঁটে হাসি চেপে সে বললে,—কিন্তু আগে বলুন তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে।

তাকে হঠাৎ চায়ের নেমন্তন্ন করার রহস্য এতক্ষণে হিমাদ্রি কিছুটা অন্তত বুঝতে পেরেছে। হ্যাঁ, তাকে পছন্দ হয়েছে বৈ কি। কিন্তু দাদা যে বলেছিলেন তাকে দেখামাত্রই ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সম্মতি দিয়ে আসতে হবে সেই কারণে নয়, একান্ত ও তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষার পর যে ছায়া সে দেখতে পেতো, এ যে তারই স্থূল, বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি ! এও কী ক'রে সম্ভব হয় ? সেই ছায়া যেন উর্ম্মিলারই একটি অস্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা সেই সঙ্কেতই উর্ম্মিলার মাঝে অভি-ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে।

হিমাদ্রি খানিক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কপালের ঘাম মুছে বললে,– আমাকে উনি আর সঠিক চেনেন না তো ? এমনি একটু আলাপ করিয়ে দিতে আপত্তি আছে ?

—আপত্তি কী ! আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেই ত' আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছি আর ওকে এনেছি কলকাতা থেকে। অমূল্যরত্ন ভেতরে যেতে-যেতে হেসে বললে,—এমন গুণীর সঙ্গে আলাপ করতে কে না চায় বলুন।

গুণী অর্থ হিমাদ্রির অল্প বয়স ও দেদার পয়সা আছে,—তা সে জানে।

ঊর্ম্মিলা এসে দাঁড়ালো ও খানিকক্ষণ টেবিলের উপর এটা-ওটা একটু নেড়ে-চেড়ে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো—হাতে একখানা বই থেকে তার উপস্থিতিতে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছে। মূঢ়ের মতো হিমাদ্রি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। সন্দেহের কিছুই আর নেই—এই সেই নিশাচারিণী ছায়া, বা সেই ছায়াই তার আত্মার প্রতিচ্ছবি। যখন রোজ রাতেই সে তার ঘরে গিয়ে অতিথি হয় তখন, আর সন্দেহ নেই, এই তার সহজীবনযাত্রিনী, এই তার পরমনির্ব্বাচিতা।

ঊর্ম্মিলার উপস্থিতিতে এখন রমণীয় একটি শোভনতা এসেছে,—কিন্তু কী যে তাকে জিগ্‌গেস করা যায় হিমাদ্রি কিছুই ভেবে পেলো না। এক জিগ্‌গেস করা যেতে পারে—'আগে তোমাকে কোথায় দেখেছি বলতে পারো?' কিন্তু সে-প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর হবে। সে রোজ তাকে দেখতে পায় যখন দিনের নির্ম্মম রুক্ষতার পর রাত্রি অন্ধকারে ও অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হ'তে থাকে, যখন চারিদিকে স্তব্ধতার ও স্পর্শহীনতার ঢেউ! এখনো কিছু মুখ ফুটে তার বলা হ'ল না। চোখ তুলে হঠাৎ আবার হিমাদ্রি দেখতে পেলো—শূন্য বাটি ও থালা নিয়ে ঊর্ম্মিলা কখন ঘর থেকে চ'লে গেছে। তেমনি অতর্কিত তিরোধান। এবং তার খাওয়ার পর তেমনি ঘরময় স্তূপীকৃত শূন্যতা!

অমূল্যরত্ন তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে: আমার ভাই-ঝিটিকে তখন দেখতে আপনার কী আপত্তি হয়েছিলো? বলুন পছন্দ হয়েছে তো? মেয়েরা পরদার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন।

হিমাদ্রির আর দ্বিধা করবার সময় আছে নাকি? আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বললে,—সে-সব আমি কী জানি? দাদাই হচ্ছেন সব - তাঁকে লিখবেন না হয়।

পরদার আড়ালে হাসি চাপবার একটা মিলিত চেষ্টার আভাস পাওয়া গেলো।

তবু তাদেরকে এ-কথা বুঝিয়ে দেওয়া হলো না যে উর্শ্মিলার রূপ দেখেই সে গ'লে যায়নি—সে বুঝেছে যে উর্শ্মিলা তার প্রথম প্রেমের মূর্ত্তিময়ী উপমিতা, তার কল্পনাছায়ার সাকারা অভিব্যক্তি। জীবনদেবতা তাকে নির্ভুল ইঙ্গিত পাঠিয়েছে—তাই তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু গূঢ় ব্যাখ্যা তলিয়ে কে বুঝতে চাইবে? স্থূল প্রকাশটাই সকলে দেখে, বুদ্ধি দ্বারা অর্থও অতি সহজে আয়ত্ত ক'রে ফেলে—কিন্তু ক'ার এমন কল্পনা আছে যে সেই মূর্ত্তির অন্তরালে ছায়া আবিষ্কার করবে?

যাই হোক্, ছায়ার চেয়ে মূর্ত্তির যেমন বেশি উজ্জ্বলতা তেমনি তার বেশি প্রয়োজন। এতদিনে হিমাদ্রির বুদ্ধি খেল্‌লো। এবং একদিন এই ঘরেই উর্শ্মিলাকে নিয়ে সে স্পর্শে স্বাদে ঘ্রাণে ভুঞ্জনে শিহরিত হবে ভাবতে হিমাদ্রির মুহূর্ত্তগুলি অবশ হ'য়ে এলো।

হিমাদ্রি রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। আজকের ছায়া না-জানি কতো অপরূপ হ'য়ে দেখা দেবে! প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই ছায়া আজ আর এলো না। সে হিমাদ্রির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

এ কেমনধারা হলো? হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে বারান্দায় পাইচারি করছে। অদূরে নদীর জল ম্রিয়মান হ'য়ে আছে, তারাগুলি আকাশময় ছড়িয়ে আছে বটে কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই। হিমাদ্রি আবার এসে শুলো। দু'চোখ বুঁজে অন্ধকারের কাছে সে সকাতরে প্রার্থনা করতে লাগ্‌লো—চোখ খুলেই তার চকিত দৃষ্টির বিস্ময় যেন সেই ছায়ার রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু বৃথা, চোখ খুলেও সেই অন্ধকার।

আশ্চর্য্য, সেই ছায়া আর নেই। তার পরের দিনও সে এলো না। তার পরের দিনও না। তীব্র প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় হিমাদ্রি ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌লো। খেতে রুচি নেই, বেড়াতে বেরুলে কারো সঙ্গে অকারণে দেখা হ'য়ে যাবে এবং তার এই নির্জ্জনতার সুর থাকবে না, তাই সে বারান্দাতেই চেয়ার টেনে চুপ করে ব'সে থাকে, ঘুমুতে যেতেও ইচ্ছে করে না, ঘুমোবার আগের আবেশময় গাঢ় মুহূর্ত্তগুলিতে সেই ছায়া আর পড়ে না ব'লে।

কিন্তু কেন যে সেই ছায়া হঠাৎ বিদায় নিলো হিমাদ্রি তার কূল-কিনারা করতে পারে না। অথচ মূর্ত্তির লোভে অনায়াসে সে উর্ম্মিলার দ্বারস্থ হ'তে পারে—অমূল্যরত্ন বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে পাঠিয়েছে; দু'চারদিন বাদে মা আর বৌদিদি এখানে আসছেন।

সেই ছায়া হঠাৎ আত্মঘাতিনী হলো। এই নির্জ্জনতার নিঃশেষে ধ্যানভঙ্গ হ'তে বসেছে। ছায়া হ'তে চলেছে মূর্ত্তিমতী, রেখার ঢেউ হ'তে চলেছে মাংসস্তূপ! সুন্দর উজ্জ্বল নগ্নতার ওপর কঠিন আবরণ এসে পড়্‌লো। সে-মূর্ত্তিতে লজ্জা আর লোভ, জ্বর আর জরা—স্থূলতাময় কুৎসিত তার উপস্থিতি—হিমাদ্রির স্বপ্ন গেলো ভেঙে। এই মোহমুক্তি সে সইতে পারলো না।

তার মনে হলো ঐ ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন—ঊর্মিলার শরীর-সঙ্কেতে যার অস্পষ্ট আভাস সে পেয়েছিলো—ভেবেছিলো ছায়ার সেই প্রতিলিপিকে অধিকার করতে পারলেই তার যৌবন ধন্য হ'য়ে যাবে। এখন তার মনে হলো ঐ ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন - মোহে যার জন্ম, মুক্তিতে যার অবসান। ঊর্মিলার পায়ের শব্দ শুনে ছায়া মুখ লুকোলো। তাকে আর উদ্ধার করা গেলো না। মূর্ত্তিই প'ড়ে আছে, ছায়া নেই।

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি কল্‌কাতাতে টেলি ক'রে দিলো, মা আর বৌদিদি যেন এখন বহরমপুরে না আসেন, কেন-না খুব জরুরি কাজে হিমাদ্রি আজ বম্বে যাচ্ছে। সময় থাকলে বাড়িতে নেমে সে দেখা ক'রে আসবে।

দেখা করবার সময় হলো না। হিমাদ্রি ট্রেনে চেপে বসলো—বহুদূরের ট্রেন ; কোথায় যে সে নাববে তার এখনো ঠিক নেই। ছায়া তাকে যতো দূর টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। যতো দিনে না সাবয়ব কামনার জন্যে তার দেহ উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে !

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ বিমানযোগে পারস্যযাত্রা সুরু করিয়াছেন। সেই গোলাপ-বুলবুলের দেশে, ওমর খৈয়মের দেশে, সাদি-হাফেজের দেশে,—একদা জরথুস্ত্রের বাণীতে যাহার সন্তানগণ নূতন ধর্ম্মে জাগিয়া উঠিল, সাইরাস যেখানে রাজ্য বিস্তার করিলেন, যেখানে বেহিস্থানের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ দারায়ূসের কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিয়া রলিন্‌সন অমর হইয়া গেল, আর আজ যেখানে জনগণের মনকে নূতন করিয়া গড়িতে পার্শিয়ার প্রধান পুরুষ রেজা সা পহ্লবীর প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে, বিচিত্র ইতিহাসে অপূর্ব্ব প্রাচ্যের সেই প্রাচীন-নবীন দেশে।

* * *

পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও সেক্রেটারী শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী ছাড়া পারস্য-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন রামানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন ইতিহাসে কেদার বাবুর যেমন ঝোঁক, তাহাতে কি আর তিনি বেহিস্থান না দেখিয়া ছাড়িয়াছেন? গোলাপের দেশের গল্প শুনিব বলিয়া বসিয়া আছি, আর তিনি দেশে ফিরিয়াই হিমবান্ পর্ব্বতের দুর্জ্জয় শৃঙ্গের দিকে অভিযান করিলেন।

* * *

প্রতিযোগিতার শেষমুখে বহু অতর্কিত বিপর্য্যয় লীগ-খেলার শেষ-ফলকে অনিশ্চিত করিয়া লোকের উৎকণ্ঠিত মনকে তীব্র কৌতূহলে ক্লিষ্ট এবং অধীর আগ্রহে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। মোহনবাগান গেল হাওড়ার কাছে হারিয়া, ডারহাম হারিল

কে-আর-আর'এর কাছে, ইষ্ট-বেঙ্গল হারিল এরিয়ানের কাছে। জয়মাল্য কাহার কণ্ঠে পড়িবে তাহার আলোচনায় পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-বুড়ো নির্ব্বিচারে ব্যগ্র ম্যাচ-দর্শকদের উচ্চ কণ্ঠ প্রবল এবং কোথাও কোথাও পক্ষপাতী হস্ত উদ্যত হইয়া উঠিতেছে।

* * *

গ্রীষ্মের ঘোর একটু কাটিলেও বাতাস এখনও স্নিগ্ধ হয় নাই। আকাশে মাঝে মাঝে ঘনঘটা করিয়া আসে বটে, কিন্তু কোথায় সেই বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয় মেঘ, কোথায় তুমি? কোথায় তুমি—যাহাকে রামগিরি-আশ্রমের বিরহী যক্ষ উচ্চসৌধশিখরা সুদূর অলকায়, স্মৃতি এবং সৌন্দর্য্যে গড়া স্বপ্নপুরী অলকায় দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল,—

অলকে কুন্দ-কোরকের মালা, লীলায়িত করে লীলা-কমল,
লোধ্রপরাগে দেখা বধূদের পাণ্ডু বদন কপোলতল,
কেশপাশে নব কুরুবক, আর পেলব শিরীষ কর্ণমূলে,
তুমি এলে তবে ফোটে কদম্ব—পরে সীমন্তে তা'রা সে ফুলে।

১ম বর্ষ] ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৯ [৪র্থ সংখ্যা

কুমার দেবকীকিশোর

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

'আহ্—মারা গেছে, মারা গেছে, দেখছি—'

'কে ? কে মারা গেছে ?'

'কুমার দেবকীকিশোর চক্রবর্ত্তী—নাম শুনেছো ?'

'না তো। কেনই বা শুনবো ? প্রসিদ্ধ লোক ?'

'নয় ? শোনো, কী লিখছে কাগজ ঃ "Famous Novelist Passes Away"—

'Novelist ?'

'আঃ, কোথায় আছো তুমি ? এমন-এক সময় ছিলো, যখন দেবকীকিশোর বাঙলার "কথা-সাহিত্য-সম্রাট"—বুঝতে পারছো তো ?—এই হন্ কি সেই হন্। সে-সময়ে তাঁর বইগুলো বাঙলা দেশে কত গ্যালন চোখের জলই যে ঝরিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেক আগেকার কথা—বছর কুড়ি, হ্যাঁ, তা তো হবেই। তোমার বোধ হয় তখনো উপন্যাস পড়বার বয়েস হয় নি। না হয় এঁর দু'একখানা বই তুমি নিশ্চয়ই পড়তে। দেবকীকিশোরের নাম যেন রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো; হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিলো, তুবড়ি-বাজির মত। তেমনি, নিবে যেতেও মোটে সময় লাগে নি। তাঁর যশের একেবারে পরিপূর্ণ জ্যোতির মধ্যে হঠাৎ দেখা গেলো, তিনি নিবে গেছেন। তিনি আর নেই। অনুমান করতে পারছি, তুমি যে-সময়ে বড় হ'য়ে উঠলে, তখন আর তাঁর বই কেউ পড়ে না; বসুমতী সংস্করণেরও বিক্রি বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর, এতদিনে তিনি কোথায় যে হারিয়ে গেছেন, তার পাত্তাই নেই। অন্ধকার। উপেক্ষার, বিস্মৃতির অন্ধকার। গভীর, গভীর একটা কূয়ো—তার তলদেশ। আজ ম'রে গিয়ে দেবকী কিশোর মুহূর্ত্তের জন্য কূয়োর ওপরে উঠে আসতে পেরেছেন; মুহূর্ত্তের জন্য খবরের কাগজী বিশেষণ ভূষিত তাঁকে আমরা দেখছি। দেখা যাক্ঃ "Kumar Debaki Kishore Chakrabarty, the famous novelist, passed away—" mind, he did not die, he passed away—উঃ, বাঙালী কাগজের ইংরিজ! "—last night at his Ballygunje residence at the premature age of 53." Premature ! বটেই তো; তিপ্পান্ন অবধি যে তিনি টিকে থাকতে পেরেছেন, আধুনিক

চিকিৎসা-শাস্ত্রের এটা মস্ত এক কীর্তি। He simply lived on injections, you know. "For sometime past he had been suffering from minor ailments of the stomach—" ah, minor ailments indeed! লিভারে কি আর কিছু ছিলো! দেবকীকিশোর আসুরিক স্বাস্থ্য পেয়েছিলেন ব'লে—নইলে অত মদ দশজন সাধারণ মানুষকে খুন করবার পক্ষে যথেষ্ট। "—which suddenly took a fatally serious turn." মোটেই suddenly নয়—বছর থেকে বছর, দিনের পর দিন অ্যাল্‌কহল ওঁকে মেরেছে—তা ছাড়া, অন্যান্য ব্যাধি তো ছিলোই। তাঁর মুখের ওপর সিফিলিস লেখা ছিলো। তারপর: "Kumar Debaki Kishore, probably one of the richest men of Bengal, was the only member of our landed aristocracy who had achieved greatness in the domain of Creative Art." God! মরি আর কী! এদের staffএ, শুনেছি, একজন সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন; এটা বোধ হয় তাঁরই দিগ্বিজয়ী লেখনী-প্রসূত। শোনো আরো আছে: "All his life, he was a devout worshipper"—উহু, হেসো না, "—at the Holy shrine of literature. He produced many novels, all of a very high order, some of which may be ranked with the glories of our national heritage." আঃ—আর কী চাও? আর কী চাও? Delicious—নয়? তারপর: "He gathered his material from the life of poor, ordinary folk, and portrayed it with such

sympathy and understanding, in so unaffected and charming a style that—" now, listen—"whoever read him could not help being overwhelmed by the beauty and truth of his vision."—Ah, there you are Mr. Professor. Beauty and Truth. Beauty is truth, truth beauty. সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। "He was a master of the emotions, particularly of pathos ; and his writings bring tears to the eyes of even the most hard-hearted." Ah, Mr. Professor, you've almost surpassed yourself !—"But his pathos—" এই, শোনো, "deep and touching as it was, was blended with an innate and unfailing humour, which"—now comes the crash—"places him on a rank with Dickens and Victor Hugo." Dickens and Victor Hugo ! Oooooh ! Too much, too much. Too good. উঃ, ভাব্‌তে পারো ?'

'থাক্ গে—রেখে দাও ওটা। বোকামি আর ভাঁড়ামি নিয়ে কত আর হাসা যায় !'

'না—না, আর-একটু শোনো, just a minute. "By the way"—mark, the writer's trying to be intimate "By the way"—অবিশ্যি কথাটা মোটেই by the way নয়, রীতিমত deliberate, pre-meditated, সে যা-ই হোক—"There was nothing immoral in his books, he did not believe in the cheap slogan of Art for Art's

sake, nor rouse man's worst passions, as some of our modern writers do, while calling it by the name of realism. Whatever he wrote was clean, wholesome and fresh." Clean, wholesome, fresh. Guaranteed pure. Unadulterated. Untouched by hand. Easily digestible. Kiddies will *love* it. হর্লিক্স মিল্ক? না, গ্র্যাক্সোর বিস্কুট? আরো শোনো ঃ "His works bring to us the message of eternal truth; and in personal life, he was a man of exemplary character." Exemplary character! তা ঠিক; ওর নিজের বোন ওর বাড়ি এসে থাক্‌তে ভয় পেতো। পর-পর তিনটে স্ত্রীকে মেরেছে; যদিও স্ত্রী ছিলো ওর পক্ষে bank holiday। একবার ওর এক রক্ষিতার সতীত্বে সন্দেহ হয় ব'লে গুণ্ডা দিয়ে মেয়েটাকে খুন করায়। জমিদার-মশাই এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে রাজার আইন-অনুসারে সেই গুণ্ডার হলো ফাঁসি। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। হ্যাঁ, সতীত্ব ধর্ম্মের উপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিলো; একটু এদিক ওদিক সইতে পারতেন না। Exemplary characterই বটে।'

'তুমি এর সম্বন্ধে এত খবর জানো কী করে?'

'তা জানি নে! বাঃ, আমি দেবকীকিশোরের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলুম যে।'

'প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলে! কবে?'

'অনেক আগে। তখন আমার বয়েস অল্প ছিলো; সবে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি। তখন আমার জীবনের সাহিত্যিক

phase চলছে। খান্-দুই বইও বেরিয়েছে। তখন—কয়েক দিনের জন্য আমার আশা করবার দুঃসাহস হয়েছিলো, আমি লেখক হবো। লেগে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো লেখক হ'তামও—এখনো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'তে পারি নি।

'কিন্তু এম-এ পাশ করবার পর হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলুম, আমার পক্ষে অর্থোপার্জ্জন করা ভয়ানক দরকার। এমন কি, আমি নিজে রোজগার না করলে আমি ভাত খেতে পাবো না, চা খেতে পাবো না, পরবার কাপড় পাবো না, থাকবার একটা ঘরও পাবো না—অবস্থাটা ভারি বিশ্রী। ও-সব জিনিষের জন্য কখনো ভাবতে হয়, বাইশ বছর পর্য্যন্ত তা ভাবতে পারি নি। বাইস বছর পর্য্যন্ত ও-সব জিনিষের নিয়মিত সাপ্লাই পেয়ে এসেছি; সেটা কোত্থেকে আসছে বা সে-সাপ্লাই একদিন হয় তো শেষ হ'য়ে যেতে পারে, এ-সব চিন্তা করবার সময় বা দরকার ছিলো না। ও-সমস্ত জিনিষ আমি দিব্যি, নিশ্চিন্ত-মনে ধ'রে নিয়েছিলুম; ও-সব জিনিষ যেখান থেকেই হোক্ আসবেই—আলো বাতাস জলের মত তাদের অভাব কখনো হবে না, মানুষ হিসেবে—জীব হিসেবে বলা যায়—তাদের ওপর আমার birth-right। উপরন্তু যে-টাকাটা পেতুম, তাতে আমার বাজে খরচ চলতো। সাধারণ ভাষা ব্যবহার ক'রে বাজে খরচ বল্‌লুম, কিন্তু সে খরচটাই হচ্চে আসল; দেহ রক্ষার প্রয়োজনের বাইরে যে-সব বিলাসিতা আমরা ক'রে থাকি তাতেই তো আমাদের মনুষ্যত্ব। দেহ-রক্ষা আমাদের সবাইকে একভাবে করতে হয়, তাতে কোনো ইতরবিশেষ নেই; কিন্তু যে-প্রণালীতে আমরা বাজে খরচ করি, তাতেই বোঝা যায় আমরা কে কী-দরের লোক। যেমন, অবসর সময়টা আমরা

যে-ভাবে কাটাই, তাতেই আমরা আমাদের চরিত্রের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিই। অন্ন-সংস্থানের জন্য যে-কাজ, সেটা বিচার্য্য নয়; যে-সময়টা বাড়্তি, যে-সময়ে আমরা স্বাধীনভাবে আনন্দ খুঁজি, তখন যে যা করি, সেটাই হচ্ছে নিরিখ। যাক্—অন্য কথা এসে গেলো।

হ্যাঁ—একদিন হঠাৎ দেখা গেলো, চা চাল কাপড় ইত্যাদির সাপ্লাই বন্ধ হ'য়ে গেছে; সে-গুলোর ব্যবস্থাও আমাকেই ক'রতে হবে; নইলে চলবে না। মনটা ভারি বিরক্ত হলো; মনে করলাম, এ কী উপদ্রব! ও-সব জিনিষের জন্য আবার কখনো কারো আট্‌কে থাকে! মনে মনে প্রতিবাদ ক'রে, বিদ্রোহ ক'রেও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকবার উপায় ছিলো না; অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় লেগে গেলুম।

'তখন যৌবনের মোহে মনে এটুকু স্পর্দ্ধা ছিলো যে আমি লেখকশ্রেণীর একজন; সুতরাং লেখাতেই আমার যা হবার হবে। কিন্তু যেটুকু হয়—অন্ততঃ, তখনকার মত আমার যেটুকু হ'লো—তার ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকতে হ'লে প্রায় অমানুষিক ধৈর্য্যের দরকার। কয়েক মাস কী যে পরিশ্রম, প্রাণ ধারণের জন্য কী মর্ম্মান্তিক চেষ্টা। অবিশ্রান্ত লেখা, সেই লেখা বেচবার জন্যে, টাকা আদায়ের জন্যে ছুটোছুটি, নানারকম ফন্দি-ফিকির খোঁজা, "প্যাঁচ" কষা—একজন মানুষের পক্ষে বড় বেশি, বড় বেশি। কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লুম। দেখলুম, এ ভাবে আর চলে না। অবিশ্রান্ত কতই বা লেখা যায়? আর যদিই বা জোর ক'রে মনকে চাবুক মেরে যা-তা রাবিশ সব লিখে যাওয়া যায়, তা হ'লেই বা কী? সেগুলো বেচবো কোথায়? যথেষ্ট কাগজ নেই, যথেষ্ট প্রকাশক নেই। যে-কটা

আছে, তার মধ্যেও নানারকম দল, বহু ছোট ছোট স্বার্থের সংঘাত, ব্যক্তিগত আক্রোশ, ঈর্ষা—সবাইকে খুসি রেখে সব দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হ'লে অসাধারণ কূটবুদ্ধির দরকার—তা আমার ছিলো না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেককে অখুসী করতে আমি সক্ষম হয়েছিলুম। তার কারণ—এখন আমার মনে হয়—আমার সমসাময়িক অনেকের চাইতেই আমি ভালো লিখতুম।

'কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে এ-দেশে ভালো-লেখা মন্দ-লেখায় কোনো তারতম্য নেই—অন্ততঃ, গোড়ার দিকে। শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি, লেখা ভালো কি মন্দ, শুধু তাই দিয়েই এক-একজন লেখকের অদৃষ্ট ধার্য্য হয়। সময়ের বিচার নির্ভুল, সময়ের বিচার নিষ্ঠুর। কিন্তু লেখকরা যখন অপেক্ষাকৃত নতুন, তখন সম্পাদকদের কাছে, প্রকাশকদের কাছে মুড়ি-মুড়কির একদর; কোনো রকম ভেদ করতে হ'লে যেটুকু সাধারণ বুদ্ধি এবং সাহিত্য-বোধ থাকা দরকার, তা তাঁদের সাধারণত থাকে না। যে লেখকের কোনো রকম ক্ষমতাই নেই, দুটো লাইন শুদ্ধ বাঙলা যে লিখতে পারে না, আর যে-লেখকের মধ্যে প্রতিভার নিঃসংশয় আভাস পাওয়া যায়, এ-দু'জনের বাজার-দর এক। লেখার দৈর্ঘ্যের ওপর পেমেণ্ট; এবং ফাঁকি দিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়াবার কতগুলো সহজ কৌশলও আছে। আর, তা-ও যা টাকা পাওয়া যায়, তা এত সামান্য—তার ওপর অনিশ্চিত যে তার ওপর নির্ভর করা অসম্ভব। বইটা যে মুসলমান দপ্তরী বাঁধায়, তার রোজগার বইয়ের লেখকের চাইতে বেশি, এ আমি হিসেব ক'রে দেখিয়ে দিতে পারি। আর, প্রকাশকের মর্জ্জি, সম্পাদকের খামখেয়াল তো আছেই। নানা রকমের ঝকমারি—স্নায়ুর্ভের ওপর অসম্ভব strain। মোট কথা,

এ-দেশে যে প্রথম থেকেই লিখে খেতে চায়, সে যতই ভালো লিখুক, অনেক দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকা দরকার।

'সে-রকম প্রস্তুত আমি ছিলাম না; আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো। দিন থেকে দিন সঙ্কীর্ণ জীবন-ধারণ, প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, মনকে চাবুক মেরে লিখতে বসানো সব মিলে আমার আর সহ্য হচ্ছিলো না। ভাবলুম, কোথাও কোনো-রকমের একটা চাকরি পাই তো বেঁচে যাই। খাবার-পরবার ভাবনাটা তো থাকবে না—তখন অবসর সময়ে আস্তে-আস্তে নিজের খুসি-মত লেখা যাবে। অত হাঙ্গামও পোয়াতে হবে না। কিন্তু কী ক'রে চাকরির চেষ্টা করতে হয়, তা-ও আমি জানি নে। রোজ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বেছে বেছে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে লাগলুম। কোনোটারই জবাব আসে না, তবু আরো পাঠাই।

'লিখে আমাদের দেশে পয়সা হয় না, এটা কিন্তু ভুল ধারণা। পয়সা হয় বই কি—সে-রকম লিখতে পারলে খুবই হয়। না, শুধু "বিষের ছুরি" বা "শ্বেতবসনা সুন্দরী" নয়; বেশ ভালো, ভদ্র সাহিত্যের মধ্যেও এমন প্যাঁচ করা যায়, যাতে পদ্মায় বেড়াজাল ফেললে যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ মাছ উঠে আসে তেম্‌নি অগুন্‌তি টাকা এসে লেখকের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট্ ফাঁপিয়ে তুলবে। প্যাঁচটা আর কিছুই নয়—পেথস্—বা বেথস্, যা-ই বলো; বাঙালী পাঠক ও-দুটোর প্রভেদ বোঝে না। বরং পেথসের চাইতে বেথসেরই এরা পক্ষপাতী—একেবারে হাউমাউ ক'রে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে না পারলে এদের মনে করুণ রস জমে না। চীৎকার ক'রে ঢাকঢোল পিটিয়ে দুঃখের কথা বলতে পারলে এরা একবাক্যে বলবে—লেখা

বটে! সাবাস্! পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পেট থেকে কান্না বা'র করতে পারলে—তবে গিয়ে সে-বইয়ের বিক্রি। "দেবদাস" কি "চন্দ্রনাথে"র মত বই লেখো—দেখবে, লাখে-লাখে বিক্রি; অত টাকা নিয়ে কী করবে, দিশে পাবে না। "দেবদাসে"র সেই বিখ্যাত প্যাসেজঃ 'যদি এমন কেহ থাকে, মৃত্যুর সময়ে যাহার শিয়রে বসিয়া কেহ দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না......" কোটেশানটা বোধ হয় ঠিক হ'লো না, যা-ই হোক্, ওখানটা পড়তে-পড়তে মেয়েরা ডু্করে কেঁদে উঠছে, ছেলেরা বই শেষ ক'রে বিছানায় শুয়ে নিঃশব্দে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে, শিশুরা মা-কে কাঁদ্তে দেখে ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠছে-সে এক চমৎকার দৃশ্য। আমি "দেবদাসে"র এমন কোনো কপি দেখি নি, যাতে ও-জায়গাটা মোটা লাল পেন্সিলে তিন চার বার ক'রে দাগানো নেই, আর মার্জিনে একাধিক বিস্ময়-চিহ্নের আগে কোনো উচ্ছ্বসিত বিশেষণ লেখা নেই। ও-বই বিক্রি হবে না! ও যে বিক্রি হবারই বই! হ্যাঁ, এ-দেশেও বই লিখে পয়সা হয় বই কি—ও-রকম লিখতে পারলে। কিন্তু আমার কখনোই হ'তো না; কারণ ও-রকম জিনিষ আমি কখনোই লিখতে পারতুম না; সে ক্ষমতাই আমার নেই। আমি যদি সাহিত্য নিয়েই থাকতুম, আজ অবধি আমাকে গরীবই থাকতে হ'তো।

'তবু—কখনো যদি সে-কথা মনে পড়ে, একটু অনুতাপ হয়। মনে হয়, কেন আমি ভয় পেয়ে পেয়েছিলাম, কেন আমি আঁকড়ে ধ'রে থাক্তে পারি নি, কেন আমি খ'সে পড়্লাম, কেন সহজ জীবন খুঁজতে গেলাম। সাহস ক'রে যদি লেখা নিয়েই প'ড়ে থাকতাম, শেষ পর্য্যন্ত হয়-তো আমারি জয় হ'তো। কারণ,

আমার এখনো বিশ্বাস, আমার ক্ষমতা ছিলো! সাংসারিক দিক থেকে তাতে আমার লাভ হ'তো না, আমি বড়লোক হ'তে পারতুম না; কিন্তু নিজের কাছে আমি বড় হ'তে পারতাম, আমি বাঁচতাম। তা হ'লে হয়-তো এমন-কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো, পরবর্ত্তী ফ্যাশানের ঢেউ এসে যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো না, যার জন্য লোকে আমাকে মনে রাখতো। এখন মনে হয়, কেন আমি না খেয়ে, এঁদো একতলা ঘরে বাস ক'রে, ছেঁড়া, নোঙ্‌রা জামা-কাপড় প'রে লি'খে যাই নি, কেন, আমার যা কাজ ব'লে বুঝেছি, নিষ্ঠুরভাবে, হিংস্রভাবে, অত্যাচারীর মত তা ক'রে যাই নি। অনেকে, শুনেছি, তা-ই করে। ইয়রোপে—এ-দেশে নয়। আমাদের দেশের লোকের সে-ক্ষমতা নেই—অন্তত, এখনো হয় নি। আমি প্রথম নই; আমার আগে অনেকে নিজেকে বেচে দিয়েছে; আমার পরে আরো অনেকে দেবে।

'এ-কথা মনে হয়, দুঃখ হয় মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্ত পরেই ভাবি, যা হয়েছে, এ-ই ভালো হয়েছে। কারণ, আমি যদি লেখকই হ'তুম, তা হ'লে তুমি গরম পড়তে না পড়তেই দার্জিলিঙ্‌ কি মুসৌরী চ'লে যেতে পারতে না, সন্ধ্যের সময় তোমার বেড়াবার জন্য দরজায় একটা লিম্যুসিন অপেক্ষা করতো না, তোমার বাড়ির পার্টিগুলো কলকাতায় বিখ্যাত হ'তো না, তোমার বাথ-রুমে পঁচিশ রকম বাথ-সল্‌ট্‌ থাকতে পারতো না। সে-কথাই বা বলি কেন? আমি যদি লেখকই হতুম, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার কখনো দেখাই হ'তো না; যদি বা হ'তো, তোমার সঙ্গে অতটা অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পেতুম না, যাতে বাইরের দৈন্যের আড়ালে আমার অন্তরের ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে তুমি আমাকে বিয়ে

করতে পারতে। তুমি—রূপের জন্য বিখ্যাত, প্রকাণ্ড লোকের মেয়ে, তখনকার বড়লোকী সমাজের rage—সেই তুমি, কত প্রার্থীকে উপেক্ষা ক'রে, কুড়ি বছর বয়েসে যে প্রায়-প্রৌঢ় আমাকে বিয়ে করেছিলে, সে কি আমার টাকার জন্যেই নয়?'

'ছি-ছি—কী যে বলো।'

'কেন—এতে লজ্জা পাবার কী আছে? কারণ, এটা তো ঠিক যে টাকার জোর না থাকলে অমন কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যে আমার পক্ষে তোমাকে লাভ করা সম্ভব হ'তো না—কিছুতেই নয়, তোমার ইচ্ছে থাকলেও নয়। যদি বা এতে কোনো লজ্জা থাকে, সে লজ্জা তোমার নয়, আমার নয়, আজকালকার পৃথিবীর, আধুনিক সভ্যতার। টাকা দিয়েই আজকাল সব জিনিষের মীমাংসা হ'য়ে থাকে, সমৃদ্ধি অনুসারেই আজকাল মানুষের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। আধুনিক সমাজে আমরা নতুন রকমের জাতিভেদ মেনে চলি, তার মান হচ্ছে টাকা; এবং হিন্দুদের বহু-নিন্দিত বর্ণ-বিচার থেকে তার কড়াক্কড় অনেক বেশি, ভাগগুলোও অনেক সূক্ষ্মতরো। যার রোল্‌স্ আছে, শেভ্রোলের মালিকের সঙ্গে সে ভালো ক'রে কথা কইবে না; এমন কি সব্‌ডেপুটি-গিন্নীর সঙ্গে মিশলে ডেপুটি-গিন্নীর জাত যাবে। আমরা আজকাল দেবতা মানি নে, বড়াই ক'রে ঈশ্বরকে অস্বীকার করি; কিন্তু সেই সমস্ত সিংহাসনচ্যুত, স্বর্গভ্রষ্ট, বিতাড়িত দেবতার জায়গায় এক অমোঘ দেবতাকে আমরা বসিয়েছি, সবাই তাকে স্বীকার করি, পূজো করি, তাকে অর্ঘ্য দিই। সে-দেবতার নাম টাকা। এবং এই নব-দেবতার রাজত্বে নতুন ধর্ম্ম, আচার, অর্চ্চনাবিধি, কুসংস্কার সবই গ'ড়ে উঠেছে, তাকে মেনে না চ'লে আমাদের

উপায় নেই। এই নব-বিধান অনুসারে সমাজ পরিচালিত; যতই আমরা রীজন্-এর বড়াই করি, হিন্দু বা রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতের আমলের চাইতে এখন-যে ব্যক্তির মর্য্যাদা একটুও বেড়েছে, তা নয়, বরং অনেক ক'মে গেছে। উচ্চ রাজনীতির মূলের কথাও ব্যবসা—টাকা। ডেমক্রেসির নিশান উড়িয়ে আমরা লাফালাফি করি, কিন্তু পৃথিবী শাসন করে কে? তোমার মন্ত্রী? বা, যারা ভোট দ্যায়? তাই মনে হ'তে পারে বটে। কিন্তু আসলে সমস্ত ক্ষমতা পৃথিবীর কয়েকটি কোটিপতির হাতে, এরা নিজেদের ব্যবসা স্বার্থের জন্য পৃথিবীর ইতিহাস বদ্‌লে দিতে পারে—এবং দিয়েও থাকে। স্পেনের ফিলিপ কি ফ্রান্সের লুইর অত্যাচারের চাইতে এদের অত্যাচার কোন অংশে বরণীয় ব'লে আমার মনে হয় না। বরং, এ-কথা বলবার আছে যে ক্যানাডার কোনো কাঠের ব্যাপারী কি ফ্রান্সের কোনো চকোলেট উৎপাদকের চাইতে ফিলিপ কি লুই মানুষ হিসেবে অনেক, অনেক ওপরে ছিলেন। মার যদি খেতেই হয়, তা'হলে যার তার হাতে না খেয়ে বরং এমন লোকের হাতে খাওয়া ভালো, যে সত্যি ওপরে বসবার যোগ্য। চামড়ায় সমানই লাগে, কিন্তু মনকে তবু সান্ত্বনা দেবার একটা কিছু থাকে। যাক, যে-কথা বল্‌ছিলাম।

'অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে পাঠাতে হতাশ হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন বেরুলো, যা মনে হ'লো যেন আমার জন্যেই উদ্দিষ্ট। "Wanted an educated, young gentleman, with literary abilities to act as Private Secretary to a Bengali nobleman......" "with literary abilities"! মনটা লাফ দিয়ে উঠলো। উদ্দাম দুরাশাকে

যা হোক লাগাম টেনে ধ'রে সীমার মধ্যে রেখে নিজের শিক্ষা ও সাহিত্যিক ক্ষমতার একটা বিনীত বিবরণ খবরের কাগজের পোষ্ট বক্সের ঠিকানায় লিখে পাঠালুম।

'দিন কয়েক পর অভিজাত-গৃহের চিহ্ন-অঙ্কিত, প্রেরকের মনোগ্রাম এমবস্-করা পুরু নোট পেপারে ডি-কে-চক্রবর্ত্তী স্বাক্ষরিত এক টাইপ-করা চিঠি এসে উপস্থিত—পরদিন সকাল দশটায় আমাকে ইন্টার্ভিয়ুর জন্য আহ্বান ক'রে। বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মত মনটা বিঘূর্ণিত হ'তে লাগলো।

'ইন্টার্ভিয়ু হ'লো। সেই প্রথম কুমার দেবকীকিশোরের স্ফীতগণ্ড, গোলাকৃতি, সুরারক্তিম মুখের ওপর আমি চোখ রাখলাম। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ায় পূর্ব্বদিকে লাল হ'য়ে যে কোণভাঙা চাঁদ ওঠে—সেই রকম তাঁর মুখ - তেমনি অসুস্থ, নির্ব্বোধ, অথচ একটু হিংস্র।

'দেবকীকিশোর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আপনার লিখে-টিকে অভ্যেস আছে, লিখেছেন—"

'আমি আরম্ভ করলাম, "দুটো বই বেরিয়েছে ; তা ছাড়া—"

'আমার কথা শোনবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না ; বাধা দিয়ে বললেন, "এখানে আপনাকে লিখতেই হবে—আর কোনো কাজ নেই। এক-শো টাকা ক'রে মাইনে পাবেন। চলবে ? .....বেশ, কাল দশটার আসবেন। .....আচ্ছা।"

'কী লিখতে হ'বে, বা আর কোনো বৃত্তান্ত সেদিন জানতে পারলুম না। যাক্—চাকরিটা তো হ'লো, সেটা কম কথা নয়। মনে শান্তি থাকবে, আর তাড়াহুড়ো ক'রে লিখতে হবে না, টাকার জন্যে চড়কি-বাজির মত ছুটোছুটি করতে হবে না—বেশ

হ'লো। নিজের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ নিউ-জিরুসালেমের স্বপ্নের মত উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটলো। চাকরিটার জন্যে তখনকার দিনের কয়েক জন নাম-করা লেখক প্রার্থী ছিলেন; তাঁদেরকে বাদ দিয়ে দেবকীকুমার আমাকে কেন নিলেন, তখন ভেবে অবাক লেগেছিলো। কেন, সেটা অবিশ্যি কয়েক দিন যেতেই বুঝতে পারলাম। তাঁরা নাম-করা বলেই বর্জ্জিত হয়েছিলেন; আমি বিখ্যাত নই, সাহিত্যিক হ্যাক্ গোছের—তায় ছেলেমানুষ। তা'র ওপর, নিশ্চয়ই আমার খুব টাকার দরকার। আমি একেবারে নিরাপদ। দেবকীকিশোরের প্রয়োজনের পক্ষে আমার চেয়ে উপযুক্ত কেউ ছিলো না।

'পরদিন দেবকীকিশোর বল্লেন, "একটা গল্প লিখে দিন্ তো।"

'জমিদারের বাড়িতে চাকুরি নিয়ে গল্প লিখতে হবে, আশা করি নি। বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"আপনাকে যখন কোনো কাজের কথা বলবো, কোনো কারণ জিজ্ঞেস করবেন না, কাজটা করবেন। বুঝলেন? সে-জন্যই আপনি এখানে।"

'মাথা নীচু ক'রে তিরস্কার হজম করলাম। ঠিক কথাই তো—চাকুরি যখন নিয়েছি, তখন আর প্রশ্ন করবার অধিকার নেই।

'সেই সমস্ত দুপুর ব'সে-ব'সে ছোট একটা গল্প শেষ ক'রে ফেল্লাম। একটা কিশোর বয়সের প্রেমের গল্প—লিখে নিজের মন্দ লাগলো না। দেবকীকুমারকে প'ড়ে শোনাতে হ'লো। সবটা পড়তে হ'লো না; খানিকটা শুনেই তিনি ব'লে উঠলেন, "উহুঁ—এ চল্‌বে না।"

"চল্‌বে না—মানে?" কথাটা প্রায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু ঠিক সময়ে আমি নিজকে সাম্‌লে নিলুম। আমি চাকরি করি—আমার কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে নেই।

'দেবকীকিশোর বল্‌লেন, "এ রকম জিনিষ আমি কখনো লিখবো না।"

'আমি বল্‌লুম, "এ রকম জিনিষ লিখতে পারলে তুমি গাল-ফোলা, পেট-মোটা জমিদার হ'তে না।" অবিশ্যি মনে মনে বল্‌লুম।

'দেবকীকিশোর বল্‌লেন, "এ-গল্প বড়লোক নিয়ে; বড়লোক বাদ দিতে হ'বে। কী-রকম জিনিষ চাই, ব'লে দিচ্ছি। গরীব লোক নিয়ে লিখবেন, পল্লীগ্রামের কথা থাকবে; ভালোবাসা যদি থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, কিম্বা অবিবাহিত ছেলেমেয়ের মধ্যে—পরে অবিশ্যি বিয়ে হওয়া চাই। তবে ভালোবাসা বেশি না থাকাই ভালো। বেশির ভাগ লিখবেন মাতৃস্নেহ। আর দু'একটা মৃত্যু থাকতে হবে, খুব ফেনিয়ে ফেনিয়ে বর্ণনা করবেন—যাতে লোকের কান্না পায়। আর মাঝে মাঝে ভালো ভালো উপদেশ, তত্ত্বকথা, দেশের উন্নতি, সমাজ-সংস্কার এ-সব দিতে হবে—বুঝলেন না, দেশের লোকের চোখে আমার তো একটা পজিশন আছে—সেটার যাতে কোনোরকম হানি না হয়। আর বুঝলেন—ও-রকম ভাষাও চলবে না; বেশ সহজ স্পষ্ট করে সাধারণ ভাষায় লিখবেন—যাতে সবাই বুঝতে পারে। ইংরিজি কোনো কথা থাকবে না; কোনো বইয়ের উল্লেখ, কোনো অবান্তর জিনিষ—ও-সব কিছুই থাকবে না। একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন—সবাই যাতে

বুঝতে পারে। আমার লেখা দেশের সব শ্রেণীর লোককে আমি পড়াতে চাই—বুঝলেন।”

‘বুঝলাম। পেছন থেকে এসে কেউ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারলেও এতদূর স্তম্ভিত হ’তাম না। হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ পাথর হ’য়ে গেলো—আর চল্‌তে চায় না। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমে হিম হয়ে গেছে—আমি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলাম—পারলাম না।

‘“বেশ”, দেবকীকিশোর তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, “কাল তা হলে ও-ধরণের একটা গল্প চাই।”

‘কোনো কথা না ব’লে বেরিয়ে চ’লে এলাম; মনে মনে বললাম, “এই শেষ, এ-বাড়িতে আর কখনো ঢুকবো না।”

‘সমস্ত অন্তরাত্মার একটা হুঙ্কার নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। হাজার দুঃখেও যৌবন মরতে চায় না; সমস্ত প্রতিকূলতার মুখে যৌবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, জয়ী হ’তে চায়। সেই সময়ে আর কোন্ শক্তি আমার ছিলো—এক যৌবনের দুঃসহ আত্ম-শ্লাঘা ছাড়া? শুধু তারি জোরে তো আমার মনের উন্মাদ বিদ্রোহ। না, না বার-বার আমি নিজের মনে বলতে লাগলুম, এ হ’তে পারে না, কিছুতেই হ’তে পারে না। যতবার ও-কথা ভাবি, চাবুকের মত মনে এসে লাগে; নিজকে এমন অপরিচ্ছন্ন লাগছিলো, যেন আমার সারা গায়ে কেউ থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে। অসহ্য হ’য়ে উঠলো, বিছানায় এসে শুয়ে থাকলাম। তারপর...... আস্তে আস্তে আমার মাথা ঠাণ্ডা হ’লো। কেন নয়? আমি যদি না করি, অন্য কেউ এ কাজ নেবে, পাপ স্বচ্ছন্দগতিতে নিজকে বৃদ্ধি করে চলবে; মাঝখান থেকে আমি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

আমার এই রোষ, এই সত্যাভিমান কারু কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।—এক আমার নিজের ছাড়া। মাসের শেষে এক-শো টাকা এমন কিছু মন্দ নয় ; এটা ছাড়লে আর একটা পাওয়া সহজ হবে না। এবং টাকার দরকার, টাকার দরকার। তা ছাড়া কী-ই বা এমন আসে যায় ? চোখ-নাক বুজেঁ, মনের সমস্ত বৃত্তিকে তখনকার মত স্থগিত রেখে কতগুলো রাবিশ লিখে গেলেই হ'লো ; ওতে আমার লজ্জা কী ? ও তো আর আমি লিখছি নে—কোনো অর্থেই নয়। ভুলে যেতে হবে আমি কোনোরকম শিক্ষা পেয়েছি ; ভুলতে হবে, আমার মাথার মধ্যে কোনো গ্রে ম্যাটার আছে, ভুলে যেতে হবে আমার কোনোরকম রসবোধ, সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান-এমন কি, খানিকটা ভালো রুচি আছে ; ডিমের খালি খোলসের মত একেবারে শূন্য ফাঁকা হ'য়ে ব'সে সম্পূর্ণরূপে ইডিয়টিক কতগুলো জিনিষ লিখে যেতে হবে। তা হ'লেই হ'লো। তারপর—অন্য সময় তো আছেই। আমি তো আছিই। এমন আর মন্দ কী? এটা যদি না নিই, হয়-তো এর বদলে আমি এমন কাজ করতে বাধ্য হবো, যা আরো খারাপ। বোকামি কোরো না।

বোকামি করলুম না, মন ঠিক করে ফেললুম। বিছানা থেকে উঠে ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রে কাগজ কলম নিয়ে বসলুম। প্রাণপণ চেষ্টা করলুম, যাতে ও-লেখায় একটুখানি বুদ্ধির চিহ্নও কোনোখানে না পড়ে। নিজের ওপর অত্যাচার ক'রে জঘন্য বাঙলা লিখলুম। প'ড়ে মনে হ'লো, এর চেয়ে stupid জিনিষ কেউ কখনো লেখে নি।

'কিন্তু ওতেও দেবকীকিশোর সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন. "হ্যাঁ—এটা একরকম হয়েছে, চলতে পারে। কিন্তু আর একট

—আর একটু ইয়ে হওয়া দরকার—যা বলছিলাম সে দিন। করুণরসটা ভালো জমে নি; আর গ্রামে খাবার জলের কী কষ্ট, সে বিষয়ে একটা প্যারাগ্রাফ ঢুকিয়ে দিতে পারতেন। এটা যা হয়েছে থাক্, ভবিষ্যতে আর একটু যত্ন নিয়ে লিখবেন।”

'তখনকার দিনে 'প্রতিমা' ছিলো বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র; ওজনে আকারে রঙীন ছবিতে বিজ্ঞাপনে—ফার্স্ট। এই কথাবার্তা হবার ঘণ্টা খানেক পর “প্রতিমা”র সম্পাদক এসে উপস্থিত। ক্রমান্বয়ে পঁচিশ বছর সম্পাদকি ক'রে তিনি রায় সাহেব খেতাব পেয়েছিলেন। ছোটখাটো, বুড়ো মানুষটি; মোটাসোটা গোলগাল নধর কান্তি; মাথায় চক্‌চকে টাক; সামনের দুটো দাঁত ছিলো না, তা'তে কথা বলবার সময় একটা hissing আওয়াজ হ'তো। দেবকীকিশোর তাঁকে গল্পটা দিয়ে শুধু বললেন, প্রতিমার জন্য।”

'রায় সাহেব ফোক্‌লা হাসি হেসে বললেন “নিশ্চয়ই সামনের মাসেই দিয়ে দেবো।”

“হ্যাঁ, তা-ই দেবেন; সামনের মাসে আরও লেখা তৈরি হবে।”

'আপনার মত লোক”, রায় সাহেব বললেন, “যখন লেখায় মন দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে আমাদের সাহিত্যের বাস্তবিক সুদিন এসেছে।” রায় সাহেব মাঝখান থেকে গল্পের কয়েক লাইন পড়লেন, “বাঃ চমৎকার লেখা হয়েছে অতি উপাদেয় স্টাইল। হ্যাঁ, আরো অনেক লিখবেন বই কি, আপনার আদর্শ সাধারণ লেখকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করবে। যখনি যা লেখেন, প্রতিমাকে ভুলবেন না যেন!... আচ্ছা, আজ উঠি তা হলে।... হ্যাঁ—একটা কথা। গল্প-বাবদ আপনার প্রাপ্য টাকা—”

"সে কথা থাক্। আমি টাকা চাই নি. সাহিত্যের সেবাই করতে চাই।"

' কিন্তু আমরা তো সব গল্পের জন্যই দাম দিয়ে থাকি।"

"তা ও-টাকাটা তুলে এনে আপনিই রাখতে পারেন।"

'পরের মাসের "প্রতিমা"য় সে-গল্প ছাপা হ'লো। তার পরের মাসে আর-একটা। তার পরের মাসে আরো একটা। এবং তার পরের মাস থেকে একটা ধারাবাহিক উপন্যাস চললো। আমি অবিশ্রান্ত লিখে যেতে লাগলাম; দেবকীকিশোর অনেক কষ্টে সেগুলোর নীচে একটা সই ক'রে দিতেন। লেখা ব্যাপারটা ভদ্রলোকের পক্ষে একটা যন্ত্রণা ছিলো; কলম ধরলেই তাঁর ভয়ানক হাত কাঁপতো। চেক সই-করা ছাড়া তিনি তার ধার দিয়েও যেতেন না।

'আমার পক্ষে কিন্তু দেবকীকিশোরের গল্প লেখা একটু অভ্যেসের পরেই নিতান্ত সহজ হ'য়ে এসেছিলো; কিছু তো ভাববার দরকার করে না, কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হয়। যতক্ষণ লিখতাম, এক রকম আত্মিক মৃত্যু আমাকে আচ্ছন্ন করতো; আমার মন অন্য কোথাও চ'লে গেছে; নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত হাতটা কাগজের ওপর ভ্রমণ ক'রে যাচ্ছে; আমি কী লিখছি, তা আমি নিজেই জানি নে। এমন হ'লো, যে আপিসের কাজের মত দেবকীকিশোরের গল্প-উপন্যাস লেখাও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ mechanical হ'য়ে উঠলো; শুধু একটু শারীরিক ক্লান্তি হ'তো; তা ছাড়া, মনকে যে ও-কাজ কোনোরকমে স্পর্শও করতে পারছে, তা নয়। তখন অন্তত তা-ই ভাবতাম। ভাবতাম, মন্দ কী? আপিসের কাজ যে এর চেয়ে কম dull হ'তো, তা তো নয়। আর, মাসের শেষে এক শো টাকা

আসছে—সেটা বেশ ভালোই। দিন কেটে যাক্ তো—একটু সময় পেলেই নিজের লেখা লিখবো। কিন্তু সময়ই পেয়ে উঠতাম না. ভদ্রলোক বড় বেশি লেখাতেন। "প্রতিমা"-সম্পাদক রায় সাহেবের চেষ্টায় দেবকীকুমারের নাম কয়েকমাসের মধ্যেই সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হ'য়ে পড়লো; দ্রুতবেগে যতই তাঁর খ্যাতি বাড়তে লাগলো, ততই আরো বেশি খ্যাতির জন্য তিনি আমার ওপর কাজের চাপ দিতে লাগলেন। যখন থেকে তাঁর বই ছাপা হ'তে আরম্ভ করলো, আমার কাজ আরো বেড়ে গেলো; প্রুফ দেখা, প্রেসের সঙ্গে, প্রকাশকের সঙ্গে বচসা করা, সমালোচনার জন্য কাগজের আপিসে-আপিসে ঘোরাঘুরি করা—নানা রকম। অবিশ্যি পাব্লিসিটির জন্য বেশি চেষ্টা করবার দরকারও ছিলো না; রায় সাহেব একাই দেবকীকিশোরকে boom ক'রে স্বর্গে তুলে দিয়েছিলেন। "প্রতিমা"তে দেবকীকিশোরের ছবি, জীবনী, তাঁর স্তুতি-মূলক প্রবন্ধ, প্রতি মাসে একটা পূর্ণপৃষ্ঠা তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন—কী নয়? অবিশ্যি তার কারণও ছিলো। "প্রতিমা"তে দেবকীকিশোরের লেখা প্রকাশ বাবদ রায়-সাহেব সব সুদ্ধ দু'হাজার টাকার ওপরে কাগজের কর্তৃপক্ষ থেকে পেয়েছিলেন।

'সাত বছর আমি দেবকীকিশোরের দাসত্ব করেছিলাম। সে সময়ের মধ্যে আমি নিজে একটি লাইনও লিখতে পারি নি। সে সময়ের শেষে দেবকীকিশোরের মনের বাসনা পূর্ণ হ'লো, তিনি প্রায় একজন সাহিত্য-সম্রাট হ'য়ে উঠলেন। তাঁর বইগুলোর এডিশনের পর এডিশন হয়েছে; বাঙলাদেশের প্রতি বিয়ে প্রতি তাঁর দশখানা বই অন্তত কাটেই। তাঁর সহজ, সরল রচনাভঙ্গীতে, গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, সহানুভূতিতে, হাস্যরসে সবাই মুগ্ধ। তাঁর সব মেয়ে-

চরিত্র নিয়ে অধ্যাপকরা গভীর গবেষণা-মূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখছেন। "প্রতিমা"য় যখন তাঁর কোনো ধারাবাহিক চল্‌তো—এর পরে কী হবে, এ নিয়ে ইস্কুলের ছেলেরা বাজি রাখছে। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে তাঁর সম্বর্দ্ধনা হ'য়ে গেলো। হ্যাঁ, দেবকীকিশোরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিলো বই কি।

'তারপর আমার মুক্তি হ'লো। এত বেশি সাহিত্যসৃষ্টি ক'রে দেবকীকিশোর বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন; সাত বছরের মধ্যে কলমের জোরে দিগ্বিজয় করবার পর একটু বিশ্রামের দরকার হ'তেই পারে। এক মাসের আগাম মাইনে দিয়ে তিনি আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন; বললেন, "আপনার কাজে আমি খুব খুসি হয়েছি; যদি আবার দরকার হয়, আপনাকেই খবর দেবো।"

'বাঁচলাম, বাঁচলাম। এতদিন পর আমি আবার আমি হ'লাম। এবার নিজের কাজ একটু করা যাক্। এবার নিজে লিখবো। একটা গল্প ভাববার চেষ্টা করলাম—কোথায় গল্প? যা মনে আছে, সব দেবকীকিশোরের; তার একটাও আমি লিখতে পারি নে। যা-ই হোক, ওরি মধ্যে একটা বেছে, ঘ'ষে-মেজে ভদ্র ক'রে নিয়ে লিখতে বসলাম। আমি ভালো-মত চেয়ারে বসবার আগেই যেন এক পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেলো। হঠাৎ চমক লাগলো। যা লিখেছি, পড়লাম। ভগবান, এ যে দেবকীকিশোর! রাগ ক'রে কুচি-কুচি ক'রে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে আবার আরম্ভ করলাম। ঠিক করলাম বলা যায় না, আরম্ভ করবো ব'লে ভাবতে লাগলাম। ভাবতেই লাগলাম। এমন একটা সেন্‌টেন্স মনে এলো না, যা বেশ খুসি হ'য়ে লেখা যায়। ভালো দূরের কথা, ভদ্র রকমের একটা জিনিষ মনে এলো না। যা মনে আসে, তা-ই লিখতে লজ্জা করে।

যা মনে আসে, তা-ই দেবকীকিশোর। কলম রেখে দিয়ে হতাশায় আমি আঙুল কামড়াতে লাগলাম। আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

নিজকে অভিশাপ দিয়ে-দিয়ে কয়েকদিন কাটলো। কিন্তু উদরপূর্ত্তি তো করা দরকার; কলম হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে থাকলে কিছু হবে না। তা ছাড়া, ভাবলাম, এক দিক যখন গেলোই, অন্য দিকটাকেই ভালো ক'রে ধরা যাক্। দেখা যাক্ চেষ্টা ক'রে, বড়লোক হওয়াই যায় কিনা। একটা দিশি ইন্‌শিয়োরেন্স কোম্পানি তখন নতুন আরম্ভ হয়েছিলো, সেটার একটা এজেন্সি নিলাম। তখনকার দিনে ও ব্যবসায় এত ভিড় ছিলো না। আমি জানতুম, দেবকীকিশোরের কোনো পলিসি নেই। অবিশ্যি, জমিদারের পক্ষে ইন্‌শিয়োর ক'রে কোনো লাভ নেই; তবু, হয়-তো—চেষ্টা করতে দোষ কী? গেলাম একদিন কাগজপত্র নিয়ে তাঁর কাছে। আমার ওপর তিনি খুসি হ'য়েই ছিলেন —তা'র ওপর, তাঁর মস্তিষ্কে তখন নেশার বাষ্প, সে-অবস্থায় কাউকে কিছু প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে করে না। এক লক্ষ টাকা করতে তাঁকে রাজি করাতে আমাকে বেশি কষ্ট পেতে হ'লো না। তখনি কাগজপত্র সই ক'রে দিলেন; পরদিন সকালেই ডাক্তার নিয়ে গেলাম। দেবকীকিশোরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার একটু আশঙ্কা ছিলো, ডাক্তারও পরীক্ষা ক'রে কী যেন সব বিড়বিড় করছিলেন। কিন্তু তাঁর ভিজিট ডবল ক'রে দিতেই তিনি A, রিপোর্ট দিয়ে দিলেন। একবারেই এক লক্ষ টাকার কেস দিতে সকলে পারে না। আমার কপাল খুলে গেলো। ঐ একটা ধাক্কা পেয়ে কোম্পানিও ফেঁপে উঠতে লাগলো; এবং কোম্পানির স্বার্থের সঙ্গে

আমার স্বার্থ দিন-দিন নিবিড়তরো হ'য়ে জড়াতে লাগলো। হু-হু ক'রে এগিয়ে চললাম। বছর দশেক পর দেখা গেলো, আমি বছরে যা ইনকম ট্যাক্স দিই, এক সময় তা বাৎসরিক আয় হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এমন কি, তুমি যে তুমি, তোমাকে বিয়েও করতে পারলাম। আরো আশ্চর্য্য।..... যাক্, দেবকীকিশোর যে আরো আগে মরেন নি, এ-ই আমাদের ভাগ্যি। আমার তো রীতি-মত ভয়ই ছিলো। অবিশ্যি, ভদ্রলোক আরো অন্তত বছর পাঁচেক বেঁচে গেলে কোম্পানি পূরোপূরি লাভ করতে পারতো, কিন্তু—যা-ই হোক, তিনি যে ইনশিয়োর করবার পরের বছরই মরেন নি, এ-ই যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তা হ'লে আর কোম্পানিকে টিকতে হ'তো না। তখন কোম্পানির কী-ই বা অবস্থা! আজ আপিসে গিয়েই হয়-তো দেখবো, তাঁর বাড়ির লোক death-notification পাঠিয়েছে। এ claimটা যত শীগ্‌গির হয় meet করতে হবে—কোম্পানির তাতে যা নাম বাড়বে—বা রে, কটা বাজলো একবার বলতে হয় না বুঝি? গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম, আপিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। এবার উঠতে হয়।'

সাময়িকী ও অসাময়িকী

রস-রচনায় অদ্বিতীয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 'ছোট গল্প' পড়িয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে গল্পের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয়টুকু পাওয়া যাইবে।

প্রিয়বরেষু, তোমার প্রেরিত 'ছোট গল্প' পেয়ে সাগ্রহে পড়লুম। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী-মশায়ের 'সেকালের গল্প' আমাকে অনেক কথা মনে করিয়ে দিলে।

গল্প জিনিষটি আগে মুখের আর কাণের জিনিষ ছিল, অর্থাৎ বলবার আর শোনবার। ক্রমে শিক্ষিতদের কলমের জিনিষ হয়ে দাঁও-প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেল। আমরা ওর মধ্যে মনস্তত্ত্বের কায়দা ভাঁজতে আরম্ভ করে গল্পকে অনুভূতিগম্য করে ফেললুম। 'বোধে-বোধ' কথাটি পরমার্থ-লিপ্সুদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন ছোটগল্প-পাঠকদের দরকারে এলো। বোধের দ্বারা যিনি যতটা রস আদায় করতে পারেন। গল্প আর গল্প করবার জিনিষ রইল না,—প্রাণের বস্তুতে প্রমোসন্ পেলে এবং তা সোনার মাদুলিতে দাঁড়িয়ে গেল,—নানাবর্ণের সিল্কের সুতোয় ঝোলানো। দেড় হাত সুতোয় আধ ইঞ্চি সোনার ধুক্‌ধুকি! সেইটি বোধের দ্বারা সুবোধে আবিষ্কার করে নেয়;—তাই আমাদের লেখকদের রক্ষে।

উন্নতিই বলতে হয়, কিন্তু দাদা-মশাই দাঁড়িয়ে গিয়ে, মুস্কিলেও পড়তে হয়েছে কম নয়। বালকেরা বোঝে না, গল্প শুনতে চায়। তখন মাথা চুলকুতে হয়। শেষ, 'মাসিক' খুলে পড়তে যাই—৭ পৃষ্ঠা গল্পের কয়েক লাইন পড়বার পর শুনতে হয়—"ছাই

গপ্পো—তুমি সেই রাজপুত্তুরের গপ্পো বলো।" বলি,—"এই শোন না এইবার, ভারী মজা আছে।" সবাই সাগ্রহে ঘেঁশে বসে। আমি সুরু করে নিজেই ভুরু কোঁচকাই। এ কি! সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী অরুণার অনুচ্চারিত বেদনার ব্যঞ্জনা! বেচারি দক্ষিণ বারাণ্ডায় কাট মেরে দাঁড়িয়ে—নিষ্পলক দৃষ্টি দূর দিগ্বলয়ে পৌঁছে দিয়ে হৃদয়ের মহাপ্রলয় হজম করছে! মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের ঝাপ্‌টা।

নিজের অবস্থায় লজ্জিৎ হয়ে সভয়ে শ্রোতাদের দিকে চেয়ে দেখি,—আঃ হরি রক্ষা করেছেন, কখন সব সরে গেছে! তবে একনিষ্ঠ সভ্যেরা সে-অভদ্রতা করে নি, ঘুমিয়ে পড়েছে! শান্তির নিশ্বাস আপনি পড়ে।

কিন্তু একটু লাগে। তখন তামাক সাজি আর ভাবি,—অভাব নয় কি? কে জানে—বোধ হয় old-school mentality.

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * *

দেবী স্বর্ণকুমারীর স্বর্গারোহণে সাহিত্য-জগতের এক সুবর্ণোজ্জ্বল প্রতিভার তিরোধান ঘটিল। লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্র নাথের মত, লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী শ্রেষ্ঠা। কাব্যে, নাট্যে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গল্পে, গাথায়, গানে—তাঁহার রচনা অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর পাঠকচিত্ত নন্দিত করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রথম উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনায় সাদরে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে যে সম্মিলন বসে, স্বর্ণকুমারী দেবী সেই ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সভানেত্রীর আসন অধিকার করেন। তাঁহাকে সম্মান জানাইবার এই অবসর পাইয়া বাঙালী

ধন্য হইয়াছে। তাঁহার বয়স হইয়াছিল সাতাত্তর। তাঁহার জন্মোৎসবের আয়োজন চলিতেছিল, মৃত্যু আসিয়া সে আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিল। 'ছিন্নমুকুল', 'দীপনির্ব্বাণ', 'কাহাকে' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি নূতন সুর আনিয়াছিলেন। 'হাতে ক রে মালাগাছি সারা বেলা বসে আছি' প্রভৃতি গান একদা লোকের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার সম্পাদনায় 'ভারতী' যে খ্যাতি লাভ করে, সেই কৃতিত্বের কথা লোকে সহজে ভুলিতে পারিবে না। তখন সকলে স্বর্ণকুমারী দেবীকে বলিত—স্বয়ং ভারতী স্বরূপা। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী।

ছোট গল্প

প্রতি শনিবার বাহির হইবে

১৩৩৯ সালের পয়লা আষাঢ় বর্ষারম্ভ

প্রতি সংখ্যা—এক আনা

—বার্ষিক মূল্য—

কলিকাতায় ৩।০ ভি-পি-যোগে ৩৸৶০

মনিঅর্ডারে ৩৸০

নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ সকল জ্ঞাতব্য অবগত হইবেন

কথক সঙ্ঘ

২, লায়ন্‌স্‌ রেঞ্জ, কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৩৮৩২

১ম বর্ষ] ৩২শে আষাঢ় ১৩৩৯ [৫ম সংখ্যা

কায়া

শ্রীসজনীকান্ত দাস

হিমাদ্রির এই অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সবাই আশ্চর্য্য আর বিরক্ত হ'ল—ব্যাপারটাকে নিরুদ্বেগে আর সহজভাবে গ্রহণ করলে শুধু ঊর্ম্মিলা। কলেজে পড়া মেয়ে—স্কটিশে বি-এ অনার্স পড়ছে, পড়াশোনা ও বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশার দরুণ তার মনের মধ্যে একটা সহজ আত্মসম্মানের বোধ জাগ্রত হয়েছে, হিমাদ্রির ব্যবহারে তাতে ঘা লাগা খুবই স্বাভাবিক। দেখতে শুনতে সে মন্দ নয়, গুণী যে কিছু কম তাও নয়—তবু বাঙালী ঘরের বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে, তাকে পার করা নিয়ে ঘরে বাইরে যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল, পিতৃকুলের তরফ থেকে তার অপমান ও হীনতাটুকু

সে সর্ব্বদা অনুভব করছিল। মুখে আপত্তি করার মত মেয়ে সে নয়, পিতৃব্য অমূল্যরত্নের নীচ কৌশলে যোগ দিতেও সে অসম্মতি জানায়নি। তার মনের গ্লানি তাকে উত্তরোত্তর গম্ভীরই করে তুলছিল। হিমাদ্রি স্বয়ং তাকে নিষ্কৃতি দিলে দেখে সে খুসী হ'ল —মনে মনে হিমাদ্রির প্রতি কৃতজ্ঞও যে একটু না হয়েছিল তা নয়। মোটের উপর, ব্যাপারটার আকস্মিকতায় উর্ম্মিলার আত্মীয়পরিজন কিছু মুহ্যমান হয়ে পড়লেও বেশীদিন ও বেশীদূর এটা গড়াল না ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

এই ব্যাপারটাই অন্যভাবে ঘটলে হয় তো উর্ম্মিলার মনে দাগ না হোক দু'একটা আঁচড়ও লাগত। স্বামী হিসাবে হিমাদ্রি কাম্য বই কি! সুপুরুষ, এম-এ পাশ, পড়াশোনায় সেরা ছেলে, পুত্রকে অধিকতর কাম্য করে তোলবার জন্যে পিতা রেখে গেছেন অগাধ পয়সা; সংসারের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার মত হীনও সে নয়। এমন স্বামীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যখন হারাতে হ'ল তখন উর্ম্মিলা কাঁদতে বসলেও কেউ আপত্তি করত না, কিন্তু বর হিসাবে হিমাদ্রি কেমন, এবং নিজের সঙ্গে হিমাদ্রিকে জড়িয়ে একটা কোনও ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিলে কতখানি সুখ হয়, এ সব যাচাই করবার অবসর উর্ম্মিলা পায়নি। নিরুপদ্রব রাজ্যে জরুরি অর্ডিন্যান্সের মত হিমাদ্রিকে তার ঘাড়ে এমন হঠাৎ চাপানোর চেষ্টা চলেছিল যে অতর্কিত আক্রমণে মুহ্যমান না হলেও হিমাদ্রির প্রতি কোনও উচ্চ ভাব পোষণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হিমাদ্রির জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজেন্দ্র যেভাবে তার হাত টিপে তার মাংস নরম কিনা পরীক্ষা করে গিয়েছিল, ট্রামের কণ্ডাক্টারের টাকা বাজিয়ে নেবার মত যেভাবে তাকে বাজিয়ে দেখেছিল, তাতেও তার

সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। তবু সে মেয়েজাতীয় ও দেশটা বাংলা দেশ বলে এতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করেছিল। কিন্তু খুড়া অমূল্যরত্ন জরুরি টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে তাকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে হিমাদ্রির সগু-কেনা বাড়ীটার ভূতসম্বন্ধীয় অপবাদের সুবিধা নিয়ে সেই তথাকথিত ভুতুড়ে বাড়ীতে তাকে দিয়ে ছ-ছটা রাত্রি হিমাদ্রির শোবার ঘরে যে কসরৎ করালেন সেটা সে একেবারেই সমর্থন করতে পারেনি। অবিশ্যি এতে হিমাদ্রির কোনই দোষ ছিল না। সে বেচারা স্বপ্ন-প্রবণ, এক টুকরো ছেঁড়া চুল হাতে পেলেই যারা গোটা মানুষটাকে কাছে পায় সেই জাতীয় লোক সে। তাকে ঠকাতে খুব বেশী পরিশ্রম হয়নি, কিন্তু যদি তাকে সত্যি সত্যিই চেপে ধরতো, যদি চেঁচিয়ে উঠে লোক জড়ো করত! একজন কুমারীর পক্ষে খুড়ার গুপ্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্যাপারটা শোভন হত না। ভূতের অপবাদ ছিল বলে তবু রক্ষে, কায়াকে ছায়া বলে ভেবে নিতে হিমাদ্রিরও বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি—চেঁচামেচি করলেও হয়তো বাড়ীটার ত্রিসীমানায় লোকের টিকি দেখা যেত না; তবু সেদিন তো সে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, চেয়ার ছেড়ে পালাবার সময় হাতের বইটা ফেলে আসত আর একটু হলে, আর বইটার একেবারে প্রথম পাতায় তার নাম ধাম স্পষ্ট লেখা, তার ইংরেজী বাংলা হাতের লেখার নমুনাও হিমাদ্রির কাছেই ছিল।

এই সব কারণে সে প্রথমটা যখন শুনলে যে হিমাদ্রি তার সঙ্গে বিয়েটা বন্ধ করবার জন্যে অনির্দ্দেশ যাত্রা করেচে তখন সে মোটেই উদ্বিগ্ন হয় নি, বরঞ্চ জুয়াচুরীর সাহায্যে স্বামী ধরার হীনতা থেকে রক্ষা পেল ভেবে খুসীই হয়েছিল। এরপরে হয়তো আজীবন এই নিয়ে তাকে আপশোষ করতে হত!

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে হঠাৎ কেন জানি না তার মনে হতে লাগল, হিমাদ্রি বাবু পালালেন কেন! তাকে পছন্দ হয় নি? অন্য কোথায়ও মন পড়েছে? না, ভুতুড়ে বাড়ীতে প্রথম রাত্রে তাকে দেখে তিনি যেমন চমকে উঠেছিলেন, অভিভূতের মতো যেভাবে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, করুণকাতর বুভুক্ষিত কণ্ঠে যেভাবে ডেকেছিলেন, কে? তুমি কে? তাতে করে মনে হয় হিমাদ্রিবাবুর আর যাই দোষ থাক ভূতপূর্ব্বরাগের বালাই তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে? ভুতুড়ে বাড়ীতে যে ছায়া-রূপিণীকে দেখে তিনি মোহাবিষ্ট—হ্যাঁ, মোহাবিষ্ট বইকি, মানুষের চোখ কখনও মিথ্যা বলে না—হয়েছিলেন, উর্ম্মিলার মধ্যে তারই কায়ারূপ দেখে তিনি ভয় পেলেন কি?

হিমাদ্রির পলায়নের আগের ব্যাপারটা একটু ঝালিয়ে নেয়া যাক। বিধবা মাতা ও দুই পুত্র, ব্রজেন্দ্র ও হিমাদ্রি। হিমাদ্রি ছোট, অবিবাহিত। ব্রজেন্দ্রের পত্নী আছে। পিতার অগাধ অর্থ, হিমাদ্রি তার অর্দ্ধেকের মালিক। লেখাপড়ায় এদেশে যতটা ওঠা সম্ভব হিমাদ্রি ততখানিই উঠেছিল, বিলেতে গিয়ে শেষ একটা ডিগ্রি উপার্জ্জন করে আনার একটা গোপন বাসনা এখনও সার্থকতা লাভ করেনি। বিয়ের সম্বন্ধ করার পক্ষে সময়টা অনুকূল, সুতরাং ব্রজেন্দ্র দেখে এলেন উর্ম্মিলাকে, সুন্দরীই বলতে হবে—স্কটিশে বি-এ পড়ছে। ব্রজেন্দ্র কনে দেখে ফেরবার পথে পাথেয় সঙ্গে এনেছিলেন, উর্ম্মিলার ইংরেজী বাংলা হস্তাক্ষর। ব্রজেন্দ্রের মারফৎ কনের বর্ণনা শুনে মা তো উদ্যত হয়ে উঠলেন - বৌদিদিও উর্ম্মিলার ইংরেজি বাংলা হাতের লেখার নমুনা হিমাদ্রির কাছে ফেলে দিয়ে সারা শরীরে চাপা হাসির ঢেউ তুলে অন্তর্হিত হলেন। সেই কাগজের

টুকরো দুটি অনিচ্ছাসত্ত্বে নিজের অজ্ঞাতসারে দেখতে দেখতে হিমাদ্রির মনে কায়া ও ছায়া সম্পর্কে গভীর দার্শনিক তথ্যের উদয় হতে লাগল। অক্ষরগুলোই চোখের সামনে একটা জীবন্ত নারীমূর্ত্তিতে লীলান্তরিত হয়ে উঠল। কিন্তু হিমাদ্রি ছায়াবিলাসী, এই ছায়া মূর্ত্তিকেই স্থূল মাংসল করে তুলে একেবারে নিঃশেষে আয়ত্ত করে ফেলতে হবে এটা হিম্যাদ্রির রুচিতে বাধলো। সে ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে বহরমপুরে গঙ্গার ধারে পাঁচ-শ টাকায় একটা সুন্দর বাড়ী খরিদ করে সেখানেই ডেরা বাঁধলে। স্থানীয় লোকে বাধা দিলে, ভূতের বাড়ী, নানা বিপদের আশঙ্কা ইত্যাদি ভয় দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করতে চাইলে কিন্তু হিমাদ্রি জেদ ছাড়লে না। এই বাড়ীতেই ছয় রাত্রে বিভিন্ন অবস্থায় এক ছায়ারূপিণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং সপ্তম দিনে সেটেল্‌মেণ্টের হাকিম অমূল্যরত্নের বাড়ীতে ছায়ারূপিণীর কায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে তার পুলক বিস্ময়। পরিচয়ে জানল সেই উর্ম্মিলা, স্কটিশে বি-এ পড়ে! হিমাদ্রির মনটা হঠাৎ কায়ালোভী হয়ে উর্ম্মিলার সঙ্গে বিয়েতে সায় দিয়ে বসল। কিন্তু কত কি আশা করে সে রাত্রে সে বাড়ী ফিরে কায়ার প্রতীক্ষা করে করে সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ছায়ারূপিণীর সাক্ষাৎ পেলে না। তার পরদিন না, তার পরের দিনও না।

বিয়ের তারিখ ঠিক, মা ও বৌদি দু-চার দিন বাদে এলেন বলে, এমন সময়ে হিমাদ্রির স্বপ্ন গেল ভেঙে, সে ভাবলে, যে কায়াবন্ধনে সে বন্দী হতে বসেছে সে একটা মাংসস্তূপ—লজ্জা আর লোভ, জ্বর আর জরার একটা সমষ্টি। তার মনে হল, ঐ ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন—মোহে যার জন্ম, মূর্ত্তিতে যার অবসান।

উর্ম্মিলার পায়ের শব্দ শুনে ছায়া পালাল। কলিকাতায় সে টেলিগ্রাফ করলে, মা বৌদির আসার প্রয়োজন নেই। তারপরে সে ট্রেণে চেপে বস্‌ল, বহুদূরের ট্রেণ।

হিমাদ্রি গেল কোথায়? উর্ম্মিলার জানার কথা নয় বটে কিন্তু আমাদের সে কথা জানবার বাধা নেই। যার থেকে হিমাদ্রির এই ছায়া-বিলাস সে সোজা পাড়ি দিল সেই ক্ষুধিত পাষাণের দেশে হাইদ্রাবাদ নিজামের রাজ্যে অরালী (আরাবল্লী) পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে স্বচ্ছতোয়া শুস্তাবিধৌত বরাঁচে। সেখানে বাল্যবন্ধু হিরণকুমার ফরেষ্ট-রেঞ্জার, স্তম্ভের ধারে একটা চমৎকার বাংলাতে সস্ত্রীক তার বাস। হিমাদ্রি আশ্রয় পেলে।

একটা কথা এখানে বলে রাখা আবশ্যক, উর্ম্মিলা শিক্ষিতা মেয়ে, স্কটিশে বি-এ পড়ে, মারি ষ্টোপস, হ্যাভেলক এলিস পার হয়ে ক্রাফ্‌ট এবিং পর্য্যন্ত তার আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিদ্যা, সে স্বচ্ছন্দে হিমাদ্রির এই ছায়াপ্রীতি ও তদ্ধেতু পলায়ন ঘটনাটাকে একটা প্যাথলজিকাল কেস ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু কেন জানিনা হিমাদ্রিকে ততখানি ছোট করে দেখতে তার মন চায় নি। সে তার কাব্যের দিকটাকেই বড় করে দেখে নিজেও ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিতে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিল। হিমাদ্রির পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই উর্ম্মিলার মনের এই দুর্ব্বলতার সূত্রপাত হয় নি. তাকে জড়িয়ে হিমাদ্রি একটা কাণ্ড করে বসেছিল বলেই আস্তে আস্তে হিমাদ্রি উর্ম্মিলার চিন্তারাজ্যে একটু একটু করে রাজ্য বিস্তার করছিল।

হিরণকুমারের ডাক বাংলোটা যেখানে—সেখানে শুস্তা একটা বাঁক ফিরেছে, সেই বাঁকটা পার হ'লেই সেই প্রসিদ্ধ দ্বিতীয়

শা মামুদের ভোগ বিলাসের প্রাসাদ, নদীর ধারে পাথর বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে শৈলপাদমূলে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এবং সম্ভবতঃ আজও পাগলা মেহের আলি [illegible] নিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করে তার অভ্যস্ত চীৎকার করছে—তফাৎ যাও তফাৎ যাও, সব ঝুটা হ্যায়, সব ঝুটা হ্যায়।

আশে পাশে হালফ্যাসানের দু-চারটে ডাক বাংলো ওঠা সত্ত্বেও স্থানটির নির্জ্জনতা দূর হয় নি, বড় বড় পুরাতন বিরাটকায় বটবৃক্ষের পাশে শিশু বকুল গাছের মত বাংলোগুলি বাড়ীটার বিরাটত্ব আর প্রাচীনত্ব বাড়িয়েই তুলেছিল। প্রথম দিন বিকেলেই হিরণকুমারের স্ত্রী মাধবী হিমাদ্রিকে সম্বোধন করে বৌদিদির ঢঙে হাসতে হাসতে যখন বললে, আপনি তো আবার কবি শুনেছি, দেখবেন ওবাড়ীটা রবি ঠাকুরের মতো আপনাকেও না পেয়ে বসে, আমরা যেন পাপের ভাগী না নই, দেখবেন—তখন সে সত্যিসত্যিই চমকে উঠেছিল; সেই ছায়াময়ী বহরমপুর থেকে বরীচ অবধি পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে না তো!

প্রাসাদ স্থানে স্থানে ভগ্ন জীর্ণ হলেও এখনও বাস করার অযোগ্য হয় নি, কিন্তু তবু কেউ তাতে বাস করে না। এক-একদিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যখন হিমাদ্রি সেই প্রাসাদের সোপানমূলে দূরবর্ত্তী অরালী পর্ব্বতের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে একলা বসে থাকত তখন বরীচের সেই তুলার মাশুল আদায়কারীর মত তারও মনে হত—যেন একেবারে অনেক-গুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলে স্নান করতে নামছে—কাকেও যেন লক্ষ্যই করছে না। আরো কিছু দেখবার শোনবার প্রতীক্ষায় সে চুপ করে বসে থাকত,

বাতাস হিমে মন্থর হয়ে আসত, তবু সে উঠে যেতে পারত না। দূরে যখন একটা টর্চ্চ আর একটা লণ্ঠনের আলো ধারালো ছুরীর মতো সেই প্রসন্ন অন্ধকারকে চিরতে স্নুরু করত, হিরণকুমারের গম্ভীর বিস্ময়সূচক সম্বোধন ও মাধবীর চঞ্চল কলহাস্যে নদীতীরের স্তব্ধতা তরঙ্গিত হয়ে উঠত, হিমাদ্রি তখন বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, যাও তোমরা বড় ব্যস্তবাগীশ, নির্জ্জনে একটু আরাম করছিলাম, তা বুঝি সইল না! মাধবী হেসে বলত, এই রে ওবুধ ধরেছে! তখন হঠাৎ কেন জানি না তার মনে পড়ে যেত বহরমপুরে তার সদ্য-কেনা বাড়ীর শয়নপ্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত যূথীর মত শুভ্র একটি নারীমূর্ত্তি—উর্ম্মিলার। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত লক্ষ্মণের চাইতেও সে তখন নিরুপায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিরণের ডাকবাংলোতে ফিরে মুগের ডালের স্নুরুয়া হতে স্নুরু করে মুর্গীর রোষ্ট পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করে নিঃসঙ্গ শয্যায় তপ্তদেহে ও বিক্ষুব্ধমনে শুয়ে শুয়ে বাতায়নপথে আকাশের তিমির-মহিমা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া তার আর কিছু করবার ছিল না।

জ্যোৎস্না উঠলে এক একদিন সে মাঝ রাত্রে উঠে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে বেরিয়ে পড়ত, যদি সেই পুরাতন প্রাসাদের শূন্য প্রকোষ্ঠে কোনও অসম্ভবের দর্শন মেলে, গঙ্গাতীরের সেই ছায়া যদি শুস্তার তীরে এসেও তাহাকে ছলনা করে! কিন্তু বৃথা, হঠাৎ বিষণ্ণ চামচিকা আর আরসোলারাই শুধু চঞ্চল হ'য়ে মাথার উপর উড়তে থাকে, নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি নিজেকে প্রতারিত ক'রে থাকে, শিশির স্নাত হয়ে বাড়ী ফিরে সকলের অজ্ঞাতসারে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো। হিরণ ও মাধবীর সঙ্গও যেন তার নিঃসঙ্গতাকে বাড়িয়ে তুলছে; তারা পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে পরিপূর্ণ, এমনই পরিপূর্ণ যে বাইরের তৃতীয় ব্যক্তি এখন তাদের পথে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক—হয়তো বা বাধাই। এদের জীবন যাত্রা দেখে দেখে ছায়াবিলাসী মন তার কামনাকাতর হয়ে উঠতে লাগল কিন্তু কলকাতায় বা বহরমপুরে ফেরবার মুখ নেই। ফলে সে একদিন শুভ প্রভাতে উঠে সোজা পাড়ি দিলে বোম্বাইয়ের দিকে - এবং সেখান থেকে জাহাজে চেপে লণ্ডন। শুধু মনের অস্থিরতাকে দমন করাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য, পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর লোভ নয়।

মায়ের কান্নাকাটি সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্র হিমাদ্রির কোনই খোঁজ করেনি, তার অপমানবোধ একটু বেশী। মা তলে তলে খোঁজ পেলেন; হিরণের চিঠিতেই জানলেন ছেলে বিলেত গেছে। মায়ের প্রাণ কতকটা নিশ্চিন্ত হল।

আর ঊর্মিলা? তার পরীক্ষা সন্নিকট, পাঠ্য বইয়ের পাতাগুলি ছাড়া আর কোনও কিছু সম্বন্ধে ভাববার তার অবসর ছিল না, অন্ততঃ বাইরে থেকে তাই মনে হত। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভিন্ন ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তিনি জানেন, রাত্রি যখন গভীর, মনের আবিলতায় পড়ার বইয়ের পাতা যখন চোখে ঝাপসা ঠেকে, সুইচটি তুলে দিয়ে অন্ধকার বাতায়নে এসে সে দাঁড়ায়, তখন মমসেনের ইতিহাস বা হব্‌সের পলিটিক্‌স আর অন্তরাল রচনা করে না, বিপুল পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হিমাদ্রি থাক্ তার মন যায় ততদূর পর্য্যন্ত ছুটে। দূরত্বটা কত তা সে জানে না, জানতে চায় না। হোক না বোম্বাই, লণ্ডন হলেই বা কি ক্ষতি!

বাইরের লোকে অনেকে অনেক কথা বলে, বন্ধুরা হিমাদ্রির নামোল্লেখ করেই ঠাট্টা করে, তাতে তার কি এসে যায়! পত্রপুষ্প পর্য্যন্তই তাদের দৃষ্টিগোচর, কিন্তু কোন্ অন্ধকার মৃত্তিকাগর্ভ হতে শিকড় জীবনীরস সংগ্রহ করে, তা তারা জানে না। হিমাদ্রি তাকে উপেক্ষা করেছে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে দেশ ছাড়া হয়েছে, এ মন্তব্যগুলির কোনও মূল্য নেই তার কাছে, হিমাদ্রিকে স্মরণ করে বিনিদ্র অন্ধকার শয্যায় সে যে জীবনের খোরাক সংগ্রহ করে তাদের তা জানবার কথা নয়।

সত্যই ঊর্ম্মিলা হিমাদ্রিকে ভালবাসতে সুরু করেছিল, এর জন্যে তাকে কোনও প্রয়াস করতে হয় নি, উল্টোরকমের মনোভাবের উৎপত্তি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেবতা অন্ধ, চক্ষুষ্মান্ লোকেদের মত পৌর্ব্বাপর্য্য ভেবে কাজ করা তার স্বভাব নয়, যে সম্পূর্ণ অযোগ্য তারই জন্যে কেন যে মনটাকে ব্যথিত করে তোলে, প্রত্যক্ষ দেখলেও সেটা বুঝে উঠতে পারি না।

* * *

এক বছর পরের কথা বলছি। ঊর্ম্মিলা ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করেছে। ইতিমধ্যে যে তার বিয়ের সম্বন্ধ এক আধটা আসেনি তা নয়। বরঞ্চ তার পক্ষে সম্বন্ধের ঘনঘটা যোগই ঘটেছিল। কিন্তু বাপ-মায়ের করুণ কাকুতিও তাকে বিচলিত করতে পারেনি ; সে অন্ততঃ আপাততঃ বিয়ে করবে না এটাই ঠিক করে রেখেছিল। নানাজনে নানাধরণের জল্পনাকল্পনা করলেও আসল কারণটা কেউই ঠাহর করতে পারেনি। তর্ক করতে করতে হেরে গিয়ে মা কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, তোর যা খুসী কর্ বাপু, ধিঙ্গি হয়ে আমার চোখের সামনে থাকবি, সেটা সইতে পারব না বলেই

না এই ধরপাকড়। মোহিত ছেলেই বা এমন নিন্দের কি! এই অল্প বয়সেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, ঠাকুরপোরই হায়ার অফিসার। ঊর্ম্মিলা বলেছিল—ধিঙ্গি হয়ে থাকাটা সইতে না পার মা, দূরে সরে যাচ্ছি। নিজের দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে নিতে পারব, এমন শিক্ষা তোমরা আমাকে দিয়েছ।

বাবা বলেছিলেন, যা খুসী করুক গে, নিজেকে সামলে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতা আশা করি ওর আছে। না থাকলেই বা করছি কি, বিয়ে করে জামাইয়ের আশ্রয়ে থেকেও তো অনেক মেয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে! ম্যাচ-মেকার অমূল্যরত্ন কিন্তু চেষ্টার ক্রুটি করে নি, একটার পর একটা টোপ সে ভাইঝির সামনে ফেলে চলেছিল, কেউ এস-ডি-ও, কেউ ডি-এস-পি। কোনোটিই কিছু সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

শেষটা ঊর্ম্মিলা সত্যিসত্যিই নিজের পথ দেখলে। পুনার একটি নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা ভাল চাকরী জুটিয়ে বাপ-মার আশ্রয় আর খুড়োর উৎপীড়ন এড়িয়ে সেখানে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিংয়েই ঘর বাঁধল। ছোট ছোট অসহায় বালিকাদের ঘিরে তার মন যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেলে, কিন্তু হিমাদ্রি জানতেও পারলে না যে যার ছায়ামূর্ত্তি একদা আসন্ন শীতের নিশীথে তাকে হঠাৎ বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, সেই ঊর্ম্মিলাই আজ নিঃসঙ্গ প্রবাসে তারই চিন্তায় কায়াকে ছায়া করবার তপস্যা করছে। সে যখন বেজওয়াটারের কাফিখানায় 'আমি-চিনি-গো-চিনি-তোমারে ওগো-বিদেশিনী' সখির কপোলের পেলবতা নিয়ে গবেষণা করছে, বাতায়নের ধারে বসে অন্ধকারে-মিলিয়ে-যাওয়া পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ঊর্ম্মিলা তখন বহুদূরাগত একটা হারানো আহ্বান ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে—কে? তুমি কে?

উর্ম্মিলা খবর পেয়েছিল হিমাদ্রি বিলেত গেছে, সেখান থেকে ফিরলেও সে যে কলকাতায় বা বাংলা দেশে ফিরবে না, এটাও সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে কলকাতাতে একটা ভাল চাকরী পাওয়া সত্ত্বেও পুনার চাকরীটাই নেওয়া সাব্যস্ত করেছিল। বিলেত থেকে ফিরে যদি সে কোনও দিন আসে, বোম্বাইয়ের কাছাকাছি কোথাও বাসা বাঁধবে নিশ্চয়। হয়তো কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হ'লেও হতে পারে—এই চিন্তায় আনন্দে তার বুকের রক্ত তোলপাড় হয়ে না উঠলেও দেহটা উত্তপ্ত হয়, বোম্বে দেশীয় ছোট্ট একটা ছাত্রীকেই সজোরে বুকে টেনে নিয়ে বাংলাতে জিজ্ঞেস করে, আমাকে তুই ভালবাসবি চন্দ্রা? চন্দ্রা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

এতদিন দাহ ছিল না, আগুনের দাহিকা শক্তি প্রতিদিন বেড়ে চলেছে—সঙ্গিনীর অভাবে নিজের মনটা পুড়ে ছারখার হ'তে লাগল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চতুঃসীমানায় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভারবাহী গর্দ্দভের মত সহজ সরলভাবেই জীবনটাকে গ্রহণ করে. বৈচিত্র্য যে কিছু থাকে না তাও নয়, কমিটির সেক্রেটারী, একজন উচ্চ শিক্ষিত মারাঠী যুবক—তার লুব্ধ দৃষ্টি সদাসর্ব্বদা তাকে সশঙ্কিত করে ফেলে। এবং এই চতুঃ-সীমানার বাইরে নাম-ধাম-না-জানা অসংখ্য বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-যুবক-বালক সম্প্রদায় মুগ্ধ ও লুব্ধ দৃষ্টিদানে তাকে অপ্রতিভ করতে ছাড়ে না। উর্ম্মিলা মনে মনে হাসে আর ভাবে এই স্থূল সংসারে শুধু ছায়াকে আশ্রয় করে হয় তো বা পুরুষেরা চলতে পারে, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে সহজ জীবন যাত্রায় কায়ার আশ্রয় একান্ত আবশ্যক এবং সে কায়া যত স্থূল ও মাংসল হয় ততই ভাল।

এই মুগ্ধ ও লুব্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ের একজন ছিল শিরীষের আঠার মত নাছোড়বান্দা, পুনারই এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর পুত্র, নাম সৈয়দ সুলেমান। বাপের অগাধ পয়সার খানিকটা সে নারীশিক্ষার কার্য্যে ব্যয় করত এবং ও-অঞ্চলে এইটাই প্রচার ছিল যে, যে-সব হতভাগিনী নারী একবার সৈয়দ সুলেমানের নজরে পড়েছে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও তার নিস্তার নেই। অসংখ্য গুণ্ডা প্রকৃতির লোক তার হাতের মুঠোয়, পুলিশ তার কাজে বাধা তো দেয়ই না বরঞ্চ সাহায্য করে।

উর্ম্মিলা প্রথমটা বিনা নোটিশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালীর হাত দিয়ে উপহারের উপর উপহার পেতে লাগল, ফুল ফল এবং আরও বিচিত্র জিনিষ সব, সুবাসিত গন্ধদ্রব্য আরও কত কি। উৎকোচে মালীর মুখ বন্ধ, সে বলে, এক সাহেব রোজ এসে দিয়ে যায়। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবে কিনা ভাবতে ভাবতেই উপহারের বদলে স্বয়ং উপহারদাতার আবির্ভাব হ'ল—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কি-ভাবে হয় দেখবার জন্য দর্শক সেজে এসেছে। চোখের লুব্ধ দৃষ্টি—উর্ম্মিলা ঠিকই চিনলে, কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। শুধু মালীকে সাবধান করে দিলে, যদি সে এরপর কারো হয়ে কোনও জিনিষ তাকে দিতে আসে তাহলে তার চাকরী থাকবে না।

শ্রীমতী অম্বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর একজন শিক্ষয়িত্রী—তার সঙ্গেই উর্ম্মিলার ঘনিষ্ঠতা। মনের কথা সুখের দুঃখের কথা হয়; ভালবাসাও কথাও হ'ল একদিন এবং শেষে হিমাদ্রি আর সৈয়দ সুলেমানের কথা উঠল। অম্বার জীবনও কম বিচিত্র নয়। বালবিধবা—স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়েই যে বসে আছে তা নয়, একজনকে ভালবেসেছে কিন্তু সে তার ভালবাসার সম্পূর্ণ অযোগ্য,

এত নীচ—তবু মন থেকে তাকে ঠেলে ফেলতে পারে না, সর্ব্বস্ব দিতেও পারে না।

সেদিন কিসের ছুটি ছিল—অলস দ্বিপ্রহরে শুয়ে শুয়ে জানলা পথে ঊর্ম্মিলা খানিকক্ষণ খণ্ড লঘু মেঘের খেলা দেখলে, তার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। অম্বাকে ডেকে নিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের একেবারে শেষে দেবদারু গাছতলার বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। পাশের রাঙামাটি রাস্তা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে ভারমন্থর গরুর গাড়ী চলেছে, তৈলহীন চাকায় একটানা কান্নার শব্দ, মাঝে মাঝে একআধটা মোটর গাড়ীও হুস্ করে চলে যাচ্ছে—তবু সর্ব্বত্র কেমন যেন একটা অবসাদের ভাব। একথা সেকথার পর অম্বা হঠাৎ জিগ্যেস করলে, আচ্ছা ঊর্ম্মিলা, হিমাদ্রি ফেরবার সময় অপ্সরীদের একজনকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসে—

—এতদিন কাঁদিনি, তাতেও কাঁদতে বসব না বোন, সে যে আমার কতখানি কোনওদিন হয় তো তাকে তা জানাবার প্রয়োজন হবে না।

—এতদিন তুমি কাঁদনি বৈকি—চোখের জলের দাগ যদি মুছে না যেত তাহলে বালিসের ওয়াড় আর বিছানার চাদরে তোমার ঘর বোঝাই হত এতদিন। আচ্ছা তুমি হিমাদ্রি বাবুকে চিঠি দাও না কেন ?

—চিঠিতে লিখব কি ?

—লিখবে, বঁধু ফিরে এস, আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

—এত সহজে যদি সে ধরা দিত বোন, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি, আমি তাহলে এতক্ষণ এমন সুন্দর দুপুরে তোর সঙ্গে মিথ্যে হা-হুতাশ করেই বা মরব কেন ?

—আমার না হয় উপায় নেই, পাপকে ভালবাসতে পারি কন্তু তাকে নিয়ে ঘর করতে পারি না, কিন্তু তুমি কেন এমন ভাবে জীবনটাকে বয়ে যেতে দেবে ভাই ?

উর্ম্মিলা হঠাৎ শিউরে উঠল। পাপ ? হিমাদ্রি যদি সত্যসত্যই লণ্ডনে তার শুচিতা বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে আসে ? পাপের স্রোতে গা ঢেলে দেয় ? এ দুর্ভাবনাকে শেষ পর্য্যন্ত টানবার ক্ষমতা তার ছিল না। সে হঠাৎ উঠে পড়ল, অম্বাকে বললে ঘুম পাচ্ছে ভাই। অম্বা জীবন-যুদ্ধে উর্ম্মিলার চাইতে একটু বেশী এগিয়েছে, সে হাসলে।

*　　　　*　　　　*

আরও এক বছর। মধ্যে উর্ম্মিলা একবার কলকাতা ঘুরে এসেছে। ইচ্ছে করলে অমূল্যর সেই হায়ার অফিসার ছোকরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে তখনও বিয়ে করতে পারত, কিন্তু সে ফিরে এল। ফেরবার সময় হিমাদ্রির মায়ের সঙ্গে বিনা ওজুহাতে সাক্ষাৎ করে এল। ব্রজেন্দ্রের পত্নী একটু কৌতুক করে বললে, উমার তপস্যা কি সফল হবে ? তখনকার মহাদেবদের শুধু ষাঁড়ের পিঠ ছিল সম্বল—চেষ্টা করলেও বড় দূর ক্রোশখানেক পথ তিনি যেতে পারতেন, কিন্তু এখনকার মহাদেবদের বিচিত্র যানবাহন—মোটরকার, ট্রেণ, জাহাজ। শ্মশানও একটা আধটা নয়, লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক। তার নাগাল পাওয়া মডার্ণ-পার্ব্বতীর পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না তো ?

উর্ম্মিলা জবাব দেয় নাই, শান্তভাবে হিমাদ্রির মাকে প্রণাম করে ফিরেছিল। এই বছরখানেক হিমাদ্রির কোনও খবর কেউই পায়নি, মা-ও না। কাউকে কোনও খবর দেওয়ার মত মেজাজ

তখন তার ছিল না; লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড আর প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে সে তখন কাপ্তেনী করছে; ফ্যানি জোসেফাইনের কায়াবন্ধনে উর্ম্মিলার ছায়া বিলুপ্তপ্রায়। তবু মাঝে মাঝে এখনও যখন ভোরের দিকে বাড়ী ফিরে তলায়-এসে-ঠেকা মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়, মোমে-ভেজা পাকানো তুলো পোড়ার গন্ধে ঘরটি ভরে যায়—উর্দ্ধমুখী নীল ধোঁয়ার মধ্যে সে চকিতে সেই ছায়াময়ীর আভাস পায়, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, উদ্দাম রজনী-জাগরণের ক্লান্তিতে দেহ অবশ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

বোম্বাইয়ে তখন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সুরু হয়েছে। নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে উর্ম্মিলা বোম্বাইয়ে এসে আটকা পড়ে গেছে। কিন্তু বোম্বাইয়ে সে একা নয়, ডিটেক্‌টিভ পুলিশের মত সৈয়দ সুলেমান অলক্ষ্যে তার পাহারায় নিযুক্ত। যে বোর্ডিংয়ে সে বাসা নিয়েছে সেটা একেবারে মুসলমান পল্লীর মধ্যে, সুতরাং সৈয়দ সুলেমানের শিকার প্রায় তার করতল গত। উৎকোচ দানে বোর্ডিংএর ম্যানেজারকে বশ করা কঠিন নয়।

উদ্দামতার শেষ আছে, ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কও অক্ষয় নয়—পরিশ্রান্ত হিমাদ্রিকে জননী জন্মভূমি টান দিলেন; দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যেই নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা হিমাদ্রিকে বোম্বাইয়ের রাজ পথে দেখা গেল। সে একাই এসেছিল কিন্তু একা থাকবার ক্ষমতাটাকে সে সাগরপারে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিল।

হিমাদ্রি যে বোর্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেটা ভদ্রপল্লীর মধ্যে নয়—এবং বোর্ডিংয়ের কামরা যাদিকে ভাড়া দেওয়া হয় তারা নিছক শোওয়া বসা ছাড়া অন্য কার্য্যে সেগুলিকে ব্যবহার করে।

মোটের উপর, ডিস্‌রেপুটেব্‌ল যাকে বলে বোর্ডিংহাউসটি সেই সেই শ্রেণীর একটি।

সারাদিন নিষিদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক রাত্রে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাসায় ফিরে হিমাদ্রি বাইরের পোষাকে বিছানায়ই আশ্রয় নিয়েছিল। বাতিটা নিবিয়ে দেবার কথাও তার মনে হয় নি। জুতোশুদ্ধ পা বিছানায় তুলে মাথার বালিসটাকে ঠেলে নীচে ফেলে দিয়ে নিজের বাহুকে উপাধান করেই নেশার ঘোরে সে চোখ বুজেছিল। আসে-পাশের কামরার হল্লা তখনও থামেনি। দূরের কোনো কামরায় তাসের জুয়া চলেছিল, তাদের কলহ-কোলাহলে গভীর রজনীর স্তব্ধতাও লাঞ্ছিত; নীচে রাস্তায় তখনও দাঙ্গা চল্‌ছে সোডার বোতল ফাটার শব্দ, আততায়ীর উল্লাসধ্বনি, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ।

হিমাদ্রি ঘুমোয়নি, নেশার ঝোঁকে চোখ বুজেই দেখছিল, বহরমপুরে গঙ্গার ধারে নতুন কেনা বাড়ীর দ্বিতলে সে শুয়ে আছে—সেই ছায়ার প্রতীক্ষায়। চারিদিকের কলকোলাহল বর্ষাস্নাত গঙ্গার কুলুকুলু কলস্রোতের মত শোনাচ্ছে. কোথায় যেন প্যাঁচা ডাকছে, দেউড়ির বটগাছটাতেই বুঝি। হিমাদ্রির হঠাৎ মনে হল কে যেন লঘু পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। সেই তবে, ধড়মড় করে উঠে বসে সে প্রশ্ন করলে, কে? তুমি কে?

যে এসেছিল সে উর্ম্মিলা, ছায়ারূপিনী উর্ম্মিলা নয়, রক্তে মাংসে গড়া উর্ম্মিলা। সৈয়দ সুলেমান তাকে ধরে এই বোর্ডিংএরই এক কক্ষে আটক করেছিল; সে বহু কষ্টে সেখান থেকে বের হতে পেরেছে; হিমাদ্রির ঘরের দরজা খোলা ও ঘরে আলো জ্বলতে দেখে বিহ্বল মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষা করবার জন্য সে এই ঘরে

ঢুকেছে। যদি সে জানত যে তার বাঞ্ছিত সেখানে কর্দ্দমধূলায় বিলুণ্ঠিত, তাহ'লে হয়তো সে সৈয়দ স্থলেমানের কবলে ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করত। ঘরে ঢোকবার সময় শয্যাশায়িত হিমাদ্রিকে সে চিনতে পারে নি।

কিন্তু যে মধুর আহ্বান গত দুই বৎসর ধরে সে শয়নে জাগরণে শুনে আসছে, এই রুক্ষ বিশুষ্কতার মধ্যেই যা সঞ্জীবনীরসধারা সিঞ্চন করে তার জীবনকে সরস করে রেখেছে, সেই 'কে? তুমি কে?' আহ্বানকে তো সে ভুল করতে পারে না। সেই অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেই উর্ম্মিলা অনুভব করলে যেন তার দুই কাণ দিয়ে গলিত মধুধারা তার মরমে প্রবেশ করল। বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে উর্ম্মিলা চীৎকার করে উঠল, তুমি? আপনি, হিমাদ্রি বাবু?

হিমাদ্রির নেশা ছুটে গেল, অপরূপ! একবার যে ছায়াময়ীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করেও সে জবাব পায় নি, সেই ছায়াময়ীই আজ প্রশ্ন করছে, হয় ত তাকে ধরাছোঁয়াও যায়। মুখে মদের গন্ধ যেন তাকে কষাঘাত করতে লাগল। নিমেষের মধ্যে বোম্বাইয়ের কলকোলাহল, লণ্ডন প্যারিসের ফ্যানি জোসেফাইনের দল গত দুই বৎসরের উদ্দাম জীবন যাত্রা, সব কিছুই যেন রাত্রিতে দেখা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল, চোখ নীচু করে প্রসারিত দক্ষিণ করতলে বেপথুমতী উর্ম্মিলার করতল চেপে ধরে বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠে সে বললে, কে উর্ম্মিলা? তুমি এখানে!

ছায়া এবার মিলিয়ে গেল না। উষ্ণ করতল আর্দ্র হয়ে উঠল। ব্রজেন্দ্র কি এই করতলেরই পেলবতা অনুভব করে এসেছিল? ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার চারটি লাইন ও বাংলাতে

শুধু উর্ম্মিলা নাম লিখেছিল কি এরই করাঙ্গুলিধৃত লেখনী? কিন্তু ছায়া ভেঙে পড়ছে, ধূলিলুণ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই তাকে বাহু পাশে বন্ধন করে হিমাদ্রি নিজের পরিত্যক্ত শয্যায় শুইয়ে দিল। আলো নিবে গেল।

মুখ থেকে মদের গন্ধ, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ের বিলিতি স্যুট ও মনের গ্লানি যখন দূর হয়েছে হিমাদ্রি তখন অরালী পর্ব্বত পাদমূলে শীর্ণ স্বচ্ছতোয়াবিধৌত বরীচের ডাকবাংলোতে—হিরণ কুমারের পত্নী মাধবী চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে কলহাস্যের সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করছে—কি ঠাকুর পো, সব ঝুট হ্যায়? উর্ম্মিলা পাশের ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সেদিনকার বোম্বে ক্রনিক্‌লে দাঙ্গার খবর পড়তে পড়তে আড় চোখে হিমাদ্রির দিকে চাইছে—ছায়া মূর্ত্তি যেন। সৈয়দ সুলেমানের কোনও খবর নাই, নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের অধিবেশনও শেষ হয়ে গেছে—অন্ততঃ রিজাইন দিয়ে আসবার জন্যেও এবার পুনায় ফিরতে হবে।

আর ক্ষুধিত পাষাণের দেশে নয়। স্থূল ও মাংসল, লজ্জা ও ঘৃণা, জ্বর আর জরার সমষ্টি হলেও কায়া ছায়াকে অতিক্রম করল। নবদম্পতী যখন বহরমপুরের ভুতুড়ে বাড়ীতে পৌঁছল, অমূল্যরত্ন তখন নওগাঁয়ে বদলি হয়েছে—তার হায়ার অফিসারটিও।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আজকালকার লেখাপড়া-জানা মেয়েরা মনে করে, বুঝি চিরকাল এমনি-ধারাই ছিল। নারীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পিছনে স্বর্ণকুমারী দেবীর দৃষ্টান্ত ও উদ্যোগ কতখানি কাজ করিয়াছে, এখনকার দিনে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন প্রথমা। নারীর মধ্যে উপন্যাস-রচনায় তিনি সকলের আগে হাত দিলেও তাঁহার উপন্যাস আজও পুরাণো হয় নাই। নিরন্তর সেবায় শিশু ছোটগল্পকে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। মহিলাদের মধ্যে অনেকেই যখন পদ্য লিখিয়া বাহবা লইতেন, তখন বলিতে গেলে একমাত্র তিনিই লিখিতেন—কবিতা। তাঁহার কাব্য মাঝে মাঝ অপূর্ব্ব সুষমায় সুমধুর হইয়া উঠিত। সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার অবসাদ ছিল না, অবহেলা ছিল না। কার্লাইলের মতে অক্লান্ত সাধনার শক্তি প্রতিভার লক্ষণ।

* * *

কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত স্বর্ণকুমারীর সখিত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের পরিচয় হইল লেখার ভিতর দিয়া। সেই সাহিত্যিক পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দু'জনের সহিত দেখা হইলে দু'জনের কথার আর শেষ হয় না। শেষে তাঁহারা 'মিলন' পাতাইলেন। একদিন গিরীন্দ্র-মোহনী বেড়াইতে গিয়া স্বর্ণকুমারীর বাড়ীতে ভুলিয়া দুটি মাথার

কাঁটা ফেলিয়া আসিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী কাঁটা-দুটি পাঠাইয়া দিলেন—একখানি চিঠির সঙ্গে। চিঠিতে লেখা ছিল একটি ছোট কবিতা। কবিতার অন্য ছত্রগুলি মনে নাই, শেষ ছত্রটি এই—

মিলন চলিয়া গেছে, রেখে গেছে কাঁটা শুধু।

* * *

ফুটবল খেলার মাঠ এবং খেলার কথায় পথ-ঘাট সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। লীগের খেলা শেষ হইতে না হইতেই শিল্ডের প্রতিযোগিতা সুরু হইল। এবার এ-দেশী দুটি প্রধান দল লীগ খেলায় বিজয়ীর সম্মান যেন হাতে পাইয়া হারাইল। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় দলের এ-বৎসরের প্রতিযোগিতায় এই অতর্কিত পরাজয়ের শোধ তুলিয়া বাঙালী দলগুলি খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছে। কয় বৎসর ধরিয়াই বাঙালী এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া আসিতেছিল, শুধু গতবর্ষে গোলমালে—নির্ব্বাচনের দোষে হারিতে বাধ্য হইয়াছিল। নিজেরা একটিও গোল না খাইয়া পরকে পাঁচটি গোল দেওয়ার মধ্যে বাহাদুরি আছে। এই জয়লাভে এইটুকু বোঝা যায়, ভাল করিয়া টিম গড়িতে পারিলে বাঙালীর কাছে কোন বিলিতি দলই টিকিয়া থাকিতে পারে না। সাম্‌নে শিল্ড। প্রথম বারের খেলাতেই ত ইষ্টবেঙ্গল গেল। মোহন বাগান শেষরক্ষা করিতে পারিলে বাঙালীর মুখরক্ষা হয়। এইটুকু লিখিবার পর দেখা গেল, আমাদের মনোরথ হৃদয়ে উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেছে। মোহন বাগান মুখ রক্ষা করিতে পারে নাই।

* * *

মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কৃত হয়—সে আজ দশ বৎসরের কথা। এই ধ্বংশস্তূপ খনন করিতে বাহির হইয়া পড়িল—পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় সভ্যতা। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন হইলেও, সভ্যতা প্রাচীনতর। সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের উপর মহেঞ্জোদাড়ো অবস্থিত। তাই সভ্যতার নাম দেওয়া হইয়াছে সিন্ধু-সভ্যতা। এই আবিষ্কারের সম্পূর্ণ সম্মান স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। সম্প্রতি তিন ভল্যুমে এই প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক—প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনার‍্যাল—সার জন মার্শাল। রাখালদাসের নাম ইহাতে আছে এবং কিছু কিছু ঋণ স্বীকারও করা হইয়াছে। তাহা যথেষ্ট নয়। একদা এই স্তূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আর কাহারও নজরে ইহার গুরুত্ব ধরা পড়ে নাই। রাখালদাস তখন সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম কেন্দ্রের কর্ত্তা। তিনি নিজের দায়িত্বে স্তূপের খননকার্য্য সুরু করেন। মার্শাল সাহেব তখন ছুটিতে—বিলাতে। রাখালদাসের আবিষ্কারে পণ্ডিতমণ্ডলী যখন সচকিত হইয়া উঠিলেন, তখন সাড়া পড়িয়া গেল। তার পর বিলাতে রাখালদাসের নাম বাদ দিয়া লেখা সুরু হইল—যেমন হয়। রাখালদাস আজ পরলোকে। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে তিনি এতটুকু না বঞ্চিত হন, বাঙালী পণ্ডিতসমাজ এই দিকে লক্ষ্য রাখিলে, তবেই সেই স্বর্গগত শক্তিশালী প্রতিভাবান পুরুষের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে।

* * *

গেল বৎসর গেছে জয়ন্তীর বৎসর। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রয়েড পর্য্যন্ত অনেক বিখ্যাত লোকেরই জন্মোৎসবে দেশ বিদেশে জয়ধ্বনির সাড়া পড়িয়াছিল। মালব্য-জয়ন্তী হইয়া গেল। প্রফুল্ল-জয়ন্তী আসিতেছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর অতিক্রম করিলেন। ফ্রয়েডের পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হইল। বার্ণাড শ'ও পঁচাত্তর পার হইয়াছেন। বছর দুয়েক হইল জগদীশচন্দ্র বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের সকলেরই খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়াইয়া দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

* * *

ফ্রয়েড নূতন মনোবিদ্যার প্রবর্ত্তক। ভিয়েনার এক সামান্য চিকিৎসক যে একদিন এক নূতন বিদ্যা ও নূতন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবেন, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে তাহা কে ভাবিয়াছিল ?

* * *

জীব-জগতে ডারুইনের থিয়োরির মতো মনোজগতে ফ্রয়েডের মত মানবের চিন্তাধারার মধ্যে নিদারুণ বিপ্লব আনিয়া দিয়াছে। মানুষ পশু হইতে অভিব্যক্ত এই কথা একদা ধর্ম্মযাজকদের একান্ত ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ সে-সব বিবরণ অনেকেই ভুলিয়া গেছে। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান-বাদের উপর এখনও ক্রুদ্ধ আক্রমণ চলিতেছে। ডারুইনের হাক্সলি ছিল। ফ্রয়েড-শিষ্যরাও

নির্জ্ঞানবাদকে অনড় এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার জন্য যে প্রাণপাতপরিশ্রম এবং সার্থক গবেষণা করিয়া আসিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের চিরদিনের আনন্দের কারণ হইবে।

* * *

মনের গোচরীভূত অংশটুকুই সম্পূর্ণ মন নয়। মনের আর একটি দিক আছে, তাহা সাধারণতঃ আমাদের অগোচরে থাকে। মনের সেই দিকটাই সব চেয়ে শক্তিশালী। কামনা বা ইচ্ছা আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে নির্জ্ঞান। মন সাগর বিশেষ। সাগরের তলদেশ, সাগরের গভীরতা আমাদের উপলব্ধ নহে। শুধু জলের উপরিভাগটাই আমরা দেখিতে পাই। মনের উপরিভাগটাই চৈতন্য, সেই সংজ্ঞানটুকুই আমাদের প্রতক্ষগোচর। নির্জ্ঞান মানস-সাগরের গভীরতা। এই নির্জ্ঞানকে জানিবার উপায় ফ্রয়েড আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই আবিষ্কার তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

* * *

আয়ারল্যাণ্ড হইতে বিঠলভাই প্যাটেলের আহ্বান আসিয়াছিল। ডি ভ্যালেরা আয়ারল্যাণ্ডের শক্তিধর পুরুষ। আজ তিনি প্রেসিডেণ্ট। আয়ারল্যাণ্ডকে তিনি নূতন করিয়া গড়িতে চান। প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা কেনই বা এক্স-প্রেসিডেণ্ট প্যাটেলের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক, তাহা লইয়া কাগজে কাগজে বহু জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। সম্প্রতি বিঠলভাই প্রকাশ করিয়াছেন আর কিছু নয়, ডি ভ্যালেরার সহিত তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দুই দেশই ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত এবং সম-ব্যথার ব্যথী।

.ডি ভ্যালেরা ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে চান বলিয়া তাঁহার সহিত তিনি এ বিষয়ে তিনবার কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। আলাপের মূল বিষয় এই, বিশেষ কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না।

* * *

মানুষ সাধারণতঃ হৃদয়হীন নয়। পরিবার-পরিজনের দুঃখ বিয়োগ সে মনে প্রাণে অনুভব করে। চোখের সামনে যে মৃত্যু ঘটে তাহাতে সে আকুল হইয়া উঠে। সমুখে যে অত্যাচার সে ঘটিতে দেখিয়াছে তাহা তাহাকে অধীর করিয়া রাখে। অথচ এই সব অবিচার অনাচার, মৃত্যু নিষ্ঠুরতা একটু দূরে—গণ্ডীর একটু বাহিরে ঘটিলেই আর তাহার চোখে জল আসে না, দুঃখেও নয়, ক্রোধেও নয়। সে হৃদীয়হীন স্বার্থপর বলিয়া যে এমন হয় তা নয়। যে বৃত্তির প্রভাবে তাহার অন্তরে এই সব ব্যাপারের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠে, তাহার সেই মানসবৃত্তি দুর্ব্বল বলিয়া এমন হয়। কল্পনা শক্তি তাহার যথেষ্ট নাই বলিয়া ঘটনাগুলিকে সে ভাল করিয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই তাহার অনুভূতির তন্ত্রী সাড়া দিয়া বাজিয়া উঠে না।

* * *

অন্য লোক যে চোখ দিয়া দেখিতেছে, সে চোখ দিয়া দেখিতে সে-ই পারে যার কল্পনা শক্তি আছে। তেমনি করিয়া দেখে বলিয়া সে অপরের আনন্দ ও ব্যথা বোধ করিতে ধারণা করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের দর্শনে যে আনন্দ অন্ধ তা উপভোগ করিতে পারে না,

কুৎসিতের দর্শনে যে ক্লেশ তাও তাকে অনুভব করিতে হয় না। চোখ নাই বলিয়া এই হর্ষ-বেদনা সম্পর্কে অন্যের সহিত তাহার সহানুভূতি নাই। কল্পনা বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া সংসারের সাধারণ লোক এমনিই অপরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, কেন-না মনের দিক দিয়া সে অন্ধ। কল্পনা মানুষের মনকে সহানুভূতিপ্রবণ করিয়া তোলে এবং সহানুভূতি অন্তকে নূতন দৃষ্টি দান করে।

* * *

বাড়ীর পাশের ছাদে কেমন করিয়া জানি না, ট্যাঙ্কের মাটিতে একটি ডালিম গাছ হইয়াছে। ফল ধরে, কিন্তু বড় হয় না, শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। ফুল ফোটে অজস্র। কয়দিন পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম. ডালিম ফুলের রঙে গাছটি একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার বাতাসে সে যেন আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া দিতে চায়। গাছের ফাঁক দিয়া আকাশের নীল দেখা যায়। সেই নীল পটভূমিতে সবুজ পাতার সীমা-রেখা এবং সেই সবুজ রেখাকে আচ্ছন্ন করিয়া লাল ফুলের অজস্রতা। এখন আর সে অজস্রতা নাই, দুই চারিটি অপরূপ রঙের ডালিম ফুল কয়দিন পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

১ম বর্ষ]   ৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯   [৬ষ্ঠ সংখ্যা

আমার ভাই !

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল; মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখনও ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি; ইংরেজেরা এদেশে রাজ্য-বিস্তার করলেও তখনও ব্যবসায়-বাণিজ্য একেবারে ছেড়ে দেন নি। কোম্পানীরও ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল; কোম্পানীর সাহেব কর্ম্মচারীরাও স্বনামে বেনামে নানা দ্রব্যের বাণিজ্য করে বিলক্ষণ দশটাকা উপরি উপার্জ্জন করতেন।

এই সময়ের একটা ঘটনার কথা বলছি।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-সময় যে-সকল জিনিষের কারবার করতেন, তার মধ্যে রেশমের বাণিজ্য সকলের চাইতে বড় ও বেশী লাভের ব্যাপার না হলেও রেশমের কারবারে লাভ নিতান্ত কম হোতো না। বিলাতের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে রেশমী বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল; বিলাসিনী মেমসাহেবেরা রেশমী কাপড়ের পোষাক খুব পছন্দ করতেন; রেশমী কাপড় বেশী মূল্যেই বিক্রয় হোতো। তারই জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা দেশের যে সকল অঞ্চলে গুটিপোকার চাষ বেশী হতো, সেই সকল স্থানে বড় বড় কুঠী তৈরী করেছিলেন। সেই সকল কুঠীতে সুধু রেশমই হোতো না, মাইনে দিয়ে বা কমিশন দিয়ে ভাল ভাল তাঁতি কারিগর রেখে রেশমী কাপড় বুনিয়ে নেওয়া হোতো।

বাঙ্গালা দেশে তখন মুরশিদাবাদ অঞ্চলে খুব বেশী গুটি পোকার চাষ হোতো; আর বলতে গেলে, তখন মুরশিদাবাদই ছিল বাঙ্গালা দেশের রাজধানী, কলিকাতা তখন তেমন জাঁকিয়া উঠে নাই, যদিও সাহেবদের প্রধান আড্ডা কলিকাতাই ছিল। কিন্তু দেশের আমীর ওমরাহ, জমিদার, বড় লোক সকলেই মুরশিদাবাদকেই কেন্দ্র করে তার চার পাশে পরিভ্রমণ করতেন। তখন সহর বললে মুরশিদাবাদকেই বুঝাত।

সেই সময় কোম্পানীর একটা রেশমের কুঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাট্‌কেবাড়ীতে। এ স্থানটি ছিল একেবারে গঙ্গার উপর; মুরশিদাবাদ সহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। পাট্‌কেবাড়ীর কুঠী মুরশিদাবাদের কুঠীরই অধীন ছিল।

তখন প্রত্যেক ছোট-বড় কুঠীতেই একজন, দুইজন বা তারও বেশী সাহেব ম্যানেজার থাকতেন; ছোট ছোট কুঠীতে একজন

সাহেবই থাকতেন। তাঁর অধীনে থাকতেন একজন দেওয়ান। বলতে গেলে, দেওয়ানই ছিলেন কুঠীর সর্ব্বেসর্ব্বা—হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যিনি সাহেব ম্যানেজার থাকতেন, তিনি কিছুই জানতেন না, বুঝতেনও না, বুঝবার চেষ্টাও করতেন না, তার কোন প্রয়োজনও বোধ করতেন না। কোম্পানী থেকে মোটা মাইনে পেতেন, কুঠীতে রাজার হালে থাকতেন, আমোদ আনন্দে দিন কাটাতেন। কাজ—জানেন দেওয়ানজি!

রেশমের কুঠীর দেওয়ানী করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অনেক দিনের শিক্ষার দরকার। হঠাৎ এসে যত বড় বিদ্বান, যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন কুঠীর দেওয়ানী করতে কেউ পারেন না। যাঁরা সামান্য শিক্ষানবীশ হয়ে কুঠীতে প্রবেশ করেন, তারপর ধীরে ধীরে সব কাজ আগাগোড়া শিখতে শিখতে উন্নতিলাভ করেন, তাঁরাই পাকা দেওয়ান হ'তে পারেন।

এমনই দেওয়ান ছিলেন পাট্‌কেবাড়ীর কুঠীতে রামজয় মজুমদার মহাশয়। পাট্‌কেবাড়াই তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান। তাঁর বয়স যখন সতের বৎসর তখন তিনি সৌভাগ্যক্রমে মুরশিদাবাদের বড় কুঠীতে শিক্ষানবীশ হয়ে প্রবেশ করেন। তখন এক পয়সাও মাইনে পেতেন না, দুবেলা আহার পেতেন, আর পালপার্ব্বণে টাকাটা সিকিটা পেতেন। এমনই করে কাজ শিখতে শিখতে নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি আঠারো বছরের মধ্যে মুরশিদাবাদ কুঠীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন, কুঠীর সাহেবেরা মজুমদারকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন; এমন-কি সে সময় যিনি বড় কুঠীর দেওয়ান ছিলেন, সাহেবেরা অনেক সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে রামজয় মজুমদারের কাছে পরামর্শ নিতেন।

তখনও পাট্‌কেবাড়ীর কুঠী হয়নি। রামজয় মজুমদারই সাহেবদের পরামর্শ দিয়ে, সরেজমিনে পাট্‌কেবাড়ীর অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে, সেখানে কুঠী করলে যে কোম্পানীর বিশেষ লাভ হবে, হিসাব-কিতাব করে সে সব দেখিয়ে দিয়ে, তবে কলিকাতার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সম্মতি নিয়ে মুরশিদাবাদের অধীনে পাট্‌কেবাড়ীতে নূতন রেশমের কুঠী প্রতিষ্ঠিত করান, আর রামজয় মজুমদারই প্রথম সেই কুঠীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। যে সময়ের ঘটনা বলব, তখন পাট্‌কেবাড়ীর কুঠীর বয়স দশ বৎসর। এই দশ বৎসরে রামজয় মজুমদার কোম্পানীর ঘরে অনেক টাকা তুলে দিয়েছেন। ও অঞ্চলে তখন দেওয়ান রামজয়ের নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো—এমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁর ছিল। কিন্তু, তাই ব'লে দেওয়ান রামজয় অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি যাকে বলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, তাই করতেন। যে মজুমদার দেওয়ানের আশ্রয় নিত, তার আর কোন ভয় থাকত না; কিন্তু যে দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দেওয়ানের বিরুদ্ধবাদী হোতো, বা কুঠীর অনিষ্ট চেষ্টা করত তার আর রক্ষা ছিল না—মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যে বাস করা তার পক্ষে অসাধ্য হোতো। দেওয়ান রামজয়ের অবস্থাও ক্রমে খুব উন্নত হয়েছিল; কোম্পানীর ন্যায্য প্রাপ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না করেও তিঁনি হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করতেন। জমিজমা বিষয়-আশয়ও যথেষ্ট করেছিলেন। আর ব্যয়—দেওয়ান রামজয় দুই হাতে ব্যয় করতেন। প্রার্থী কখনও তাঁর দুয়ার থেকে শূন্য হস্তে ফেরে নাই। তাঁর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হোতো, বাড়ীতে অতিথিশালা ছিল, নারায়ণ বিগ্রহ ছিল; অর্থাৎ সে সময়ে ধনাঢ্য লোকের যা যা থাকবার, যা যা করণীয়, দেওয়ান রামজয় মজুমদারের সে সব ছিল, সে সবই তিনি করতেন।

এ ত গেল দেওয়ানের কথা। এবার পাট্‌কেবাড়ীর কুঠীর সাহেবের কথা ব'লি। কোম্পানীর ব্যবস্থা ছিল এবং নিয়ম ছিল, কুঠী বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, প্রত্যেক কুঠীতে একজন কি প্রয়োজন-মত একাধিক সাহেব ম্যানেজার থাকাই চাই। সেকালে, আর সেকালই বা বলি কেন, একালেও রাঙা মুখের জয় সর্ব্বত্র। একজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব যদি সুমুখে এসে দাঁড়ান, তা হলে হাজার হাজার বাঙ্গালী একেবারে ভয়ে ভটস্থ। সেকালে এ ভাব আরও বেশী ছিল। কুঠীতে একজন সাহেব ম্যানেজার থাকলেই হোলো; তিনি কাজ কর্ম্ম জানেন বা না জানেন, তাতে কিছু যায় আসে না—লালমুখ একটা থাকাই চাই—লোকের সম্ভ্রম আকর্ষণ করবার জন্য।

সুতরাং পাট্‌কেবাড়ীর কুঠীর দেওয়ান রামজয় মজুমদার মহাশয় যতই উপযুক্ত হোন না কেন কোম্পানীর আদেশে তাঁর উপর একজন সাহেব ম্যানেজার, কুঠী স্থাপিত হবার বছরখানেক পরেই এসেছিলেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তার মাস-ছয়েক পূর্ব্বে পাট্‌কেবাড়ী কুঠীর সাহেব ম্যানেজার দুই বৎসরের ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গিয়েছিলেন। তাঁর পদে কাজ করবার জন্য এসেছিলেন তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক। তাঁর নাম মিঃ রবার্ট ব্ল্যাকি।

বছর খানেক পূর্ব্বে রবার্ট ব্ল্যাকি তাঁর ছোট ভাই জন ব্ল্যাকিকে সঙ্গে নিয়ে বাঙ্গলা দেশে আসেন। অল্প বয়সে বাপ-মা মারা যাওয়ায় তাঁদের লেখাপড়া শেখা তেমন হয় নাই। একজন দূর আত্মীয়ের আশ্রয়ে দুই ভাই থাকেন। সেই আত্মীয়টির সঙ্গে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডিরেক্টরের বিশেষ পরিচয় ছিল; তিনিই চেষ্টা ক'রে যুবকদ্বয়কে ভারতবর্ষে পাঠান। যুবকদ্বয়

কলিকাতায় পৌঁছিলে কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষেরা দুইজনকেই মুরশিদাবাদের বড় কুঠীতে কাজকর্ম্ম শিখবার জন্য পাঠান। মাস-ছয়েক তথা-কথিত শিক্ষানবিশীর পর যখন পাট্‌কেবাড়ীর ম্যানেজার ছুটি নিয়ে বিলাত চ'লে গেলেন, তখন বড় ভাই রবার্ট ব্ল্যাকি ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে এলেন; ছোট ভাই জন ব্ল্যাকি মুরশিদাবাদেই থাকলেন।

প্রবীণ দেওয়ান রামজয় মজুমদার দুই এক দিনের পরিচয়েই বুঝতে পারলেন রবার্ট যদিও কাজকর্ম্ম কিছুই জানেন না, কিন্তু তিনি অতি সচ্চরিত্র ও সুশীল যুবক। দেওয়ানজি এতকালের মধ্যে অনেক নবীন প্রবীণ সাহেবের সংশ্রবে এসেছেন; কিন্তু এমন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু যুবক তিনি কখনও দেখেন নাই। সে সময় বিলাত এত কাছে হয় নাই; আর এ দেশেও তখন এত অধিক সংখ্যায় সাহেব বিবির আমদানী হয় নাই; কাজেই সে-সময় যে সব সাহেব এ দেশে এসেছিলেন, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলুষিত হয়ে যেত; বিশেষতঃ এ দেশে এসে তাঁরা যে রকম রাজার হালে বাস করতেন, নানা উপায়ে যে পরিমাণ অর্থ রোজগার করতেন, তাতে অপরিণত বয়স্ক যুবক দূরে থাকুক, পরিণত বয়সের সাহেবদেরও মাথা ঠিক থাকত না—তাঁরা বিলাস ব্যসনে একেবারে ডুবে যেতেন। কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু করতে হোত না, অবসর যথেষ্ট থাকত; সেই অবসর সময় তাঁরা যে ভাবে অতিবাহিত করতেন, তার বিবরণ খুলে না বলাই ভাল।

কিন্তু বহুদর্শী দেওয়ান মজুমদার মহাশয় এই তেইস বৎসরের নবীন যুবক রবার্ট ব্ল্যাকিকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন এই সাহেবটি একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ!

যুবকটি যেমন শিষ্ট শান্ত, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ। মজুমদার যুবকটিকে বড়ই শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না; থাকবার মধ্যে একটি কন্যা; দুর্ভাগ্যক্রমে সে মেয়েটিও বিবাহের এক বৎসর পরেই বিধবা হয়েছিল। মজুমদার মহাশয় এই বিধবা, পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যাকেই অবলম্বন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই, এই নবীন যুবক ব্ল্যাকিকে তিনি নিজের ছেলের মত ভালবেসে ফেললেন, যুবক ব্ল্যাকিও এই প্রৌঢ় দেওয়ানকে পিতার ন্যায়ই ভক্তিশ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, তিনি পাট্‌কেবাড়ীর কুঠীর ম্যানেজার, আর রামজয় মজুমদার তাঁরই অধীন দেওয়ান।

আগেই বলেছি দেওয়ানজির বাড়ী পাট্‌কেবাড়ীতেই। কুঠী থেকে তাঁর বাড়ী বেশী দূরে নয়। কুঠী একেবারে নদীর তীরে। দেওয়াজির বাড়ীও সেই নদীরই তীরে। তাঁর বাড়ীটি অতি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা; সম্মুখে নদীর দিকে ফুলের বাগান। অন্দর মহলের পিছনে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে ফলের বাগান। বাড়ীর সর্ব্বত্র লক্ষ্মী-শ্রী বিদ্যমান। কিন্তু, আর সবই অন্ধকার! এক বিধবা কন্যা ছাড়া তাঁর যে আর কেহই নাই। এত জমাজমি, এমন সুন্দর বাসগৃহ কে ভোগ করবে? কাহার জন্য যে তিনি উপার্জ্জন করছেন, তাহা তিনিও ভাবিয়া পান না। এক এক সময় মনে করেন, কাজকর্ম্ম ত্যাগ করে বিষয়-আসয় বিক্রয় করে, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে শেষ জীবন কাশীতে কাটাবেন। কিন্তু ঐ পাট্‌কেবাড়ীর কুঠী! ওটি যে তাঁর নিজের হাতে তৈরী; ওর প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের সঙ্গে, প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের সম্বন্ধ! এ সম্বন্ধ, এ আকর্ষণ ছিন্ন করা যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এখন আর তিনি অর্থের

মায়ায় কুঠীর কাজ করেন না। কার জন্য উপার্জ্জন? রবার্ট ব্ল্যাকির কাছে এ কথা তুল্‌লে তিনি বলেন, "না, না দেওয়ানজি, অমন কাজও করবেন না। সমস্ত সম্পত্তি কোন সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত করবেন; দেশের উপকার হবে।" দেওয়ানজি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন, "বেশ, তাই হবে।"

রবার্ট সাহেবের যখন তখনই ইচ্ছা করে, মধ্যে মধ্যে ছোট ভাইটিকে কুঠীতে এনে দুই চারি দিন রাখেন। এতকালের মধ্যে ভাইকে ছেড়ে তিনি থাকেন নাই। কিন্তু, সে ইচ্ছা তিনি মনেই রাখেন, ভাবেন জনের এখন কাজকর্ম্ম শিক্ষা করবার সময়। এখন কাজ ছেড়ে তাঁর কাছে এসে থাকলে তার শিক্ষার ক্ষতি হবে।

ছয়মাস এই ভাবেই অতিবাহিত হোলো। শেষে তিনি মুরশিদাবাদের কুঠীর বড় সাহেবকে লিখলেন, দিন পনেরর জন্য যদি ছুটি মঞ্জুর ক'রে জনকে পাট্‌কেবাড়ীতে পাঠান, তা হ'লে তিনি বড়ই অনুগৃহীত হবেন। মুরশিদাবাদ কুঠীর বড় সাহেব রবার্ট ব্ল্যাকির এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না, জনের পনর দিনের ছুটি মঞ্জুর হোলো। জন হৃষ্টচিত্তে দাদার কাছে এলেন।

জন ব্ল্যাকিকে দেখেই প্রবীণ দেওয়ানজি বেশ বুঝতে পারলেন, এই কুড়ি বছর বয়সের যুবকটি তাঁর বড় ভায়ের মত নয়। বড় ভাই দেবপ্রকৃতির, ছোট একেবারে তার বিপরীত। দুই ভাইয়ের মধ্যে চরিত্র ও ব্যবহারগত প্রভেদ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেওয়ানজির দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারল না, তবুও ম্যানেজার সাহেবের ছোট ভাই বলে তিনি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

দুই তিন দিন পরে এক অপরাহ্নে দেওয়ানজি তাঁর গৃহ-সংলগ্ন ফুলবাগানে কন্যা মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ফুল

বাগানের সম্মুখেই নদীর তীর দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। জন ব্ল্যাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই রাস্তা দিয়ে একাকী সান্ধ্যভ্রমণে বে'র হয়েছিলেন। দেওয়ানজির বাগানের সম্মুখে এসেই তিনি তাঁর ঘোড়ার গতি থামালেন। এই দেখে দেওয়ানজি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন ; কন্যা মনোরমা সেখানে ছিল, সেইখানেই পিতার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময় জনের দৃষ্টি এই সুন্দরী যুবতীর দিকে আকৃষ্ট হোলো। তিনি সে দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না, অভিভূতের মত চেয়ে থাকলেন। এমন সুন্দরী যুবতী যেন তিনি কখনও দেখেন নাই।

দেওয়ানজি সেই সময় গেটের কাছে উপস্থিত হ'তেই জন ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর করমর্দ্দন করবার জন্য অগ্রসর হলেন. কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সেই বাগানের মধ্যে দণ্ডায়মানা রূপসীর দিকে।

জন সাহেব দেওয়ানজির সহিত করমর্দ্দন ও মামুলী দুই-একটি কথা ব'লে ঘোড়ায় চড়লেন ; তাঁর আর বেড়াতে যাওয়া হোলো না ; সুন্দরী যুবতীর রূপ চিন্তা করতে করতে তিনি কুঠীতে ফিরে গেলেন।

বড় সাহেবের খাস আরদালী কলিমদ্দীকে নির্জ্জনে ডেকে জন সাহেব মেয়েটির খোঁজ নিলেন। কলিমদ্দী বলল, "হুজুর, উনি দেওয়ানজির মেয়ে।"

জন বললেন, "দেওয়ানজির মেয়েই হোক, আর যার মেয়েই হোক, ওকে আমি চাই।" কলিমদ্দী হাত যোড় করে বলল, "হুজুর, অমন কথাও বলবেন না ; ও-কথা মনেও আনবেন না। এ কথা প্রকাশ হ'লে এই পাট্‌কেবাড়ী কুঠীর একখানি ইটও থাকবে না, এক রাত্রির মধ্যে সব গঙ্গায় যাবে। দেওয়ানজিকে

আপনি জানেন না। তিনি একবার ডাক দিলে দশ হাজার হিন্দু মুসলমান এসে দাঁড়াবে। আর যা বলেন হুজুর, করতে পারি; বুনো বাউড়ির মেয়ে চান, এনে দিতে পারি; কিন্তু দেওয়ানজির ঘরের দিকে যেতে পারব না।"

জন সাহেব বললেন, "আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। যেমন করে হোক, বিবিকে এনে দিতে হবে।"

কলিমদ্দী বল্‌ল, "হুজুর, এতদিনের চাকরী ছেড়ে দিতে রাজী আছি, অমন কর্ম্ম আমার দ্বারা হবে না। দেওয়ানজি আমার বাপের মত, তাঁর নেমক খেয়ে মানুষ। নেমকহারামী কলিমদ্দী সেখের দ্বারা হবে না।"

সাহেব রেগে বললেন, "তুম চলা যাও। হাম দেখেঙ্গে।"

কলিমদ্দী সাহেবের সুমুখ থেকে চ'লে গিয়ে মনে করল, সাহেবের যে রকম মেজাজ, তাতে সে কি ক'রে বসে, তার ঠিকানা নেই। সে দেওয়ানজিকে এ কথা না জানিয়েই পারে না; আল্লার কাছে তার যে জবাবদিহি আছে।

কলিমদ্দী আর স্থির থাকতে পারল না, বিলম্ব করতেও পারল না। সে তখনই কুঠী থেকে বেরিয়ে দেওয়ানজীর বাড়ীতে উপস্থিত হোলো।

এমন অসময়ে কলিমদ্দীকে দেখে দেওয়ানজি বল্‌ল, "কি বাবা কলিমদ্দী, এ অসময়ে কি মৎলবে?"

কলিমদ্দী দেওয়ানজিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা নিবেদন করে বল্‌ল, "বাবাজি, হুকুম দিন, এখনই লোকজন নিয়ে গিয়ে জানোয়ারটাকে শিক্ষা দিয়ে আসি। তাতে বড় সাহেব যদি বাধা দেয়, তা হ'লে এই রাত্রির মধ্যে পাট্‌কেবাড়ীর কুঠী ভেঙ্গে

গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। আপনার ইজ্জত রক্ষার জন্য আমরা জান দেব বাবাজি!"

দেওয়ানজি ধীরভাবে বললেন, "কলিমদ্দী, অধীর হোয়ো না। পাট্‌কেবাড়ীর কুঠী আমার প্রাণের তুল্য। তার অনিষ্ট আমি হ'তে দেব না। তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা কর; আমি একবার বড় সাহেবের কাছে যাই। তাঁকে আমি ভালরূপেই জানি। তিনি সব কথা শুনে যদি কোন প্রতিবিধান না করেন, তা হ'লে আজ রাত্রির মধ্যেই আমি সপরিবারে পাট্‌কেবাড়ী ত্যাগ করে যাব। যে কোম্পানীর নিমক এতকাল খেয়েছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করব না। মান-ইজ্জত রাখবার জন্য আমাকেই দেশান্তরী হ'তে হবে কলিমদ্দী!"

কলিমদ্দী বল্‌ল, "আপনার কথার উপর কথা বলবার সাহস নেই। কিন্তু বলে দিচ্ছি বাবাজি, আপনি এ অপমান সহ্য করলেও আমরা তা সহ্য করব না। আমরা মুসলমান, বাবাজি! আমরা এমন অন্যায়কে কিছুতেই ক্ষমা করব না, জান কবুল।"

দেওয়ানজি বললেন, "কলিমদ্দী, তুমি আমার ছেলের মত কথাই বলেছ। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে হঠাৎ কিছু করতে নেই। তুমি অপেক্ষা কর, আমি একবার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।" এই কথা ব'লে দেওয়ানজি তখনই বে'র হয়ে গেলেন।

বড় সাহেবের কুঠীতে গিয়ে এত্তালা দিতেই রবার্ট সাহেব তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে বললেন, "দেওয়ানজি, হঠাৎ যে আগমন, কোন জরুরি কাজ আছে কি?"

দেওয়ানজি বললেন, "একটা জরুরী কাজের জন্যই আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে এসেছি। আপনি বাইরে আসুন. নির্জ্জনে একটা আরজ করতে হবে।"

বাইরে বাগানের মধ্যে একখানি বেঞ্চ ছিল ; সেখানে গিয়ে সাহেব বললেন, "এইখানে বসুন দেওয়ানজি, তারপর আপনার কথা শুনি।"

দেওয়ানজি বললেন, "বসতে হবে না ; আমি দাঁড়িয়েই কথা বলছি।"

তখন তিনি অতি ধীরভাবে সমস্ত কথা সাহেবকে বললেন। সাহেব নীরবে শুনে যেতে লাগলেন। দেওয়ানজির কথা শেষ হ'লে রবার্ট সাহেব বললেন, "What next ?"

দেওয়ানজি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রবার্ট সাহেব সহসা উঠে দেওয়ানজির দুই হাত চেপে ধরে বললেন, "Come in, my more than a father." সাহেবের শরীর তখন কাঁপছিল।

দেওয়ানজিকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে কুঠীর একটা কামরায় গিয়ে সাহেব হাঁকলেন, "কৈ হ্যায় !"

একজন ভৃত্য এসে সেলাম করতেই বললেন, "ছোটা সাহেব কো জলদি বোলাও। আভি বোলাও। আউর দেখো, সহিসকো বোলো, দো মিনিটমে ছোটা সাহেবকা ঘোড়া হাজির করনেকো।"

ভৃত্য বিদায় হোলে রবার্ট সাহেব অধীরভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একটু পরেই ছোট সাহেবের পায়ের শব্দ

পেয়েই দেওয়ালে বিলম্বিত একখানি চাবুক নিয়ে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হলেন।

জন ব্ল্যাকি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই রবার্ট সাহেব ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "Here you are infernal dog !" এই ব'লেই তাঁর উপর সপাসপ চাবুক চালাতে লাগলেন। জন সাহেবের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল। দেওয়ানজি তাঁকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে যেতেই বড় সাহেব বললেন, "নেহি, নেহি দেওয়ানজি, মুভ য়্যায়োয়ে।"

তারপর ছোট সাহেবের ঘাড় ধ'রে ধাক্কা দিতে দিতে বাইরের দিকে নিয়ে গিয়ে বললেন—

"Go away for ever I have no brother, my brother is dead !"

সহিস ঘোড়া নিয়ে আসতেই বড় সাহেব বললেন, "আভি চলা যাও, বিষ্ট !"

ছোট সাহেব আর কি করবেন ; ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন। যতক্ষণ সেই সন্ধ্যার চাঁদের আলোয় দেখা গেল, রবার্ট সাহেব জনের গতি-পথের দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "Oh, my brother, my brother !"

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বিশ্বামিত্র একটি মাত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল জনে জনে বিশ্বামিত্র। তাই জগতের আর সংখ্যা নাই। বায়স্কোপ জগৎ, রেডিও জগৎ, সবাক জগৎ, অবাক জগৎ চিত্র জগৎ, ছবির জগৎ, বাঁশীর জগৎ, বেহালার জগৎ, সাবানের জগৎ, তৈলের জগৎ, জ্বরের জগৎ, জুতার জগৎ, বিস্কুটের জগৎ, বীমার জগৎ,—বাংলা আজ জগন্ময়। বিশ্বম্ভর হইলে কি হইবে, এত জগতের ভার জগন্নাথ সহিতে পারিলে হয়।

*　　　*　　　*

তাহার উপর 'ভ্রাম্যমান'। সে কি রে বাবা, কোন্ বস্তু সে, কি বস্তু বা? প্রাণী না উদ্ভিদ্ না জড়? ভগবান সৃষ্টি করিলেন মানুষ, মানুষ সৃষ্টি করিল ভাষা, ভাষা সৃষ্টি করিল ভ্রম এবং লেখক সৃষ্টি করিল ভ্রাম্যমান। সংস্কৃত না হয় মৃত, বাংলা ত মাতৃভাষা। সংস্কৃত ধাতুর উপর এই অত্যাচার বাংলার ধাতে সহিবে ত? পর্য্যটক নাকচ হইল, পরিব্রাজক পরিত্যক্ত হইল, ভ্রমণকারীতে কুলাইল না, ভ্রমণশীলেও সানাইল না। একেবারে ভ্রাম্যমান। সোণায় সোহাগা, চাটনিতে আলুবোখারা, পোলাওয়ে বাদামকুঁচি, পরমান্নে কিশমিশ। ভ্রমর বেচারা ঘুরিয়া মরিল তবু ভ্রাম্যমান হইতে পারিল না। কিন্তু ভ্রাম্যমান হইয়া সুকুমারমতি বালকেরা যে ভাষার দুয়ারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবে, এ আমরা জানি। 'ভ্রমৎ' শব্দটিরও কালেভদ্রে সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু ভ্রাম্যমান সকলের সেরা।

*　　　*　　　*

ইহার উপর অনুবাদ-সাহিত্য আছে। সে এক অপরূপ ব্যাপার। শুনিয়াছি, বাংলা না জানিয়া অনেক সাহেব বাংলা সাহিত্যের উপর বই লেখে, সমালোচনা করে, অধ্যাপনা করে। সে হ'ল সাহেবী কায়দা। কিন্তু আমরা ফার্সী না জানিয়াও বাংলায় আমদানী করি ফার্সী কবিতা, ইংরেজী না জানিয়াও প্রবন্ধে প্রকাশ করি ইংরেজী আলোচনা, ফরাসী না জানিয়াও লিখি—'মূল ফরাসী হইতে', সংস্কৃত না জানিয়াও অনুবাদ করি সংস্কৃত কাব্য। একেই ত জীবন আধিদৈবিক আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখে ছট-ফট করিতেছে, তাহার উপর যদি এই অনুবাদের বিড়ম্বনা ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, তাহা হইলে মানুষকে চীৎকার করিয়া বলিতে হয়, "বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা ?"

* * *

অথচ অনুবাদেই ভাষাকে পুষ্ট এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। দৃষ্টান্ত—ইংরেজী সাহিত্য। প্রতীচ্য ভাষাগুলিতে এমন ভাল বই নাই, ইংরেজীর ভিতর দিয়া যাহার পরিচয় না মেলে। শুধু পাশ্চাত্য কেন, প্রাচ্য সাহিত্যের খোঁজও সেখানে পাওয়া যাইবে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের কাব্য পর্য্যন্ত, আবেস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া কনফ্যুশিয়াসের বাণী পর্যন্ত সেখানে সমাহৃত। শুনিয়াছি ফরাসীতেও তাই, জার্মানেও তাই। আর বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত একখানা 'মৃচ্ছকটিকে'র ভাল অনুবাদ পাওয়া গেল না; টলষ্টয়, ইবেসেন, আনাতোল ফ্রাঁসের কথা দূরে থাক্।

* * *

দেখিলাম, সংবাদপত্রে বাংলার সাংবাদিক সমিতি এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর পরলোকগমনে শোক সভার অনুষ্ঠান হইবে। ভাল কথা। কিন্তু বিজ্ঞাপনে তাঁহাকে "ভারতী"র founder-editor বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সাত বৎসর পরে ১২৯১ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। পঞ্চান্ন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রথম আবির্ভূত বাংলার একখানি বিখ্যাত পত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ইহার মধ্যেই যদি বাঙালী সংবাদপত্রসেবীরা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাঙালীর দুর্ভাগ্য, বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য।

* * *

এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি, আর এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের আলোচনা ; এবং সাহিত্যে মানব-জীবনের আলোচনা চলে বলিয়া সাহিত্যেই জীবনসমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায়। অতএব সাহিত্যকে জীবনের ব্যাখ্যা বলাও চলে। কিন্তু জীবনকে প্রকাশ করিবার ধরণও এক রকম নহে এবং ইহার ব্যাখ্যাও একটি নহে। বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন প্রকারে জীবনের আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্যে এই বিচিত্রতা, এই বিভিন্নতা কবিদের ব্যক্তিত্ব বা স্বভাবের বিশেষত্বের ফল। রাধা-কৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলা বিদ্যাপতিও গাহিয়াছেন, চণ্ডীদাসও গাহিয়াছেন। অথচ উভয়ের গানে কত প্রভেদ।

* * *

যে-কোনও কাব্য জীবনের প্রতি রচয়িতার বিশেষ ধারণার আলোকে অনুরঞ্জিত। প্রতিভার ধারণা সাধারণের ধারণা হইতে অন্যতর এবং সত্যতর। এই ধারণা যতই সত্যতর হইবে, ধারণার আলোকও ততই স্পষ্টতর হইবে; আলোক যতই স্পষ্টতর হইবে, অনুরঞ্জন ততই প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিবে। সেই জন্য প্রতিভাশালীর সাহিত্য-রচনার মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতর প্রগাঢ়তর ভাবে অঙ্কিত থাকিয়া যায়।

*　　　*　　　*

কবির ভিতরে এক আত্মপুরুষ বিরাজ করিতেছে এবং বাহিরে এক বিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে। এই বাহিরের বিশ্ব প্রাণে ও প্রকৃতিতে বিজড়িত। কবির আত্মা বাহিরের মানব-জীবন এবং জড়প্রকৃতিকে সমগ্র করিয়া কখনো এক ভাবে এবং কখনো বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুভাবে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির গাঢ়তার উপর সাহিত্যের গভীরতা নির্ভর করে। যাহাই হোক্, যে কথা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা এই। কবির আত্মার সহিত বাহিরের সত্বার মিলনে একটি হর্ষের হিল্লোল পড়িয়া যায়। সেই আনন্দের মুহূর্ত্তে সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্য সেই আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ।

*　　　*　　　*

বাহির প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং অন্তর প্রতি মুহূর্ত্তেই বাহিরকে গ্রহণ করিতেছে, সকলের মধ্যেই এই মিলনের আকুল চেষ্টা অহরহ চলিতেছে। সাধারণ মানুষ স্বপ্নের মত এই অনুভূতির সাড়া দেয়। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা সচেতন

ভাবে অনুভব করে বলিয়াই কবির অন্তর এত অনুভূতিপ্রবণ। কবির অন্তঃশক্তি বাহিরের সত্ত্বার উপর সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আকৃতি প্রদান করে, কবির প্রকৃতির 'ছাপ' তাহার উপর অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাই একই বহির্জগৎ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী এবং কীটসের কাব্যে বিভিন্ন 'রূপ' ধারণ করিয়াছে। তাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'চোখের বালি'র গল্পাংশে ঐক্য থাকিলেও, বিনোদিনীর সহিত রোহিণীর, মহেন্দ্রের সহিত গোবিন্দলালের মৌলিক প্রভেদ আছে। তাই এমার্সন এবং কার্লাইলে একই নেপোলিয়নের বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাই রাস্কিন এবং লাওয়েল একই কার্লাইলকে এমন বিপরীত চক্ষে দেখিয়াছেন। সেই হেতু সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন গুরুতর বিষয়।

* * *

এই ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া সাহিত্যালোচনা করিলে কবির রচনাকে নিতান্তই বিবর্ণ এবং নিৰ্জ্জীব করিয়া দেখানো হইবে। রামের চরণরেণুস্পর্শে একদা অহল্যা যেমন জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই ব্যক্তিত্বের পুণ্য স্পর্শেও কত জড় ভাব জীবন্ত হইয়া যেন যুগযুগান্তরের নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই সাহিত্যে বর্ণ, বৈচিত্র্য, উত্তাপ এবং চঞ্চলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

* * *

ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসির সকল কলাকৌশল ব্যর্থ করিয়া ডি ভ্যালেরা অনড় হইয়া রহিলেন। আইরিশ পণ্যের উপর

গুরু শুল্ক বসাইবার ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতে পারিল না। ম্যাকডোনাল্ডের নিমন্ত্রণ ও মৌখিক মিষ্টালাপও তাহাকে টলাইতে পারিল না। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে ডিপ্লোমেসির সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরা সেখান হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।
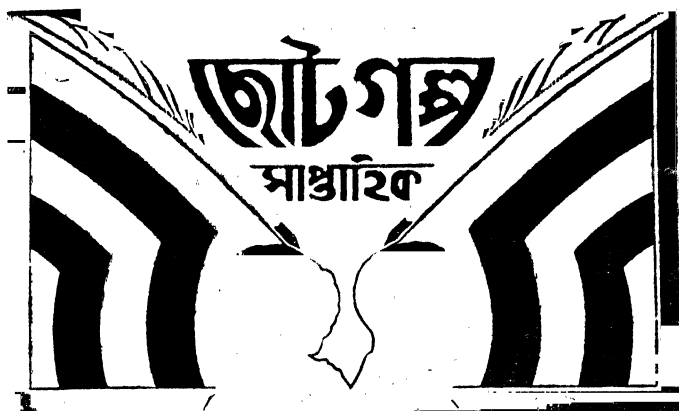
১ম বর্ষ]   ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৯   [৭ম সংখ্যা

শার্দ্দূল-সংবাদ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

খবরের কাগজ যাঁহারা নিয়মিতভাবে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ১৩৩৭ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের বঙ্গবাণী পত্রিকার সাতের পাতায় তৃতীয় কলমের ৩০ লাইন পরে একটি বিস্ময়কর সংবাদ বাহির হইয়াছিল। স্মরণশক্তি যাঁহাদের সবল নয় তাঁহাদের জন্য উক্ত সংবাদটি এখানে যথাযথ ভাবে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গৌহাটি নগরে বিষম চাঞ্চল্য

রাজপথে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব

"গত কল্য সন্ধ্যার পর কেমন করিয়া একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র নগরের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সহরের

নানা স্থানে বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। ব্যাঘ্রটিও সহরের ভিতর হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সকাল বেলা জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর বাড়ির নিকট দিয়া যাইবার সময় উক্ত ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলিতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সুখের বিষয় নগরের কোন ব্যক্তির তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নাই।”

২রা ভাদ্র, গৌহাটি

বৈজ্ঞানিক ও দাশনিকেরা একবাক্যে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে নিশ্চয় কোন ঘটনাই অকারণ বা নিরর্থক নয়। সুতরাং গৌহাটি সহরে এই ব্যাঘ্রপ্রবরের আবির্ভাবেরও কোন না কোন দিক দিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

সে প্রয়োজন যে কি তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে কিন্তু আমাদের আত্মনাথের জীবন-বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক।

আত্মনাথ বিংশ শতাব্দী অপেক্ষা বয়সে বছর আষ্টেকের ছোট হইলেও কল্পনায় চিন্তায় তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষের মোটরকারের মডেল অপেক্ষাও সে ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক; কলিকাতা নগরীতে এমন কোন সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আত্মনাথকে তাহার রূপাবাঁধানো ছড়ি, গগল্‌স চশমা ও মাদ্রাজী চাদর সমেত দেখা না যায়। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপূরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের যে কোন স্বল্পায়ু পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আত্মনাথের রচিত গল্প তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পূর্ব্বে আদ্যনাথ কখনও ইলেকট্রিক লাইট দেখে নাই এবং তাহাদের পদ্মাতীরস্থ গ্রামের মৈনুমাঝির 'গহনা'র নৌকা ছাড়া কোন বাহন ব্যবহার করে নাই। সেই জন্যই কলেজে পড়িবার জন্য প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আদ্যনাথ সহরের ঐশ্বর্য্যে ও আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এবং দুই বৎসরের মধ্যে আদ্যনাথকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবর্ত্তন যে শুধু তাহার বেশভূষায় ও আচরণে ঘটিল তাহা নয়—তাহার মনোজগতেও সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। আদ্যনাথের সে উৎকট উৎকর্ষের পরিচয় কিন্তু আমরা দিতে অক্ষম. পাঠকদের অনুমানের উপরই তাহা ছাড়িয়া দিলাম।

কলেজে পড়িতে আসিয়া প্রথম প্রথম আদ্যনাথ ছুটিতে দেশে যাইত, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কলিকাতাতে তাহার কাজ এত বেশী যে দেশে যাইবার তাহার অবসর নাই। অন্ততঃ মা চিঠির পর চিঠিতে তাহাকে আসিতে লিখিয়া ওই কথাই জবাব পাইতেন।

আদ্যনাথের দেশের প্রতি বিরাগের কারণ ছিল। তাহার পিতা সেকেলে লোক, একালের প্রয়োজনে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আদ্যনাথ যতবড় আধুনিকই হোক না, রাশভারী পিতার মুখের উপর কথা কহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। দেশে গিয়া তাহার নব্য রুচি ও মতামত প্রতিক্ষণেই ক্ষুণ্ণ হইত।

সেখানে সকালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজার আগে আহার নিষেধ। সেখানে রাতদিন জামা গায় দিয়া থাকা অনাবশ্যক

বিলাস, সেখানে পানীয় হিসাবে চায়ের কোন মূল্য নাই এবং সেখানে জুতার স্থান একমাত্র বাহিরের ঘরে। শুধু তাই নয় সেখানে নিত্য-নিয়মিত ভাবে গৃহের পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইতে হয়।

আজকালকার দিনে কোন সংসারের এমন নিষ্ঠার কথা শুনিলে যদি বাড়াবাড়ি মনে হয় তাহা হইলে আমরা নাচার। আদ্যনাথের পিতৃভাগ্য এমনি।

দেশে থাকিতে আদ্যনাথ এ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে না। সেজন্য এ সমস্ত এড়াইবার সহজ উপায় স্বরূপ সে দেশে যাওয়াই বন্ধ করিয়াছে।

আদ্যনাথ কয়েক বৎসর এমনি করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আধুনিকতা যতখানি আয়ত্ত করিল, বিদ্যাটা তেমন করিয়া পারিল না। বি-এ পরীক্ষায় বার দুই ফেল করিয়া আরো অনেক পৃথিবীর বড় বড় মস্তিষ্কের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রদত্ত মাসোহারার আশা ও কলিকাতায় থাকাও ছাড়িতে হয়, এ কথা আদ্যনাথ জানিত। উপায়ও সে একটা করিল। ইতিপূর্ব্বে খ্যাত অখ্যাত নানা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে বাংলা সাহিত্যকে কয়েক যুগ আগাইয়া দিবার সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই জোরে একটি বাংলা কাগজে তাহার কাজ জুটিয়া গেল। এবং সংবাদটা আদ্যনাথের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোন রকমে দেশে পৌঁছিল।

পুত্রের চাকরীর সংবাদে খুশী হওয়া দূরে থাক্ পিতা পত্রে লিখিলেন, "তোমার লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদে দুঃখিত

হইলাম। যাহাই হউক এই পত্র পাওয়া মাত্র দেশে চলিয়া আসিবে তোমার চাকরীর কোন প্রয়োজন নাই। এখনও রায় পরিবারের যাহা আছে তাহাতে তাহাদের বংশের কাহাকেও চাকরী করিতে হইবে না।" মাতা সে চিঠির সঙ্গে একটি ছোট কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তোমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছি। কলিকাতায় আর তোমার থাকিবার দরকার নাই।"

বলা বাহুল্য আত্মনাথ কোন পত্র পাইয়াই খুশী হইতে পারিল না। চাকরী করার প্রয়োজন না থাকিলেও কলিকাতায় বাস তাহার না করিলেই নয়। দেশে স্বাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাই থাক্ তাহার মনের উৎকর্ষের উপযোগী চিন্তা ও সৃষ্টির আবহাওয়া নাই। সেখানে সে কোনমতেই আর বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জীবনের সঙ্গিনীরূপে যে মানসীকে সে এতদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, মাতার পছন্দ করা পাড়াগেঁয়ে মল ও নোলক পরা মেয়ের সহিত তাহার কোন দিক হইতেই মিল হইবে না, সে জানে। আত্মনাথ নানা রকম ওজর আপত্তি তুলিয়া দেশে যাওয়া ও আসন্ন বিবাহ উভয় বিপদই কোনরকমে ঠেকাইয়া রাখিল। কিন্তু বেশীদিন এমন করা চলিল না।

মাতার সাঙ্ঘাতিক অসুখের তার পাইয়া আত্মনাথ দেশে গিয়া দেখিল তার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

এই প্রবঞ্চনায় আত্মনাথ চটিল, কিন্তু পিতার সামনাসামনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। বিবাহ তাহার হইয়া গেল।

যেমনই হোক বিবাহের রাত্রের বোধ হয় একটা নেশা আছে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে বিহাহ করিতে বাধ্য হইলেও আত্মনাথের আগাগোড়া ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগিতেছিল বলা যায় না।

শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াও চেহারার খুঁত সে বিশেষ বাহির করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সব ভালোই হইত কিন্তু বাসরঘরে শ্যালিকা সম্পর্কীয়া গ্রাম্য মেয়েরা তাহার মেজাজ একেবারে চটাইয়া দিল। বাংলার আধুনিক চিন্তা ও শিল্প-জগতের একজন উদীয়মান দিকপালের কোন সম্মান তাহারা রাখিল না। নানাপ্রকার অসভ্য অভদ্র ইতরজনোচিত রসিকতা করিয়া তাহাকে একেবারে নাকাল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার তাহার নববিবাহিত বধূ নীলিমা একসময়ে তাহার লাঞ্ছনায় ঘোমটার তলাতেও হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার মন একেবারে বিষ করিয়া দিল।

নীলিমার ভাগ্য মন্দ। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী তাহার সহিত কথাই কহিল না এবং তাহার পরদিন যখন সে শুনিল যে আত্মনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে তখন তাহার লজ্জা ও দুঃখের অবধি রহিল না।

ইহার পর আর বহুদিন আত্মনাথ ও নীলিমার দেখা হয় নাই। আত্মনাথের পিতা অত্যন্ত তেজী লোক। পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আত্মনাথ আর দেশেও যায় না। যাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। আত্মনাথ কলিকাতায় না থাকিলে বাংলার সাহিত্য যে কানা হইয়া যায়।

নীলিমার পিতা জামাইকে দেশে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মনাথের মন গলে নাই। যে সব অসভ্য অশিক্ষিত মেয়েদের হাতে সে অমন অভদ্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে

তাহাদেরই অনুরূপ একটি নোলকপরা গ্রাম্য মেয়ের প্রতি তাহার মনে কোন করুণা নাই।

ইতিমধ্যে আদ্যনাথ ও নীলিমার মধ্যে মাত্র দুইটি চিঠি লেখালিখি হইয়াছিল।

স্বামীর অবহেলায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া সখীদের অনুরোধে নীলিমা একবার একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

আদ্যনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আদ্যনাথ লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার পত্রের উপর 'শ্রীচরণেষু' কেন লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নয় যে আমার চরণবন্দনা করাই তোমার কাজ। তা'ছাড়া আমার শুধু চরণেই তুমি যদি শ্রী দেখিয়া থাক তাহা হইলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের কথা নয়। 'শ্রীচরণেষু' বানান করিতেও তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার পত্রে বানান ভুল ওই একটি নয় আরও যথেষ্ট আছে। ভালো করিয়া লেখা পড়া না শিখিয়া চিঠি লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার কোন্ সখী শিখাইয়াছে জানিনা, কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারি যে কোন সভ্য মেয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় হয় নাই। ফুল-আঁকা লাল চিঠির কাগজ ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।"

ইহার পর আর তাহারা কেহ কাহাকেও চিঠি লেখে নাই। এমন করিয়া কতদিন যাইত বলা যায় না, কিন্তু ইহার ভিতর গৌহাটিতে বড় গোছের একটা সম্মিলনী বসিল এবং আদ্যনাথকে

তাহার কাগজের তরফ হইতে বিশেষ সংবাদদাতারূপে সেখানে যাইতে হইল।

সম্মিলনী শেষ হইয়াছে। আত্মনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় আশ্চর্য্যভাবে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। শ্বশুর মহাশয় আকাশের চাঁদ হঠাৎ ধূলির ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে? কটার ট্রেণে এলে? আজ বড্ড জরুরী কাজে একটু সকালেই বেরুতে হয়েছিল, নইলে দেখা হয়ে যেত।"

সে তাঁহাদেরই বাড়ীতেই আসিয়াছে এমন ভুল করার ধৃষ্টতার জন্য শ্বশুরের উপর চটিয়া আত্মনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমি আজ আসিনি, আজ যাচ্ছি, এখানকার সম্মিলনীতে এসেছিলাম গত রবিবার।"

পলকের মধ্যে শ্বশুরের মুখে গভীর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, "এখানে এতদিন এসেছ, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করনি?"

আত্মনাথ এবার সত্য কথাই বলিল, "আপনারা এখানে এসেছেন তা কেমন করে জানব?"

"বাঃ, আমি যে এখানে বদলী হয়েছি আজ তিনমাস তা জানতে না?" না জানিবারই কথা। গত কয়েকমাস শ্বশুরবাড়ীর চিঠির প্রতি বিশেষ মনোযোগ সে দেয় নাই। আত্মনাথ চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, "বেশ, এখন ত জানলে, আজ আর না দেখা করে যেতে পারবে না।"

একা থাকিলে রূঢ়ভাবে হোক বা যে কোন রকম ওজর আপত্তি তুলিয়া হোক আদ্যনাথ এ নিমন্ত্রণ এড়াইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে তাহার কলিকাতার জন দুই বন্ধু ছিল। ইহাদের কাছে তাহার বিবাহের সংবাদ গোপন করিয়া রাখার দরুণ অমনিই সে এখন বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রয়োজন হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ইহাদের কাছে জামাইয়ের নিদারুণ ঔদাসিন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। আদ্যনাথ 'না' বলিতে পারিল না। কিন্তু রাস্তার মাঝে হঠাৎ এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করিবার জন্য শ্বশুর এবং তাহার সমস্ত পরিবারবর্গের উপর বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

এতদিন বাদে জামাতার আগমনে তাহার আদর-আপ্যায়নের যেরূপ ঘটা হইল তাহাতে আর কিছু না হোক আদ্যনাথের অহঙ্কার তৃপ্ত হইবার কথা। সাহিত্যজগতে তাহার মূল্য যে কত তাহার একটা হিসাব আদ্যনাথ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে মূল্য এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কেহ দেয় নাই। এই একটি বাড়ীতে পৃথিবীর এত লোকের মাঝে তাহার জন্যই এতখানি সম্মান যে জমা হইয়া আছে তাহা জানিতে পারিয়া আদ্যনাথ হয়ত সম্পূর্ণভাবে খুসীই হইত, কিন্তু সে খুসীর মাঝে একটি খুঁত রহিয়া গেল।

বাসরঘরে তাহাকে যাহারা অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছিল তাহাদেরই অধিনায়িকাকে এ বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। জানা গেল মলিনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর মামাতো বোন; কয়েকদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মলিনা প্রথমটা নিরীহ ভালমানুষটির মত যেভাবে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল তাহাতে আদ্যনাথের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল।

শ্বশুরের বিস্তর অনুরোধ অনুযোগ সত্ত্বেও জরুরী কাজের অজুহাত দেখাইয়া আদ্যনাথ, সন্ধ্যার পরই তাহাকে কলিকাতা যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। জামাতা যদি বা অনেক কষ্টে একবার আসিয়াছে তাহাকে বেশী থাকিবার জন্য পেড়াপীড়ি করিয়া চটাইতে শ্বশুর মহাশয়ের সাহস হয় নাই। আদ্যনাথ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এমন সময় শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ প্রসন্নমুখে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে এলাম বাবা, তোমাদের বাড়ীতে যে নিয়মের কড়াক্কড়ি, রাত্রে তুমি মাংস খাবে ত?"

আদ্যনাথ অবাক হইয়া বলিল, "মাংস! রাত্রে ত আমি খাব না, আমায় খানিকবাদেই কলকাতা যেতে হবে যে!"

মলিনা সঙ্গেই আসিয়াছিল। শ্বাশুড়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "বাঃ, এই যে মলিনা বল্‌লে—তুমি থাকতে রাজী হয়েছ!"

আদ্যনাথকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আহা, এখন আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে? অত ভণ্ডামী কেন বাপু! এইমাত্র আমায় কি বল্‌লে?"

লজ্জায় রাগে আদ্যনাথের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মলিনা আবার বলিল, "তুমি যাওনা পিসিমা। দু'বচ্ছর গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, তাই এখন লজ্জা হয়েছে বুঝতে পারছ না।"

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ চলিয়া গেলেন। আত্মনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুলশয্যার রাত্রের পর স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম দেখা।

আত্মনাথ ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ভারি মিষ্ট। কিন্তু আত্মনাথের মন তখন মলিনার শঠতায় তিক্ত হইয়া আছে। নহিলে সে শুধু হাসি নয় অনেক কিছুই দেখিতে পাইত। দুই বৎসরে নীলিমার শ্রী অনেক ফিরিয়াছে। তাহার বেশভূষার যে গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আত্মনাথের বিরূপতা তাহারও আর কোন চিহ্ন নাই। ফিকে নীল একটি ব্লাউসের উপর চওড়া কস্তাপাড় শাড়ীটিতে তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। আত্মনাথ কিন্তু কোন দিকেই নজর না দিয়া গম্ভীর হইয়া খাটের একধারে গিয়া বসিল। কিন্তু স্বামীর ঔদাসিন্যে অভিমান করিবার অবসর আর নীলিমার নাই। এই দুই বৎসরে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে। নিজেই অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ?"

আত্মনাথ হাতটা ছাড়াইয়া লইল, উত্তর দিল না। নীলিমার চোখে হয়ত জল আসিল, তবু সে নিরস্ত হইল না। আর একবার স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল, "আমার কি দোষ বল?"

আত্মনাথ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমরা সব সমান! ওই মলিনারই ত তুমি বোন। আর এরকম জুয়াচুরি করে আমায় একদিন ধরে রেখে খুব লাভ হবে মনে করছ!"

কথাটা বড় রূঢ়। তবু নীলিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দিদির কি দোষ বল, আমাদের জন্যেই ত করেছে। তোমার নিজের কি একদিন থাকার ইচ্ছে হয় না।"

আত্মনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না।"

নীলিমা এবার অত্যন্ত আহত হইল। আজ সে অনেক আশা করিয়া স্বামীর দেখা পাইবার জন্য বসিয়াছিল। শোবার ঘরের কুলঙ্গিতে তাহার বই খাতা সাজানো। এই দুই বৎসর স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে কি ভাবে পড়াশুনা করিয়াছে, কতখানি নির্ভুল ও নিখুঁত ভাবে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার বড় আশা ছিল সমস্তই সে স্বামীকে দেখাইবে। এই রূঢ় আঘাতে সমস্ত আশা চুরমার হইয়া গিয়া তাহার একটু রাগই হইল। বলিল, "তাহলে তুমি না থাকলেই ত পারতে।"

স্বরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আত্মনাথ একটু অবাক হইয়া বলিল, "তাই নাকি!"

নীলিমা আরও কঠিন স্বরে বলিল, "নিশ্চয়, তোমাকে ত কেউ জোর করে ধরে রাখেনি।"

আত্মনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "বটে! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রাখতে চাও!"

নীলিমা বলিয়া ফেলিল, "আমার দায় পড়েছে!"

"আচ্ছা, তাহলে চল্‌লাম"—বলিয়া হঠাৎ গট্ গট্ করিয়া দরজার কাছে গিয়া আত্মনাথ খিল খুলিয়া ফেলিল। মুখ দিয়া রাগের মাথায় অমন একটা কথা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহার পরিণতি এমন হইবে নীলিমা ভাবে নাই। সে ভীত হইয়া একবার আত্মনাথকে বারণ করিতে গেল। কিন্তু 'আর কখনো দেখা হবে না,

মনে রেখো" বলিয়া চক্ষের নিমেষে আত্মনাথ দরজা খুলিয়া তখনই বাহির হইয়া গেছে।

অন্ধকার রাত। দরজার বাহিরে তারের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ খানিকটা পার হইয়া লোহার গেট।

আত্মনাথ অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইয়া গেটের হাতল খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া দেখিল গেট বন্ধ নয়। কিন্তু গেট খুলিতে গিয়া মুস্কিল হইল। অন্ধকারে মনে হইল একটা গরুই বোধ হয় গেটের গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া আছে, তাহাকে না উঠাইলে গেট খোলা যায় না।

আত্মনাথ গরুটাকে উঠাইবার জন্য বলিল, "হেট্ হেট্।" গরুটা তবু উঠিল না। আত্মনাথ অসহিষ্ণু হইয়া গেটটা নাড়িয়া তাহার গায়ে আঘাত করিয়া আবার বলিল, "হেট্ হেট্, ওঠ্ বেটা।"

হঠাৎ গরুটা একটু গা নাড়া দিয়া অদ্ভুত এক আওয়াজ করিল। গরুর গলা হইতে এমন আওয়াজ আত্মনাথ কখনও শোনে নাই। একটু বিস্মিত হইয়া আর একবার গেট নাড়া দিতেই গরুটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মনাদের মাথার চুলগুলা পর্য্যন্ত যেন খাড়া হইয়া উঠিল। হাজার অন্ধকার হইলেও গরু কখনও এমন আকৃতি লাভ করিতে পারে না।

যেটুকু সন্দেহ আত্মনাথের মনে ছিল তথাকথিত গরুর আর একটি আওয়াজেই তাহা দূর হইয়া গেল। আর গেট খোলার সমস্ত

বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক ছুটে সে একেবারে বাড়ীর রকে গিয়া হাজির। কিন্তু এখন উপায়? যে জানোয়ারটিকে সে গেটের ধারে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে কল্পনার ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার নাই। সহরের ভিতর গৃহস্থপল্লীর মাঝখানে বিশালকায় ব্যাঘ্রের আবির্ভাব সাধারণ যুক্তিতে যত অসম্ভবই মনে হউক, নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করে কি করিয়া? এ গেটের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে আজ অসম্ভব। কিন্তু অমন করিয়া তেজ দেখাইয়া চলিয়া আসিবার পর স্ত্রীর ঘরে সে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া! কথাগুলা লিখিতে যত বিলম্ব হইল আদ্যনাথের চিন্তা অবশ্য তাহা অপেক্ষা আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের গেটের কাছে ভূতপূর্ব্ব গোবৎসের নড়িবার শব্দ পাইয়া আদ্যনাথ একমুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর গিয়া দরজার খিল লাগাইয়া দিল। তারপর ফিরিয়াই দেখিল, মলিনা তাহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়াইতেছে।

অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর কিন্তু আদ্যনাথের আর যাহাই হোক উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ছিল না।

মলিনা তাহার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কিগো বীরপুরুষ, স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছিলে কোথায়?"

সদ্য সদ্য যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেছে বীরপুরুষ সম্বোধনটা সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই করা হয় নাই, তবু আদ্যনাথের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। স্বচক্ষে সে যাহাই দেখিয়া ফিরিয়া আসুক মলিনার কাছে সে কাহিনী বলিলে তাহার লাঞ্ছনার যে অবধি থাকিবে না, একথা সে অনেক আগেই জানে। না, আত্মসম্মান

বজায় থাকে এমন একটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গত কারণ তাহার বাহির করিতেই হইবে।

মলিনার কথার উত্তরে প্রথমটা সে বোকার মত একটু হাসিল; মলিনা আবার বলিল, "বীরপুরুষ, হাঁপাচ্ছ যে বড়!"

আত্মনাথ বলিল, "তোমরাও ত দেখি ফোঁপাচ্ছ।"

"বাঃ, এই যে মুখে কথা ফুটেছে! কিন্তু ছেলেমানুষকে এই রকম করে ভয় দেখানোতে কি বাহাদুরী আছে বাপু? ওত কেঁদেই সারা! আমি যত বলি, 'কক্ষনো চলে যায়নি দেখ্, এক্ষুনি আসবে।'--ওর কান্না কি থামে!"

বলা বাহুল্য অকূলে কূল পাইয়া তাহার চলিয়া যাওয়ার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আত্মনাথ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। মনে মনে অদূর ভবিষ্যতে মলিনা মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার মতামত যথাসম্ভব সংশোধন করিবে এমন একটা সঙ্কল্পও সে করিয়া বসিল। দরজার খিলটা ভাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া তারপর সে প্রসন্ন মনে বিছানার ধারে গিয়া বসিল।

সেই এক রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর কি আলাপ হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা গেল তাহার পরের দিনও আত্মনাথের কলিকাতায় যাইবার বিশেষ তাড়া নাই এবং পরের দিনও আত্মনাথকে গৌহাটি ত্যাগ না করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এবং নীলিমা মাত্র বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া কি করিয়া আত্মনাথের কল্পনালোকের মানসীকে হার মানাইল তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই ক'দিনে তাহার নিজের খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহও আত্মনাথের হয় নাই।

তাহাদের দাম্পত্যজীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃতকল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজো জানে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যাপনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে রামতনু রিসার্চ ফণ্ড নামে এক তহবিল আছে। যিনি এ বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন তাঁহাকে রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর নামে অভিহিত করা হয়। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন এই পদে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। এবার এই অধ্যাপকপদ কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনা চলিয়াছিল। সকল অনুমান ব্যর্থ করিয়া নূতন খবর বাহির হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নূতনত্ব হিসাবে সংবাদটি একটু আশ্চর্য্যের হইলেও, আনন্দের কথা। অধ্যাপনা-কার্য্য কে করিবেন সে খবর এখনও বাহির হয় নাই, চাপা আছে।

*   *   *

পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ স্বার্থরক্ষার খাতিরে অনন্যচিন্তাপরায়ণ হইয়া নিজেদের ঘর পরিষ্কার করিবার কাজে লাগিয়া গেছে। তাই কনফারেন্সের উপর কনফারেন্স বসিতেছে। লসেনের বৈঠকে অনেক তাল-ঠোকাঠুকির পর আপনা-আপনির মধ্যে সমরঋণের গোলযোগ একরকম মিটিয়া গেল, কেন-না না মিটাইলে উপায় নাই। জার্ম্মানি এক থোকে একটা মোটা টাকা জমা দিয়া ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেই যুদ্ধঋণের জঞ্জাল ইয়োরোপ হইতে সাফ হইয়া যায়। বাকি আমেরিকা।

*   *   *

ইহার পরেই সাম্রাজ্যান্তর্গত সকল রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া ইংরেজ এক অর্থনৈতিক সম্মিলন বসাইয়াছে। উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের বাণিজ্যগত স্বার্থরক্ষা, অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যাপারে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার আদান প্রদান। বৈঠক বসিয়াছে কানাডার রাজধানী অটোয়ায়। ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিদের নেতারূপে স্যর অতুল চ্যাটার্জি নাকি সেখানে গিয়াছেন, এইরূপ শুনিতে পাই। ইনি পূর্ব্বজীবনে কোথাকার যেন জজ-টজ ছিলেন। পরে বিলেতে হাই-কমিশনার নামে কি-একটি উচ্চবেতনের পদ আছে, তাহাতে নিযুক্ত হন এবং মেমসাহেবের স্বামী হন। নাম হইতে বেশ বোঝা যায় ইনি হিন্দু বাঙালী, কেন-না চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা স্যর অতুলকে কখনও দেখি নাই, দেখিবার আশাও নাই, আর কেহ দেখিয়াছেন কি-না তাহাও জানি না, কারণ তিনি ইংলণ্ডবাসী। তিনি নিশ্চয়ই খুব বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান, নহিলে-কি এত বড় পদ এবং পদবী পান! লোকে বলে, তাঁহার বক্তৃতার ইংরেজি খাটি ইংরেজের মত ইডিয়মেটিক হইবে।

* * *

আমরা আমাদের দেশকে কতটুকু জানি? শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা কয়জন? তাঁহারা দেশের বাকি 'ছোট-লোকে'র জীবনযাত্রার ধারার সহিত কতটুকু ঘনিষ্ঠতার দাবী করিতে পারেন বা তাহার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যে শিক্ষা বা কৃষ্টির অভিমান করিয়া থাকেন তাহার মূল দেশের মাটি হইতে কতটুকু রস টানিয়াছে?

* * *

আমরা কথায় ও কাগজে-কলমে দেশমাতার বন্দনা করিয়াছি, কার্য্যক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত-ভাবে অপূর্ব্ব শৌর্য্য, সহনশীলতা ও

আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়া বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু যে দেবতার জন্য এত আয়োজন তাঁহার আসল মূর্ত্তিটির ধ্যান কয়জনে করিয়াছি ? ধ্যান বিনা দেব-পূজার সার্থকতা কোথায় ? আসল কথা এই যে দেবী এখনও দেশবাসীর কাছে অব্যক্তরূপা। এতদিন কেবল তাঁহার নামেরই পূজা হইয়াছে এবং তাহাও বর্ণাভিমানী পুরোহিতের দ্বারা।

* * *

অশিক্ষিত শূদ্র দেশবাসী যেদিন পূজারীর আসন লইবে, যেদিন দেবতার ধ্যান-ধারণা সাধকের মনে সুস্পষ্টরূপ প্রতিগ্রহ করিবে, পূজা সেইদিন সার্থক হইবে। দেশমাতাকে জানিতে হইলে তাঁহারই মূর্ত্ত প্রতীক দেশের মানুষকে জানিতে হইবে। শতকরা ৯৫ জন মূক মৌন নিরক্ষর দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্প-বিজ্ঞান, অর্থ-সামর্থ্য, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, আশা-নিরাশার সত্য রূপ একান্তভাবে জানিবার আগ্রহ নিষ্ঠা ও সমবেদনা চাই। দেশমাতার অবারিত দান—মাটি জল হাওয়া হইতে আমরা কি পাই ও ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা আরও কি পাইতে পারি, তাহা জানিবার তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা চাই।

* * *

ইউরোপের রাজনীতি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। উহাদের কাছে আমরা thrilling ও spectacular এই দুইটা কথা ধার করিয়াছি। যাহাতে উত্তেজনা নাই এবং যাহা বিধিনিষেধের অপেক্ষা রাখে না এমন কোন কাজে আমাদের মন সহজে বসে না। সেইজন্যই বিদেশীবর্জ্জনে যে উদ্দীপনা পাই, স্বদেশীগ্রহণে তাহা পাই না। যাহা আমাদের মাতাইয়াছে, দেখি তাহার মধ্যে আছে

negative নাগরিক প্রেরণা, দেশবন্ধুর পল্লীসংস্কার আমাদের কাছে একটা positive idea মাত্র, প্রেরণা বা প্রত্যাদেশমূলক নহে।

* * *

অবশ্য সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ভাঙার কাজের প্রয়োজন আছে, এবং স্বয়ং মহাকালই যে ধ্বংসের কাজে লাগিয়া আছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে তাঁহার আর এক রূপ স্রষ্টার রূপ, ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলা একাধারে বর্ত্তমান। বলিতে চাই, শুধু ভাঙার কাজে পৌরুষ নাই। সৃষ্টি করিবার ক্ষমতার অভাব জাতির ক্লীবত্বের নামান্তর মাত্র।

* * *

দিনের পর রাত্রির মত ধ্বংসের পর অবসাদ আসে. ব্যষ্টির পক্ষেও, সমষ্টির পক্ষেও। দূর বা অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভাগ্যলিপিখানিতে জাতির বিধাতা হয়ত স্বারাজ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বরাট্ হইলেও আমাদের পক্ষে এই ক্লৈব্য এবং অবসাদ অবশ্যম্ভাবী, এখন হইতেই যদি ভাঙার পাশাপাশি গড়ার কাজে লাগিয়া না যাই।

* * *

নৈরাশ্যের কারণ নাই। চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। শক্তিকে কেবল রূপান্তরিত করিতে হইবে। দুষ্করতার বাধা অপসারণ করিতে হইবে। ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে। আলস্য পরিহার করিতে হইবে। চেষ্টাপ্রয়োগে কাজকে সহজ করিতে হইবে। দুঃসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত করিতে হইবে। অন্য পন্থা বিদ্যমান নাই।

১ম বর্ষ] ২১শে শ্রাবণ ১৩৩৯ [৮ম সংখ্যা

ক্ষণপ্রভা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিতে যাহা বুঝায় ছোড়দি এ বাড়ীর তাই। ছোড়দির শাসনে সকলে তটস্থ হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন সকল যন্ত্রগুলিকে সচল করিয়া রাখে তেমনি ছোড়দির একটি গোপনসঞ্চারিণী প্রেরণায় পরিবারের সকলে জীবন নির্ব্বাহ করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছোড়দির ছোড়দি বলিয়াই খ্যাতি, তিনি স্বপদবীধন্যা। আসল নামটি তাঁহার সকলে ভুলিতে বসিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ভিতরে বাহিরে ছোড়দি বলিয়াই তাঁহার বিজ্ঞাপন চলিয়া আসিতেছে।

পিসিমা, মাসিমা, খুড়িমা, জেঠিমা, বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বাড়ীর অসংখ্য ছেলেমেয়েরা, কর্ত্তা মহাশয়, সরকার নিকুঞ্জবাবুর পরিবার—সকলের ঘরেই ছোড়দি। চকচকে আসবাবপত্র, রগরগে

ঘর-দালান, পরিচ্ছন্ন বেল ও তুলসীতলা, ঠাকুর ঘর, সুসজ্জিত স্নানের কক্ষ—ইহাদের দিকে তাকাইলেই ছোড়দি সকলের চোখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেন। ইহারা সবাই পাশাপাশি থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া নীরবে তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকে। ছেলেমেয়েগুলি সচ্চরিত্র, কারণ তাহাদের চরিত্রের মধ্যে আছেন ছোড়দি ; বাড়ীর অন্যান্য মাহলারা, পিতা, সরকার, ঠাকুর, ঝি-চাকর, ভাই-বোনেরা—ইঁহাদের প্রতিদিনের জীবনে একটিবারও ছন্দপতন হয় না, তাহার কারণ ছোড়দি একজন বিশিষ্ট ছন্দশিল্পী ; ইঁহাদের লইয়া তিনি ছন্দে বাঁধিয়াছেন, এই সংসারটি তাই সকলের চোখে হইয়াছে একটি ভাবব্যঞ্জনাময়ী কবিতা।

ছোড়দি—

ছোড়দি ছাড়া আর কথা নাই। রান্নায়, খাওয়ায়, পূজায়, হাসিতে, গল্পে, গানে, রোগে, দুঃখে, অভাবে একটিমাত্র নাম—ছোড়দি। পাড়ায় বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে তামাকের আড্ডা, সেখানে ছোড়দি ; ছেলেদের ড্রামাটিক ক্লাব, সেখানে ছোড়দি ; পার্ব্বতী গয়লানির পরনিন্দা-পরচর্চ্চার আসরে সেখানেও ছোড়দি।

সংসার চলে ছোড়দির মুখ তাকাইয়া। বাজার খরচ, গোয়ালার ফর্দ্দ, ধোবা ও মুদীর হিসাব, ঝি-চাকরের মাহিনা ও বক্‌শিস্—এ সব ছোড়দির তাঁবে। ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পরীক্ষা, স্কুল-ফি, খেলার চাঁদা, চড়িভাতির খরচ—এরা ছোড়দির হাতে। বড় ছেলেমেয়েদের গাড়ীভাড়া, বায়স্কোপ দেখা, হাওয়া বদলাইতে যাওয়া, দর্জ্জির হিসাব, পকেট-খরচ—এ সমস্তই ছোড়দির করতলগত।

এমন নারীকে দেখিতে কাহার না কৌতূহল হয় ?

পুজার ঘর হইতে হাসিমুখে ছোড়দি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া একে একে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। তিনি হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন না, কেবল প্রসন্ন উদাসীন দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়া ঠাকুর ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন।

আপনি ছাড়া তুমি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে সাহস হয় না। পরণে একখানি তসরের ধুতি, গলায় সোণার চেন-এ বাঁধা একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, বাঁ-হাতের কনুইয়ে একগাছি সোণার বাহুবলয় ছাড়া দুইখানি হাত সম্পূর্ণ নিরাভরণ; সদ্যস্নাত মাথায় অপরিমাণ রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে প্রাতঃসূর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়া রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ, কিন্তু আপন গাম্ভীর্য্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন।

আসবাবপত্রের বিলাস ঘরের মধ্যে প্রচুর; সৌখিন এবং আধুনিক গৃহসজ্জা। পাশেই বড় একটা স্ফটিকপাত্রে জলের মধ্যে কতকগুলি নানা রঙের মাছ খেলা করিতেছে। ছোড়দি প্রথমে সুইচ বোর্ডে রেগুলেটর ঘুরাইয়া মন্দগতি পাখা খুলিয়া দিলেন, তারপর একটি ব্লাউস ও একখানি ধবধবে সাদা ধুতি লইয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন।

যখন পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন তখন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন আর রূপের বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ হয় না। প্রথমেই নজরটা গিয়া পড়ে তাঁহার দেহের বয়সটার দিকে। মনে হয় কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে কোন্ একটা অঙ্কে গিয়া হঠাৎ

তাঁহার কোমল ও দীঘল দেহখানি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূজাসন হইতে উঠিয়া তপস্বিনী অপর্ণার মত তাঁহার দীর্ঘায়ত চোখে সন্ধ্যা তারার যে গভীরতা ছিল, এখন সে চোখে নামিয়াছে বুদ্ধি এবং জীবন-চেতনার দীপ্তশ্রী, সে দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়, উজ্জ্বলও বটে।

প্রথমেই তিনি একটি নয় দশ বছরের মেয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, খুকি, তোমার গানের সুর মুখস্থ হয়েছে ?

খুকি কহিল. হয়েছে ছোড়দি, শুনবেন ?

শুনবো চল।

পাশের ঘরে গিয়া খুকি টেবিল হারমোনিয়ম খুলিয়া গান গাহিতে বসিল, ছোড়দি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া তিনি খুসি হইলেন। বলিলেন, বেশ হয়েছে, তবে সামান্য 'ইমন কল্যাণ' সেট্ করতে এত দেরী হওয়া উচিত হয়নি।

আপন অক্ষমতায় খুকি মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

পিছন হইতে মণ্টু কহিল, ছোড়দি, পঞ্চু বললে—ও আর এমন কাজ কখনো করবে না। আজ থেকে—

ছোড়দি ঘাড় ফিরাইয়া দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইলেন। কহিলেন, সে হবে না, পরের জিনিসে যে না বলে হাত দেয় তার শাস্তি কমতে পারে না। এখনো দু'দিন তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। মণ্টু, তোমার গালিভার্স ট্রাভ্‌ল্‌ শেষ হয়েছে ?

মণ্টু কহিল, হয়েছে।

এবার জুলে ভার্ণের বই পড়তে দোবো। একটু শক্ত তা হোক। বলিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে বামুন ঠাকুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি কি রান্না হবে।

ঝি বাজারে গেছে, সে এলে খবর নিও ঠাকুর।—বলিয়া ছোড়দি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। চলিয়া তিনি কেন গেলেন তাহা সবাই জানে। প্রতিদিন সকালে এই সময়টায় বাবা, দাদা, পিসিমা, বৌদিদি প্রভৃতির শারীরিক সংবাদ লওয়া তাঁহার প্রধান কাজ। নিজে তিনি সকলের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। দুপুরবেলা কোন্ এক সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য তাঁহার দাতব্য ঔষধালয় খোলা থাকে। পাড়ার মেয়েরা তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া ধন্যবাদ দিয়া যায়।

এমনি করিয়াই ছোড়দির দিন কাটে। তাঁহার নিকটে কেহ নাই, সবাই আছে আশে পাশে। তিনি নিয়মের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নিজের বন্ধন কোথাও সৃষ্টি করেন নাই। সকলের সংবাদ লইয়া বেড়ানো যাঁহার কাজ, নিজের সংবাদ লইবার তাঁহার সময়াভাব। তাঁহার চারিদিকে আছে শৃঙ্খলা, কিন্তু শৃঙ্খল কোথাও তাঁহার নাই। তবু তাঁহার আসল চেহারাটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাড়ীর মধ্যে কোথাও হাসি তামাসা আরম্ভ হইলে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যান। সামান্য মিথ্যাকথা কেহ বলিলে যন্ত্রণায় রাত্রে তাঁহার ঘুম আসে না। সংবাদপত্রের মারফৎ যদি নারী-হরণের কথা তাঁহার কাণে আসে, এই ভয়ে তিনি খবরের কাগজ আনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে আধুনিক কোনো উপন্যাস কি নাটক প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। মণ্টু একদিন কোথা হইতে কি একটা অশ্লীল কথা শিখিয়া আসিয়া এ বাড়ীতে তাহার পুনরুক্তি করিয়াছিল বলিয়া তিন দিন তিনি

লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। কেহ কোথায় অন্যায় করিয়াছে শুনিলে ভয়ে ও বেদনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ছোড়দি এমনিই।

ভাঁড়ার ঘর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, ছোট ভাই বিজু আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। একটি হাত ধরিয়া কহিল, ছোড়দি, কাল আমাদের ম্যাচ্ খেলা হয়নি. জানো ত?

ছোড়দির চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, হয়নি? কেন রে?

আমাদের বন্ধু শ্রীমান্ বাদলবাবু এসে জুটতে পারলেন না!

তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ছোড়দি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ট্রেণ ফেল্ করেছিল নাকি? বর্দ্ধমান থেকে তার আসবার কথা না?

বিজু কহিল, হ্যাঁ, বর্দ্ধমান থেকে। চমৎকার খেলে, না ছোড়দি? ও ছেলেটা সব দিকেই স্মার্ট। মনে হচ্ছে এবার আই-এতে অনেক টাকা দামের স্কলারশিপ্ পাবে। আমাকে একটা চিঠি লিখেছে, এইমাত্র পেলাম।

ছোড়দি কহিলেন, তা-হলে আসতে পারলে না?

সেই কথাইত বলছি তোমাকে, বেলা তিনটে নাগাৎ সে এসে পৌঁছবে ছোড়দি। আমাদের এখানেই থাকবে, কেমন?

বেশ ত, ওদিকের বারান্দার ঘরটা তাকে দিও? বেশ ঘরটি। বিজু খুসি হইয়া হঠাৎ আনন্দে ছোড়দির কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একবার আদর করিয়া লইল, তারপর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ছোড়দি হাসিয়া কহিলেন, মনের মতন

সঙ্গী আসবে শুনলে এমনিই হয়, না রে বিজু? বাদল বুঝি তোদের হাফ্ ব্যাকে খেলে?

হ্যাঁ ছোড়দি, সেন্টার হাফ্। শীগ্‌গিরই একদিন দেখবে তুমি, বাদল মোহন বাগানের ডিফেন্সে নেমেছে। বলিতে বলিতে বন্ধুর গৌরবে গর্ব্বিত মুখখানি লইয়া বিজু বাহিরে চলিয়া গেল।

ছোড়দি কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাহার পথে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর রান্নাঘরে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঠাকুর ওবেলা পটলের চপ্ আর মাংস রান্না কোরো। রান্না যেন ভাল হয়। বলিয়া উত্তর না শুনিয়াই তিনি সেখান হইতে সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন।

বেলা তিনটার পর ছোড়দি বারান্দা হইতে নীচে তাকাইয়া দেখিলেন, একটি বলিষ্ঠ সুশ্রী ছেলে বিজুর গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। ছোড়দি সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দুই বন্ধু পায়ের শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। পরিচয় আগেই ছিল সুতরাং তাহার প্রয়োজন হইল না। বাদল হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, চিনতে পারেন ছোড়দি?

ছোড়দি হাসিয়া কহিলেন, না। অনেক বড় হয়ে গেছ।

বেশ লোক ত আপনি? দু'বছরেই এত বড় হ'য়ে গেলাম যে চিনতেই পাচ্ছেন না?

ছোড়দি কহিলেন, আগে একটু রোগা ছিলে। রোগা আর আর দুরন্ত।

এখনই বুঝি খুব শান্ত হয়েছি? বলিয়া বাদল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তা হলেই খুব আমাকে চিনেছেন দেখছি। আগে ইস্কুল পালাতাম, আজকাল কলেজ পালাই।

উত্তরে ছোড়দি কহিলেন, স্কলারশিপ্ যে পায় তার কলেজ পালানো আমি সইতে পা র।

বাদল কহিল, এই ষ্টুপিড্ বুঝি আমার স্কলারশিপের খবর আপনাকে দিয়েছে?

বিজু কহিল, তুমি পেতে পারো আমি বলতে পারিনে?

বাদল কহিল, বাঁধাবাঁধি আমার ভাল লাগে না! যাক্ সে কথা, আপনি কেমন আছেন বলুন।

বলত কেমন আছি?

ছোড়দি যে বিধবা, সংসারের সাধ আহ্লাদ যে তাঁহার চলিয়া গেছে এই সামান্য কথাটা সহজেই সকলে বুঝিতে পারে। বাদল মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আমি কি করে বলব?

ছোড়দি তাহার অপ্রতিভ অবস্থাটি উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, মানুষ কেমন থাকে তার মুখ দেখলে বোঝা যায় না?

বাদল হাসিয়া কহিল, খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা দুর্বোধ্য।

সেইজন্যেই ত এত অশান্তি। এস ভাই, এই তোমার ঘর। বিজু, বাদলের স্যুটকেসটা রেখে এসো ও-ঘরে। বলিয়া ছোড়দি আগে আগে গিয়া ছোট ঘর তে প্রবেশ করিলেন।

বাদল কহিল, ছোড়দি, আমি কিন্তু নিতান্ত অস্থায়ী লোক। কাল সকালে আমাকে বর্দ্ধমানে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে।

ছোড়দি আসিয়া কহিলেন, হাওয়ার মতন এলে, তা বলে ঝড়ের মতন চলে যাওয়া হবে না।

বাদল কহিল, তা বলছিনে ছোড়দি, কাল আমাদের কলেজে টাকা জমা দেবার শেষ তারিখ, তাই যেতেই হবে। আজ রাতে একবার যাবো বৌবাজারে মেজদিদির কাছে। আমার বড়দা গিছলেন হিমালয় ভ্রমণে, সেখান থেকে এনেছেন শিলাজিত্, এক শিশি মেজদিদিকে দিয়ে আসব।

একটা চেয়ারে গিয়া বাদল বসিল, ছোড়দি সুইচ টিপিয়া তাহার মাথার উপরে পাখা খুলিয়া দিলেন। তাহার কপালের পাশ দিয়া যে দুইটি ঘামের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল ছোড়দি তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, বেশ ত, যাবার ব্যবস্থা আমার হাতে, তুমি এখন মুখটা মুছে ফেল দেখি! পাঞ্জাবীটা খোল; স্নান করবে?

আগে চা খাবো।

আগে না, আগে স্নান করো। তোমার ম্যাচ ক'টার সময়? সাড়ে পাঁচটা ত? অনেক সময় আছে। খোল, পাঞ্জাবীটা আগে খুলে ফেল।

আপনি যান ছোড়দি, খুলছি।

এখনই খোল, লজ্জা করবার মতন দেহ তোমার নয়। খুলে স্নান করে এসো। এই কাপড় রয়েছে টাঙানো।

গায়ের জামা খুলিতেই ছোড়দি সেটি তাহার হাত হইতে লইয়া আলনায় তুলিয়া রাখিলেন। বলিলেন, শরীরটাকে এমন

মজবুত করে গড়েছ, পুলিশে না বিপ্লবী সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়।

বিজু নীচু হইতে কহিল, ছোড়দি খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

ছোড়দি গলা বাড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা। এসো ভাই, তোমায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে যাই। বলিয়া বাদলের হাত ধরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

ছোড়দির এই সহৃদয় ও ঐকান্তিক আতিথ্যে বাদল একটু থতমত খাইতেছিল। ছোড়দি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া সাবান গামছা তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। বলিলেন, এসো, এইটা বাথরুম, এই সাবান রইল ভাই। 'গডরেজ' কি 'চন্দন' যা ইচ্ছে মেখো। যাই, তোমার চা তৈরী করিগে।

স্নান করিয়া যখন বাদল বাহির হইয়া আসিল, ছোড়দি চিরুণী ও বুরুশ দিয়া তাহার মাথা আঁচড়াইয়া দিলেন। নিজ হাতে তিনি চা ও খাবার লইয়া আসিলেন। বিজু আসিয়া একবার তাড়া দিয়া গেল। ছোড়দি তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া কহিলেন, আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে তুমি পর!

বাদল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সেবারও আপনি এই নালিশ করেছিলেন। আমি পর, সে ত আপনার চোখের দোষ ছোড়দি!

চোখের দোষ হতে পারে, তবুও তুমি আপন নও। দাঁড়াও ভাই, ছেলেদের খাওয়াটা একবার দেখে আসিগে। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিয়া যখন আসিলেন, দেখিলেন বাদল হাফ্প্যাণ্টে দড়ি লাগাইয়া কোমরে বাঁধিতেছে। ছোড়দি হাসিয়া বলিলেন, ও

কি হচ্চে, চোরের মতন? দাঁড়াও আমি বেল্ট্ এনে দিচ্ছি। আমার কাছে যা নেই তা বাজারেও নেই!

কিন্তু যা আছে তা যে কোথাও নেই ছোড়দি?

কী সে? বলিয়া তিনি উত্তর না শুনিয়াই আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কোমরে বেল্ট্ বাঁধিয়া ছোড়দির নিকট হইতে দইয়ের টিপ্ লইয়া তারপরে দুই বন্ধু ম্যাচ খেলিতে বাহির হইয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছোড়দি তাহাদের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাদল যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহারাদি করিয়া রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার কথা। বৌবাজারে রাতটুকু কাটাইয়া সকালের গাড়ীতে সে বর্দ্ধমান ফিরিয়া যাইবে। বারান্দায় আসিতেই সে দেখিল তাহার ঘরের অন্য দরজা দিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাকিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না, আজকার ম্যাচ খেলায় তাহারা হারিয়া আসিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া আসিলেন। বাদল কহিল, কি করব বলুন ছোড়দি, দশচক্রে ভগবান আজ ভূত হ'লো। একা কি করতে পারি বলুন ত?

ছোড়দি হাসিলেন। কহিলেন. আমার টিপ্ নিয়ে যারা যায়, তারা কোথাও জয় ক'রে ফেরে না। তারা আসে লজ্জা নিয়ে, তাইতেই আমার আনন্দ।

অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বাদল কহিল কি বলচেন ছোড়দি?

ছোড়দি কহিলেন, এমন নয় যে মানুষের অপমান দেখে আমার আনন্দ। আমার আনন্দ ভাই তাকে দেখে, যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়, যে দুঃখ পেয়েছে, যে হেরেই এসেছে বার বার। তাঁহার চোখ দুইটি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

বাদল একটু অধীর হইয়া কহিল, আপনার চরিত্র অত্যন্ত এ্যাবসার্ড!

তা হবে। ছোড়দি কহিলেন, তাই ত বলচি ম্যাচে যে জেতে তার সঙ্গে আমার ম্যাচ করে না।—মৃদু মৃদু হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যাইবার একটা তাড়া ছিল। ছোড়দি অনুরোধ করিতে নিবৃত্ত হইয়া বাদলকে খাওয়াইতে বসাইলেন। বিজু পাশে বসিল। সে আজ ছোড়দির দিকে তাকাইয়া ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হইতেছিল। ছোড়দির গাম্ভীর্য্য যেন আজ কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে খসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া আজ যেন তাঁহার বিপুল উৎসাহের জোয়ার।

আহারাদির পর ছোড়দি উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে আর সকলের খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিতে গেলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

বাদল জামা কাপড় পরিয়া লইল। বিজু তাহাকে বাস্-এ তুলিয়া দিয়া আসিবে বলিয়া প্রস্তুত হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি ঘটনায় সে একটু চঞ্চল হইয়া বাদলের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তাহার ছোট স্যুটকেসটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এইত এই টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম, তুই বুঝি কোথাও সরিয়ে রেখেচিস!

না রে। আমি হাতই দিই নি।—বাদল বলিল।

তবে গেল কোথায়? বলিয়া বিজু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খোঁজাখুজি করিতে লাগিল।

এ ঘরে আঁতিপাঁতি খুঁজিয়া সে গেল পাশের ঘরে। সে ঘরে সমস্ত ওলটপালট করিয়া খুঁজিল। ছেলেদের ঘরে গিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল, নিজের ঘরে গিয়া চারিদিক দেখিল। শেষকালে ভিতরে ঢুকিয়া ছোড়দিকে কহিল, বাদল এবার যাবে ছোড়দি, তার স্যুটকেসটা কোথায়?

ওই ত ওখানে ছিল, তুমিইত রেখেছ। ছোড়দি কহিলেন।

বিজু আবার ফিরিয়া আসিল। ভয়ে তাহার ক্ষণে ক্ষণে ঘাম দেখা দিতেছিল, সারা গায়ে এক একবার কাঁটা দিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল এ বাড়ী হইতে চুরি হইবার সম্ভাবনা ত নাই! না বলিয়া এ বাড়ীতে কেহ কাহারও জিনিসে হাত দেয় না! সে চুপি চুপি গিয়া একে একে সকল ছেলে মেয়ে এবং ভাইবোনদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল। ভিতর বাড়ীতে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিল; বাবা, খুড়িমা, দাদা, বৌদিদি সকলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কেহই বলিতে পারিলেন না। এইবার ছোড়দির কাণে উঠিতে বাকি থাকিবে না। অতিথির জিনিস তাহাদের এই সম্ভ্রান্ত বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছে শুনিলে অপমানে ছোড়দির চির-উন্নত মস্তক ধূলায় লুটাইবে, এত বড় লজ্জা তিনি সহিতে পারিবেন না। সকলে সকলে ছি ছি করিবে, সকলেই বলিতে থাকিবে ছোড়দির সৎশিক্ষা এ বাড়ীতে ব্যর্থ হইয়াছে। ছেলেদের অবস্থাটাই বা কি হইবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পেটের ভিতর হঠাৎ একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া সে চঞ্চল হইয়া

ভূতের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভয়ে, লজ্জায়, গ্লানিতে, দুঃখে অপমানে তাহার দম আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলে এবং প্রত্যেকটি মেয়ের কপালে চৌর্য্য বৃত্তির কলঙ্ক লেপিতে আর দেরি নাই! তাহার বন্ধু যাইবার সময় জানিয়া যাইবে, ঐশ্বর্য্যবান হইলেই সচ্চরিত্র হয় না, ধনাঢ্য হইলেও সামান্যর লোভ ইহারা এড়াইতে পারে না; মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সমস্ত স্বচ্ছল অবস্থার আবরণ ভেদ করিয়াও একএকবার কুৎসিতভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে জানিয়া যাইবে ইহারা সবাই চোর, ইহাদের এই সহৃদয় আতিথ্যের আড়ালে হিংস্র প্রলোভন মুখব্যাদান করিয়া নখর শানাইতেছিল। জুয়ার আড্ডা, বাজারের গাঁটকাটা এবং কারাগারের সাধারণ কয়েদীর সহিত ইহাদের কোনো প্রভেদ নাই। তাহারা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সাজিয়া থাকে না, ইহাদের কৃত্রিম ভদ্রতা এবং সভ্যতার ছদ্মবেশ পরিয়া তাহারা বেড়ায় না। তাহারা স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সহজবোধ্য সদ্ব্যবহারের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া নাই। সভ্যসমাজের চোখে এ বাড়ী আজ ধ্বংস হইল, ছোড়দির অকলঙ্ক জীবনের হইল অপঘাত মৃত্যু, তাহারা হইল চিরকালের জন্য লোকচক্ষে ঘৃণিত। বিজুর গলার ভিতরে কান্না উঠিয়া আসিল।

দেখিতে দেখিতে কানাঘুসায় বাড়ীর সকলের মধ্যে জানাজানি হইয়া গেল। ছোড়দির অলক্ষ্যে যখন একটা লজ্জাকর আন্দোলন নিতান্তই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার জানিতেও বাকি রহিল না। বিজুর একবার মনে হইল, বাড়ীর সকলকে আজ একবার প্রচণ্ডভাবে অপমান করিয়া নিজে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। তবু সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোড়দি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিজুর মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, ছোড়দির মুখখানা কঠিন, শীতল, ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ,—ধারালো অথচ জীবনচিহ্নহীন। চোখে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মুখখানা রক্তহীন, বিকৃত ওষ্ঠাধরে মর্ম্মান্তিক শ্লেষ। জিজ্ঞাসা করিলেন, পেয়েছ স্যুটকেস ?

না ছোড়দি। বলিতেই বলিতেই বিজুর মুখের ভিতর হইতে এক টুক্‌রা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। বলিল, সারা বাড়ী, সব ঘর, সমস্ত খুঁজলাম, কোথাও তার চিহ্ন নেই!—তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তা-হলে বাদল যাবে কেমন করে ?

যেতে সে পারে ছোড়দি, কিন্তু এ অপমান যে আমাদের সইবে না।—হঠাৎ চুরমার হইয়া বিজু তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

অন্ধকারে ছোড়দি পলকের জন্য একবার নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন, তারপর পা সরাইয়া চলিয়া যাইবার সময় একরূপ অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া গেলেন, একে অপমান বোলো না বিজু, এ হচ্ছে অপমৃত্যু!

নীচে উপরে সমস্ত বাড়ীখানা স্তব্ধ ও মুহ্যমান হইয়াছিল। আগামী কাল প্রাতঃকাল হইতে যে কলঙ্ক ও লজ্জার স্রোত অবারিত হইতে থাকিবে, সারা নিঝুম বাড়ীখানা যেন অটল নীরবতায় তাহারই সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ছোড়দি ছাদের পাঁচিলে ভর দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। সে রাত্রি ঘোর কৃষ্ণ পক্ষের। আকাশে কোথাও আলো নাই, তারায় তারায় সারা অন্ধকার আকাশ ছাইয়া আছে। তিনি চলৎশক্তিহীন,—মনে

হইল জীবনের আর তাঁহার চেতনা নাই, ইচ্ছা-অভিরুচি নাই, তিনি প্রস্তরীভূত, তিনি ক্লান্ত। মেরুদণ্ড আজ তাঁহার ভাঙিয়া গেল, এ আর কোনোদিন সোজা হইবে না। এ বাড়ীতে পাপ প্রবেশ করিল, সে পাপ এবার সকলকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে। অসাড় দুইটি চক্ষু মেলিয়া ছোড়দি কোন্ দিকে যে তাকাইয়া রহিলেন তাহা বুঝা গেল না। শুধু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ অন্যায়ের জন্য তিনিই দায়ী, তিনিই। কাল হইতে মহাসমুদ্রের মত বিরাট জন-সমাজ তাঁহার নিন্দায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তাঁহার সম্ভ্রম যাইবে সম্মান যাইবে, লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে হইবে, ভদ্রসমাজের জঞ্জালের মত তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে। কাণের ভিতর তাঁহার অগ্নিদাহের মত হু হু করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

ছোড়দি, আপনি এখানে?

ছোড়দি পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন, বলিলেন, কে বাদল? চল ঘরে যাচ্ছি। তোমার যাওয়া ত তাহলে হলো না দেখছি?

ছাদের কোলেই তাঁহার ঘর। ভিতরে ঢুকিয়া কহিলেন, তাইত, তোমার স্যুট্‌কেসটার কথাই ভাবছি ভাই। এ রকম কখনো হয় না। ভোজবাজীর মতন কোথায় যে...আশ্চর্য্য!

বাদল একটু হাসিল। বলিল, স্যুট্‌কেশটার জন্যে আমি ব্যস্ত নই, আমি ভাবছি মেজদিদির ওষুধটার কথা। শিলাজিত্ ত হিমালয় ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না! ওটা যদি ফিরে পেতাম!

ছোড়দি কহিলেন, তা-হলে তোমাকে থেকেই যেতে হ'লো ত?

না ছোড়দি, এ রাতে যাওয়া হ'লো না, ভোর রাতে আমায় চলে যেতেই হবে। ওষুধটা যদি না পাই তাহলে মেজদিদির সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবো। কারণ, যেতেই হবে!

তুমি ত ভারি একগুঁয়ে বাদল। যদি ঘুমিয়ে পড় তা হলে কেমন করে প্রতিজ্ঞা থাকবে?

প্রতিজ্ঞা নয় ছোড়দি, প্রয়োজন।

প্রয়োজন? এ ছাড়া সংসারে আর কোনো দাবি নেই? প্রয়োজনের জন্যেই আমাদের বাঁচা, আর কোনো প্রয়োজনে নয়? এখানে থাকতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না বাদল?—ছোড়দি অস্থির হইয়া একটু হাসিলেন।

ঘরের দরজায় বাদল দাঁড়াইয়াছিল। মুখের উপর তাহার বিদ্যুতের আলো পড়িয়াছে। ছোড়দি ছিলেন খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া। বাদল হাসিয়া কহিল, ওরে বাবা, আপনার এ মুখ কখনো দেখিনি ছোড়দি। আমার কিন্তু সত্যি যাওয়া দরকার। আপনি একটু বিবেচনা করুন না।

কি বল?

বাদল একটু থামিল, তারপর ঢোক গিলিয়া হাসিয়া কহিল, বলছি ওই স্যুট্‌কেসটারই কথা, ওটা পেলেই আমি চলে যেতে পারি।

ছোড়দি তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। বাদল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, আমি দেখতে পেয়েছিলাম ছোড়দি, আপনি যখন ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন!

তার মানে বাদল? আমি চোর?—ছোড়দি প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাদল কহিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, সেকি আমার চোখের ভুল ?

ছোড়দি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু কোথাও গেলেন না, আবার তখনই ফিরিয়া আসিলেন। গায়ের রক্তে রক্তে তাঁহার আগুন ধরিয়া গিয়াছে। ভিতরে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া এটা ওটা নাড়া চাড়া করিয়া চাবি খুলিয়া আল্‌মারির ভিতর হইতে তিনি স্যুট্‌কেসটি বাহির করিলেন। বলিলেন, এই নাও, আমিই চোর! আর ত তোমার চলে যাবার বাধা নেই, এবার বেরিয়ে পড় ? হ্যাঁ, খুলে দেখে নাও, টাকা কড়ি সব ঠিক আছে কিনা !

স্যুট্‌কেশটি তুলিয়া লইয়া বাদল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই পিছনে পিছনে ছোড়দি আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, চুপ করে চলে যেও না বাদল, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার কাজ করেছি, একটা যা হোক শাস্তিও দিয়ে যাও। হ্যাঁ, এক্ষুণি তোমায় চলে যেতে হবে, আর এক মুহূর্ত্ত না। চল, তোমাকে বের করে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে আসি। কেউ জেগে নেই। চল, আর এক মুহূর্ত্তও না।

বাদল বাহির হইয়া নীচে নামিতে লাগিল। পিছনে নামিতে নামিতে ছোড়দি কহিলেন, আমার সব চেয়ে দুঃখ ...সব চেয়ে আনন্দ যে একজন আজ আমাকে চোর বলে জেনে গেল। কী হয়ে বেঁচে আছি বল ত? ভাল হয়ে, সৎ হয়ে, সচ্চরিত্র হয়ে। এর কি দরকার, এসব কি হবে আমার বলতে পার ?

নীচে নামিয়া বাদল সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। একটি কথাও সে কহিল না। ছোড়দি গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তুমি রইলে না, কিছুতেই রইলে না ; সেই ভালো,

আমাকে চোর বলেই জেনে যাও,— চোর, মিথ্যেবাদী, অধার্ম্মিক ! কেমন করে তোমাদের বোঝাবো, উঁচু আসন আর আমার ভাল লাগে না,—সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে বাঁচা..... ক্লান্ত, আমি বড় ক্লান্ত বাদল !

দরজার চৌকাঠে পা দিয়া বাদল হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গেল, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, না না না, ছুঁয়ো না, শুধু আমাকে ছুঁয়ো না, তখন আমার পা ছুঁয়েছিলে তুমি ... জানো না পা ছুঁলে আমার কী হয়, কী যন্ত্রণায় আমার চোখ বুজে আসে ... তুমি যাও বাদল, তুমি যাও সুমুখ থেকে। বলিয়া একরূপ তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

ব্যবস্থাপক সভার ডিবেটিং ক্লাবে বোধ হয় বেশীর ভাগ বক্তৃতার সময়েই মাননীয় সদস্যগণ কেদারায় ঠেস দিয়া 'ক্ষীরঘুম' উপভোগ করেন, কিন্তু সেদিন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তর্জ্জনগর্জ্জন ও টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত সহ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা-কালে তাঁহাদের ঘুম নিশ্চয় চটিয়া গিয়াছিল। ইউরোপীয় সদস্য শ্রীযুক্ত আর্মষ্ট্রং সাহেব, শ্বেতাঙ্গেরা-যে দেশের স্বাধীনতার শত্রু, এই কথার প্রতিবাদ করিয়া, দেশের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহারই একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, "যেহেতু এ দেশের লোকেরা রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল ইত্যাদি কখনও দেখে নাই, যেহেতু আমরাই প্রথমে এ-সকল এ-দেশে আমদানী করি, এবং যেহেতু আমরা অনেক কষ্ট ও খরচপত্র করিয়া অনেক কল কারখানা বসাইয়াছি সেহেতু আমরা ন্যায্যভাবেই এদেশের শাসনকার্য্যে ভাগ পাইবার দাবী করিতে পারি।"

* * *

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জবাব দিলেন, "আপনারা টাকা খাটাইতে-ছেন, তাহার লাভও কড়ায় গণ্ডায় উশুল করিয়া লইতেছেন, তাহার উপর আবার দেশ-শাসনের ভাগ লইবার কথা ওঠে কেন? আপনাদের যুক্তি এই যেহেতু আপনারা এঞ্জিন আবিষ্কার করিয়াছেন ও এ-দেশে চালাইতেছেন সেহেতু আপনারা দেশ-শাসনের দাবী করিতে

পারেন। তাহা হইলে যখন আপনাদের আবিষ্কৃত এঞ্জিন রাশিয়া ও জার্ম্মাণীতে চলিতেছে এবং তাহাতে তাহাদের অশেষ উপকার হইয়াছে, তখন ষ্টালিন বা হিণ্ডেনবার্গ পছন্দ করুন বা না-করুন আপনারা ঐ দুই দেশ শাসন করিবার অধিকারী। আপনাদের অনেক টাকা জার্ম্মাণীতে খাটিতেছে ও জার্ম্মাণীর অনেক টাকা রাশিয়াতে খাটিতেছে, অতএব আপনারা জার্ম্মাণী শাসনের দাবী করুন ও জার্ম্মাণীও রাশিয়া শাসনের দাবী করুক।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেন, "যেহেতু নদেরচাঁদ সাধুখাঁ রাম বাবুর জমীর উপর তেলের কল করিয়াছে ও রাম বাবুর বাড়ীতে সম্বৎসরের তৈল সরবরাহ করে, সেহেতু নদেরচাঁদ রাম বাবুর জমী, বসতবাড়ী ও তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি নিযুক্ত হইবার 'লেহ্য' দাবী করিতে পারে।"

* * *

প্রাচ্যের অনেক দেশেই এই আর্মষ্ট্রঙ্গীয় যুক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন পাশ্চাত্য শক্তির vested interest বা প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ আছে এবং সেই স্বার্থকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য গোটা দেশটাকে নিজের হেফাজতে রাখিবার দরকার হয়। Vested interest না থাকিলেও শুধু মায়া বসিয়া যায় বলিয়াই কোন-কোন অনাথ শিশু-দেশকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে হয়, আর না করিলে লোকেই বা কি বলিবে, পরমপিতা পরমেশ্বরই বা কি বলিবেন? একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে ত?

* * *

ইউরোপের ব্যবহারিক রাজনীতি বলিতে মূলতঃ Science of Diplomacy বা কুটনীতি-বিজ্ঞান বুঝায়। চল্‌তি ভাষায় ইহাকে Science of bluff বা ধাপ্পাবাজী-তত্ত্বও বলা যায়। স্বরাষ্ট্রশাসন ও পররাষ্ট্রের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ—এই দুই ক্ষেত্রেই কূটনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য্য। কোন রাষ্ট্রিক সমস্যা সমাধানের সময় ইহাই প্রকৃতপক্ষে জাতির কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত করে। এই ব্যবহারিক রাজনীতির মধ্যে কোন গঠনমূলক আদর্শের সন্ধান করিতে গেলে হতাশ হইতে হইবে।

* * *

ম্যাকিয়াভেলির আমল হইতে এই রাষ্ট্রনীতি—পররাজ্য হরণ ও শোষণ মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে এবং ইহার সমর্থক ও উত্তরসাধক হিসাবে একটা সঙ্কীর্ণ আত্মম্ভরি ও পরদ্বেষী স্বাজাত্য বোধকে নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত শঠতা ও সুবিধাবাদ ইহাকে চিরদিনই গোপনতার আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্ব্বত্র সংশয় বিরোধ ও ধ্বংসের বীজ বপন করিয়াছে।

* * *

পাশ্চাত্যের নানা রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ—মনীষিগণের রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক দার্শনিকতার ক্রমবিকাশে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সহিত এই ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির কোন সমবেদনা বা সহযোগিতা নাই। বরং যে ধর্ম্ম, সমাজ, জাতীয়তা ও মানবতা এই সকল আদর্শের ভিত্তি, এবং যাহাদের দোহাই দিয়া এই

'কেজো' রাজনীতি চিরদিন আপনার কাজ হাসিল করিয়াছে, তাহাদেরই ইহা পরম শত্রু।

* * *

গণতন্ত্রবাদের জন্মদাতা প্লেটো রাষ্ট্রশাসনের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহাব আসন টলে নাই। বিগত শতাব্দীর রাষ্ট্রবিৎ আব্রাহাম লিঙ্কলন্ প্লেটোর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনের স্বরূপ বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, "Government of the people, by the people, for the people." আমরাও যে সুদূর অতীতে এই আদর্শকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ বা জাতির বাস্তবজীবনের উপর আদর্শ অপেক্ষা traditionএর প্রভাব বেশী বলিয়া অনেক আদর্শই বাস্তবে পরিণতি লাভ করিতে পারে না।

* * *

আধুনিক যে কোন রাষ্ট্রেই তথাকথিত ডিমক্রাসির স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন, আমরা দেখি, উহা আসলে Plutocracy-cum-Bureaucracy—ডিমক্রাসির মুখোস পরিয়া লোক ঠকাইতেছে। রুষবিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই ধনিক আমলাতন্ত্র মাঝে মাঝে বিপ্লবের বন্যায় ডুবিয়া গেছে, কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত ও উন্মূলিত হয় নাই, বন্যা সরিয়া গেলে আবার মাথা তুলিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়েই ইহা সব চেয়ে বড় ঘা খাইয়াছে, কিন্তু তাহাও কাটাইয়া উঠিয়াছে। এই বিপ্লবের পর যে Mobocracy [illegible]ন্দের শূন্য

সিংহাসন দখল করিয়াছিল তাহার আয়ু বেশী দিনের নয়। আনাতোল ফ্রান্সের 'The Gods are Athirst' বইয়ে ইহার উন্মাদ কার্য্যকলাপের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

* * *

রাশিয়াতে এই ধনিক আমলাতন্ত্র আপাত-দৃষ্টিতে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখানে যে সাম্যবাদের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়, ফরাসী বিপ্লবের পরিকল্পয়িতা রুষোর কাম্যও তাহাই ছিল। অর্থ ও সমাজ-নীতি সম্বন্ধে Le Contrat Socialএর বাণী ও পরবর্ত্তী যুগের কার্ল মার্কস ও বাকুনিনের পরিকল্পনার মধ্যে মূলগত প্রভেদ নাই। রাশিয়ার পঞ্চবর্ষব্যাপী বিরাট কার্য্যতালিকা এখনও পরীক্ষাধীন। এই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য বহু জাতিই রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে—কেহ ভয়ে, কেহ-বা আশান্বিতচিত্তে। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ধনিকতন্ত্র আবার কোনদিন আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা এ প্রশ্নের জবাব দিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই।

* * *

বলা বাহুল্য আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সাধনার সহিত শুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত সাম্যবাদ কখনও খাপ খাইবে না। জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস আমাদের বাস্তব ও অধ্যাত্ম-জীবনকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এ কথা যদি বিশ্বাস করি যে মানুষকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এজন্মে ভোগ করিতেই হইবে, তবে "All men are born equal" এ কথাটা আমার কাছে অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলরূপ ভূতের বোঝা লইয়াই

জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং জন্মের সময়েই বা সাম্য কোথায়? অবশ্য আপনার বা আমার ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও সংস্কার অন্যরূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও লৌকিক ধর্ম্মই সাম্যবাদের পরিপন্থী দেখা যাইতেছে।

* * *

আর একটা কথা এই যে, ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা এই লৌকিক ধর্ম্মের দ্বারা চিরদিন সমাদৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, স্মার্ত্ত ও দার্শনিক সকলেই শিখাইয়াছেন, ঐহিক সুখের কোন দাম নাই, পারমার্থিক সুখই প্রকৃত সুখ এবং এই সুখভোগে সকলেই সমান অধিকারী; সুতরাং যতদিন এই শিক্ষার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য জনসাধারণে মাথা ঘামাইবে না, অধ্যাত্মজীবনে সাম্য থাকিলেই তাহাদের শান্তি ও সন্তুষ্টি।

* * *

তৃতীয় কথা এই যে, দেশের শিক্ষিত সাধারণ—যাঁহারা দেশবাসীর স্বরাজ যজ্ঞের হোতা হইয়াছেন ও ধীরে ধীরে জনমতকে শিক্ষিত ও সংহত করিতেছেন এবং অনাগত কালের স্বরাষ্ট্রভারতের গণতন্ত্রে যাঁহাদের নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী—তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই বোধ হয়, বিংশ-শতাব্দীর এই রুষীয় সাম্যবাদের বিরোধী।

* * *

লৌকিক ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া যুক্তির দিক হইতে দেখিলেও, জন্মিবার সময় সকল মানুষই সমান—এ কথাটা বিচারসহ

বলিয়া বোধ হয় না। কুলসংক্রমন এবং প্রতিবেশ, জন্মিবার আগে heredity ও জন্মিবার অব্যবহিত পরেই environment—তোমার ও আমার নিয়তিকে অসমভাবে গঠন করিয়াছে। এই দুইটা ঘটনা আকস্মিক নহে এবং তোমার, আমার বা অন্য কাহারও ইহাদের উপর হাত নাই। তোমার ও আমার মধ্যে এই আদিম বৈষম্য নৈসর্গিক, ইহার কোন প্রতিবিধান নাই। তবে যে-বৈষম্য প্রাকৃতিক নহে এবং যাহা ব্যক্তিগত সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে। সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-স্থাপনা, বিংশ শতাব্দীর মানবতার প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে এখনও বহু পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

১ম বর্ষ] ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৯ [৯ম সংখ্যা

নাইট ডিউটি

ঘটনা বহু দিনের হইলেও ঠিক মনে আছে; হয়ত সামান্য দুই এক বিষয়ে ভুল হইতে পারে। উনিশ-শ সাত কিংবা আট সালের কথা। মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। তখন শীতকাল। সমস্ত দিন মেঘে অন্ধকার করিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে ও সোঁ সোঁ করিয়া ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে। আমার নাইট ডিউটি পড়িয়াছে। রাত্রি আটটা হইতে পর দিন সকাল সাতটা পর্য্যন্ত হাসপাতালে ডিউটি। ডিউটির নামে সন্ধ্যা হইতেই মনটা খারাপ হইয়া আছে। সুবিধা পাইলেই ডিউটিতে ফাঁকি দিতাম; বন্ধু বান্ধবদের ধরিয়া ডিউটি খাটাইয়া লইতাম, নিজে যাইতাম না। সেদিন কাহাকেও জোটাইতে পারি নাই।

আমি বাড়ী হইতে মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত করিতাম। বেশীর ভাগ ছেলে মেসে থাকিত। বাড়ীর পরিচ্ছন্ন আরামে

অভ্যস্ত হওয়ায় ডিউটিরুমে পাঁচ জনের সহিত অপরিস্কার বিছানায় শুইতে প্রবৃত্তি হইত না। বন্ধুরা ঠাট্টা করিত, বাড়াবাড়ি বলিত। ডিউটিরুমের বিছানা কম্বল চাদর যখন কাচাইয়া দেওয়া হয়, তখন আর আপত্তি কি? কিন্তু রোগীরা যে-কম্বল, যে-চাদর, যে-বালিশ ব্যবহার করিয়াছে, কাচানো হইলেও সেগুলি ব্যবহার করিতে আমার মন উঠিত না। নিতান্ত বাধ্য হইয়া শুইতে হইলে খবরের কাগজ পাতিয়া শুইতাম। তাই স্থির করিলাম ডিউটিতে গিয়া গল্প করিয়াই রাত কাটাইয়া দিব; নিজেও ঘুমাইব না, অপর ছেলেদেরও ঘুমাইতে দিব না। এমনই ছেলেদের ভাগ্যে প্রায়ই রাত্রে বিশ্রাম জুটিত না।

আমাদের সময় রাত্রে ডিউটিতে চারি জন করিয়া ছাত্র থাকিত। দুইজন সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডে, দুই জন মেডিক্যালে। রোগীদের রাত্রে কম্‌প্রেস দেওয়া, খুলিয়া গেলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া ও অন্যান্য নানাপ্রকার সেবাশুশ্রূষার কাজ ছেলেদের করিতে হইত। হয়ত একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় ওয়ার্ড হইতে কুলী আসিয়া ডাকিল, "বাবু—এ বার্ড সাহেবকা বাবু"—ইণ্ডিয়ান ফিমেল ওয়ার্ডে তিন নম্বর 'পেসেন্ট'কে সেঁক দিতে হইবে। যাহার উঠিবার কথা সে মটকা মারিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু কুলীও ছাড়িবার পাত্র নয়। "বাবু—এ বাবু"—অগত্যা সকলেরই তন্দ্রা ছুটিয়া যাইত। এইরূপ এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা অন্তর প্রায় সারা রাতই চলিত। ইহার উপর যেদিন কোন গাড়িচাপা-পড়া বা হাত-পা-ভাঙ্গা রোগী আসিত, অথবা কোন হতভাগিনী আফিং খাইয়া রাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইত, সেদিন ইমার্জেন্সি রুমে সকলের সারা রাতটাই রোগীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কাটিয়া

যাইত; কাহারও বিশ্রামের অবসর হইত না। ছাত্রেরা ছাড়া একজন করিয়া ডাক্তার রাত্রে ডিউটিতে থাকিতেন। ইঁহাকে 'অফিসর-অন-ডিউটি' বা সংক্ষেপে 'ও-ডি' বলা হইত।

সন্ধ্যা হইতে ঝড় বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। রাত্রি আটটায় রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইল। বাবা বলিলেন, "আজ আর ডিউটিতে গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু অন্য কোন ব্যবস্থা করি নাই, অগত্যা যাইতেই হইবে। বাবা আবার বলিলেন, "নিতান্তই যদি যেতে হয় ভাড়া গাড়িতে যাও।" দুর্যোগে গাড়ি মিলিল না। এক জোড়া জুতা ও এক প্রস্থ জামা-কাপড় কাগজে জড়াইয়া লইয়া ছাতা মাথায় দিয়া রওয়ানা হইলাম। খানিকটা যাইতেই ঝড়ের জোরে ছাতা উল্টাইয়া গেল। খালি মাথায় ভিজিতে ভিজিতে এ-রাস্তা সে-রাস্তা করিয়া যখন কলেজে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দশটা। একে বাহির হইতে দেরী হইয়াছিল, তাহাতে কালীতলায় এক কোমর জল, সেজন্য সোজা রাস্তায় না গিয়া অনেক ঘুরিয়া গিয়াছিলাম।

রোঁয়াওঠা ভিজা কাকটির মত ডিউটিরুমে ঢুকিতেই সমুপস্থিত বন্ধুরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এসো বাবা।" দেখি আমার আগেই ব্রজেন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর বীরু-দা আসিয়াছে। বীরু-দা আমার দুই ক্লাস নীচে পড়িত, কিন্তু কলেজসুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'বীরু-দা' বলিয়াই ডাকিত। বীরু-দা হাসপাতালেই দিন রাত পড়িয়া থাকিত। তাহাকে কদাচিৎ নিজের মেসে যাইতে দেখিয়াছি। হাসপাতাল বীরু-দার উপর যে কি মোহ বিস্তার করিয়াছিল বলিতে পারি না। শুনিলাম বীরু-দা সকাল হইতেই ডিউটিতে আছে; দুর্যোগে যদি কেহ না আসিতে পারে তাহার

বদলি রাত্রিতেও থাকিবে মনস্থ করিয়াছে। ব্রজেন আকাশের গতিক দেখিয়া সন্ধ্যার মুখেই চলিয়া আসিয়াছে। আমাকে লইয়া ডিউটিতে তিন জন হইল।

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া জুতা-জামা বদলাইয়া সবে বসিয়াছি, এমন সময় জলস্তম্ভের মত বটব্যাল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়াই আমরা 'জ্যাবোরাণ্ডি' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলাম। জ্যাবোরাণ্ডি একটি ঔষধের নাম। মাঠে ফুটবল ম্যাচের সময় উৎসাহ দিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা মড়ার পায়ের লম্বা হাড় হাতে করিয়া ঘুরাইত ও 'বাই জ্যাবোরাণ্ডি' বলিয়া চীৎকার করিত। বিপক্ষ দলের সহিত মারামারি বাধিলে হাড় কাজে লাগিত।

বটব্যাল কখনও ছাতা ব্যবহার করিত না। রৌদ্র ভিন্ন ছায়া দিয়া চলিত না। সে খুব আমুদে লোক ছিল। মনে আছে একদিন আমার সঙ্গে বাইসিকেলে যাইতে যাইতে কলেজ স্কোয়ারে পড়িয়া যায়। সামনের রোয়াকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি দাঁত খিঁচাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, বাইসিকেলে চড়া! জাননা ত সাইকেল চড় কেন? কেন বাপু, ভগবান কি পা দেন নি?" পরে বলিলেন, "চোট লেগেছে? কোথায় লাগ্‌ল দেখি?" বটব্যাল ধূলা ঝাড়িয়া সাইকেলে উঠিতে উঠিতে অতি শুদ্ধভাষায় বলিল, "আমার লাগুক না লাগুক মহাশয়ের পিতার তাহাতে কি?" এই বটব্যালই কি-প্রকারে কলেজ হইতে যন্ত্রপাতি 'মৃগয়া' করিয়া বাড়ি লইয়া যাইতে হয়, আমাকে সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিত। কেহ প্রতিবাদ করিলে বলিত, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, এতে পাপ নেই।" বটব্যাল এখন

কোথায়? ডাক্তার হইয়া বাহির হইবার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে সে কালাজ্বরে মারা যায়। তখনও কালাজ্বরের ঔষধ বাহির হয় নাই। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্লীহা কমিবে বলিয়া তাহাকে 'আরগট্' খাইতে দিয়াছিলেন। বটব্যালের এক বন্ধু-ডাক্তার বটব্যালকে জিজ্ঞাসা করে, "মেয়েদেরই ত ছেলে হবার সময় আরগট্ খাওয়ায়, তোমাকে কেন আরগট্ দিলে?" বটব্যাল তখন মৃত্যুশয্যায়, বলিল, "ছেলের আর পিলের একই ওষুধ।"

ডিউটিরুমে বটব্যাল আসিয়া দাঁড়াইতে মেজেতে জল জমিয়া গেল। আমি বলিলাম, "ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।" সে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র আনে নাই। বিছানা হইতে চাদর উঠাইয়া বটব্যাল মাথা মুছিল। ভিজা কোট, সার্ট, গেঞ্জী ও জুতা খুলিয়া গা মুছিল। সার্টটা নিংড়াইয়া গায়ে দিয়া ধুতি খুলিয়া ফেলিয়া শুখাইতে দিল। তাহার অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রজেন বলিল, "এই বেশে গোটা হাসপাতাল ঘুরে আসতে পার ত একসের রসগোল্লা খাওয়াব।"

বটব্যাল বলিল, "বীরুদার কাছে রসগোল্লার টাকা গচ্ছিত রাখ।" বলিয়াই আমাদের ভাবিবার অবসর না দিয়া সে ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইল।

রাত তখন এগারটা। সারি সারি লাল কম্বল মুড়ি দিয়া রোগীরা প্রায় সকলেই ঘুমাইতেছে, দু'একজন রোগের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে। ওয়ার্ডে মাত্র একটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে এবং তাহার সামনে টেবিলে খাতাপত্র লইয়া মেম নার্স বসিয়া আছে। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। ওয়ার্ডের সমস্ত দরজা খোলা। দুর্য্যোগেও ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করা হয় না। ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া থাকিয়া থাকিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। কুলীরা বারান্দায় বসিয়া ঝিমাইতেছে। বটব্যাল

ইণ্ডিয়ান মেল ওয়ার্ডে অর্থাৎ দেশীয় পুরুষ রোগীর ঘরে ঢুকিল। পিছু পিছু আমরা তিনজনও ঢুকিলাম। নার্স খাতায় একমনে রিপোর্ট লিখিতেছিল, একবার আমাদের দিকে তাকাইয়া খাতায় মন দিল। আমরা যেখান দিয়া যাইতেছিলাম সেখানে আলো কম এবং নার্সও অন্যমনস্ক থাকায় তাহার নজরে অস্বাভাবিক কিছুই পড়িল না। বটব্যাল নির্ব্বিঘ্নে এই ওয়ার্ড ঘুরিয়া অন্য ওয়ার্ডে ঢুকিল। এখানেও কেহ কিছু লক্ষ্য করিল না।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বটব্যাল ইউরোপিয়ান মেল ওয়ার্ডে অর্থাৎ সাহেব রোগীদের ঘরে প্রবেশ করিল। একজন রোগী বিছানায় বসিয়াছিল। এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শনে হাসিতে গিয়া তাহার কাশি আসিল। শীতকালের রাত্রে হাসপাতালে একজন কাশিতে আরম্ভ করিলে হাসপাতাল শুদ্ধ রোগী কাশিতে সুরু করে। এই রোগীর কাশি শুনিয়া ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীদের মধ্যেও কাশি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। নার্স সচকিত হইয়া খাতাপত্র ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং বটব্যালের অপরূপ মূর্ত্তি চোখে পড়ায় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তারপর মুখে রুমাল দিয়া 'হু হু' করিয়া হাসিতে হাসিতে বারান্দায় পলাইল। বটব্যাল নির্ব্বিকার। গম্ভীরভাবে সারা ওয়ার্ড ঘুরিয়া অন্য ওয়ার্ডের দিকে চলিল।

বীরু বলিল, "আর কেন? এখনি সিষ্টার রাউণ্ডে বেরুবে, এ অবস্থায় ফিমেল ওয়ার্ডে আমাদের দেখলে নিশ্চয় প্রিন্সিপ্যালকে রিপোর্ট করবে, তার চেয়ে ফিরে চল।"

বটব্যাল কোন উত্তর না দিয়া মেম সাহেবদের ওয়ার্ডে ঢুকিল। কাশির জন্য এখন অনেক রোগীই জাগিয়া উঠিয়াছে। নার্সও ওয়ার্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নার্স বটব্যালকে দেখিল এবং

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পলাইল। কিছুদিন পূর্ব্বে নীচের সেল্ ওয়ার্ড হইতে এক মাতাল পলাইয়া আসিয়া এই নার্সকে তাড়া করিয়াছিল। বোধ হয় সে কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। বটব্যাল যে ওয়ার্ডে প্রবেশ করে, সেখানেই নার্স হয় মুখে রুমাল গুঁজিয়া 'হি হি' করিয়া হাসিতে থাকে, নয় ভয়ে পালাইয়া যায়।

সারা হাসপাতাল ঘোরা হইলে বটব্যাল বলিল, "ছাদে যাব।" ছাদে যাইতে সিঁড়ির উপকার গোলঘরে তখন ডিপ্‌থিরিয়া রোগী রাখা হইত। ডিপ্‌থিরিয়া ছোঁয়াচে রোগ বলিয়া এই ব্যবস্থা। সেদিন কোন ডিপ্‌থিরিয়া রোগী ছিল না।

বীরুদা বলিল, "আর বিষ্টিতে ছাদে উঠে কি হবে?"

বটব্যাল ছাড়িল না, বলিল, "বাজি রেখেছ যখন. আমার সঙ্গে সারা হাসপাতাল ঘুরতে হবে।"

বটব্যাল সিঁড়িতে উঠিল। আমরাও সঙ্গে চলিলাম। কেবল বীরুদা গেল না। ছাদে উঠিয়া দেখি বৃষ্টি থামিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ জীর্ণ পর্ণকুটীর ক্যামেরার মধ্যে যেমন অপূর্ব্বসুষমামণ্ডিত হইয়া ধরা দেয়, ছাদের উপর হইতে ইট পাথর জল কাদার কলিকাতা সেইরূপ রাত্রের অন্ধকারে আমার চক্ষে অপরূপ শান্তমূর্ত্তিতে দেখা দিল। জনকোলাহল নাই. গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি নাই। গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছে। মেঘাবৃত ধূসর আকাশের গায়ে গ্যাসের আলোর সারি মালার মত দেখাইতেছে; মনে হইতেছে রাস্তাগুলি সব আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। রক্তাভ বিদ্যুতালোকে দূরে জেনারেল পোষ্ট অফিসের গুম্বজ ক্ষণে ক্ষণে ঝলকিয়া উঠিতেছে। কলিকাতা ঠিক যেন মায়াপুরী। এ নগরীতে হাসপাতাল নাই, রোগীর কাতরানি নাই, ডিউটি নাই, ডিউটিরুমে

ছারপোকা নাই। উঁচুতে উঠিলেই মাটির বন্ধন টুটিয়া যায়। জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার অর্থশূন্য হইয়া নীচে পড়িয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় স্বর্গপুরীর দেবতারা মানবের দুঃখে কষ্টে এত নির্ব্বিকার।

মনের মধ্যে কবিত্ব জমাট বাঁধিতেছিল। এমন সময়ে ব্রজেন বলিল, "শীতে যে রক্ত জমে গেল, নীচে চল।" ডিউটিরুমে ফিরিয়া আসিলাম। বটব্যাল বিছানার চাদর পরিল। ভিজা সার্ট খুলিয়া কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া ব্রজেনের দিকে হাত পাতিয়া বলিল, "নিয়ে এস।" ব্রজেন বলিল "এত রাত্রে রসগোল্লা কোথায় পাব, কাল খেও।" বটব্যাল আপত্তি শুনিল না। আমি ও বটব্যাল দুইজনে রসগোল্লা কিনিতে বাহির হইয়া গেলাম। বাদলায় ময়রার দোকান সেদিন সব সকাল সকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দুয়ার ঠেঙ্গাঠেঙ্গি করিয়া বৌবাজারের এক দোকান হইতে রসগোল্লা মিলিল। বটব্যাল বলিল, "পান নিতে হবে।" মেডিক্যাল কলেজের ফটকের সামনে অপর ফুটপাতে তখন এক পানওয়ালীর দোকান ছিল। পানওয়ালী অল্পবয়স্কা। তাহার অনেক খরিদ্দার। ভাজামশলা-দেওয়া মেডিক্যাল কলেজের পান তখনকার দিনে বিখ্যাত ছিল। বটব্যাল রোয়াকে উঠিয়া তাহার দরজার কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, "লক্ষ্মীটি, আজ আর জ্বালাসনি ভাই, কাল আসিস তখন, মাইরি।" বটব্যাল বলিল, "আরে মোলো!" দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা পড়িতে লাগিল। পানওয়ালী বাহিরে আসিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ওঃ আপনারা, এখুনি পান সেজে দিচ্ছি।"

পান কিনিয়া রসগোল্লা লইয়া আমি ও বটব্যাল যখন ডিউটিরুমে ফিরিলাম তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে।

বটব্যাল বলিল, "আমি আজ বাড়ী থেকে খেয়ে আসিনি, অর্দ্ধেক রসগোল্লা আমি খাব, বাকী অর্দ্ধেক তোমরা খাও।"

বটব্যাল আমারই মত বাড়ী হইতে যাতায়াত করিত। আমি বলিলাম, "রাত দশটার পর হাসপাতালে এসেছ, খেয়ে আসনি কি রকম ?"

বটব্যাল রসগোল্লা মুখে পুরিয়া বলিল, "সে অনেক কাহিনী। আজ উড়ে ঠাকুর ব্যাটাকে মেরে বিদেয় করেছি। ব্যাটা রোজ ঘি চুরি করত। রোজই দেখি ডাল খস্‌কা হয়। মেয়েদের জিজ্ঞেস করলে বলে, বামুন ঠাকুর তাদের সামনেই ডালে ঘি সম্বরা দেয়, কোত্থেকে চুরি করবে। আজ সন্ধ্যেয় ঠাকুরকে বললাম, আমার সামনে ডালে ঘি দেবে। গিয়ে দেখি হাঁড়িতে ডাল ফুটছে, ঠাকুর অতি সন্তর্পণে হাঁড়ির মধ্যে ঘি ঢাললে। কি রকম সন্দেহ হল। ঠাকুরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাঁড়ির মধ্যে উঁকি মেরে দেখি ফুটন্ত ডালের ওপর এক এলুমিনিয়মের বাটি ভাসছে। ব্যাটা সেই বাটিতেই ঘি ঢেলেছে। তার পরই মার আর মার। মনে করেছিলাম সকাল সকাল খেয়ে বিষ্টির ফোঁটার ফাঁকে ফাঁকে হাসপাতালে চলে আসব, তা আর হ'ল না! রাত হয়ে গেল। যখন বেরলাম রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তা খুঁড়ে মেরামত হচ্ছে, ভয় হ'ল জলের মধ্যে পাছে গর্ত্তে পড়ে যাই। একটা লাঠি জোগাড় করে বীরবিক্রম দেবের হাতির মত রাস্তা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে পড়লাম।"

ব্রজেন বলিল, "কি বললে ?"

বটব্যাল বলিল, "সে গল্প জান না ? ছেলেবেলায় আমার বাবার কাছে উড়িষ্যার এক রাজা আসত। রাজার নাম বীরবিক্রম

ত্রিভুবননাথ ভঞ্জ দেও ভ্রমরবর রায়। রাজার এক শিকারী হাতি ছিল। সে একবার জলের মধ্যে চলতে চলতে গর্ত্তে পড়ে যায়। রাজা বলেছিলেন, তার পর থেকে "হতি শুণ্ডরে দণ্ড ধড়ি কিরি বাট ঠুকি ঠুকি যাউথিলা।"

বীরুদা বলিল, "বটব্যালটার যত উড়ের গল্প! আর বক্ বক্ কোরো না, একটু ঘুমোও।"

আমি বলিলাম "বীরুদা চেঁচায় কেন? ব্রজেন বলতে পার, ও ছাদে গেল না কেন?"

ব্রজেন বলিল, "সষ্টারের ভয়ে। ওর কোনও মুরদ্ নেই।"

বীরুদা বলিল, "কখ্খনো নয়। আমি অন্য কারণে ছাদে যাইনি।"

বটব্যাল বলিল, "প্রকাশ করে বল শুনি।"

বীরুদার মুখ গম্ভীর হইল। বলিল, "তোমরা বিশ্বাস করবে না, বলে কি হবে?"

আমি বলিলাম, "ওকে আর খোসামোদ কোরো না। ও মনে করেছে আমরা ওকে পেড়াপিড়ি করব।"

বীরুদা বলিল, "ভাই, রাগ কর কেন? আমি বলছি।"

বীরুদা আরম্ভ করিল, "মনে পড়ে, মাস তিন চার আগে একটি ছোট্ট ছেলে ওপরের সিঁড়ির ঘরে ডিপ্থিরিয়ায় মারা যায়?"

ব্রজেন বলিল, "হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?"

বীরুদা বলিল. "আমি তখন স্পেশ্যাল ডিউটিতে ছিলুম। যখন ছেলেটি মারা যায় আমি সেখানে উপস্থিত! ছেলেটির মা কিছুদিন আগে বিধবা হয়েছিল। না খেয়ে দেয়ে দিন রাত ছেলের কাছে বসে থাকত। ও-রকম করুণ মুখের ভাব আমি কারুর দেখিনি।"

ব্রজেন বলিল, "তার বয়স কত?"

বীরু-দা কহিল, "উনিশ কুড়ি।"

বটব্যাল বলিল, "ও! তাই তোমার হাসপাতালের ওপর এত টান।"

বীরু-দা বটব্যালের কথা কাণে তুলিল না। বলিল, "ছেলেটা যখন মরে গেল তখন তার মাকে দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। তারপর যখন 'ও-ডিকে' খবর দিয়ে ডিপথিরিয়া রুমে ফিরে গেলুম তখন ছেলের মাকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, পরের দিন সকালে মেডিক্যাল কলেজের নীচে সানের ওপর তাকে থঁ্যাতলানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আমি যখন ছিলুম না, সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরেছিল।"

আমি বলিলাম. "তার পোষ্টমর্টেমে আমি ছিলাম। মাথার খুলি ভেঙ্গে সব ব্রেণ বেরিয়ে গিয়েছিল।

বীরু-দা বলিতে লাগিল, "তার মাস খানেক পরে নিরঞ্জনের বদলি একরাত্রে নাইট ডিউটি খাটছি; এই বিছানায় শুয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ মনে হল কুলী আমাকে ডিপথিরিয়া রুমে যাবার জন্যে ডাকাডাকি করছে। 'যাতা হ্যায়'—ব'লে আর একটু গড়িয়ে নিলুম। তার পর সোজা ডিপথিরিয়া রুমে উঠে গেলুম।

গিয়ে দেখি একটি ছোট্ট ছেলে বিছানায় শুয়ে আছে, আর একজন স্ত্রীলোক তার শিয়রে বসে আছে। ছেলেটির ইনটিউবেশন্ টিউব শ্লেষ্মায় বন্ধ হয়ে নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। কোনও নার্স সেখানে নেই দেখে একটু আশ্চর্য্য হলুম। পালক দিয়ে টিউব পরিষ্কার করতে গেলুম। পালকটি ছেলের গলার কাছে এনেছি, এমন সময় দেখি ছেলেটি বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুলে দেখি, যে-মেয়েটি শিয়রে বসে আছে তার চেহারা অবিকল সেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া মেয়েটির মত। অত্যন্ত করুণ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে এসে ও-ডিকে রিপোর্ট করলুম। তিনি বললেন, কোন ডিপথিরিয়া কেস সেদিন আসে নি। আমার পেড়াপিড়িতে আমার সঙ্গে ওপরে উঠে গেলেন। গিয়ে দেখি ডিপথিরিয়া রুম চাবি বন্ধ সেখানে—"

"মাতুওয়ালা আয়া বাবু!" সঙ্গে সঙ্গে ও-ডি ঢুকিলেন। বলিলেন "একটা মাতালকে পুলিশে এনেছে, বড় দুষ্টুমি করছে। তোমরা সবাই শীগগীর নীচে এসো।"

আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। মাতাল ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। কাপড় ও জামা কাদায় মাখামাখি হইয়াছে। কোথাও জখম আছে কি না দেখিবার জন্য বটব্যাল তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মাতাল বলিল, 'কি দেখ্-শো বা-বা? এমন ক-ত শ-ত শা-লা-র হয়ে থাকে।"

বমি করাইবার ঔষধ তাহার মুখের কাছে ধরিয়া বটব্যাল বলিল, "নাও ঢুক্ করে খাও ত চাঁদ।"

মাতাল বলিল, "টুকু টু-কু ! কি বলিলি মালিনী ফিরে বল্ বল্।"

বটব্যাল বলিল, "খুব হয়েছে, খাও।"

মাতাল বলিল, "কি ঢেলেছ মাসি ? বিলিতি না দিশী ?"

বটব্যাল বলিল, "রসিকতা রাখ, ভাল মানুষটির মত খেয়ে বমি করে ফেল।"

বমির নামে ভয় পাইয়া মাতাল বলিল, "ও কথা বোলো না দা-দ্দা, বাপ্, ওপরেই বিলিতি।"

মাতালের আপত্তি কেহ শুনিল না। তাহাকে ধরিয়া বিলাতী মদ বাহির করাইয়া শাওয়ার বাথ দিয়া, নীচে সেল ওয়ার্ডে বন্ধ করিয়া যখন ওপরে উঠিয়া আসিলাম তখন প্রায় চারিটা বাজে।

আমি বলিলাম, "বীরু-দার এমন গল্পটা মাতাল ব্যাটা নষ্ট করলে। আর এখন ঘুমিয়ে কি হবে ? আর একজন কেউ একটা গল্প বল।"

বটব্যাল বলিল, "বীরুদারটাত গল্প, ও তিন রাত্তির উপরোপরি নাইট ডিউটিতে জেগে খেয়াল দেখেছিল। আমি একটা সত্যি ঘটনা বলছি শোনো।"

বটব্যাল আরম্ভ করিল, "ঐ যে বীরবিক্রম ত্রিভুবননাথের কথা তোমাদের বলেছিলাম, ও যে-ভাবে মরে সে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। বীরবিক্রম উড়িষ্যার একজন ছোটখাট সামন্ত রাজা। খুব শিকারের সখ ছিল। উড়ে বাঘ মেরে তার অরুচি হয়েছিল।

বাঙ্গালী বাঘ মারতে বীরবিক্রম দলবল সমেত সুন্দরবনে গেল। সুন্দরবনে মাঝে মাঝে আবাদ আছে; সেই সব আবাদের ধারে লোকের বসতি। এই সব লোক যখন জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়, তখন তারা পীর গোরাচাঁদের পূজো দিয়ে যায়। গোরাচাঁদ বাঘেদের দেবতা। যারা তাঁর পূজো করে তাদের সাঁই বলে। কাঠুরেদের সঙ্গে সাঁই থাকলে বাঘে ধরে না। সাঁই মন্ত্রবলে বাঘ মারতে পারে, এই সেখানকার লোকের বিশ্বাস। যাই হোক সাঁইরা বাঘের গতি-বিধি জানে ব'লে বীরবিক্রম একজন সাঁইকে দলে নেবার ইচ্ছে করলেন। সন্ধানে একজন সাঁই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে তার সুন্দরী নতুন বৌকে ছেড়ে দিনের পর দিন জঙ্গলে জঙ্গলে শিকারীদের দলের সঙ্গে যেতে প্রথমটা রাজী হল না। রাজা বীরবিক্রম শেষে তাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করালেন। ঠিক হ'ল সাঁই তার বৌকে সঙ্গে নিয়েই রাজার সঙ্গে যাবে। যেখানে তাঁবু পড়বে তাকে আলাদা ছোট তাঁবুতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

"পীর গোরাচাঁদের দরগায় সিন্নি চড়ানো হ'ল। বীরবিক্রম মানত করলেন, ভাল শিকার পাওয়া গেলে ফেরবার সময় খুব ধুমধাম করে পূজো করবেন। রাজা প্রায় মাস-খানেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বাঘ আর হরিণ মারলেন। সাঁই ও তার স্ত্রীর জন্যে রাজার তাঁবুর পাশেই এক ছোট তাঁবু পড়ত। বীরবিক্রম দেখলেন, সাঁইয়ের স্ত্রীর মত নিখুঁত সুন্দরী তাঁর রাজ্যে নেই। তাঁর মনে মনে এক বড় শিকারের মতলব পাকিয়ে উঠতে লাগল। তিনি প্রায়ই অসুখের ছুতোয় তাঁবুতেই থাকতে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর অনুচরেরা সাঁইকে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে

যেত। শেষে একদিন দেখা গেল যে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সাঁই তার গ্রামের পাশে আবাদের মধ্যে পড়ে আছে, আর রাজা বীরবিক্রম দলবল নিয়ে অন্তর্ধান করেছেন। সাঁইএর স্ত্রীরও কোন খোঁজ কেউ পেলে না।

"একবছর পরের কথা। বীরবিক্রম চৌরঙ্গী আর আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে যে বাড়ীটা আছে সেটা ভাড়া নিয়েছেন। তাঁর শিকার-করা নতুন রাণী সঙ্গে আছেন। কলকাতায় বেশ ফুর্ত্তিতেই দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন হৈ হৈ ব্যাপার ঘটল। বাড়ীর লোকজন সকালে উঠে দেখে যে-দোতলার যে-ঘরে রাজা রাণীকে নিয়ে শুতেন তার সামনের ছাদ রক্তারক্তি। রাজারাণীর কাপড়চোপড়ের ছেঁড়া টুক্‌রো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। রাণীর হাতের গোটাকতক আঙ্গুল পড়ে আছে। রাজার ঝুঁটিশুদ্ধ মাথার খুলিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। এখানে মাংসের টুকরো ওখানে নাড়ীভুঁড়ি। এক বীভৎস কা[illegible]। পাশের ঘরে রাজার খাস চাকর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই পুলিশ-সাহেব, ডাক্তার, আর সব লোকজন এসে পড়ল। ডাক্তারের অনেক চেষ্টায় চাকরের জ্ঞান হল বটে, কিন্তু কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করতেই সে চোখ কপালে তুলে 'বাঘ' বলেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পুলিশ সাহেব দেখলেন বড় বড় রক্তমাখা থাবার দাগ ছাদ থেকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে লোয়ার-সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। দাগ মেপে একজন বললে, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অন্ততঃ পনের ফুট লম্বা।' পুলিশের লোক দেখলে রাস্তা থেকে থাবার দাগ মাঠে গিয়ে পড়েছে ও সেখান থেকে সোজা পশ্চিম-মুখো গিয়ে তেলকল ঘাটের কাছে গঙ্গার মধ্যে নেমে গেছে।"

ব্রজেন বললে, "বাঘটা এলো কোত্থেকে ? তাকে রাস্তাই বা চিনিয়ে দিলে কে ?"

বটব্যাল বলিল. "বাজে কথা বকো কেন ?"

কুলী ডাকিল, "বাবু, ওসিডেণ্ট্ কেস্ নীচে যাইয়ে।"

"আবার কিরে বাবু ? একটু স্থির হয়ে বসতে দেবে না।" ঘড়ি দেখিলাম প্রায় পাঁচটা বাজে।

হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া নীচে ইমার্জেন্সি রুমে গেলাম। দেখি ইমার্জেন্সি টেবিলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, ও ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহার পায়ে আঁচড়ের দাগ ও সেখান হইতে রক্ত পড়িতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ?"

ভদ্রলোক কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ও ম-শা-য় বা-ঘ।"

বীরু-দা বলিল, "বলে কি !"

ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার পুত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পিতা অনিদ্রা রোগে ভোগেন ও প্রত্যহ তাঁহাকে ব্রোমাইড খাইয়া ঘুমাইতে হয়। অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া তিনি তামাক খান ও পরে পায়খানায় যান। আজও সেইরূপ অভ্যাস মত পায়খানা গিয়াছিলেন, কিন্তু ঢুকিতে যাইয়াই চীৎকার করিয়া পড়িয়া যান। বাড়ীর লোকজন ছুটিয়া আসিয়া দেখে তাঁহার পা হইতে রক্ত পড়িতেছে। তিনি বলেন, একটা বাঘ পায়খানায় বসিয়াছিল, তিনি ঢুকিতেই তাঁহাকে আঁচড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাঘ ?"

বটব্যাল বলিল, "ভাস্বুরকো নাম ব্যাঘ্রঃ।"

ভদ্রলোকের পুত্র বলিলেন, "কলকাতা সহরে বাঘ কোথা থেকে আসবে ? হয়ত কোন বড় কুকুর ঢুকেছিল। কিন্তু বাবা বলেন তিনি হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখেছেন বাঘ।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "হাঁ বাবা বাঘ। আমি তামাক খেয়ে পায়খানায় যাই রোজই। অন্য দিন তো বলি না বাঘ আছে।"

বটব্যাল জিজ্ঞাসা করিল, "বড় তামাক ?"

ভদ্রলোক কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "তুমি বাবা ছেলের বয়সী, কেন ঠাট্টা কর ?" তিনি পা দেখাইলেন।

যাহাই হউক তাঁহার কাটা জায়গা ঔষধ দিয়া ধুইয়া টিঞ্চার আইওডিন্ লাগাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

ও-ডি বলিলেন, "অনেক সময় ব্রোমাইড্ খেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকৃত হয়, তখন——"

একখানা থার্ডক্লাস গাড়ী আসিয়া থামিল ও দুইজন লোক এক বুড়ীকে ধরিয়া ঘরে আনিল। বুড়ী পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে, "বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে।" তাহার গায়ের স্থানে স্থানে আঁচড়ের দাগ ও রক্ত পড়িতেছে।

"কি হয়েছে ?"

সঙ্গের লোক বলিল, "বাঘ।"

বুড়ী ভোর রাত্রে ফিয়ার্স লেন দিয়া যাইতেছিল ; সে হেদোর মোড়ে বসিয়া ভিক্ষা করে। হঠাৎ একটা বাঘ আসিয়া তাহাকে আঁচড়াইয়া দিয়াছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও ফিয়ার্স লেকে থাকেন। ফিয়ার্স লেন মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিম গায়ে।

বুড়ির ব্যাপার শুনিয়া ও-ডির ব্রোমাইডের লেকচর্ থামিয়া গেল। বুড়ীর শুশ্রূষায় আমরা লাগিলাম। আবার ঘড় ঘড় করিয়া গাড়ী আসিয়া ফটকে লাগিল। গাড়োয়ান একজন ভদ্রলোককে ধরিয়া ঘরে আনিল।

"কি হয়েছে ?"

গাড়োয়ান বলিল, "বাঘ !" ইঁহাকে ফিয়ার্স লেন ও কলুটোলার মোড়ে বাঘে কামড়াইয়াছে। ইনি মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করেন, ভোরেই রোঁদে বাহির হইয়াছিলেন।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইতে চলিল। আর অবিশ্বাস করা যায় না। কলিকাতার রাস্তায় বাঘ! হাসপাতালের দরওয়ান ও কুলীরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ইমার্জেন্সি রুমে ক্রমেই কোলাহল বাড়িতেছে ও-ডি ধমক দিয়াও থামাইতে পারিতেছে না।

আবার গাড়ী আসিয়া থামিল এবারেও "বাঘ !" আরও একজনকে বাঘে কামড়াইয়াছে। তখন ফরসা হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় যথেষ্ট লোক চলাচল করিতেছে। ও-ডি রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনকে খবর পাঠাইলেন। পাঁচ মিনিট অন্তর বাঘে জখম করা রোগী আসিতে লাগিল ; সব কলুটোলা রাস্তা হইতে। হাসপাতাল সরগরম হইয়া উঠিল। রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন কোনর সাহেব আসিলেন ; স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল লিউকিস্ সাহেব আসিলেন ; মিলিটারী ছাত্রদের সুপারিণ্টেডেণ্ট নীল সাহেব আসিলেন ও হাসপাতালের সামনের মাঠে দাঁড়াইয়া বিউগল্ বাজাইলেন। দলে দলে মিলিটারী ছাত্রেরা আসিয়া বন্দুক লইয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইল ও 'রাইট এবাউট্ টার্ণ' করিয়া কলুটোলার দিকে মার্চ্চ করিয়া চলিয়া গেল। হাসপাতালের সমস্ত কাজ ওলট্ পালট্ হইয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় শুনিলাম বাঘটা 'হিতবাদী'র কাগজের গুদামে আশ্রয় লইয়াছিল, পুলিশের মাল্‌কাই সাহেব তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। টেরিটি বাজারের কোন দোকানদারের খাঁচা হইতে বাঘটা নাকি পলাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

সংস্কৃতে নভঃ মানে আকাশ, কিন্তু নভ মানে শ্রাবণ মাস। চতুরঙ্গ-ক্রীড়ায় যাহাকে কোনাকুনি চালনা করা হয় তাহার নাম গজ। শ্রাবণ মাসে যে গর্জ্জন করে, নব-অভিধানে তাহার নাম নভী। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া গজনির পানে চাহিয়া চাহিয়া যে চীৎকার করিয়া ওঠে, তাহার নাম গজনভী।

* * *

করি এবং গজ আর্য্যভাষায় একার্থক, করিম নয়। ত্রিংশৎবর্ষ পূর্ব্বে একদিন পরিতৃপ্তির সহিত পলান্ন ভোজনের পর দিবা দ্বিপ্রহরে অভিধান উলটাইতে উলটাইতে টাঙ্গাইলের নবনবোন্মেষবুদ্ধিশালী করিমোপাধিক আবদুল সাহেবের মস্তিষ্কে আইডিয়ার তড়িৎ খেলিয়া গেল। তখনই তিনি স্মরণ করিলেন, ঘৃণা লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়; ন লজ্জা ন চ ঘৃণা ন ভী। তখন 'করি' স্থানে 'গজে'র আদেশ করিয়া তিনি হইলেন গজনভী।

* * *

দাদার প্রতিভায় ভ্রাতা অবাক হইয়া গেল। নত-মস্তকে জ্যেষ্ঠ-দত্ত নামের হার কণ্ঠে পরিতে কুণ্ঠাবোধ করিল কি? না। জৌলুষে জাজ্বল্যমান হার-মানা হারের হালি গলায় দিয়া হালিম মিঞা গজনির ধার শুধিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর পরে সুযোগ মিলিল। ইতিহাস সাক্ষী, গজনির মামুদের বংশধর আজও ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

* * *

কোথায় গজনি, কোথায় উড়িষ্যা! ছ-ছয় ছত্রিশ মাসের পথ পলকে অতিক্রম করিয়া অশ্ব-মনোরথ ওড্রদেশে উত্তরণ করিল। উড়িষ্যাবাসীরা সেদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাহারা বীরের জাতি। উড়ে ঠাকুর অথবা উড়ে বেহারাকে জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞান করিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। ঐতিহাসিকেরা ততক্ষণ বাস্তব উড়িয়ার পরাক্রম-কাহিনীর হিসাব-নিকাশ করিতে থাকুন। ইতিমধ্যে আমরা যদি গল্পের কল্পিত উড়ের বীররস একটু উপভোগ করিয়া লই, অরসিক জনই তাহাতে শুধু বাধা দিবে। দুই উড়ের ঝগড়া মিটাইতে গিয়া তৃতীয় পক্ষ একটু কাবু হইয়া পড়ে, কেন-না তাহার বামে ও দক্ষিণে দুই পক্ষই কাপড় গুটাইতে থাকে, এবং উভয়েই প্রতিপক্ষকে অভিধান-বহির্ভূত অজস্র প্রীতি-সম্ভাষণে সম্বোধিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়ে, "সড়া রে সড়া।" সেই প্রলয়কাণ্ডে সচকিত হইয়া স্নেহশীল মধ্যস্থ উভয়ের উপর কিণাঙ্ককঠিন নিরপেক্ষ হস্তদ্বয় যতই দ্রুত-তালে সঞ্চালন করিতে থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে অগ্নিবর্ষী নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া পিছাইতে পিছাইতে অদমনীয় বামমার্গী ততই প্রবলভাবে জিহ্বা সঞ্চালন করিয়া আস্ফালন করে, "সড়া, মারিবি না কি?"

* * *

বন্ধু বলিলেন, গজনির কথা বলিতেছিলে—বল। এ গল্প অবান্তর।

আমি বলিলাম, গজনির কথা ফুরাইয়া গেছে। বংশ ও বীরত্বের কথা বলিতে পারি।

বন্ধু বলিল, বলি—গজনির কথা ফুরাইলে অর্দ্ধেক বাংলার বাকি থাকে কি?—বিজয় সিংহ?

—সিংহল দ্বীপ যিনি জয় করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় বীর। তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আর অজরাজের সহিত যুদ্ধে যে বঙ্গবীর পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন তিনিও নমস্য।

বলিয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি। আমরা' কবিতাটিও বড় ভাল। কিন্তু ওর একটা লাইন মনে পড়িলেই কেন-জানি-না আমার হঠাৎ হাসি পায়। অন্যায়!

কোন্ লাইন?

ওই, 'দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।' পড়িলেই রবীন্দ্রনাথের—

'ম্যারাথন আর থার্ম্মাপলিতে
কি যে হয়েছিল বলিতে বলিতে'

'পাটের পলিতা'র কথা মনে পড়িয়া যায়।

বন্ধু উত্তর করিল না, পকেটে হাত পূরিল।

এই পকেটে হাত-দেওয়াটাকে আমি বড় ভয় করি। কোথাও কিছু নাই, পাঞ্জাবীর কোন্ নিভৃততম অংশ হইতে ফস্ করিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া বন্ধু ঘাড় দুলাইয়া আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে, আমি ঘাবড়াইয়া যাই। বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, 'একটু কাজ আছে।' বন্ধু জেরা করিল, 'কি কাজ?'

চট্ করিয়া কোন কাজের কথা মনে পড়িল না, বলিলাম, এই ইয়ে—

কোলরিজের প্রাচীন নাবিকের মত চোখের উপর চোখ রাখিয়া বন্ধু বলিল, ইয়ে নয়, বোসো।

অগত্যা ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া চা আনিতে অর্ডার দিলাম।

বন্ধু hero-worshipper, তাহাকে তখন গজনির মামুদে পাইয়াছে, বলিল, শোন, এ সম্বন্ধে একটা সাময়িক কবিতা লিখিয়াছি।

কিন্তু গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। প্রেস সকালে তাগাদা দিয়া গিয়াছে, আমাকে তাড়াতাড়ি 'সাময়িকী' শেষ করিতে হইবে। অতএব আর যাহাই হউক, বন্ধুবরের কাব্য এ-সময়ে অত্যন্ত অসাময়িক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি চশমা মুছিলাম।

বন্ধু গলা খাঁকরি দিয়া আরম্ভ করিবার উপক্রমে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কবিতাটির ছন্দ কি ?

বন্ধু বলিল, বৈর অর্থাৎ বীরত্বপূর্ণ ছন্দ। বলিয়াই সুরু করিল।

'অণ্ড হতে পক্ষী ফোটে, পক্ষী হতে ডিম্ব'—

এই ডিম-ফোটানো কবিতায় একান্ত মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আপনার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে আনন্দধ্বনি বাহির হইল, সাবাস, সাবাস।

বন্ধু বলিল, চুপ।

আর বাধা মানিল না, আবৃত্তির স্রোত বহিতে লাগিল।

*　　　*　　　*

অণ্ড হতে পক্ষী ফোটে, পক্ষী হতে ডিম্ব,
স্রষ্টার অনন্ত চক্র—বিম্ব প্রতিবিম্ব।
গজনি গজায় নিত্য, মরে না মামুদ,
যত দাও তত বাড়ে বিদুরের ক্ষুদ।

বাগিচায় বাঘ ডাকে, পুকুরে বেঙাচি,
কানাচে কানাই ডাকে, সিংহ বলে আছি,
ময়মনসিংহে পোড়ে ছয় মণ তৈল,
রাজার নন্দিনী রাধা, নাচ তার হৈল।

এ ত বড় রঙ্গ বঁধু, এ ত বড় রঙ্গ,
ময়মনসিংহে এল তইমুর-লঙ্গ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে আর জলে ভাসে শিলা,
সে বড় দুর্গম দুর্গ উঁচু যার টিলা।

—তারা করে সোরগোল, মোরা খাই হব্য,
তারা মরে খেটে খেটে, মোরা মারি লভ্য।
——রাজঅশ্ব অপরূপ প্রসবিল অণ্ড,
কোটাল খাইল গোটা সে ডিম অখণ্ড।

আঁকা তাল, বাঁকা তাল, আর তাল ফাঁকা,
রাজার নন্দিনী তার সব দোষ ঢাকা।
উঠানের দোষ ঢাকে নাচিতে যে জানে,
অর্থ যে বুঝিতে পারে, খোঁজে না সে মানে।

গর্জ্জিল দাদার ভ্রাতা বীর-অবতংশ,
ধরাতলে লুপ্ত নহে মামুদের বংশ।
হিল্লী গেল, দিল্লী গেল, সাড়া দেয় বঙ্গ,
এ ত বড় রঙ্গ, সখা, এ ত বড় রঙ্গ।

* * *

আমি বলিলাম, থামো থামো, এ ত পয়ার। বৈর ছন্দ কোথায় ?

বন্ধু আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, পয়ার ? এ heroic couplet। অতীতের গৌরব করিতে গেলে এইরূপ প্রাচীন 'বীরত্বপূর্ণ দ্বি-পদে'র প্রয়োজন।

আমার আর সহ্য হইল না, বলিলাম, আর যদি পড়, তোমার মাথায়, রাজঅশ্বের না পারি, এই রাজহংসের ডিম ছুঁড়িয়া মারিব।

সামনে দু'কাপ চা, একখানি প্লেটে দু'খান টোষ্ট আর মোলায়েম ভাবে সিদ্ধ দুটি হাঁসের ডিম বিরাজ করিতেছিল। অণ্ডের কবিতা পড়িবার পূর্ব্বেই বন্ধু তার এক-তমের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন, রাজহাঁসের ডিম এর চেয়েও বড়। বলিয়া আর-একটি অম্লানভাবে বদন-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি একখানি টোষ্ট হস্তগত করিলাম। কি-জানি বন্ধুবরের inspiration আসিলে আর রক্ষা নাই।

* * *

কতই যে লিখিবার ছিল! প্যাটেল—ডি-ভ্যালেরা সংবাদ, ইণ্ডো-আরিশ লীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা। কিছুই লেখা হইল না। সব গুলাইয়া গেল। নির্জ্জনে একমনে লিখিতে হইবে।

*   *   *

বন্ধু উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বান্ধবী আসিয়াছিলেন। বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনায় সময় নষ্ট হয় না। ওদের কথা অনেকটা কবিতার মত। মিষ্টি বলিয়া নয়। অনেক সময় ঝালের ঝাঁঝে কাণ লাল হইয়া ওঠে। ওদের বাক্য অর্থকে অতিক্রম করিয়া চলে; অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনা বলে। অবিনবগুপ্ত অথবা সাহিত্যদর্পণকার যা-ই বলুন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, পথে ট্রামে বাসে এবং তাড়ার সময় ব্যঙ্গ ঠিক উপভোগ্য হইয়া ওঠে না। প্রেসের শাসন সময়ে সময়ে বান্ধবীদের শাসনের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। হইতেই পারে। প্রেস যন্ত্র মাত্র। বান্ধবী চলিয়া গেলেও তাঁহার বাক্যের ব্যঞ্জনা কাণে বাজিতে লাগিল,—প্রাণেও। 'কবিতা ছেড়ে আজকাল কি ছড়ার প্রচার চলছে?' ভাগ্যে ছড়াটা আগাগোড়া সে পড়ে নাই! তাহা হইলে ধরণীকে তাড়াতাড়ি দ্বিধা হইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত। যাক্—

*   *   *

নন্দ প্রবেশ করিল। নন্দ আমার কবিতার ভক্ত পাঠক। তাহাকে চটানো যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও মানুষের একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে ত? কি একটা কড়া কথা বলিতে যাইতেছিলাম, সে

চট্ করিয়া গজনিকাব্য তুলিয়া লইয়া পড়িয়া ফেলিল। বলিল, 'চমৎকার!' রাগ তখনও পড়ে নাই, বলিলাম, 'কি বুঝলে?' নন্দ মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহার দিকে আর-রবিবারের 'আনন্দবাজার'খানা ফেলিয়া দিলাম।

* * *

—মিঃ হালিম গজনবী বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় শিখ এবং হিন্দুদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, গজনির মামুদ বংশধরগণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। "সাহেবের বক্তৃতা পাঠ করিয়া একটা পুরাতন গল্প মনে পড়িল। বাংলাদেশে কি-হিন্দু কি-মুসলমান, একটু লেখাপড়া শিখিলে, কি আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল হইলে, অনেকেরই উপাধি বদলাইবার বাতিক দেখা দেয়। এমনি একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে টাঙ্গাইল মহকুমার দেলদুয়ার মিঞা-বাড়ীর কৃতী সন্তান মিঃ (অধুনা স্যর) আবদুল করিম সহসা নিজের নামের পশ্চাতে গজনবী শব্দ যোগ করিয়া নামটিকে একটু জাঁকালো করিয়া তুলিলেন।"

* * *

"আমাদের মিঃ হালিম গজনবী সাহেব তখন তরুণ যুবা। দাদা 'গজনবী' হইলে তিনি একটু গোলে পড়িলেন। স্থানীয় এক বৃদ্ধ রসিক ডাক্তার মিঃ হালিম সাহেবের সমস্যা শুনিয়া কহিলেন, বড় সাহেব গজনবী হইলেন, অতএব তুমি অশ্বনবী হও। বৃদ্ধ চিকিৎসকের রহস্য দীর্ঘকাল পরে সফল হইয়াছে।" ইত্যাদি—

* * *

নন্দ বলিল, "ওঃ।" আমার একটু মায়া হইল। ও-বেচারা কল্পনার রংমহলে ঘুড়িয়া বেড়ায়, বাস্তব অর্থাৎ সংবাদপত্র-জগতের খবর রাখে না। তা হোক অমন পাঠক পাওয়া ভাগ্যের কথা। আনুষঙ্গিক-সহ আর এক কাপ চা নন্দর সামনে হাজির হইল।

১ম বর্ষ]   ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৯   [১০ম সংখ্যা

যুগান্তর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুপুর পার হইয়া গেছে, তবে ঠিক বিকাল হয় নাই এখনও।

কাল অনেক রাতে বর-বধূ আসিল। বরণ প্রভৃতি প্রাথমিক আচারে, হাঁকডাক-গল্পগুজবে এবং তাহার পর খাওয়া-দাওয়ায় অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাড়িটা তাই এখন পর্য্যন্ত দিবা-সুপ্ত; নেহাৎ যদি এক আধ জন জাগিয়া থাকে।

বাড়িটার গায়ে হেমন্তের হোলদেটে রোদ, এখানে ওখানে গোটাকতক নারিকেল গাছের আর একটা ঘন পল্লবিত জামরুলের ছায়া। মনে হয় এই ক-দিন আগে বাড়িটাতে গায়ে-হলুদের যে ধুম পড়িয়াছিল, তাহারই ছোপ-ছাপ এখনও যেখানে-সেখানে

লাগিয়া রহিয়াছে।... এই গায়ে-হলুদ সে দিনকার হাসিহল্লা হট্টগোলের মধ্যে ছিল অন্য এক রকম; আজ কয়েক দিন দূরে পড়িয়া এরই মধ্যে তাহাতে স্মৃতির যাদু-রং ধরিয়াছে।

বিয়ের জের এখনও শেষ হয় নাই। আজ সকালে দিন ছিল, বৌভাতের অনুষ্ঠানটা সারিয়া রাখা হইয়াছে। রাত্রে ফুলশয্যা। পরশু বৌভাতের খাওয়ানোর হাঙ্গাম। সদরে রোশন-চৌকি বসিয়াছে। বাজনদারেরা দুপুরের ঝোঁকে একটু জিরাইয়া লইতেছিল, আবার নিজের নিজের বাজনা ধরিল। প্রথমে ঢোল খঞ্জনী; তারপর একজন সানাইয়ে একটানা ফুঁ দিয়া সুরের একটা স্রোত বহাইয়া দিয়া গেল; তাহার উপর ওস্তাদ মূল-শানাইয়ে রাগিণীর বিচিত্র লহরী সৃষ্টি করিয়া চলিল।

যেন বীচি-চপল স্রোতই বটে।—এক এক সময়, যেমন হেমন্তের এই রকম একটা উৎসবক্লান্ত ম্লান দিনে মনে হয়, এ কবেকার একেবারে-ভুলিয়া-যাওয়া-সময়ের মধ্যে থেকে কত হাসিকান্নার টুকরা ভাসাইয়া আনিয়া, অল্প একটুর জন্য চোখের সামনে দুলাইয়া নাচাইয়া আবার নিজের প্রবাহের বেগে মিলাইয়া গেল।

আজকের স্রোতে এমনিভাবে হঠাৎ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার এমনি উৎসব দিনের গোটাকতক বিচ্ছিন্ন কাহিনী ভাসিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া এই কঠিন বাড়িটার কিছু কিছু অংশ গলিয়া মিলাইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আজকের দিনে যাহারা সুখদুঃখের কলরবে বাড়িটা মুখরিত করিয়া আছে তাহারা নিদ্রিত রহিল; কিন্তু একটুর মধ্যেই সেই পরিবর্ত্তিত মায়াগৃহে

কবেকার বিস্মৃত একটা আনন্দ-চঞ্চলতা সাড়া দিয়া উঠিল।—কত মুখের কত রকম কথা, কত সব ভঙ্গী; কত রকম চোখ, তাহাতে কত কৌতুকের কি-সব বিচিত্র চাহনি; কত রকম পায়ের কত ভঙ্গিমায় চলা——

—তাহাদের অনেকেরই চলা শেষ হইয়া গেছে; যাহারা আছে-বা তাহারাও তাহাদের কণ্ঠস্বরের সে-সুর, চাহনির সে-অমৃত, গতির সে-ছন্দ হারাইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ সেই সেদিনকার মত শানাইয়ের করুণ সুরে বাড়িটার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল; অমনি প্রত্যক্ষের সমস্ত কঠিনতা, সত্যের সমস্ত গ্লানি বিলুপ্ত হইয়া গেল, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তর্হিত হইয়া গেল,—যাহারা জীবিত আর যাহারা মৃত সবাই তাহাদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই কটি দিনের উৎসবদীপ্ত জীবনের চাঞ্চল্য লইয়া আজ দুইটি স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল।

আজ বধূ আসিয়াছে মীরা; নূতন যুগের নূতন নাম, নূতনবিধ সজ্জা—পায়ে জরির-কাজ-করা মকমলের লক্ষ্ণৌয়ী নাগরা, নীচের হাতে হালকা স্বর্ণাভরণ; কাণে দুইটি হীরার টপ ছাড়া মুখমণ্ডল মুক্ত; আর ভরা বয়সের সেই পূর্ণ মুখখানিতে একটা সপ্রতিভ ভাব যা নিতান্তই যেন এই স্বাধীনত-যুগের বিজয়কেতন। বধূ আই-এ পাশ।

—সেটা ছিল লাবণ্যপ্রভার দিন।......আজ যেখানে রোশন চৌকি বসিয়াছে সেদিন সেইখানে সাঁচ্চার-ঝালর-দেওয়া পালকি নামিল। কচি, সবে-খেলাঘর-থেকে-বেরিয়ে-আসা আলতাপরা দুখানি পা একথাল দুধে ধোয়াইয়া 'দুধে-আলতা' করা হইল।

তাহার পর শাশুড়ীর সেই কোল—নথপরা ঘোরালো মুখের সেই প্রসন্ন হাসি "এস মা—লক্ষ্মী আমার......"

তাহার পর বরণের পালা। সেটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন কালকের কথা;—যেন কাল মীরার বরণের পাশে পাশে পঞ্চাশ বছর আগেকার এই বাড়ির সেই আর একটি বরণও হইয়া গেছে। .....ঐখানে একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ ছিল—নাকি অনেক বরণের সাক্ষী—তাহার তলায় বরবধূ দাঁড়াইল। চারিপাশে উচ্ছল আনন্দের একটা মিশ্র কোলাহল,—বাজনার শব্দে, হাসির হিল্লোলে, বড়দের হুকুমের গুরু আওয়াজে, ছেলেমেয়েদের আবদারের স্বরে যেন মাখামাখি পড়িয়া গেছে। ওর মধ্যে একটা কথা স্নেহের গভীরতায় খুব স্পষ্ট—কালের গায়ে দাগিয়া বসিয়া আছে—"ওগো, তোমাদের একশোবার বলচি—ওই বাজে মেয়ে আচারগুলো শিগ্গীর সেরে নাও,—মা আমার রোদে ধূলোয় সারা হয়ে এসেচেন, আর দাঁড়াতে পারেন না ..."

সে-শ্বশুর আর সেই-শাশুড়ী কেহ কি পায়? মনে হইলেই হাত-দুখানি কপালে গিয়া ঠেকে, চোখে জল ভরিয়া আসে।

পিসৃশাশুড়ীর সেই ঝঙ্কার—"নে বাপু, তোর নোতুন শ্বশুরগিরি ফলাতে হবে না...আমাদের আচার সবই বাজে ."

পাশে একজনের বোকার মত কথা, "বাজেই তো; আমারও ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধ'রে আসচে..."

সঙ্গে সঙ্গে, "ও ঠাকুরপো! রোসো. এখনও ঘরে ঢোকেনি, এরই মধ্যে!..."

সেই এক হাসি—ছোট বড় কেহ আর বাদ রহিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনটা এযুগে ফিরিয়া আসে। সুরস্নাত ঘুমন্ত পুরীতে শানাইয়ের সুর হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। তাহার পর অতীতের সেই সে-দিনের শানাইয়ের সঙ্গে আবার এক হইয়া যায়।

বরণ-শেষে দেখার ভীড় পড়ে,—মুখ দেখা, গড়ন দেখা, ভূষণ দেখা।—"না রাঙাগিন্নী, বউয়ের সেরা বউ এনেছ বাছা;—আহা, আঙুল গা!—যেন আগুনের শিখে।" কেহ বলে, "যেন চাঁপার কুঁড়ি।" একজন কচি গলায় বলে, "নখগুনো কত রাঙা দেখেচ মা! টকটকে—নট্‌কানের মতন।" এর সঙ্গে অনেক ভাব হইয়াছিল—অনেক কথা মনে পড়ে—কত শপথ করিয়া 'আতর' পাতানো—কিন্তু

শাশুড়ী বলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে বেঁচে থাক্—এই; রূপ আর কি?.." সুখের ভারে আওয়াজ ভারী হইয়া পড়ে। হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলেন, "এই রতনচুর দিয়েচে, এই তাবিজ, আর এই কণ্ঠি...মুখটা তোল তো মা.."

"দিব্যি দিয়েচে, দেবেই তো,—এমন প্রতিমের মত মেয়ে, সাজিয়ে দেবে না গা?"

আতরের কথাও মনে পড়ে,—"আর নোলকটাও চমৎকার দিয়েচে, মা; সত্যি।"

সবাইয়ের আবার সেই হাসি, "চুপ কর্ পাগলী; এত গয়নার মধ্যে ওর চোখে ঠেকল কিনা নোলক!..."

কে বলিয়াছিল, "নোলকে মুখখানি খুব খুলেচে কিনা—যেন সকালের পদ্মফুলটি...নামটি কি হ'ল গা?"

শাশুড়ী বলিলেন, "লাবণ্যপ্রভা।" শ্বশুর বাড়ির লোকে নামে যেন একটা সুর বসাইয়া দেয়।

আঙুর মুখে দিয়া লোকে যেমন ধীরে ধীরে চাপিয়া রসটা মুখে চারাইয়া লইতে থাকে, প্রশ্নকর্ত্রী সেইরকম ভাবে নামটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, "লাবণ্যপ্রভা ..লা – ব—ণ্য – প্র ভা... লাবণ্য . বাঃ চমৎকার নামটি—দিব্যি।"

সেদিনকার আদরের বধূ আজকের বধূর দিদিশাশুড়ী;—কোথায় সেই লাবণ্য, কোথায়ই বা প্রভা ?...

যা কোনকালেই চিরস্থায়ী নয় তাহার জন্য দুঃখ নাই; দুঃখ হয় সে-সব ধরণের প্রশংসাও আর নাই। আজ সকালে মীরাকে দেখিবার সময় একজন বলিল, "একেবারে হাল-ফেশানের বেলাউজটি —সবচেয়ে নতুন ছাঁট—দিব্যি!"

অমন নিটোল গড়ন, অমন পটের ছবির মত মুখ;—কারুর একটা মিষ্ট তুলনা দেওয়ার মুরোদ হইল না—কত তো ঠাকুর দেবতা রহিয়াছেন—দুর্গা প্রতিমে—লক্ষ্মী ঠাকরুণ – রাইগ্রামের রাধারাণী .. কত ফুল, কত কি ..হাল ফ্যাসানের বেলাউজ! শুনিলেও গা জ্বালা করে।

যাক্, নূতন যুগের নূতন রীত, অমন হয়-ই। সে-যুগে যাহারা দিদিশাশুড়ী ছিল তাহারাও নাতি-নাতনীর বিয়েতে সব-জিনিষ নিজের মনের মত করিয়া পায় নাই। নাতবৌয়েরা মাথায় তোলা খোঁপা, সিঁথির নীচে অৰ্দ্ধেক কপাল জুড়িয়া তেলে-গোলা সিঁদুর আর চোখে টানা কাজল পরিয়া আসিত না বলিয়া দুঃখ করিত! .. সময়টা হাওয়া,—বহিতে বহিতে নিজের গন্ধ হারাইয়া ফেলে,

আবার নূতন গন্ধ সঞ্চয় করিয়া চলে। মানুষ ঠিক থাকিলেই হইল। পায়ে জুতা দিয়া আসুক গিয়া; কিন্তু মীরা মেয়েটি ভাল। জুতা কি চিরজন্মই পরিবে?—কোলে একটি হইলেই কোথায় যাইবে জুতা, কোথায় যাইবে বেলাউজ, যে কটা দিন কোল খালি থাকে...

আজ সকালের মধ্যেই কতজনের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে। দিদিশাশুড়ী তো যেন কতদিনের খেলার সাথীটি। নাতি যেমন হাসিখুস ভালবাসে ঠিক তেমনটি হইয়াছে। আর, হাসিটিও চমৎকার, কেমন ঘাড়টি বাঁকাইয়া নেয় সঙ্গে সঙ্গে, কেমন মুক্তার সারির মত দাঁতগুলি! হ্যাঁ, ঐ আবার এক একেলে রোগ—পান খাইবে না! ধরুক গিয়া দাঁতে রাঙা ছোপ,—বউ মানুষ পান খাইবে না এ-আবার কোন-দেশী কথা! ..আজ ফুলশয্যা—এই ব্রতটি ভাঙা চাই—নাতিকে টিপিয়া দিতে হইবে।

একটু কাণাঘুষা চলিয়াছে—ক'নে একটু যেন বেহায়া। অত খোলাখুলি ভাব, ঘোমটায় চোখের অর্দ্ধেকটাও ঢাকে না; কথা পড়িবার আগেই হাসি...

নেত্য-ঠাকুরঝির ঠোঁটে ক্ষুর—অতক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া উঠিবার সময় বলিয়া গেল, "কই গো রাঙাগিন্নী—এতক্ষণ ব'সলাম কনে বউ দেখালে না তো!.."

লোকে বলে, যেন কতকালের পুরণো বৌ ঘরে এলো; বয়েস হয়েচে কিনা ..

দিদিশাশুড়ীর গায়ে লাগে; ভাবে—বলুক গিয়া লোকে। শ্বশুরবাড়ির কি আবার নূতন-পুরাণ আছে নাকি? একি একজন্মের

সম্বন্ধ ? জন্মাবার আগে থেকেই স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেওর, জা—সব ঠিক হইয়া আছে। বাপভাইয়ের বাড়ি, সে তো পরের বাড়ী ; সেখান থেকে আসিয়া নিজের ঘরকরণা বুঝিয়া লওয়া,—অবস্থাগতিকে কেহ দুইদিন আগে আসিল, কেহ দুইদিন পরে। আসিয়াই যে নিজের ধন, নিজের জন চিনিয়া লইল সেই তো সেয়ানা মেয়ে। . মেয়ে মানুষের শাস্ত্রই তো এই।

বাঁশি অব্যাহত প্রবাহে বাজিয়া চলিয়াছে,—সুরের মধ্যে কেমন একটা মালাবদলের ভাব।—সুধু মানুষেরই মালাবদল নয়—অশোক-মীরারই নয়—যেন এযুগ-সেযুগের মধ্যেও মালাবদল, গলাগলি, মেশামেশি আজ ..

আজ ফুলশয্যা না ?—ইহারা যে দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে ! কেমন ননদ জা সব ? মীরাকে দিয়া মালা গাঁথাইবে না ? এদের সব ভাল, ঐটিই কেমন একটা বদ প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলেই বলে, "সেকালে দুধের বাছা কচি মেয়ে সব ঘরে আসতো, অতশত বুঝত না তাদের দিয়ে সব করানো যেত। আজকাল ডাগরটি হ'য়ে সব শ্বশুরবাড়ী পা দিচ্চে—ওসব করতে চায় না .."

কী যে কথা ! না, মেয়েরা সব গলাবন্ধ বুনুক, পায়ের জুতার জন্য কার্পেট বুনুক—গলার মালা গাঁথিয়া কাজ নাই। কোথাকার কে মালিনী, বেদেনী মালা গাঁথিয়া দিবে, সেই মালা গলায় দেওয়া—লগ্নক্ষণে এই করিয়াই আজকাল যত অনাসৃষ্টির ছড়াছড়ি—প্রায়ই পুরুষদের সব নোঙরছেঁড়া ছাড়াছাড়া ভাব...একটা

অলক্ষণ যে! কে মনে কি-ভাব লইয়া মালা গাঁথিয়া দেয়... ঐ জন্যে বিয়ের মালাতেও সেকালে বরকনেকে একটি করিয়া ফুল লাগাইয়া দিতে হইত—দোষ-খণ্ডানো। সেকালে তো আর কাহারও বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না ..

—না, ছিল সেই 'দুধের বাছা কচি' মেয়েদের লজ্জাসরম। তাহারা উঠানের মাঝখানে শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর সব একত্র করিয়া ঢং করিয়া মালা গাঁথায় লাগিয়া যাইত আর কি...

—না বাপু, একালের তোমরা—যতই বুদ্ধিমান ভাব নিজেদের, কোন ব্যাপার তলাইয়া বুঝিবার মত বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তোমাদের ; আর যদি হক্ কথা বলিতে হয় তো তোমাদের একালের ছেলেমেয়েই সব বিয়ে করতে আসে যেন 'দুধের বাছা' সব—এসব দিকের কিছু জ্ঞান নেই—স্কুল কলেজ ঘাঁটিয়াই আক্লান্ত।—এই তো অশুই একটা নমুনা—কে বলিবে ছেলেটার কাল পারাইয়া পরশু বিবাহ হইয়াছে ?

সেকালের ছবি ফুটিয়া উঠে,—ফুলশয্যার মালাগাঁথা—

জামরুলতলার এই ঘরটা তখন অত বড় ছিল না ; ওর জায়গায় দু'টো ছোট ছোট ঘর ছিল, তাহার মধ্যে ওদিকেরটা একটেরের ছিল বলিয়া সেটাতে কাহারও বড় একটা নজর পড়িত না—নিরিবিলি থাকিত।

এখন-কি-আর সব কথা মনে পড়ে ?- দুপুর বেলা, বড়দের মধ্যে বসিয়াছিল -শাশুড়ী পিসশাশুড়ী, আরও কে সব। কে আসিয়া তাহাকে তাঁহাদের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া টানিয়া লইয়া গেল...মলের ঝমর্ ঝমর্ শব্দ -শাশুড়ীর ঘাড় বাঁকাইয়া হাসি

মুখে চাহিয়া থাকা—এখন বুঝা যায় সে গুমরের দৃষ্টি।...তাহাদের মনে পড়ে জামরুলতলার সেই ঘরের মধ্যে ফুলের মেলা—শিউলি, গোলাপ, দোপাটির রাশি; আরও কত সব--কলকের মধু-মধু গন্ধটা নাকে লাগিয়া আছে।..ঘরে ঢুকিতেই টগর ঠাকুরঝির গম্ভীর হইয়া কথা, "ডিম ফুটেই তেড়েকুঁড়ে যে আমার দাদাকে বিয়ে করতে এলি—ফুলের গোড়ে গাঁথতে শিখেচিস্?" ঘাবড়াইয়া গিয়া তাহার কাঁদো-কাঁদো হইয়া উত্তর,—"আমি বে করব বলিনিতো।"... ঘরশুদ্ধ সকলের হাসি—ছাত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দশ বছরের ছোট মেয়ে, ছলছল চোখ—ঘরের মধ্যে দুষ্টামিতে-ভরা কতকগুলি মুখ—সবগুলো হাসিতে এলাইয়া পড়িল—এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে ..

সেই গোড়ে-গাঁথায় প্রথম হাতে খড়ি।

ফুলশয্যার কোন কথাই মেয়েরা সারা-জীবনে ভোলে না; কিন্তু তারই মধ্যে একটা ব্যাপার যেন এই কাল কি পরশুর কথা। সেই একরকম জবরদস্তি করিয়াই মুখ ফিরাইয়া ঘোমটা খুলিয়া প্রশ্ন, "আমার মালা কৈ? পরাতে হবে না?"

কে উত্তর দেয়?—সেই জোর করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকা...

কত খোসামোদ, প্রবঞ্চনা, অভিমান। "বেশ, বোঝা গেল আমায় পছন্দ হয় নি"

উত্তর দিতে বয়ে গেছে।

"আচ্ছা, আর তিনবার বলব, মাত্র তিনটিবার—পরাও মালা—পরাও মালা—পরাও...আচ্ছা, আর দু'বার...দু'বার হয়ে গেল

ব'লে দিচ্চি ..আচ্ছা আর একবার বলব—এই শেষ—না শোন তো বরের অকল্যাণ হবে—বেশ তো "

"কোনটে প'রবে ?" —জীবনে সেই প্রথম কথা।

রেকাবিতে তাহার নিজের হাতের গাঁথা মালা ছিল। আসিবার সময় কাপড়ের মধ্যে চুরি করিয়া ননদের নিপুণ হাতে তৈয়ারী একটা মোটা, গোলাপ-ফুলের-ধুকধুকি-দেওয়া গোড়ে আনিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিল। সেইটের উপর লোভ না হইয়া যায় না।

"আহা-হা, এতই বোকা নাকি আমি—এইটে আর কোনটে"—সেই বোনের গাঁথা মালাটি স্বামী তুলিয়া ধরিল।

তাড়াতাড়ি মালাটা গলায় পরাইয়া দিয়াই পাশবালিসে মুখ গুঁজিয়া সে কি হাসি! ..ফুল-ছড়ানো বিছানায় হতভম্ব বরের চোখের নীচে হাসিতে কম্পমানা কিশোরীটিকে স্পষ্ট যেন দেখা যাইতেছে। হঠাৎ অমন দুষ্টামির বুদ্ধি যে কোথা হইতে জুটিল!

ছেলেবেলায় যখন কেহ বলিত, "মেয়েটা হাঁদা হবে", ঠাকুরমা বলিতেন, "রোসো, মেয়ে মানুষ—কপালে সিঁদুরের বাতি জ্বললেই মাথায় বুদ্ধির ঘর আলো হ'য়ে যাবে।"

তাই ঐ রকমভাবে আলো হইয়াছিল আর কি। এর সাজাও হইয়াছিল।—এর পর আর বাহির-হইতে-আনা মালা গলায় দিতে চাহিত না। দেরাজে ফুল আনিয়া লুকাইয়া রাখিতে হইত; রাত্রে বিছানায় বসিয়া সদ্য সদ্য মালা গাঁথিয়া তুলিয়া দিতে হইত। ইসারা ছিল,—যেদিন ফুল জোগাড় হইত না আগে আগেই জানাইয়া দিতে হইত, জামার পকেট ভরিয়া রাশীকৃত ফুল আসিয়া হাজির হইত।

এক এক সময় মনটা কেমন উদাস হইয়া যায়, হঠাৎ যেন এত নিবিড়ভাবে পাওয়া অতীতটা ঝাপ্‌সা হইয়া যায়; বর্ত্তমানটাও থাকে না, সব লুপ্ত করিয়া আসিয়া পড়ে কেমন একটা অবসাদ। ..একটা জীবনের বসন্ত থেকে শরৎ পর্য্যন্ত সবই শেষ হইয়া গেছে; সামনে মরণের শীতের হাওয়া,—এই কথাটাই যেন হেমন্তের পাণ্ডুর লিপির মধ্যে কোথায় লেখা রহিয়াছে।

বাঁশিতে আবার ফুঁ পড়ে। তরতরে স্রোত, তাহাতে কোন্ শতদলের পাপড়ি যেন ভাসিয়া আসে—শ্বশুরবাড়ীর সেই প্রথম ক-টা দিন,—একবাড়ী লোকের মধ্যে মিলনের সেই হাজার রকম ফন্দি,—একটু চকিত দেখা, একটু হাসি, একটু স্পর্শ—যা লাভ ..

কৈ? আজকালকার বরকনেদের মধ্যে সে রকম যেন আঠাই হয় না, তা একালের ছেলেমেয়েরা যতই না কেন গুমোর করুক্। বিয়ে করিতে হয় করে - ঐ পর্য্যন্ত। বাপ মা বিয়ে দিয়া খালাস, বরকনে মন্ত্র আওড়াইয়া খালাস, ভাজেরা শালী-শালাজ-ননদেরা প্রীতি-উপহার লিখিয়া খালাস।...এখন নূতন কনের নেশায় মাতিয়া থাকিবে, মনটা আন্‌চান্ করিবে,—অশুর কথাবার্ত্তায়, চলাফেরায় তাহার একটুও আঁচ পাওয়া যায় কি? মীরারও ঐ রোগ,- বেশ হাসিখুসি, আমোদ-আহ্লাদ,—শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে যেন এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু মনের কোথাও যে আসল লোকটির ভাবনার রং ধরিয়াছে এমন তো বোধ হয় না; সে হইলে আর পাকা চোখকে এড়ানো যাইত না। যেন—'হচ্চে, হবে, ও ত হাতের পাঁচ' —এই ভাব।...এই জোড়া-গাঁথার সময়—এসময়টা অমন ঢিলেঢালা

ভাবটা ভাল নয় তো। এই জন্যই সেকালে হাতের-তৈরী মালা, হাতের-সাজা পান, এই সব করিয়া প্রথম ঝোঁকেই ভাল করিয়া মিলাইয়া দিত।

না, সে নিজে যখন বাঁচিয়া, প্রথম নাতির বিয়েতে একটা পুরাণ রেওয়াজ নষ্ট হইতে দিতে দিবে না। মীরা উঠুক—ঢের ঘুম হইয়াছে; ননদ জায়েরা ফুল আনিয়া দিক, মীরা মালা গাঁথুক। লজ্জা চলিবে না, গাঁথিতে হইবে। একি ঘুম সব? অনাসৃষ্টি!

ওকালের দরদী দিদিশাশুড়ীর আর বসিয়া থাকা চলিল না।—আহা, একালের আপনভোলা দম্পতি—কতদিক দিয়াই যে এরা বঞ্চিত!..

উঠিতেই একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে গেল,—যেন ওপাশের কোণের ঘরটায় সন্তর্পণে দুয়ার খোলার আওয়াজ হইতেছে। এত লুকাচুরি করিয়া কে দুয়ার খোলে! চাকর দাসী কেউ ঘরে ঢোকে নাই তো? কাজের বাড়ীর ভীড়—গয়নাপত্র, কাপড়চোপড় যেখানে সেখানে ছড়ানো, গোঁজড়ানো রহিয়াছে; নাঃ, এই অলক্ষণে ঘুমে একটা কাণ্ড ঘটাইবে...

ঘরটা একেবারে আড়ালে পড়ে; আবার দু'পা যাইলেই ওদিক দিয়া নীচের দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে, একেবারে খিড়কির পানে। কে মানুষটি দেখিতে হয় তো! আর একটু আড়াল হইয়া বসিতে হইল।

সিঁড়িতেও যেন খস্ খস্ পায়ের শব্দ,—থামিয়া থামিয়া খুব সতর্কে উঠিবার আওয়াজ। সর্ব্বনাশ! এ যে একজোট করিয়া চুরির ব্যবস্থা! ডাকাতিও হইতে পারে।—এইভাবেই তো সেবারে বোসেদের বাড়ী দিনদুপুরে ডাকাতি হইয়া গেল।.. আর ওদিকে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকার ধুম!

বাইরের ঘরে পাশা পড়িয়াছে; কিন্তু কে গিয়া খবর দেয়?—ঝি-টা পর্য্যন্ত কাছে নাই। কিন্তু এরকম করিয়া চুপচাপ করিয়া থাকাও তো চলে না; এদিকে চেঁচাইতে গেলেই সে আসিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিবে। তা হোক, এতগুলা লোকের প্রাণ—গয়নাগাঁটি ..

দুয়ার আরও একটু খুলিল; কব্জার একটা টানা মিহি আওয়াজ হইল। আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—একেবারে তাড়াতাড়ি তিন-চারটে ধাপ।...আর দেরি করা নয়,-বুঝি সব যায়!

সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আধ ভেজানো দুয়ার গলিয়া লঘু পাদক্ষেপে মীরা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, এবং একবার এদিক ওদিক চাহিয়া জামরুলের ঝোঁপে রেলিংএ ভর দিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়ির শব্দটা আবার জাগিয়া উঠিল,—জুতার খস্‌খসানি। মীরা চকিতে চাহিয়া ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিল,—গালের আধখানা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িল।

ভয়ের জায়গায় কৌতূহল আসিয়া মনটা দখল করিয়া বসিয়াছে; কাণ্ডটা কি?—একটা সমস্যা যে!

সমস্যার মূর্ত্তিমান সমাধানের মত নাতির শরীরের ওপরের ভাগটা হঠাৎ বারান্দার শেষে সিঁড়ির ওপর আবির্ভাব হইল।

অবাক করিল! আর ঐ অশোক?—সাত চড়ে কথা কয় না আর সে কিনা খিড়কির বনবাদাড়, এঁটোশকড়ি, ছাইগাদা ঠেলিয়া ...আর এই নিশুতি দুপুরে কখনই বা ওদের মতলব ঠিক হইল, আর এখন এরা করিতেই বা চায় কি? দেখদেখি কাণ্ডখানা!

খানিকটা দূরে যে মূকাভিনয় হইতে লাগিল, তাহাতেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে লাগিল। নাতি সিঁড়ি বহিয়া বারান্দায় আসিল; ঘরের অর্দ্ধ-মুক্ত দুয়ারটি ভেজাইয়া দিয়া শিকল চড়াইয়া দিল, তাহার পর চারিদিক চোরের মত দেখিয়া লইয়া বধূর পাশ ঘেঁসিয়া পিঠের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার রেলিংএর ওপর গলা বাড়াইয়া নীচের দিকটা দেখিয়া লইল।

কি সব কথা হইতেছে, শোনা যায় না; সুধু ঘোমটাটা 'না'-র সঙ্কেতে ডাইনে বামে নড়িয়া উঠিল।

ঠাকুরমা এদের ব্যাপার দেখিয়া কৌটা হইতে মুখে পান-গুল পুরিয়া দিয়া হাসিতেছিল।—ওপরে-ওপরে সব গোবেচারী আর ভেতরে ভেতরে একালের এঁদের এই কীর্ত্তি! সেকালের বড়াই আর রইল কোথায়? তিনটে রাতও হয় নাই-যে চার চোখ এক হইয়াছে—ইহারই মধ্যে এত মতলব—এত লুকাচুরি, গলাগলি!

নাতির বাম হাতটা নাতবৌয়ের কাঁধের উপর উঠিল। ঠাকুর-মা এদিকে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।—ওরে, করিস্ কি?—এখনও ফুলশয্যে হয় নি; ফুলশয্যের আগে যে গায়ে গা ঠেকতে নেই—মনুর আমল থেকে পদ্ধতি চলে আসচে—তোরা কি কিছু মানবি নি?—শাস্ত্রটাস্ত্র সব রসাতলে দিবি? ..

ততক্ষণে বাম হাতটি ঘোমটায় উঠিয়াছে। অল্পপরেই বাহুর বেষ্টনে বধূকে বাঁধিয়া বর মিলনের প্রথম নিদর্শন অধরে অঙ্কিত করিয়া দিল। . প্রথম কি না তাহাই বা কে জানে ?

ঠাকুরমা ওদিকে পান আর গুল দোক্তার রসে মুখ বোঝাই করিয়া একলাই চাপা-হাসি হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছিল। অশোক শিকলটি খুলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে নামিয়া গেলে আঁচলে অত্যধিক-হাসির অশ্রু মুছিয়া বলিল, "বাবাঃ--হার মানলাম ; তোদের যুগের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার,--কটা ঘণ্টার আর তর সইল না ? ."

সাময়িকী ও অসাময়িকী

জাতীয় জীবনে চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে কেবল তুরীয় ভাবে মগ্ন থাকিলেও চলিবে না, আবার পার্থিবতার পায়ে সমস্ত সমর্পণ করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার পানে ছুটিয়া চলিলে এক বিরাট অস্বাভাবিকতাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে।

* * *

জাতীয় জীবনকে সার্থক করিতে হইলে ব্যক্তির জীবনকে সুস্থ সবল এবং নিশ্চিন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

* * *

জাতীয় স্বাস্থ্যোৎকর্ষের এক প্রধান উপায় পল্লীর উন্নতি। পুকুরে পাঁক, বাড়ীর পাশে ডোবা, গাঁয়ের মাঝে জঙ্গল, খালে পাট-পচা, জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত নাই, চলিবার ভাল পথ নাই, নিঃশ্বাস লইবার ভাল বাতাস নাই—এই ত বাংলার পল্লীগ্রাম। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়া মৌরুসি পাট্টা লইয়া বসে, সে কি ম্যালেরিয়ার দোষ ?

* * *

যে রোগ আমাদের দেশ ভোগ দখল করিবার কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, শুধু রোগ বলিলে তাহার অপমান করা

হয়। ম্যালেরিয়া বাংলার বুকের উপর সত্তর বৎসর ধরিয়া দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করিতেছে। বাঙালীও নড়ে না, বাংলার রোগও নড়ে না। উভয়ই রক্ষণশীল; বোধ হয় বাংলার মাটির গুণে।

* * *

অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, স্বস্তির অভাব— অভাবের ত আর শেষ নাই; ইহার উপর যদি অভাব দূর করিবার প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়, তা হইলে যে সে-অভাব মিটাইবার কোন উপায়ই আর মেলে না।

* * *

বাঙালী না নড়াইলে নড়ে না, পথ না দেখাইয়া দিলে চলে না এবং যে-দিকে ঠেলা দেওয়া যায় ঠিক সেই দিকেই চলিতে থাকে; তার একটু এ-পাশেও নয়, ও-পাশেও নয়।

* * *

বাঙালী জাতি জীবন্ত মানুষের সমষ্টি; কিন্তু তার মধ্যে এই জড়ত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত।

* * *

মনে পড়িতেছে, অনেক দিন আগে লিখিয়াছিলাম,—

বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর রেসে জীবন মৃত্যুকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। বাংলায় জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যেন fox-huntingএর খেলা চলিতেছে—মৃত্যু জীবনের টুঁটি চাপিয়া ধরিল বলিয়া।

আজ বুঝি সে টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

* * *

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে। তার বিশগুণ লোক রোগে ভোগে। চার-মাস পাঁচ-মাস ছয়-মাস অবধি রোগে ভুগিয়া যখন এই অমৃতের পুত্রগণ উঠিয়া দাঁড়ায়, তখন দেখে, চালে খড় নাই, পরণে কাপড় নাই, হাতে পয়সা নাই, ঘরে খাবার নাই, মস্তিষ্কে মেধা নাই; পা টলিতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে।

*　　*　　*

বাঙালী জড়ধর্ম্মী, জড় ত নয়। তাই সে নিজের অবস্থা বুঝিয়া হায় হায় করে; কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় বার-বার শিহরিয়া ওঠে, অথচ আগন্তুক কোন বিভীষিকাকে নিবারণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা কখনও করে না।

*　　*　　*

উলা ছিল নদীয়ার এক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। ডাকাত ধরিয়া সে বীরনগর আখ্যা পাইল। কিন্তু ম্যালেরিয়াকে ঠেকাইতে পারিল না। ১৮৫৬ সালের মহামারীতে বীরনগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া গেল। সেদিন যাহা দৈব দুর্ব্বিপাক ছিল, আজও কি তা তাহাই আছে?

*　　*　　*

সেদিন বীরনগর পল্লিমণ্ডলীর বাৎসরিক অধিবেশনে গিয়াছিলাম। প্রথমে উদাসীনভাবে, তাহার পর একান্ত আগ্রহে মণ্ডলী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু মহাশয়ের রিপোর্ট শুনিলাম। বুঝিলাম শুধু কথার ঝঙ্কারে নয়, জাতির মনের নিভৃত কোণেও চৈতন্য জাগিয়াছে বই কি?

*　　*　　*

যেটুকু শুনিলাম তাহাতে বুঝিলাম বাঙালীও কাজ করিতে শিখিয়াছে। আট বৎসর ধরিয়া উলায় ম্যালেরিয়ার তথ্যানুসন্ধান চলিতেছে। সম্প্রতি 'মণ্ডলী' কর্ত্তৃক একটি ম্যালেরিয়া-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে যে-সব নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, শুধু বিচিত্র নয়, তাহা বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

* * *

সাধারণের ধারণা, এনোফিলিস মশক মাত্রই বুঝি ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে। বীরনগরে বারো জাতের (species) এনোফিলিসের সাক্ষাৎ মেলে। কৃষ্ণনগরের সরকারী ম্যালেরিয়া গবেষণাগারের সুযোগ্য অধ্যাপক ডাক্তার পঞ্চানন সুরের নিম্নোক্ত আবিষ্কারটি বীরনগরের পরীক্ষাগারেও সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতে সকল বিশেষজ্ঞই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আবিষ্কারটি এই—

কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ পল্লীগুলিতে এবং বীরনগরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে শুধু ফিলিপিনেনসিস্ শ্রেণীর এনোফিলিসের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রতিমাসে তিনি পাইয়াছেন, অন্যগুলির মধ্যে নয়। দীর্ঘকালব্যাপী সতর্ক গবেষণার পর মণ্ডলী-সম্পাদক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কেবল এই-জাতীয় মশককে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া-দমন সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। গণ্ডীর রেখা সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিলে অন্ধকারে আর হাতড়াইতে হইবে না। চেষ্টাও সুপ্রযুক্ত হইবে।

* * *

আসামের ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার র‍্যামসে বলেন, আসাম অঞ্চলে যে বিশ জাতীয় এনোফিলিস দেখা যায় তাহার মধ্যে একমাত্র এনোফিলিস মিনিমাসই রোগটিকে বিস্তার করে। এ জ্ঞানও বহুদিনের পরীক্ষার ফলে লব্ধ। রস্ ইনষ্টিটিউটের প্রধান অধ্যাপক স্যর ম্যালকল্‌ম ওয়াটসন্ বলেন, বিভিন্ন দেশের ম্যালেরিয়া-সম্পর্কিত কাজ দেখিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, নানাজাতীয় এনোফিলিসের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও এক বা দুই জাতির এনোফিলিসের দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগ প্রসার লাভ করে। কিন্তু সকল প্রদেশে সম-জাতীয় মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয় না। মশকের পক্ষে দেশভেদে ম্যালেরিয়া-বীজাণু বহনের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে।

* * *

বীরনগরে যে বারো জাতির এনোফিলিস আছে, পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাহাদের প্রত্যেকটির স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এনোফিলিস মশারা মানুষের মত শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এনোফিলিসদের মধ্যে ফিলিপিনেনসিন্ মশারা মানুষের রক্ত খাইতে বড় ভালবাসে। গোরক্তে তাহাদের অরুচি। আবার এনোফিলিস একোনাইটাসের কাছে কেবল গোরক্তই উপাদেয়। ইহারা ম্লেচ্ছ। পরমানন্দে গোয়ালেই থাকিতে ভালবাসে। মানুষের আবাসের দিকে বড় একটা ঘেঁসে না। অন্য দিকে এনোফিলিস ফুলিজিনোসাস্, এনোফিলিস প্যালিভাস্, এনোফিলিস র‍্যামসেয়াই, এনোফিলিস সব্-পিকটস্ এবং এনোফিলিস ভেগস—খাদ্য-হিসাবে মানুষের রক্ত ও গোরক্তের কোন বাছ-বিচার করে না, যাহার রক্ত সহজে পায়

তাহাই খায়। ইহারা পূর্ব্বজন্মে সম্ভবতঃ পক্ষধর রাক্ষস ছিল। এনোফিলিস ট্যাসিলেটস্, এনোফিলিস বার্বিরষ্ট্রিস্ এবং হায়েরকেনস্ নিগারিমস্ প্রধানতঃ বৃক্ষলতার রস খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা ঋষিপ্রকৃতি। গোয়ালে বা লোকালয়ে শেষোক্ত ত্রি-জাতীয় মশকের কচিৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

* * *

যাহাদের চেষ্টা আছে, তাহাদের সাহায্যের অভাব হয় না। তথ্যানুসন্ধানে 'পল্লী-মণ্ডলী' বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের দুইটি গবেষণাগার এবং ম্যালেরিয়া সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সাহায্য পাইয়াছেন। প্রখ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ কর্ণেল স্যর এস-আর-ক্রিষ্টোফার্স ইঁহাদের কয়েটি জটিল বিষয়ের সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

* * *

গীতায় আছে—

"পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং ॥

কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মফললাভ, পাঁচটী কারণের উপর নির্ভর করে, যথা—

(১) যে অধিষ্ঠান লইয়া কর্ম্ম

(২) কর্ত্তা অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম করিতেছেন

(৩ করণ অর্থাৎ উপকরণ বা সাধন-দ্রব্য

(৪) শক্তি অর্থাৎ সাধন-দ্রব্য উপযুক্তভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা, এবং

(৫) দৈব, ইংরেজিতে যাহাকে unknown factors বলে। এই কারণগুলির মধ্যে দৈব বা অজ্ঞাত ব্যাপারগুলি একেবারেই আমাদের অধিকারের বাহিরে। পুরুষকার বা বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ক্রমে দৈবকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্মসিদ্ধি সুগম হয়। মণ্ডলী এইরূপ কয়েকটি অজ্ঞাত ব্যাপার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে; ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে তাহা সাহায্য করিবে। এইগুলি বিশদভাবে ম্যালেরিয়া রেকর্ডসে প্রকাশিত হইয়াছে।

* * *

ম্যালেরিয়াবাহী এনোফিলিস ফিলিপিনেনসিসের স্বভাব ও ব্যবহার যতই ভাল রকম জানা যাইবে, ততই তাহাদের জন্ম-নিবারণ ও ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করা সহজ হইবে। ইহাদিগকে লোকের বাড়ীতে সন্ধ্যার পরই বেশী দেখা যায়। কিন্তু এরা কত দিন বাঁচে, ডিম পাড়িবার স্থান হইতে কতদূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়, কেনই-বা কতকগুলি জলাশয়ে ডিম পাড়ে এবং অপরগুলি পাড়ে না, এ-সব বিষয়ের তদন্ত দরকার।

* * *

বীরনগরে যে-সকল জলাশয়ে টোকাপানা, ইন্দুরভানি, ঝুমকো শেওলা, পাটা শেওলা, ভাঁটা শেওলা, পাতাড়ি, লজ্জাবতীলতা, লম্বা ঘাস, পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্ আছে সেইগুলিতে ফিলিপিনিনসিস-লারভি সকল ঋতুতেই পাওয়া যায়। অনেকের

ধারণা বিভিন্ন জাতীয় মশকের ডিম পাড়িবার বুঝি বিভিন্ন জলাশয় নির্দ্দিষ্ট নাই, সকলেই যেখানে সেখানে পাড়ে। বীরনগরে এনোফিলিস ফিলিপিনেনসিসকে নির্দ্দিষ্ট জলাশয় ছাড়িয়া অন্য কোন নূতন স্থানে ডিম পাড়িতে দেখা যায় নাই।

* * *

সম্প্রতি কাগজে পড়িলাম বহরমপুরের একজন ডাক্তার এক নূতন মত প্রচার করিয়েছেন। তাঁহার মতে একমাত্র টোকাপানাই ম্যালেরিয়াবাহী এনোফিলিসের সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়তা করে এবং তাহাতেই ম্যালেরিয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এই জলজ উদ্ভিদ গ্রামের যাবতীয় জলাশয় হইতে উঠাইয়া ফেলিলেই ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে। বীরনগর যে সকল তথ্য বাহির করিয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যাইবে এরূপ উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ।

* * *

পল্লীগ্রামের জলাশয়গুলি সংস্কার-অভাবে মজিয়া গিয়াছে। যেটুকু জল আছে তাহা জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। ডোবাগুলির ত কথাই নাই। এমন-কি খাল-বিলও পরিষ্কৃত অবস্থায় নাই। গ্রামের দুই চারিটি জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়ত সম্ভব। সকলগুলির সংস্কার পল্লীবাসীর ক্ষমতাতীত। জলজ উদ্ভিদ একবার পরিষ্কার করিলে আবার জন্মায়। বর্ষাকালে পদ্ম শেওলা প্রভৃতি এত শীঘ্র বাড়ে, যে বার-বার কাটাইয়াও পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা যায় না। সুতরাং জলজ উদ্ভিদ মারিয়া ম্যালেরিয়া তাড়ানো দুরাশা মাত্র।

* * *

বাংলাদেশের দু'একজন ডাক্তার বলেন, আর— সাধারণের মধ্যে ত অনেকেরই ধারণা যে পোনার ছানা, তেচোকো, ট্যাংরা, খলসে কই প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দিলে, তারা মশার সব লারভি খাইয়া ফেলে। সুতরাং ম্যালেরিয়া তাড়াইবার সহজ উপায় ত পড়িয়া রহিয়াছে। এক বোতল জলে একটি ছোট মাছ ছাড়িয়া তাহাতে মশার লারভি দিয়া দিলে, মাছটি সেই লারভি নিমেষে খাইয়া ফেলে। কলিকাতার স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীতে ইহা বহুবার দেখানো হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া, পুষ্করিণীতে মৎস্য-পালন যে ম্যালেরিয়া বিনাশের সহায়তা করে, এই ধারণা অনেকের বদ্ধমূল হইয়াছে। আবদ্ধ স্থানে অন্য খাদ্যের অভাবে বোতলবিহারী মাছটি লারভি খাইবার যেরূপ উৎসাহ দেখায়, দুঃখের বিষয় জলাশয়ে তাহার সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ পায় না। বীরনগরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, পোনার ছানা এবং অন্যান্য ছোট মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পুকুরে ছাড়িয়া দিলেও মশার লারভির সংখ্যা কমে না। তাহাতে প্রমাণ হয়, মাছেরা মশার লারভি অপেক্ষা পাঁক ও জলজউদ্ভিদ খাইতেই ভাল বাসে।

*

এইজন্যই বৈজ্ঞানিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ অপরিহার্য্য। আহারের জন্য পুষ্করিণীতে যথেষ্ট মৎস্য রাখা প্রয়োজন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই মাছগুলি ম্যালেরিয়া দূর করিতে সহায়তা করিবে মনে করিলে ভ্রমে পড়িতে হইবে।

* * *

ম্যালেরিয়া-বিশারদগণ মশার পরিবর্ত্তে মশার লারভি মারিতে বলেন। ম্যালেরিয়াবাহী মশার স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট

জ্ঞান লাভ না করিয়া, সাধারণভাবে মশা মারিতে গেলে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া হইবে। তাহাতে নিরীহ শ্রেণীর মশা মরিবে বহু, কিন্তু ফলে হয়ত কিছুই পাওয়া যাইবে না। বিনা পরীক্ষায় মশার লারভি মারিতে গেলেও অনর্থক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। যে-গ্রাম বা যে-এলাকা হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইবে, তাহার ভিতরের এবং বাহিরে আধ মাইল পর্য্যন্ত চারিপাশের ভূখণ্ডের সমস্ত জলাশয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ইহাকে ইংরেজিতে larval survey বলে। বীরনগরে এখন গ্রামের বাহিরের লারভি পরীক্ষা চলিতেছে। এ-যাবৎ মশার জন্ম নিবারণ কার্য্য গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাহাতে আংশিক ফল পাওয়া গিয়াছে। বাহিরের সার্ভে সমাপ্ত হইলেই সেখানে মশক-জন্ম নিরোধের কাজ আরম্ভ হইবে। তখন মশক-দমনপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

* * *

লারভি মারিবার জন্য বীরনগরে নানাপ্রকার লারভি-নাশক পদার্থ পরীক্ষিত হইয়াছে। তার মধ্যে এখন সেখানে 'পেষ্টেরিণ' নামক মিশ্রিত তৈল এবং প্যারিসগ্রীণ নামক পাউডার ব্যবহৃত হয়। প্রথমটা স্প্রেয়ার-সাহায্যে ও দ্বিতীয়টি ব্লোয়ার-দ্বারা নিক্ষেপ করিতে হয়। যে-সকল পুষ্করিণী জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ তাহাতে তৈল ভাল খেলে না। সেথায় তাই অনেক লারভি বাঁচিয়া যায়। সেজন্য পরিষ্কৃত জলে তৈল দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্যারিসগ্রীণ জলজউদ্ভিদ থাকিলেও কার্য্য করে। তৈলের চেয়ে ইহা সস্তা এবং প্রয়োগের সুবিধা আছে বলিয়া বীরনগরে ইহাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে

মানুষ, গরু, হাঁস বা মাছের কোন অপকার হয় না। বিস্তৃত বিলে, সুদীর্ঘ খালে এবং বড় বড় দীঘিতে নৌকাযোগে প্যারিসগ্রীণ অতি সত্বর দেওয়া চলে। নৌকার উপর ব্লোয়ার-যন্ত্র বসাইয়া চালনা করিলে গাঢ় ধূমের ন্যায় ধূলিমিশ্রিত প্যারিসগ্রীণ নির্গত হইয়া বাতাসে বহুদূর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়। সেই ধূলিকণা জলের বুকে সমানভাবে পড়িয়া মশার লারভি ধ্বংশ করে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু অট্টালিকা জনশূন্য হওয়ায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই-সব পুরাতন ইটের মিহি গুঁড়া প্যারিসগ্রীণের সহিত মিশ্রিত হইয়া ম্যালেরিয়া নাশের সহায়তা করিতেছে।

* * *

এই বিবরণ একটু বিস্তারিতভাবে লিখিলাম, যদি-বা সুদূর পল্লীবাসী কোন উৎসাহীর প্রেরণা জাগে, কোন সাহসীর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে কাজ করিবার প্রবৃত্তি আসে। পল্লীমণ্ডলীকে সে আদর্শ করিতে পারে। নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। পুরাতনের উপর আলো ফেলিতে পারে। পল্লীকে সুন্দর এবং সুস্থ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

* * *

শ্রাবণের ধারাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সহস্রশীর্ষ রাক্ষসের মত ম্যালেরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা ভোগে তাহারাই জানে। কে-ই বা চাহে এই চিরন্তন দুর্ভাগাদের পানে! সাধারণে উদাসীন। সরকারের দরকার অন্যদিকে। দুইচারিটি গ্রামে দুই চারিজনের আকস্মিক উৎসাহে ম্যালেরিয়া-দমন সমিতি গজাইয়া ওঠে। তার দু'একটি মুমূর্ষু অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে। যে পথে সকলে যায়, বাকিগুলি সেই দক্ষিণের মার্গ অবলম্বন করে। যেগুলি

বাঁচে সেগুলি কি করিতে হইবে জানে না। তাই পুকুরে তেচোকো মাছ ছাড়ে, আর বাড়ীতে মশা মারে। নিরীহ মশা। মানুষের রক্তের স্বাদ কি হয়ত জানে না কর্ণে শুধু বিচিত্র কলরব করে। অর্থাভাবে কতকগুলি মরিয়া যায়, মশা নয়—মশক-নিবারণী সভা। আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরিচালনার অভাবে, হাঁকিয়া হাঁপাইয়া কত-কি করিতেছি মনে করিয়া খুসীতে ভরিয়া উঠে, প্রকৃত কাজ পড়িয়া থাকে।

* * *

কাজীর বিচার শেষ হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানী ভাগ বাটোয়ারা সম্বন্ধে লোসিমাউথের ডোনাল্ডপুত্র রায় দিয়াছে। সে রায় ন্যাশনাল-নামে আখ্যাত - রক্ষণশীল শাসনতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্তই হইয়াছে। বার্ণাড শ-র বাণী সফল হোক। লোসিমাউথের ভাইকাউন্ট দীর্ঘজীবি হোন।

৭ম বর্ষ] ১১ই ভাদ্র ১৩৩৯ [১১শ সংখ্যা

খুঁটী-দেবতা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায় সে ধরণের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময় তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্ব্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটার দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটী-দেবতার অপূর্ব্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্ব্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চড়াটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বস্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চড়ার দখল লইয়া পুরাণো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মোকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চড়াটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা দখলে আসিলেও চড়াটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্ত্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্ত্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়ীতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও

ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্ত্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘর চক্রবর্ত্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ার করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর-সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলুখড়ের টুপি, ফুল, ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারে কেহই নাই, না স্ত্রী না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সা কড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুণিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্ত্তী হাতে বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ী আসিয় তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ী হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধূলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছইএর মধ্যে কে? ..

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও ! তা কোথায় যাবে ? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি ?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়ীঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়ীতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই ..

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, গ্যাখো কাণ্ড !

যাহা হউক আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে টাছে তো ? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা…

নন্দ এ-কথায় কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই ?

—ও কোথায় পাবে ! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে ; ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি এক কোণে প'ড়ে গাঁয়ের—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুরে যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্ব্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে, কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল, লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুণি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইস্‌ম্যানি করচে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড-মিস্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটী আসিল। সে রাত্রেই ষ্টেশনে নামিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষ রাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ী ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পূবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্চে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?...

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল।

মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ-বয়সে তৃতীয়-পক্ষে বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ীর উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্ত্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল —দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক্।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল খুব ভোরে উঠিয়া দেখিল, স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ ঘরের পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরণের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো

না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে! তুমি উত্তর দিকটা থেকে ছাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া ঘরের দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকূয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানা রকমে বুঝাইল। কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি সুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্ম্মনিপুণা সেবা-পরায়ণা কর্ম্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্ত্তী তখন ঘরে ছিলেন না; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুণি রঙের কাগজ, স্যাকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়। এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, স্যাকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনার বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণ-ছেঁড়া বেগুণি রঙের পাতলা কাগজখানি!..

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু

ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জ্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোষের একটা বাঁশের খুঁটীকে সম্বোধন করিয়া সে করজোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটী, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করচি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে, তোমাকেই বলচি...

বাঁশের খুঁটীটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জ্জনে খুঁটীটার কাছে এ নিবেদন সে করিত কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর, চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চড়াটা। সারাবছরই চড়ায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক চরিয়া বেড়ায়। চড়ার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁসিয়া থাকে। কণ্টিকারীর বনে চড়ার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুণি রঙের ফুল ফুটিয়া নির্জ্জন বালির চড়া আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই, ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্ত্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া

এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে।

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিমদিক কত-কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ, চড়া, রেলওয়ে-বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্ত্তী বা তাঁহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লী-প্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—যেখানে আজ সর্ব্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটী দেবতার আবাহন করিল।..

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধ হয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুসী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্ম্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়,

ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চড়া ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটীর রঙের জলে ভর্ত্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরীও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্ত্তীও ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি স্থরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ী রেখে তুমি কল্‌কাতার দিকে গিয়ে কাজকর্ম্মের ভালো ক'রে চেষ্টা করো, নইলে আমি কি ক'রে চালাই বলো। এই তো দেখচো অবস্থা ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরী, না আছে কোনো সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাওয়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাতঃ তুলিল। দুইমাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রী একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল। মিস্ত্রী গাড়ীতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক্ আগাগোড়া পুরাণো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্ত্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেক জনমজুর ধরিয়া বাড়ীর উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। সখ করিয়া একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন-কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্ত্তী বাড়ীর চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া শেষ-রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল-সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা ...এগারোটা ...বারোটা...রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না

কেন ? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই ! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা ! রাঘবের কেমন ভয় হইল তবে বোধ হয় আজও ঘুম হইবে না ! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া ? উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম...ঘুম যদি না আসে ! তাহা হইলে ? রাত্রি ফরসা হইয়া কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্ত্তী বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন !

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে কি রাতে রাঘবের চোখে এতটুকু ঘুম আসিল না—পলকের নিমিত্তও নয়। রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম...

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কার্য্য শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল। রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা হয়েচে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোট করে ভাববে--আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে দ্যাখো দিকি? আর সকাল-সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরাণো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়? ..পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা...

একঘণ্টা . এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন...বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্‌ করিতেছে কেন ?...না, এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা। ..রাত একটা, গ্রাম নিশুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই - কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা ?...না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই ?.. যাহা-হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।...যাক্‌ এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা !...

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁট্‌কী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে· ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা - তিনটা--একখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন--তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের তাহারা চলিয়া যাক্‌। এখনও জন তিনেক বাকী। ..রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।...এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন।... আর একজন মাত্র ! ..মিনিট পনেরো দেরী—তাহাই হইলেই ঘুমাইবেন !

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট? . এ সব কি আবোল-তাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয় ..

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?...ওটা কিসের শব্দ? বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশী বাজিতেছে নাকি?...সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এতটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটীটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল · মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস্। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস্, লজ্জা করে না?...

বীজপুরের কারখানার বাঁশীর শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে। রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোমা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটী-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুণ...

কিন্তু ঠিক এই একই স্বপ্ন রাঘব পর পর তুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশী বাজিবার পূর্ব্বে। ঘুমই নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে? ..

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারায় মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোম্‌টা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্ত্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে ব'লে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা— তোমার কাছে বললে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে ..

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্ত্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ী করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন, এই যে দেখচো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটী, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা...

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটী! ..

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়ের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটী-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ-আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই। ..

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্‌সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিত, ইদানীং কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া আরো পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটী-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সাররাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রার মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটীটা আর খুঁটী নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্ত্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্ত্তি!...

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তাহার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্ত্তী যে বিরাটকায় পুরুষ দেখিয়াছিলেন, সে-ও তাঁহার অনিদ্রাপ্রসূত অনুতাপবিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটীর মধ্যের দেবতা সেই সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটী-দেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

আমি এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে কিছু কিছু পারসীর আলোচনা করি। তিনি যে-পারসী জানেন তা ভারতে প্রচলিত বিকৃত পারসী নয়, এ ভাষা যাদের মাতৃভাষা, ভারতবর্ষের বাইরে তাদের কাছ থেকে তাঁর পারসীর বিদ্যা অর্জ্জিত ও মার্জ্জিত, কিন্তু তিনিও সূর্য্য অর্থে তাম্বু শব্দের প্রয়োগ জানেন না।

* * *

ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে তিনি সেই 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা'র অকুণ্ঠ আলোচনাটি শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া—

'হিন্দু বাঙালীর সূর্য্যই সূর্য্য আর মুসলমান বাঙালীর সূর্য্য তাম্বু, এমনতর বিদ্রূপেও যদি মনে সঙ্কোচ না জন্মে, এতকাল একত্রবাসের পরেও প্রতিবেশীর আড়াআড়ি—ধরাতলে মাথা ভাঙাভাঙি ছাড়িয়ে যদি অবশেষে চন্দ্রসূর্য্যের ভাষাগত অধিকার নিয়ে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তবে আমাদের ন্যাশানাল-ভাগ্যকে কি কৌতুকপ্রিয় বলব, না বলব পাড়া-কুঁদুলে। পৃথিবীতে আমাদের ভাগ্যগ্রহের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসচেন; আমরাও হাসতে চেষ্টা করি কিন্তু হাসি বুকের কাছে এসে বেধে যায়। পৃথিবীতে কম্যুনাল বিরোধ অনেক দেশে অনেক রকম চেহারা ধরেছে, কিন্তু বাংলা দেশে সেটা এই যে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরল তাতে আর মান থাকে না।'

* * *

প্রভাতের স্বাস্থ্য-সুন্দর বায়ুপ্রবাহের সঞ্চালন হইতে বহু নিম্নে, দৃপ্ত মধ্যাহ্নের দীপ্তি এবং সন্ধ্যার সঙ্গহীন একাকী তারার আলো হইতে বহুদূরে, এক গভীর উপত্যকার ম্লানিমা-নিবিড় ব্যথিতচ্ছায়ায় স্থানুর মত স্তব্ধনিশ্চলভাবে শুভ্রকেশ স্যাটার্ন বসিয়াছিলেন।

Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn,
Far from the fiery noon, and eve's one star,
Sat gray-hair'd Saturn, quiet as a stone.

* * *

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'কীট্সের হাইপীরিয়ন নামক কবিতাটির বিষয়টি গ্রীসীয় পৌরাণিক, তথাপি মুসলমান ছাত্রের পক্ষে সেটা যদি বর্জ্জনীয় না হয়, তবে তাতে পারসী মিশেল করলে তার কি-রকম শ্রীবৃদ্ধি হয় দেখা যাক।'—

Deep in the *Saya-i-ghamagin* of a vale,
Far sunken from the *nafas-i-hayat afza-i*-morn,
Far from the *atshin* noon and eve's one star,
Sat *ba moo-i-safid* Saturn *Khamush* as a *Sang*.

* * *

'জানি কোনো মৌলবী ছাহাব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইংরেজী সাহিত্যিক ভাষার এ-রকম মুসলমানীকরণের চেষ্টা করবেন না। করলেও ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা, এদেশের বিদ্যালয়ে তাদের ভাষার এ-রকম ব্যঙ্গীকরণে উচ্চাসন থেকে তাঁদের মুখ ভ্রূকুটি-

কুটিল হবে।......জানি বাংলাদেশের গোঁড়া মক্তবেও ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে এ-রকম অপঘাত ঘটবে না ; ইংরেজের অসন্তুষ্টিই তার একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষক জানেন পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজীকে বিকৃতি করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে ছাত্রদের শিক্ষায় গলদ্ ঘটবে, তারা ঐ ভাষা সম্যকরূপে ব্যবহার করতে পারবে না। এমন অবস্থায় কীট্সের হাইপীরিয়নকে বরঞ্চ ফার্সিতে তর্জ্জমা করিয়ে পড়ানো ভাল, তবু তার ইংরেজীটিকে নিজের সমাজের খাতিরেও দো-আঁশলা করাটা কোনো কারণেই ভাল নয়। সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের খাতিরেই বাংলাটাকে খাঁটি বাংলারূপে বজায় রেখেই তাদের শেখানো দরকার।'

* * *

উদ্ধৃতাংশ একটু বেশী হইয়া গেলেও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' হইতে প্রবাসী-সম্পাদকের নিম্নলিখিত উপভোগ্য মন্তব্যটি উঠাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

'ইংরেজী নেপটিজ্ম্ শব্দটির চলিত অর্থ আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি পক্ষপাত বা অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন। লাটিন ভাষায় নেপোস্ শব্দের অর্থ ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া এবং নেপটিজ্ম্ তাহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথাটির ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্চ্যান্সেলার স্যর হাসান সুরবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীকে খয়রা অধ্যাপক বোর্ড 'রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক' নিযুক্ত করিতে সুপারিশ করায় নেপটিজ্মের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, এই পদে কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত তদ্বিষয়ে

পরামর্শ দিবার জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—যথা ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিস্‌টার পার্সী ব্রাউন। তদ্ভিন্ন, ইঁহারা উক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচনের কমিটির সভ্যও ছিলেন। স্যর হাসান সুরবর্দ্দী স্বয়ং ঐ নির্ব্বাচন-কমিটির সভ্য ও সভাপতি এবং মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীর পিতাও ঐ কমিটির সভ্য। ....

রবীন্দ্রনাথ অন্যতম বিশেষজ্ঞ পরারর্শদাতা এবং নির্ব্বাচন কমিটির সভ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি আগে হইতেই মিঃ সাহেদ সুরবর্দ্দীর নিয়োগের জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। বিচারকের পক্ষে আগে হইতেই অন্য-সব প্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতা জানিবার পূর্ব্বেই এই প্রকারে একজন প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই।'

* * *

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জিজ্ঞাসা এবং তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া, এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি যে তার করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে শান্তি নিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন—

ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের সুদৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ মনোভাব এবং আমাদের আশাহীন অবস্থার কথা জানিয়া কোনরূপ অভিযোগ করিতেও আমি ঘৃণাবোধ করি (I hate even to complain)। পরিণামে কি হইবে তাহা না ভাবিয়া যে-শক্তি আমার দেশবাসীর বৈষম্যকেই চিরস্থায়ী করিতে চায়, সে-শক্তির নিকট ন্যায্য-ব্যবহারের আশা আমরা করিতেই

পারি না। বৈষম্যের পরিণাম তাহার পক্ষেও কল্যাণপ্রদ হওয়া সম্ভব নয়।

কোন যুক্তিতর্কই যখন সার্থক হইবার সম্ভাবনা নাই; তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ প্রবল প্রতিবাদে আপনার আস্থা আছে। আমার সে বিশ্বাস নাই। নূতনতর ব্যবস্থা অবলম্বনের যেটুকু স্বাধীনতা আমাদের আছে, তদনুসারে বর্ত্তমান অবস্থার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে একত্রে দাঁড়াইয়া এই বিশেষ সুবিধা এবং অন্যান্য বিভেদ নীতি যাহাতে অস্বীকার করিতে পারে, সে উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের উপায়জ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের কাজ। এই ভেদনীতি আমাদের সাধারণ মানবতার ভিত্তিমূলকে বিদীর্ণ করিবে।

—ফ্রী-প্রেস

* * *

ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রীর পদে যাহারা তাঁহাকে বসাইয়াছিল, সুখে দুঃখে সেই তাঁহার চিরদিনের আপনার জন শ্রমিক দলকেও, নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অন্তরায় দেখিয়া. নিঃশেষিত-রস শুষ্ক আঁটির মত যিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তিনিই যে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? ভুলিলে চলিবে কেন, তাহারা ছিল তবুও আপন, অন্য লোক ত পর?

* * *

ইংরেজিতে মুদ্রার মূর্ত্তির দিকটিকে head, আর উল্টা দিকটিকে tail বলে। বাজী রাখিয়া খেলায় কেউ বলে, 'এই দিকটা আমার',

কেউ বলে, 'ওই দিকটা আমার।' ঊর্দ্ধনিক্ষিপ্ত মুদ্রা মাটিতে পড়িলে যাহার কথা মিলিয়া যায়, তাহার জিত। একটা চিরাগত রসিকতা প্রচলিত আছে, 'মাথার দিকে আমার জিত, উল্টা দিকে তোমার হার'—অর্থাৎ যে-ভাবেই পড়ুক-না-কেন হারিতে হইবে তোমাকেই 'Heads I win, tails you lose।'

* * *

বালক পুকুরে ঢিল ছোঁড়ে, ব্যাঙ মরে। কথামালার সুবিখ্যাত ছেলেটি ঢিল ছুঁড়িয়াছিল ব্যাঙকে আঘাত করিবার জন্য নয়, খেলিবার জন্য; তবুও ব্যাঙ মরিল। জীবনের জলাশয়ে কত সুবিখ্যাত বালকই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে শুধু ছিনিমিনি খেলিবার আমোদে, অসংখ্য দর্দ্দুরকুল তবুও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধ ব্যাঙ উঠিয়া আসিয়া জোড়-হাতে বলে, ক্ষমা দাও, তোমার ক্রীড়া আমার পক্ষে মৃত্যু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * *

সেন্সাস জিনিষটা অনেকটা ম্যাজিসিয়ানের মায়াদণ্ডের মত, অনেকটা আত্মারাম সরকারের অস্থিখণ্ডের মত। যষ্টির স্পর্শে চুবড়ির ভিতর চাপা আস্ত মানুষ অদৃশ্য হইয়া যায়। লোকের চোখে ভেল্কি লাগে, হাততালি পড়ে, যাদুকর টিপি টিপি হাসে। মুগ্ধ লোকগুলি ত জানে না, আছে সব, ওড়ে নাই কিছু, এখানকার মানুষ শুধু ওখানে গিয়াছে।

* * *

'রবিবাসরে'র সদস্যবৃন্দ লিখিতেছেন—

বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিকদের অন্যতম রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর তাঁহার জীবনের দীর্ঘ যাত্রা-পথে সম্প্রতি ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সর্ব্বজন-প্রিয় সাহিত্যরথীকে তাঁহার অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী সাহিত্য-সাধনার জন্য অভিনন্দিত করা বাংলার সমস্ত সাহিত্য-সেবীরই কর্ত্তব্য। তাই বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে 'রবিবাসরে'র সদস্য-বৃন্দ আগামী ১২ই ভাদ্র, রবিবার তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। বাংলার সাহিত্য-সেবীদের দ্বারা পরিকল্পিত, বাংলার একজন শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকের এই সম্বর্দ্ধনা-বাসরে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

স্থান—রামমোহন লাইব্রেরী হল—২৬৭, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা ১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) রবিবার

* * *

মুসলমানী বাংলায় 'স' স্থানে 'ছ' আদেশ হয়। অতএব ছাহেদ, ছাহিদ ও ছুরবর্দ্দির স্থলে সাহেদ, সাহিদ ও সুরবর্দ্দি কেন লেখা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। মাসিক ও সাময়িক পত্রগুলির পক্ষে অবহিত হওয়া উচিত।

* * *

অটোয়া-কনফারেন্স এক বিরাট অট্টহাস্যে পর্য্যবসিত হইল। ক্যানাডা হাসিল, অষ্ট্রেলিয়া হাসিল, গ্রেট-ব্রিটেন হাসিল। নাচিল শুধু স্যর অতুলের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-দল। অতুলনীয় নাচ! Ye have not danced, তোমরা নাচিলে না—বলিয়া দুঃখ করিতে হইবে না। তারা বাঁশী বাজাইয়াছে, বাঁশীর সুরে সুরে এরা নাচিয়াছে—They have piped unto you, and ye have danced.

* * *

'ভরা বাদরে মাহ বাদরে' শূন্য মন্দিরে শুইয়া বসিয়া রাধার বড় কষ্ট হয়। পথে কাদা, বাহির হইতে পায় না। বৃন্দাবনের পথ—মেঠো পথ। যমুনায় জল আনিতে যাওয়া—তাও হয় না। ঝড় হোক, জল হোক, আমাদের পথে বাহির হইতে হয়। কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিতে হয়। গাড়ী চাপা পড়িবার ভয়ে ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে হয়। পাথর-চাপা কপালে পাথর-বাঁধানো পেভমেণ্ট নিদারুণ হইয়া ওঠে। হয়ত ইলেকট্রিক-কর্পোরেশন ফুটপাথের নীচে লাইন বসাইয়া গেছে। উপরে-উপরে শিথিল পাষাণখণ্ড সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রহিয়াছে। দশ বছর আগে বাঁধানো ফুটপাথের পাথর হয়ত পাঁচ বছর আগে আল্‌গা হইয়া গেছে। আল্‌গা পাথরের তলায় তলায় ছল-ছল জল নিভৃত গোপনে জমিয়া আছে; একবার পা পড়িলে হয়, ছলাৎ করিয়া পরিপাটী কাপড়-জামা ব্যথিত হৃদয়ের উপচিত সলিলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে। পথিক বেচারা ত জানে না, কলিকাতা কর্পোরেশন নগরীর পথে-ঘাটে কি-চমৎকার চোরাবালির কল

বানাইয়া রাখিয়াছে, আমরাও জানি না। রাধার ছিল নীল নিচোল। নগরীর কাদাগোলা জলে তাহাকে কাবু করিতে পারিত না। আমরা পরি সাদা কাপড়-জামা। তা-ই। নইলে চিৎপুর যে চৌরঙ্গী হইয়া উঠিবে না, তা আমরাও জানি, কাউনসিলররাও জানে, রোড-ইনস্পেক্টাররাও জানে, চীফ-অফিসারও জানে।

*　　*　　*

আগামী সংখ্যায় কি গল্প বাহির হইবে তাহার ঘোষণায় গতবারে অনবধানতা বশতঃ ভুল থাকিয়া গিয়াছিল। 'মিসেস গুপ্ত' পরে প্রকাশিত হইবে। এ সংখ্যার কথক 'পথের পাঁচালী'র খ্যাতনামা লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ম বর্ষ] ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯ [১২শ সংখ্যা

সন্ধির দূত

শ্রীরমলা দেবী

"পিসীমা—"

"কি বাবা ?"

"যদুবাবুর নাতিটি গাড়ী চাপা পড়েছে, গৌরীকে বোলো না যেন।"

পিসীমা রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছিলেন। বঁটিটা কাৎ করিয়া সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "কেন বাবা, এ আর এমন একটা কি ব্যাপার যে বৌমাকে বলতে নেই ?"

"জানতো পিসীমা তার মনটা কি রকম নরম। কিছু একটা ঘটলেই ভয়ে অস্থির হয়।"

"ভ্যালা বাপু তোদের ভয়। সবতাতেই তোদের বাড়াবাড়ি। পাছে পিঁপড়ে ধরে বলে কি বউকে শিকেয় তুলে রাখবি? বুড়ো মানুষের কথা শোন্, এতো আস্কারা দিস্‌নে, মাথায় চড়ে বসবে।"

"বুঝি—পিসীমা, কিন্তু কি করব বল? শুনলেই ও মুষড়ে পড়বে। বরাবর এতোটা তো ছিল না। এ ক'মাসই যেন ভয়টা বেড়ে গ্যাচে।"

"তবেই হয়েচে! বলি, সংসারে থাকতে গেলে কি দুঃখকষ্ট পাবে না? না, চোখে দেখবে না? রাংতা মুড়েই রাখবি নাকি? আমি থাকলে এখানে ওকে পোক্ত করে দিতুম। এ তোর কর্ম্ম নয়।"

"জানতো ওর এখনকার অবস্থা; নেই বা কিছু বললে পিসীমা। চুপ কর, এদিকেই আসচে।"

বাঁধানো উঠান পার হইয়া একহাতে জলখাবারের রেকাবী, আর একহাতে বসিবার আসনখানি লইয়া গৌরী অগ্রসর হইয়া আসিল। খুব ফর্সা না হইলেও সব মিলিয়া তাহার মুখখানি বেশ সুশ্রী ও গড়নটিও সুন্দর। এক কথায় তাহাকে সুন্দরীই বলা যায়। সব চেয়ে মনোরম তাহার বড় বড় দুইটি হরিণের মত আয়ত চক্ষুর ত্রস্ত শঙ্কিত চাহনি। মাথায় দীর্ঘ ঘোমটার বালাই নাই। সিন্দুরের রেখা অবধি শুধু সাড়ীর আঁচল টানা। পিস্‌শাশুড়ীর সামনে স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তাও সহজ সরল। গৌরীর বেশ বড় হইয়াই বিবাহ হইয়াছিল। বাপের বাড়ীতে শিক্ষাদীক্ষাও তখনকার দিনের তুলনায় আধুনিক ভাবে পাইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীতেও লজ্জা করিয়া চলিবার মত কোন অভিভাবক ছিল না। পিসীমাও কাশীবাস ছাড়িয়া কদাচিৎ আসিতেন।

মরণ আসিয়া যখন তাহার ধ্বংসের বিজয়ভেরী ঘোষণা করিয়া গেল, তখন অলোকের ভাঙ্গা সংসারে রহিলেন শুধু বড় ভাই আর

এই পিসীমা। তাহার পর অলোকের বিবাহের আমোদ-আহ্লাদ মিটিতে না মিটিতে অন্যান্য দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন যেমন পাততাড়ি গুটাইলেন, তাহার দাদাও তেমনি সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান সুদূর পশ্চিমের পথে প্রস্থান করিলেন। পিসীমা বৌকে বড়সড় ও সর্ব্ব বিষয়ে সংসারচালনে সমর্থা দেখিয়া ভাবিলেন, সংসারের মায়া কাটাইবার এই এক সুযোগ। তিনি বহুকষ্টে অলোককে রাজি করাইয়া শেষ দিন-কয়টি বিশ্বেশ্বরের চরণতলে কাটাইয়া দিতে মনঃস্থ করিলেন। তারপর সুদীর্ঘ চারি বৎসরের পরে অলোকের বিশেষ অনুরোধে কিছুদিনের জন্য তাহার এই আগমন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ কখন দুই একদিনের জন্য মাত্র আসিয়াছেন। বধূর সহিত বলিতে গেলে এই তাঁহার প্রথম ঘর করা।

গৌরী আসিয়া আসনখানি মাটির উপর পাতিয়া জল খাবারের থালা তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তাহার পর ফিরিয়া গিয়া কাঁচের গেলাস-ভরা বরফ-দেওয়া সরবৎ আনিয়া হাজির করিল। স্বামীর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি চেহারাই হয়েচে! আপিস থেকে এসে বুঝি মুখহাত ধোওনি? কোথা গিয়েছিলে?"

অলোক স্ত্রীর নিকট পারৎপক্ষে মিথ্যা কথা বলিতে ভালবাসিত না। সংক্ষেপে তাই বলিল, "যদুবাবুর বাড়ী একটা দরকারে গিয়েছিলাম। মুখহাত ধুয়ে এখুনি আসচি। তোমার সরবৎ গরম হয়ে যাবে না"—বলিয়া সে স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পিসীমার মুখ তখনও অপ্রসন্ন ছিল। তিনি হটাৎ গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হাঁ বৌ, বলি সবতাতেই অত উতলা হও কেন? তোমার বয়সটাও তো কচি খুকীর মত নয় বাছা যে এসব

ন্যাকাপনা সাজে!" এই অবান্তর মন্তব্যে গৌরী হাসিয়া উঠিল, বলিল,

"কিসে উতলা দেখলে পিসীমা? মুখ ধুতে বলেছি বলে?"

"না, কিছু না—" বলিয়া তিনি দলা-পাকানো কাটা তেঁতুলগুলি সজোরে হাঁড়ির ভিতর পুরিতে লাগিলেন। হাঁড়ি ভর্ত্তি করিয়া বলিলেন, "মেয়ে মানুষকে বাছা অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। অত আতু-তুতু করলে কি চলে? অলো কি তোমাকে মোমের পুতুল পেয়েচে?"

গৌরী হটাৎ এ উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অন্য কথা পাড়িল। কিন্তু পিসীমার মনে তখনও ঐ কথা ঘুরিতেছে, তিনি বলিলেন, "আজ বাপু, বলে দিচ্চি, যদুবাবুর বাড়ীর দিকে যেওনা।"

"কেন পিসীমা, কি হয়েচে? ওদের বাড়ীর ন-বৌ আমাকে একদিন যেতে বলেছিল। ভেবেছিলাম আজ সন্ধ্যেবেলা—"

"না বাছা, আজ তারা বড় ব্যস্ত।"

"কি হয়েচে পিসীমা?"

"কি জানি বাপু, তোমায় বললে শেষ একটা ফিট-টিট করে বসবে। তখন অলো আমাকে আর আস্ত রাখবে না।"

আতঙ্কে গৌরীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল; কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বল না পিসীমা, কি হয়েচে—"

"কি আর হবে? ঐ ওদের ন-বৌয়ের ছেলেটা গাড়ী-চাপা পড়েচে।"

"অ্যাঁঃ!—"

এক নিমেষে গৌরীর মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটা বাড়ীর সামনে রাস্তায় খেলা করছিল, মার চোখের সামনেই কাটা গেল। ডাক্তাররা বলেচে পাটা কেটে ফেলে দিতে হবে।"

"উঃ—" বলিয়া গৌরী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িল। অলোকও মুখ হাত ধুইয়া উপস্থিত হইল। গৌরীর এই অবস্থা ও পিসীমার উৎসুক মুখভঙ্গী দেখিয়াই সে বুঝিল, ব্যাপার কি ঘটিয়াছে। তাঁহার ব্যবহারে মুখ তাহার এক নিমেষে কঠিনভাব ধারণ করিল। সে গৌরীকে বলিল, "অত ভয় পাবার মত কিছুই হয় নি ; সামান্য চোট, দু একদিনেই সেরে যাবে। তুমি এখন একটু শোবে চল।" এই বলিয়া সন্তর্পণে তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। জলখাবার তেমনই পড়িয়া রহিল।

পিসীমা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আজকালকার আধিক্যতা ও লজ্জাহীনতার শত শত ধিক্কার দিতে দিতে ঠাকুর ঘরে উঠিয়া গেলেন।

অলোক তাহার ভীরু কোমলপ্রকৃতির স্ত্রীটিকে বড়ই ভালবাসিত। সর্ব্বদাই সংসারের সব ঝঞ্ঝাট হইতে প্রাণপণে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত।

পিসীমা হরিনামের মালা ঘন ঘন ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্থির করিলেন যে অলোকের দ্বারা কিছু হইবে না। তাহার উপর রাগ করা বৃথা। বিশ্বেশ্বরের পদচ্যুতা হইয়া তিনি যে কয়দিন এইখানে পড়িয়া আছেন বৌয়ের শিক্ষার ভার নিজের হাতেই লইবেন। ইহাতে পুণ্য হইবে, আর বিশ্বেশ্বরও তাঁহার উপর প্রসন্ন হইবেন। এতটা বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়। তাঁহারাও তো মেয়েমানুষ

—তাঁহাদের মন কি পাথর গড়া ? তাঁহারা তো কই কাহারও দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে এরকম অধীর হইয়া পড়েন না। বরঞ্চ এই সব চর্চ্চায় মনে আরামই হয়। আজকাল নভেলপড়া মেয়েদের গতিকই আলাদা। সবতাতেই "ধর—ধর!" কথায় কথায় ফিট আর "আহা—উহু!"

২

অলোক নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছিল। তাহারই একান্ত অনুরোধে পিসীমা প্রিয় তীর্থস্থান ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য এখানে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে গৌরী সন্তানসম্ভবা হইয়াছে। স্ত্রীর শরীর বিশেষ সবল নয় যে কলিকাতার ডাক্তার-বৈদ্যের আশ্রয় ছাড়িয়া মফঃস্বলে বাপমায়ের নিকট পাঠাইয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। শাশুড়ীরও নিজের গৃহস্থালী ফেলিয়া আসিয়া মেয়ের নিকট বেশী দিন বসিয়া থাকা সম্ভব নয়। অগত্যা আর কোন নিকট-আত্মীয়া না থাকাতে বৃদ্ধা কাশীবাসিনী পিসীমারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে এখানে আনাইতে হইয়াছে।

কিছু দিনের মধ্যেই অলোক আবিষ্কার করিল যে গৌরীর ভীরু কোমল পরনির্ভরশীল স্বভাবটুকু পিসীমাকে মুগ্ধ তো করিলই না, বরঞ্চ মন তাঁহার তাহার উপর ক্রমে বিরূপ হইয়াই উঠিতে লাগিল। সমস্তই তিনি ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি, এমন-কি স্বামীর

নিকট বধূর সোহাগ ও আদর কাড়াইবার একটি নির্লজ্জ পন্থা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন থাকিবার পরই কথায়-বার্ত্তায় তিনি গৌরীকে এই সব লইয়া খোঁটা দিতেও লাগিলেন। বধূ বেচারী এইরূপ ব্যবহারে মোটে অভ্যস্থ ছিল না। কাজেই মুখে কিছু না বলিলেও সেও যে ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, অলোক তাহা ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিল। কিন্তু উভয় সঙ্কট। পিসীমাও কম ভক্তি ও ভালোবাসার পাত্রী নন, তাঁহাকে বুঝাইতে যাইলেই তিনি উল্টা বুঝেন। ভাবেন বৌ আসিয়া তাঁহার অলোককে একেবারে পর করিয়া দিয়াছে।

কাজেই অলোক গৌরীকেই আদর করিয়া নানারকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সে যেন পিসীমার কাছে গিয়া সর্ব্বদা বসে ও গল্প-সল্প করে। বুড়ো মানুষ—মনে যেন কোন কষ্ট না পান। দুদিন পরেই তো তিনি চলিয়া যাইবেন।

স্বামী আপিসে যাইবার পর গৌরী তাহার পরিত্যক্ত কাপড় জামা গুছাইয়া রাখিল। ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর নিজের খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া পিসীমার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

দেখিল তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন। গৌরীকে দেখিয়া তিনি কিছু কথা বলিলেন না। সে গিয়া তখন একখানি বই টানিয়া পাশে বসিল, বলিল, "পিসীমা কিছু পড়ে তোমায় শোনাব?"

পিসীমা মুখ ব্যাজার করিয়া বলিলেন, "না বাছা দরকার নেই।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলিল, "বলি বৌমা, শুনেচ কি কাণ্ডটাই হয়ে গ্যাচে?"

"কি পিসীমা ?"

"ও বাড়ীর ঠানদি বলে গেলেন, বড়বাজারে এমন আগুন লেগেছিল যে কি বলব ? কত যে জিনিষপত্তর লোকজন পুড়ে গ্যাচে তার ঠিক নেই। একটা ছোট ছেলে—"

গৌরীর গলার ভিতরটা শুকাইয়া উঠিল, কে যেন বুক চাপিয়া ধরিল, বলিল, "পুড়ে গ্যাচে ?'

"না বাছা ছেলেটা বেঁচে গ্যাচে, কিন্তু মা'টা তাকে বাঁচাতে গিয়ে একেবারে ঝলসে গ্যাচে। একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এয়েচে আর—"

"উঃ কি ভয়ানক ! থাক পিসিমা আর বোলো না—"

গৌরীর বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া সে শুইয়া পড়িল।

"সত্যিকারের কষ্টের আঁচ তো কখন লাগেনি, একটুতেই মুচ্ছো যাও। মেয়েমানুষের প্রাণটা বাছা মনে রেখো। ভালমন্দ একটা পেটেও ধরেছ। আমাকে দিয়েই ত্থাখো, সবি বিধাতা সইয়ে ত্থান।"

গৌরী আর কিছু বলিল না। স্বামীকেও নয়। পিসিমা গৌরীর শিক্ষার ভার রীতিমতই হাতে লইলেন। তাঁহার নিজের জীবনে যত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, কি-করিয়া অলোকের মা শেষ সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন, অমুকের ছেলে চোখের সামনে কি-করিয়া জলে ডুবিয়া মরিল, অমুকের বৌ বিষ খাইয়া পরে বাঁচিবার জন্য কি আর্ত্তনাদ করিল, অমুকের মাসী পক্ষাঘাতে কি কষ্টেই না জীবন কাটাইতেছে, এই-সব গল্পের ভাণ্ডার বিভীষিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া একের পর একে মুক্ত

করিয়া দিতে লাগিলেন। বেচারী গৌরী যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা তাহার কাছে এক আকস্মিক বিপদে ভরা ভয়ানক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রতি পদেই বিপদ দুঃখ আর কষ্ট। মানুষ ইহার মধ্যে থাকিয়া কি-করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, গৌরী তাহা ভাবিতেও পারে না। প্রতিরাত্রে সে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে, দিনেও স্বামীর আপিস হইতে এক মিনিট বাড়ী আসিতে দেরী হইলে তাহার মন উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়। হয়তো স্বামী ট্র্যাম চাপা পড়িয়াছেন, নয় রাস্তায় কোথাও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন ইত্যাদি। চোখের কোণে তাহার মসীরেখা দিন দিন গাঢ়তর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মুখখানি শুকাইয়া আধখানা হইয়া গেল। ঠোঁটের কোণের সরস হাসিটুকুও মিলাইয়া গেল।

স্বামীকে তবু সে তাহার ভয়ের কারণ কিছু বলিল না। কারণ ইদানীং সে বুঝিয়াছিল, পিসীমা ও স্ত্রী এই দুই প্রিয়জনের ভিতর মিল না থাকার লক্ষণে স্বামী মনে মনে বড়ই আঘাত পান। কাহারও কাছে এই সব আশঙ্কার কথা মন খুলিয়া বলিতে পারিলে বুঝিবা সে খানিকটা হাল্কা বোধ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারিয়া বুকের বোঝা তাহার পাহাড়ের মত দিন দিন ভারী হইয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল।

৩

একদিন অলোক অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে গৌরী বাহির-বাড়ীতে তাহার বসিবার ঘরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আধ-আলো আধ-আঁধারে তাহার মুখের ভাব অলোক দেখিতে পায়

নাই। ঠাট্টা করিয়া তাই বলিল, "ঘরের বৌ যে আজ একেবারে বাইরে? ব্যাপার কি? পিসীমা কোথায়?"

গৌরী আর পারিল না, কাছে আসিয়া স্বামীর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল। হাত দুইখানি তাহার তুষারশীতল। ঠোঁট দুইটি উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। চোখের কোলে অশ্রু টলমল করিতেছে। বলিয়া উঠিল, "দোহাই তোমার, কদিন আমাকে মার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অলোক বলিল, "এ আবার কি? চরণে অধম কি অপরাধে অপরাধী যে তার এই গুরু দণ্ড?"

"না—না—ঠাট্টা রাখ। সত্যি আমি আর সহ্য করতে পারি না। সারা রাত কত কি যে দুঃস্বপ্ন দেখি তার ঠিক নেই। জেগে থাকলেও বুক দুর্ দুর্ করে। ওগো এমনি ক'রে আমি আর বাঁচব না।"

অলোক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কি হয়েচে?"

গৌরী শুধু কাঁদিতে লাগিল। অলোক অনেক আদর করিয়া সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে থামাইল।

গৌরীর মুখ হইতে সে শুনিল যে পিসীমা তাহাকে বলিয়াছেন, প্রথম প্রসব মোটেই নিরাপদ নয়। অলোকের মার প্রথম সন্তান নাকি পেঁচোয় পাইয়া জন্মিবার পরই মারা গিয়াছিল। পিসীমা যে বধূটিকে সুনজরে দেখেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভীরু মনকে এইরূপ বিভীষিকা দ্বারা দিনরাতই যে পেষণ করিতেছেন ইহা সে ভাবে নাই। এই কর্কশস্বভাবা পিসীটিকে সে সত্যই খুব ভালোবাসিত। সাত বৎসর বয়সে মা তাহার যখন তাঁহার মাতৃত্বের সব কর্ত্তব্য সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, তখন সেই কচি

বালকটিকে মাতৃহীন পিতৃভবনে এই পিসীটিই মাতার স্থান অধিকার করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাই অলোকের ইচ্ছা ছিল না যে তাহার স্ত্রী ও পিসীমা—এই দুই অতি প্রিয়জনের মধ্যে সত্যকার বিচ্ছেদ ঘটে।

সে সস্নেহে গৌরীর হাতখানি নিজের বুকে টানিয়া লইল ও বলিল, "আচ্ছা গৌরী, তুমি যদি যেতে চাও তো তোমাকে পাঠিয়েই দেব। পিসীমা সামনের সূর্য্যগ্রহণ যোগে নিজেই কাশী চলে যেতে চাইচেন। তিনি আর এখানে থাকতে চান না। আমি তোমার জন্যেই তাঁকে আটকে রেখেচি। আর দিন সাত মাত্র যাবার দেরী আছে, তুমি এই কটা দিন অপেক্ষা কর।"

গৌরী আর কি করিবে? স্বামীর এ অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিল না। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ম্লান মুখে বলিল, "হ্যাঁ তাতো ঠিক কথাই। কিন্তু দোহাই তোমার—তাঁকে আর এনো না, এলে আমি মরে যাব।"

৪

ইহার পর আরো দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। গৌরী পিসীমাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। গৌরীর মুখেও আবার পূর্ব্বের নিশ্চিন্ত ভাব ও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর যত্নের অন্ত নাই। কথায় বার্ত্তায় ছবিগল্পে শুধু তিনি তাহাকে জীবনের সুন্দর দিকটাই দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। যেন তাতে কত হাসি, কত আলো, কত অফুরন্ত আশার ভাণ্ডার। পক্ষীমাতার ন্যায় ডানা মেলিয়া অলোক তাহাকে পৃথিবীর সব রূঢ় আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।

একদিন গভীর রাত্রে গৌরীর মাতৃত্বের চরম পরীক্ষার ডাক আসিল। একাই এই কষ্টের ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। হাজার ইচ্ছা থাকিলেও স্বামীর সাধ্য নাই একটুও এ-কষ্টের ভাগ লইয়া তাহা লাঘব করেন। অলোক গৌরীর মা ও একজন সুদক্ষ ধাত্রীকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইল। অলোক সমাজের অনেক কুসংস্কারই মানিত না। বাড়ীর সব চেয়ে অপরিষ্কার স্যাঁৎসেঁতে ঘরখানি না হইয়া উপরের সব চেয়ে ভাল ঘরখানিই নূতন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আঁতুড়ের বাচ-বিচার সে মানিবে না।

তিন দিন যমে মানুষে যুদ্ধ চলিল। চতুর্থ দিনে ভোর রাত্রে গৌরী যখন সহ্যের ও ক্লান্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, তখন একটি শিশু আসিয়া তাহাদের গৃহ উজ্জ্বল করিল। গৌরী কিন্তু তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সে তখন অজ্ঞান। চিকিৎসকের পরামর্শ মত ধাত্রী শিশুটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া অন্য ঘরে লইয়া শয়ন করিল। তিন দিনের পরিশ্রমে সেও অত্যন্ত ক্লিষ্ট। গৌরীর মা শুধু ঘরের এক কোণে বসিয়া নিদ্রার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

এমন সময় অলোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শাশুড়ীকে তদবস্থায় দেখিয়া সে তাঁহাকে বলিল, "মা, আপনি গিয়ে একটু ভাল করে বিশ্রাম করুন। আমি তো অনেকটা ঘুমিয়ে নিয়েচি, আমি একটু না হয় বসি।" শ্বাশুড়ী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, বলিলেন, "আচ্ছা তাই বোসো বাবা। আমি আর চোখ মেলতে পারচি না"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

অলোকও আস্তে আস্তে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া গৌরীর মাথার পাশে বসিল। ধীরে ধীরে তাহার মাথায় বাতাস করিতে

লাগিল। খানিক পরে গৌরী অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই স্বামীকে দেখিতে পাইল। "তুমি এয়েচ—" তাহার কণ্ঠস্বর তখনও ক্লান্তির অবসাদে জড়িত। খানিকক্ষণ ফের চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ত্যাখো, আমার অনেক শিক্ষা হয়েচে। আর কখনো আগের মত কষ্ট আর ভয়কে অত ভয় করব না। এবার থেকে দেখবে, আমি কত শক্ত হয়েচি"—বলিয়া ক্লান্তি বশতঃ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

অলোক উঠিয়া গিয়া খানিকটা বরফ লেমনেড আনিয়া চামচে করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল। বলিল, "অত কথা এখন কোয়ো না। একটু ফের্ ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

গৌরী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া একখানি হাত স্বামীর হাতের উপর রাখিয়া বলিল, "না গো, আমায় বলতে দাও। বললে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। জানো গো, এবার আমি বুঝতে পেরেচি দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষকে যেমন যেতেও হয় তেমনি সেগুলো সহ্য করবার শক্তিও সে পায়।"

অলোক চুপ করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, আর ধীরে ধীরে অতি স্নেহে পত্নীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর কৃতজ্ঞতায় বিপদহারী ত্রাণকর্ত্তাকে স্মরণ করিতেছিল। গৌরীর কি সঙ্কটই না কাটিয়া গিয়াছে, সে তাহার কি জানিবে?

আবার গৌরী বলিতে সুরু করিল। কণ্ঠ তাহার অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে বলিল, "জানো গো, যদিও আমি অজ্ঞানের মত পড়েছিলাম তবু আমি সব বুঝতে পেরেচি। যার পথ চেয়ে বসে ছিলাম, সে যে আমার বুকে আসতে না আসতে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে, তাও আমি টের পেয়েচি। এতে প্রথম বড় দাগা লেগেছিল,

তাইতেই আরো অজ্ঞানের মত পড়েছিলাম। এখন তাও সহ্য করতে পারচি—” ঠিক এই সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল। সে তাহার জগতে প্রথম অভাব ক্ষুধার অভিযোগ তারস্বরে জানাইবার চেষ্টা করিতেছে।

গৌরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “ও কিসের শব্দ?” বলিতে বলিতেই ধাত্রী-কোলে শব্দকর্ত্তার আবির্ভাব হইল। অলোক উঠিয়া গিয়া একরাশ নরম মল্লিকা ফুলের মত শিশুটিকে পরম যত্নে গৌরীর পাশে শোয়াইয়া দিল।

তৃপ্তিতে গৌরীর সমস্ত দেহমন ভরিয়া গেল। সব ক্লান্তির জড়িমাও যেন সেই সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। গভীর স্নেহে সে সেই ক্ষুদ্র জীবটিকে নিজের বুকের দিকে টানিয়া লইল। পরিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, “গ্যাখো, গ্যাখো ঠিক তোমার মত নাক মুখ চোখ। ঠিক তোমার ছেলে বেলার চেহারা। পিসীমা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাঁর কত আহ্লাদ হবে। ওগো তিনকড়ি-দাকে পাঠিয়ে দাও না, তাঁকে কাশী থেকে নিয়ে আসুক।”

সেই এক-রতি মাংসপিণ্ডের চারিটি রেখা ও গর্ত্তের সহিত নিজের চোখমুখের সাদৃশ্য দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অলোক হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িল। পিসীমার প্রতি তাহার স্ত্রীর এই পরিবর্ত্তিত ভাব দেখিয়া অন্তর তাহার এই একবিঘৎপরিমিত সন্ধির দূতটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে সে বলিল, “বেশ কথা গৌরী! এখুনি তাঁকে আনাবার বন্দোবস্ত করচি।”

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বাংলাদেশে সাহিত্যিক সভা সমিতি সঙ্ঘ ক্লাব এসোসিয়েশন আছে বিস্তর, তাহার মধ্যে কতকগুলি মুমূর্ষু, কতকগুলি মূর্চ্ছাতুর, কতকগুলি ম্লান, কতকগুলি ক্ষণদীপ্তি, কতকগুলি গণ্ডীবদ্ধ। 'রবি-বাসর' এক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। ইহা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। সজীব কিন্তু চঞ্চল নয়, অসাম্প্রদায়িক কিন্তু সাধারণ নয়। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকই ইহার সদস্য। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রসমূহে দুই তিন বৎসরের মধ্যে যে-সকল উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি এই বাসরে প্রথম পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে একবার করিয়া প্রতি সদস্যের ভবনে ইহার রবি-বাসরীয় অধিবেশন হয়। তিন বৎসর নিয়মিতভাবে এইরূপ অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। অথচ ইহার লিখিত কোন আইন কানুন নাই, কার্য্যকরী সভা নাই, বিবরণী, নাই, অনুষ্ঠানপত্র নাই। একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত সভ্য লইলে একটু অসুবিধায় পড়িতে হয় বলিয়া, ইহাতে মাত্রাধিক সদস্য লওয়া হয় না।

* * *

শ্রীযুক্ত জলধর সেন অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অজস্র দানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। রবিবাসরের তিনি প্রাণ। এই সুপ্রবীণ এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনার্থ যে উৎসব-সভার ভার রবিবাসর গ্রহণ করে, তাহা যে সে সুসম্পন্ন করিয়াছে, নিম্নলিখিত বিবরণী হইতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

* * *

সোমবারের 'বঙ্গবাণী'তে যে সুসম্পূর্ণ রিপোর্টটি বাহির হইয়াছে দেখিলাম, নিম্নের বিবরণীর অধিকাংশ স্থল তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল।

'গতকল্য (১২ই ভাদ্র, রবিবার) রামমোহন লাইব্রেরী হলে বিশেষ সমারোহের সহিত বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণতম সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। রবিবাসর সভার সভ্যগণই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁহারা অনুষ্ঠানটি সার্থক করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরী হলে প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। একটি উদ্বোধন সঙ্গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। তাহার পর একটি বরণসঙ্গীত গীত হয়। এবং মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ও পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ আশীর্ব্বচন ও মাঙ্গলিকী পাঠ করেন।'

* * *

'শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকবৃন্দ ও রবিবাসরের সদস্যগণের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল।'

— অভিনন্দন পত্র —

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর করকমলেষু—

হে শান্ত স্নিগ্ধ আনন্দময় জলধর আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর সরস-রসধারা-বর্ষণে তুমি রসিকচিত্তকে উন্মুখ, সাহিত্যাকাশকে শ্যামায়মান এবং সাহিত্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়াছ।

কথা-সাহিত্য তোমার কথার মিষ্টত্বে মধুর হইয়াছে, তোমার কাহিনী দুর্গম ভ্রমণবর্ত্মকে কুসুমাস্তীর্ণ করিয়াছে, তোমার বর্ণনা সুদূরকে সুগম এবং সাধারণকে সৌন্দর্য্যময় করিয়াছে; তোমার রচনা শব্দে শ্রী এবং ভাষার ভঙ্গী দান করিয়াছে।

হে পথিক জলধর, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি। সংসার তোমার আনন্দের কারণ, কিন্তু প্রবাস তোমার আকর্ষণের বস্তু। তাই ঘর এবং পথ তোমার অন্তরে একটি সুমধুর সামঞ্জস্যে সুষমাময় হইয়া উঠিয়াছে; তাই পর তোমার কাছে পরিজন, পরিচিত তোমার কাছে প্রীতির পাত্র, এবং বান্ধব তোমার কাছে আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে।

হে চির-দিবসের তীর্থযাত্রী, সাহিত্যকে তুমি তীর্থে পরিণত করিয়াছ, তাই পুণ্যলোভাতুর অসংখ্য-জন-সমাগমে সে তীর্থ মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

কমলকিশলয় পাথেয় করিয়া মানসগামী যে রাজহংসেরা অনুকূল পবনে পক্ষবিস্তার করে, কৈলাস-অবধি তুমি তাহাদের সঙ্গী হইয়াছ। হিমালয়বিহারী হে জলধর, কোন্ বিরহের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়া মিলনের লিপি লইয়া আসিয়াছ, সকল সাহিত্যরসগ্রাহীর চিত্ত তাহার উপভোগের আনন্দে পূর্ণ হইয়া আছে। কুসুমধবল শৃঙ্গসমুচ্ছ্বাসে মহাদেবের প্রতিদিবসের যে অট্টহাস রাশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আহরণ করিতে কি প্রথম যৌবনে তুমি পরিব্রাজক সাজিয়াছিলে? সেই আনন্দময় আহরণের বিতরণে বঙ্গের প্রান্তর প্রফুল্ল হইয়া আছে।

তোমার দৃষ্টি সকলকে সমানভাবে নন্দিত করিয়াছে। তোমার প্রীতি অখ্যাতকে খ্যাত এবং নবীনতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। স্নেহ বিতরণে তোমার কার্পণ্য নাই, দারিদ্র্যে তোমার কুণ্ঠা নাই, বিলাসে

তোমার স্পৃহা নাই; সম্মানে তোমার গর্ব্ব নাই, সামাজিকতায় তোমার শৈথিল্য নাই, বাণীর সেবায় তোমার শ্রান্তি নাই। হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে ও সমাজে তাই তুমি জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারী। হে তাত, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

* * *

'অভিনন্দন পত্র পাঠের পর শ্রীযুক্ত জলধর সেনকে রজত মঞ্জুষা, লেখনী ও মস্যাধার উপহার দেওয়া হয়।

'শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায় এইবার সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রেরিত পত্র পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মন্মথ ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ও ডাঃ সুরেন্দ্র সেনের পত্র পড়া হয়। পাটনা সাহিত্য সভার শ্রদ্ধা জ্ঞাপক একটি তারের কথাও বিজ্ঞাপিত হয়।

'ইহার পর শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, গিরিজাকুমার বসু, হেমেন্দ্রলাল রায়, অবনীনাথ রায়, নরেন্দ্র দেব, সুকুমার সরকার, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধাদি পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, রমাপ্রসাদ চন্দ, নরেন শেঠ, যতীন বসু, গুরুসদয় দত্ত, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

'শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে মানুষ হিসাবে ও সাহিত্যিক হিসাবে জলধর সেনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীযুক্ত চারু মিত্র সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভায় কলিকাতার সাহিত্যিকমণ্ডলীর প্রায় কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না।'

* * *

এই সভাটির মত এমন শিষ্টজনসম্মিলন আমি আর দেখি নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বক্তৃতায় এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। জনসমাগমে হলে তিলধারণের স্থান ত ছিলই না, অনেককে বাহিরে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তবুও এতটুকু গোলমাল হয় নাই। কেন? হয়ত বক্তাদের কথার আকর্ষণ ছিল, হয়ত অসংখ্য খ্যাতির মিলন সভাকে একটি অসাধারণ মহিমা দান করিয়াছিল, হয়ত সভাপতির অভিভাষণের জন্য সকলে উন্মুখভাবে অপেক্ষা কবিতেছিল। কিম্বা হয়ত সম্বর্দ্ধনাব ভিতব এমন একটি আন্তরিকতার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা সকলকে আচ্ছন্ন কবিয়া মুগ্ধ করিয়া বাখিয়াছিল।

* * *

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী একনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত সাহিত্য-সেবার কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তা এবং লেখকগণ ক্ষান্ত হন নাই। সকল ভাষণের মধ্যে বার বার যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল, সে কথাটি—অজাতশত্রু। যে মনের উগ্রতা শ্রদ্ধাশীলের শ্রদ্ধাকে প্রহত করিয়া আহত করে, খ্যাতিকে আকর্ষণের কারণ না করিয়া ভয়ের বস্তু করিয়া তোলে, স্নিগ্ধহৃদয় জলধব সেন মহাশয় সেই উদগ্রতার সাধনা কখনও করেন নাই। তাই নবীন এবং প্রবীণ নির্ব্বিশেষে সকলেবই তিনি দাদা। এক অমায়িক অন্তরঙ্গতায় সকলের হৃদয় তিনি জয় করিয়াছেন।

* * *

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করেন, দাদার স্নেহের তাড়না না থাকিলে তাঁহাদের অধিকাংশ রচনা কল্পনায় বিলীন হইয়া যাইত। বাংলা দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্যসাধনার জন্য জলধর বাবুর নিকট ঋণী।

* * *

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত শুধু সম্বর্দ্ধনা-সভায় যোগ দিবার জন্যই জেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দ উপভোগ করিয়াছিল। দেখিলাম বাংলার গৌরবের কথা বলিতে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে। ছন্দে, তালে এবং ভঙ্গীতে 'He is a jolly good fellow' গানটি এবং তাঁহার স্ব-কৃত অনুবাদটি গাহিয়া তিনি সকলকে আনন্দ দান করেন। এই অকৃত্রিম বঙ্গপ্রেমিক বাঙালীকে শুধু এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, বাংলা পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রিয়ত্ব লাভ করিলেও jolly good fellow যে jolly good fellowই থাকিয়া যায়, মনের মানুষ হয় না, এ বিচারে তাঁহার মত লোকের ভুল হয় কেন?

* * *

প্রতিভাষণে শ্রীযুক্ত জলধর সেন যে কথাগুলি বলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যের উপযুক্তই হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমি সাহিত্যিক নই, আমি সাহিত্যিকগণের সেবক। আমার ধর্ম্ম সেবা এবং সেবা করিয়াই আমি ধন্য হইয়াছি।' ভক্ত বৈষ্ণব নিজেকে কখনও বিষ্ণুর পূজারী বলিয়া পরিচয় দেয় না। সে বলে, 'আমি বৈষ্ণব নই,—বৈষ্ণবের দীন সেবক, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।' শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পরমবৈষ্ণবোচিত বিনয়কে লোকে বিনয়ের মূল্যেই গ্রহণ করিয়াছে।

১ম বর্ষ] ২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৯ [১৩শ সংখ্যা

মিসেস্ গুপ্ত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বর্ষার সন্ধ্যা। টিপ-টিপ, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে; কখনো জোরে নামে না, কখনো থামে না; একঘেয়ে, একটানা, সমানে চলেছে। ধোঁয়াটে, বিবর্ণ আকাশ। সমস্ত শহর ছায়ায় আচ্ছন্ন। টিপ, টিপ। ঘণ্টাকয়েক পরেই মনে হতে থাকে, যেন এই অবস্থাই চিরস্থায়ী; কখনো যে অন্যরকম ছিল, তা ভুলে যেতে হয়। খুঁড়তে খুঁড়তে, বর্ষা আমাদের আত্মা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। টিপ, টিপ। সূক্ষ্ম সূচী-মুখের মত বৃষ্টি আমাদের আত্মার ভেতরে অবিশ্রান্ত কেটে চলে।

চমৎকার—আপনি বলছেন? কল্‌কাতায় বাস করবার এ-ই তো সময়। ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, গরম নেই, হাওয়াটা পরিষ্কার; স্বচ্ছ আবহাওয়ায় শহরের আলোগুলো কি আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বল।

আপনার বুঝি পার্ক ষ্ট্রীটের দক্ষিণে কোথাও একটা বাড়ি আছে?—দোতলার ঘরে কার্পেট-বিছানো বসবার ঘর—এন্তার বই, গ্রামোফোন, একতাড়া নতুন রেকর্ড। নিজের একটা সীডান বডি গাড়ি—তা-ও আপনার আছে নিশ্চয়ই, আর খরচ করবার প্রচুর পয়সা? আশ্চর্য্য নয়, এই ওয়েদারের আপনি ভক্ত। কিন্তু আমাদের কথা একবার ভাবুন, যাদেরকে একতলার ফ্ল্যাটে বাস করতে হয়; ছাতা আর কোঁচা সামলে পিছল ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হয়; নোংরা, বিড়ি-গন্ধ-আবিল বাস্-এ চ'ড়ে কর্ম্মস্থল থেকে কর্ম্মস্থলে যেতে হয় (বাস্-এর সীটগুলো ভেজা, যাত্রীদের ছাতা থেকে জল প'ড়ে প'ড়ে মেঝেটা ভেসে যাচ্ছে); প্রত্যেকবার নাববার সময় আছাড় খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আমাদের কথা একবার ভাবুন, যাদের এক জোড়ার বেশি জুতো নেই। কিন্তু আপনি—আপনার মরিস্-সীডানের গদীতে হেলান দিয়ে যেতে-যেতে, কিম্বা প্রশস্ত সোফার ভেতর ডুবে গিয়ে নতুনতম ইংরেজ লেখকের নতুনতম উপন্যাস পড়তে-পড়তে—আপনি তা ভাবতে পারবেন না। আপনার হৃদয় দয়াপ্রবণ, আপনি উদার, কারো দুঃখে সাহায্য করতে পারলে আপনি খুসী হন; কিন্তু আপনি, যাঁর জুতোর তদারক করবার জন্য একজন আলাদা চাকর রাখতে হয়, আপনি কী করে ভাবতে পারবেন, কোনো লোকের এক জোড়ার বেশি জুতো না থাকা সম্ভব? আপনাদের মিসেস্ গুপ্তর কথাই ধরুন্; চ্যারিটির জন্য তিনি বিখ্যাত; কত হাসপাতাল, ইস্কুল, লাইব্রেরি যে তাঁর দানে স্ফীত হয়ে উঠেছে, কত গরীব ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যয় যে তিনি বহন করেন, কত দুঃস্থ পরিবার যে তাঁর সাহায্যে আসন্ন সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছে, তার ইয়ত্তা

নেই ; তার সমস্ত হিসেব লিখতে গেলে একটা বই হয়। এমন কেউ নেই, যে তাঁর সমস্ত দানের বিবরণ জানে—তাঁর বন্ধুদের, সহকর্ম্মিণীদের মধ্যে কেউ নয়, এমন কি, তাঁর নিজের মেয়ে, মায়ের জন্য যে অবিবাহিত জীবন বরণ করে নিয়েছে, কল্‌কাতার সমাজে যে ফ্লরেন্স গুপ্ত বলে পরিচিত, সে-ও নয়। মিসেস্ গুপ্তর নিজেরি সব মনে থাকে কিনা সন্দেহ ; অত জিনিষ মনে রাখা মানুষিক স্মরণশক্তির অসাধ্য। মোট কথা মিসেস্ গুপ্তর মত দানশীলতা, দয়াপ্রবণতা, দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা বিরল, বিস্ময়কর, অসাধারণ—অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। কল্‌কাতার বিভিন্ন নারী-সমিতির তিনি পেট্রন-সেণ্টের মত ; সমাজ-সেবার বহু অনুষ্ঠানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সশ্রদ্ধে—প্রায় সভয়ে—লোকে তাঁর নাম উচ্চারণ করে। গভর্ণর-পত্নীর সঙ্গে মাঝে-মাঝে তিনি চা-পান করেন ; গভর্ণর-পত্নীর অনুপস্থিতিতে কোনো নতুন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন তাঁকে করতে হয়। বিখ্যাত, বন্দিত মিসেস্ গুপ্ত—দয়াশীলতায় তিনি অতুলনীয়। বিশেষ করে, শিক্ষার প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত জীবন ব্যাপী অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অকৃপণ অর্থব্যয়—একটা কাহিনীর মত ; শুন্‌লে বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর স্বামী—পবিত্র স্মৃতির এম-আর-গুপ্ত—তিনি ছিলেন আই-ই-এস্ এর লোক ; সরকারের প্রিয়পাত্র, বাঙালীদের মধ্যে একজন উদীয়মান শিক্ষাতান্ত্রিক ; বেঁচে থাক্‌লে তিনি কৃতিত্বের কোন্ দুর্গম, কল্পনা-অতীত শিখরে যে না উঠতে পারতেন, বলা যায় না। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই বহু সঙ্কল্প, স্বপ্ন অপরিপূর্ণ, বহু অভীষ্ট অর্দ্ধ-সাধিত, বহু কাজ আরব্ধ মাত্র রেখে তিনি মারা গেলেন ; এবং তাঁর হয়ে বৈধব্যিত, শোক সন্তপ্ত মিসেস্ গুপ্ত গ্রহণ করলেন তাঁর বৃহৎ কর্ম্মভার। শিক্ষা,

তাঁর জীবনের একমাত্র জপমন্ত্র শিক্ষা। শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করেন, কাল্‌চারে তিনি বিশ্বাস করেন। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশে স্বর্গ নেমে আসবে। যত বেশি ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখবে, ততই জাতির শক্তি বাড়বে, সুখ বাড়বে। একজন লোক যত বেশি শিক্ষা পাবে, ততই সে ভালো হবে, সুখী হবে। Sweetness and light. তমসো মা জ্যোতির্গময়।

কিন্তু অন্ধকারের তিনি কী জানেন, কী করেই বা কিছু জানতে পারেন, আলো থেকে বিচিত্রতর আলোয় যাঁর জীবন কেটে যায়? আলো, আলো। কল্‌কাতার সব চেয়ে উজ্জ্বল রাস্তা এই লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীট; বর্ষায় স্বচ্ছ এই সন্ধ্যায় কল্পনার কোনো রাস্তার মত সুন্দর। মিসেস্ গুপ্তকে এখন একবার দেখুন—এক বাদ্যযন্ত্রের দোকান থেকে বেরিয়ে এইমাত্র তিনি ফুটপাথে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনার কিছু জানা না-ও থাকে, শুধু তাঁকে দেখে আপনি প্রবৃত্তি দিয়ে তাঁর অসাধারণত্ব অনুভব করবেন। রাণীর মত তিনি দেখতে। পুরোণো হস্তীদন্তের মত তাঁর গাত্রবর্ণ; করুণায় সহৃদয়তায় কোমল তাঁর মুখ, শাদা-কালোয় মিশোনো ঘন একমাথা চুলের জন্য আরো সুন্দর হয়েছে। দুধের মত শাদা তাঁর গরদের শাড়ি আলোয় ঝল্‌মল্ করছে; বাঁ হাতের কনিষ্ঠায় হীরের আংটি থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে আলো। আলো, আলো। দীপ্তিময় তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব; তাঁর ভেতর থেকে যেন দয়ার, শুভানুধ্যায়িতার, সমস্ত পৃথিবীর জন্য মঙ্গল-কামনার আলো নিঃসৃত হচ্ছে। রাস্তায় তাঁর প্রকাণ্ড ক্রাইজ্‌লার গাড়ি দাঁড়িয়ে; শোফার হাত বাড়িয়ে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলে। দোকানের এক সুদর্শন পার্শী কর্ম্মচারী তাঁর পেছন-পেছন এসে গাড়ীতে রেকর্ডের

বাক্সটা তুলে দিলে। বাহুর অতি লঘু, অথচ অপরূপ এক ভঙ্গীতে তাকে বিদায় দিতে তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে; উষ্ণ, নরম আরাম তাঁকে অভ্যর্থনা করলে। প্রায় নিঃশব্দে, গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। সেই আরাম আর আলোকের কারাগৃহে আবদ্ধ মিসেস্ গুপ্ত, কী করে জানবেন তিনি, কত গভীর বাইরের অন্ধকার, কত দুঃস্বপ্নে, কত হতাশায়, কত উন্মাদ-কারী তিক্ততায় পরিপূর্ণ? এইমাত্র যে লোকটি তাঁর গাড়ি আসতে দেখে দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে, তাঁর সমস্ত হিতৈষণা সমস্ত উন্মুখ হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও কি তিনি তার কাছে আসতে পারবেন?

কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর গাড়িটা সেই লোকটির কাছে, বড় বেশি কাছে এসে পড়েছিল। ভড়্কে গিয়ে লোকটি একবার পেছোলো, তারপর কী মনে করে সাম্‌নের দিকে দৌড় দিলে। রাস্তা ছিল পিছল; ধুপ্ করে সে আছাড় খেয়ে পড়ল। প্রাণপণে, শোফার ব্রেক কষে দিলে। ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ক'রে লোকটির মাথার এক ইঞ্চি দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেলো। একটা সোর্‌গোল উঠল; দেখতে-না-দেখতে গাড়িটাকে ঘিরে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেলো। পুলিশ এলো। লোকটি ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে। তার এম্‌নিতেই অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় একটু বেশি নোঙ্‌রা হয়ে গেছে—তা ছাড়া আর তার কোনো ক্ষতি হয় নি। এত লোক কেন? আবার পুলিশ! না জানি কী অপরাধ সে করে ফেলেছে! তাকে হয়-তো থানায় ধরে নিয়ে যাবে। এখন কি আর পালানো যাবে? ভীত, সচকিত, সাবধানী দৃষ্টিতে সে এদিক থেকে ওদিকে তাকাতে লাগলো।

ব্যাপার কিছুই নয়; ভিড় খ'সে পড়তে লাগলো। পুলিশটাও শোফারের সঙ্গে দু'একটা কী কথা ব'লে স্বস্থানে ফিরে গেলো। যাক্, সে কোনো বেআইনী কাজ করে ফেলে নি তা হলে! সে যেতে পারে, চলে যেতে পারে। নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে সে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারী-মূর্ত্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এক মধুর, এক উৎকণ্ঠিত, এক আশঙ্কা কম্পিত কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লেগেছে?'

ভয়ে তার গলা আট্‌কে আসছিল; অতি কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'লাগে নি।'

কৌতূহলী, সানুকম্প, সযত্ন দৃষ্টিতে মিসেস্ গুপ্ত তার দিকে তাকালেন। ছেলেমানুষ; সতেরোর বেশি বয়েস কিছুতেই হবে না। মুখখানা দেখে তাঁর বড় মায়া হলো। ভাগ্যিস, ভাগ্যিস কিছু হয় নি। যদি কোনোরকমে তাঁর গাড়ির চাকা—উঃ, ভাবা যায় না। ওই নতুন ক্রাইজ্‌লারগুলোর ব্রেক চমৎকার করেছে যা হোক্। একটু চাপ; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি একেবারে দাঁড়িয়ে গেলো। ভাগ্যিস, ভাগ্যিস্।

মধুর হেসে তিনি বললেন, 'লাগে নি কী বলো!'

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে ফেললে, 'এই এখানটায় একটু—' ব'লে তার ডান কাঁধ দেখালো; ও জায়গাটা একটু ব্যথা করছিল!

'তাই বলো!' মিসেস্ গুপ্ত ছেলেটির ডান কাঁধে একবার হাত রাখলেন। 'খুব লেগেছে?'

'না, না, এই একটু।'

'কী ক'রে প'ড়ে গেলে?'

'আমি চ'লে যাচ্ছিলাম,' সে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'গাড়িটা এসে পড়লো।' কথাগুলো থেমে থেমে, ছোট ছোট টুকরোয় তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল, 'ভাবলাম, কী করি, কী করি; তারপর—তারপর—' ভেতরে ভেতরে ঘেমে, সে থেমে গেলো। বাকিটা সে নিজেই স্পষ্ট মনে করতে পারছিল না।

ছেলেটির অপ্রতিভ, সলজ্জ ভীরুতায় মিসেস গুপ্তর হৃদয় আরো যেন বিস্ফারিত হ'লো। আহা বেচারা। মুখ দেখে, হাব-ভাব দেখে মনে হয় না, খুব সুখে আছে। হয়-তো সুখে নেই। ভালো লেখাপড়াও হয়-তো শেখে নি; অথচ মুখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওর বুদ্ধি আছে, স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। অজ্ঞতায় দীনতায় ও দিন কাটাচ্ছে—অথচ সুযোগ পেলে ও অনেক-কিছুই হয়-তো হতে পারত, করতে পারত। এখনো পারে। এখন আর ওর বয়স কী? মিসেস্ গুপ্তর কল্পনা জ্ব'লে উঠল...

ছেলেটি ইতিমধ্যে ভাবছিল, চ'লে যাবার এই সুযোগ। কিন্তু এই মহিমাময়ী, অবিশ্বাস্য নারীর কাছ থেকে কী করে সে বিদায় নেবে? তার সব চেয়ে উদ্দাম যে স্বপ্ন, সেখানেও এত দীপ্তি সে ভাবতে পারে না। এই দীপ্তিময়ী তার সঙ্গে কথা বলেছেন, সত্যি-সত্যি কথা বলেছেন! প্রত্যুত্তরে, কী বলবে সে? যত কথা সে জানে—এই আলোর মূর্ত্তির কাছে, এই মধুর, ঈষৎ-আর্দ্র কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত, পরিচ্ছন্ন, মার্জ্জিত ভাষার তুলনায় কী বিশ্রী, কী বিসদৃশ শোনায় সব। 'আমি তা হ'লে যাই।' না—এ চলবে না; বড় রূঢ়, রীতিমত কর্কশ। 'আমায় এবার বিদায় দিন।' এটা বরং ভালো; দু'একবার মনে মনে সে কথাটা আওড়ালে। নাঃ, কেমন

যেন বই-বই গোছের ; শুন্‌লে হাসি পায়। ও-রকম ক'রে কি কেউ কথা বলে ?

মিসেস্ গুপ্ত বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে।'

ছেলেটির হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে যেন গলার কাছে এসে আট্‌কে গেলো, একটা সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার মনের ওপর ভেসে উঠল ; ছোট একটা ঘরে টেবিলের চারিদিকে অপরিচিত, রহস্যময় একসার মুখ ; মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে, প্রশ্নে প্রশ্নে সবাই তাকে জর্জ্জর করে তুলছে। দৃশ্যটা মৌলিক নয় ; একটু সচেতন হলেই সে বুঝতে পারত, দু'দিন আগে সে বায়স্কোপের যে ছবিটা দেখেছিল, তা থেকে নেয়া। (এই তার প্রথম সিনেমা-দর্শন ; এবং ছবিটা তার মনে এমন গভীর ছাপ মেরেছিল যে জেগে কি ঘুমিয়ে সব সময় সে তারি স্বপ্ন ছাখে , সেই বিস্ময়ের পর বিস্ময়, সৌন্দর্য্য আর উত্তেজনা কিছুতেই ভুলতে পারে না। কিন্তু এখন, এক বৃহত্তর উত্তেজনার মুখে, এক প্রত্যক্ষতর, সজীবতর সৌন্দর্য্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তার মন থেকে সিনেমার স্মৃতির হানা সাময়িকরূপে দূর হয়ে গেছে।)

অনেক কথা সে বলতে চাইলে; কিন্তু তার তার অস্ফুট, ভয়-বিকৃত স্বর যা উচ্চারণ করতে পারলো, তা শুধু এ-ই 'না, না—'

'না ? তা কি হয় ?' মিসেস্ গুপ্তর কণ্ঠস্বর—তা-ও যেন একটা আলো, ঘুমের আগে চোখে-এসে-লাগা মোমের নরম আলো— 'আমার গাড়ি তোমাকে চাপা দিতে যাচ্ছিল, আর তুমি একবার আমার বাড়িও যাবে না—তা কি হয় ?' দেবীর মত মিসেস্ গুপ্ত হাস্‌লেন। 'নাও ওঠো গাড়িতে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজে লাভ কী ?' গাড়ি থেকে নাব্বার সময় তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর রেন্-কোট জড়াতে ভুলে গিয়েছিলেন ; হাল্‌কা বৃষ্টির ফোঁটা তাঁর গরদের ওপর কালো-কালো

অক্ষর লিখেই আবার মুছে ফেলছিল। 'নাও, ওঠো।' ছেলেটির হাতে ধরে, একরকম জোর করেই তিনি গাড়িতে তুলে দিলেন। ছেলেটি একবার শেষ, হতাশ চেষ্টা করলে, 'দেখুন আমি—' 'ওঠো, ওঠো,' মিসেস্ গুপ্ত তাকে মৃদু একটা ধাক্কা দিলেন, 'গাড়িতে বসে সব শোনা যাবে।' উঃ, যেমন সে তার দাদার কথার অমান্য করেছে, তেমনি হ'লো তো শাস্তি! দাদা তাকে বার বার করে বলে দেন নি, 'সন্ধ্যে না হতেই বাড়ি ফিরিস কিন্তু...?'

জীবনে এই সে প্রথম মোটার গাড়িতে চড়ল। মোটারে চড়া যে খুব মজার ব্যাপার, তা সে ভেবেছিল, কিন্তু তা যে এত চমৎকার...! কিন্তু ভয়ে উৎকণ্ঠায় এমন চমৎকার ব্যাপারটাও সে উপভোগ করতে পারছিল না। তার কল্পনার অতীত স্বর্গের এই অধিবাসিনী কেন তাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন? আর, কোথায়ই বা নিয়ে যাচ্ছেন? কত দূরে এঁর বাড়ি? সে যদি ভালোয়-ভালোয় ছাড়াও পায়, তবু কি সে পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে? পায়ে হেঁটে বেড়ালেই রাস্তা ঠিক করতে তার সময় লাগে—আর এই বদ্ধ গাড়িতে যেতে যেতে রাস্তা মনে রাখার তো কথাই ওঠে না। ইস্, কেন, কেন, কেন সে আজ বেরিয়েছিলো? বৌদি তো বলেইছিলেন, 'এই বাদ্‌লার দিনে আবার বেরুচ্ছো কোথায়?' দাদা হয়-তো এতক্ষণে আপিস থেকে ফিরেছেন—ফিরেই তার খোঁজ করেছেন। রাত বাড়বে, সে ফিরবে না। সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবে—সে ফিরবে না। কী ভয়ানক! আর, একবার ফিরে গেলে দাদা কী তাকে আস্ত রাখবেন? গদির এক কোণে সঙ্কুচিত, জড়োসড়ো হয়ে বসে সে কাঁপতে লাগলো। মিসেস্ গুপ্ত তা লক্ষ্য করে বললেন, 'শীত করছে বুঝি তোমার?

এই নাও এটা জড়িয়ে বোসো।' ব'লে তাঁর মভ্ রঙের পাৎলা, উষ্ণ রেন্-কোটটা তার দিকে এগিয়ে দিলেন। জিনিষটা ছুঁতে তার সাহস হ'লো না। 'নাও না।' মিসেস গুপ্ত নিজ হাতে কোটটা তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। ঐ দেবীর গাত্রবাস তার শরীরে! তার জামাটা নোঙরা, কাদা-ছিটোনো। ভেতরে ভেতরে সে আরো বেশি কাঁপতে লাগলো। তার গায়ের নিকটতর সংস্পর্শের অপবিত্রতা থেকে কোটটাকে বাঁচাবার জন্য সে একেবারে কাঠের মত শক্ত হয়ে ব'সে রইলো; একটু হাত নাড়তেও সাহস হয় না।

সহাস্য, উজ্জ্বল, মিসেস গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এইবার বলো।'

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে রাস্তা মনে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল; মুখস্থ করছিল উল্লেখযোগ্য সব চিহ্ন, যা দেখে তার মনে পড়বে—মিসেস গুপ্তর কথা শুনে চমকে ফিরে তাকালো।

'কী নাম তোমার?'

'রমেশ।' তারপর তার গ্রাম্য শিক্ষা স্মরণ করে নিজেকে সংশোধন করলে, 'শ্রীরমেশচন্দ্র সরকার।'

'কোথায় থাকো এখানে?'

হায়, হায়, জায়গাটার নাম তো সে ভুলে গেছে! কী, না? কী, না? মনে করবার চেষ্টায় তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল।

'কোথায় থাকো?' মিসেস গুপ্ত পুনরাবৃত্তি করলেন।

হঠাৎ, 'বেলেঘাটা', সে বলে উঠল। হ্যাঁ, বেলেঘাটা, বেলেঘাটা। উঃ, বাঁচন।

'সেখানে কেউ থাকেন বুঝি তোমার?'

'দাদা।' পাছে তার দুর্দমনীয় যশুরে টান বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়ে, যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

'কী করেন তিনি ?'

'কেরাণী।'

'হুঁ।' আহা বেচারা—হয়-তো মস্ত সংসার; যা মাইনে পায়, ভালো ক'রে চলে না। এই ছোট ভাইটিই হয়-তো এখন আশা ভরসা। মিসেস গুপ্তর মন ভিজে উঠলো। 'আর তুমি—তুমি পড়ো বুঝি ?'

'না।' হঠাৎ দেশস্থ গুরুজনদের উপদেশ তার মনে পড়ল। 'আজ্ঞে না।'

'পড়ো না ? ম্যাট্রিক পাশ করেছো তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোন্ ইস্কুল থেকে ?—আর ছাখো, আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় আজ্ঞে বোলো না।' লজ্জায়, আত্ম-ধিক্কারে রমেশের কান গরম হয়ে উঠলো। গাধা, গাধা! 'কোন্ ইস্কুল থেকে ?' মিসেস গুপ্ত আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'অমৃতপুর হাই স্কুল।'

'অমৃতপুর—কোথায় সেটা ? ও, তোমাদের দেশ বুঝি ?'

'আ—' রমেশ তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিলে, 'হ্যাঁ।'

'পরীক্ষার পর দাদার কাছে বুঝি বেড়াতে এসেছো ?'

বেড়াতে ঠিক আসে নি; কিন্তু 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া রমেশ উপায় দেখলে না।

'কলেজে পড়বে না ?'

'দাদা বলেন, কী হবে কলেজে প'ড়ে?—' তার বশুরে টান গোপন করবার চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে থেমে গেলো।

'বুঝেছি, বুঝেছি।' সান্ত্বনার, আশ্বাসের সুরে তিনি বললেন। একজন নয়, দু'জন নয়, দেশে এ-রকম কত ছেলে আছে, পয়সার অভাবে যাদের পড়াশুনো হয় না। হাজার-হাজার। তাদের দিকে কারো কোনো লক্ষ্য নেই—এদিকে বয়কটের ধূম। মাথা-খারাপ সব! সমাজের সব স্তরের মধ্যে কালচার যদি না ছড়ালো, ভারি তো লাভ হবে তা-হলে দেশ স্বাধীন হয়ে! মিসেস গুপ্তর রীতিমত মন খারাপ হয়ে গেলো!

রমেশ এই ফাঁকে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালো। কোথায় এসে পড়েছে! এ সব রাস্তায় সে কখনো আসে নি—কী অদ্ভুত সব রাস্তা, চুপচাপ, দু'দিকে গাছ, একটি লোক নেই, একটু গোলমাল নেই। অন্য সময় হলে তার কাছে খুব সুন্দর লাগতো; কিন্তু এখন তার মনের সে অবস্থা ছিল না। মোড়ের পর মোড়; প্রতি মোড়ের সঙ্গে তার মন যেন একটা কূয়োর মধ্যে আরো গভীরভাবে ডুবে যাচ্ছিল। তার মাথা ঘুরে উঠল। অসম্ভব—এই গোলকধাঁধাঁ মনে রাখা অসম্ভব। কোথায় সে এসেছে—কোথায় বেলেঘাটা—এতটুকু ধারণাও যদি তার থাকত! কী ক'রে, কী ক'রে সে আজ বাড়ি ফিরবে? হয় তো সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরবে, না হয় পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যাবে; যদি কাউকে জিজ্ঞেস করে, হয় তো ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো গুণ্ডার আড্ডায়—ভাবতেও সে শিউরে উঠল। কী হবে, কী উপায় হবে তার? গাড়িটা আর একটা মোড় ঘুরলো। সবগুলো রাস্তা এক রকম দেখতে। তার রীতিমত কান্না পেতে লাগল।

'কলেজে না পড়েই বা করবে কী?'

ঠোঁট কামড়ে, চেষ্টায় চোখের জল আটকে রেখে রমেশ বাধ্য ছাত্রের মত জবাব দিলে, 'দাদা বলছেন, কোনো কাজের চেষ্টা—'

'কাজ?' রূপালি স্বরে মিসেস্ গুপ্ত অল্প একটু হেসে উঠলেন, 'এ বয়েসে তুমি কী কাজ করবে?'

'যা হয়।'

এই কাঁচা বয়েস, অথচ এখনি এই নৈরাশ্য! এর চেয়ে সর্ব্বনেশে, ভয়ানক আর কী হতে পারে? কংগ্রেস কী জন্য হৈ-চৈ ক'রে মরছে? সমস্ত স্বদেশী প্রোপ্যাগাণ্ডার চাইতে এই একটি ছেলের জীবন মূল্যবান। তাকে শিক্ষা দাও, দুরাশা করবার সাহস দাও তাকে। অন্ধকার থেকে তাকে আলোয় নিয়ে যাও। মিসেস্ গুপ্তর দয়ার্দ্র হৃদয়ে একটা প্ল্যান তৈরি হ'য়ে উঠতে লাগলো। মুখে তিনি আলাপ চালালেন, 'এখানে কোথায় এসেছিলে?'

রমেশ সত্যি কথা বলাই সব চেয়ে নিরাপদ মনে করলে, 'মার্কেট দেখতে এসেছিলুম।'

'এই প্রথম এলে বুঝি কল্‌কাতায়?'

'এই প্রথম।'

এই ছেলে—জন্ম থেকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোন্ এক গ্রামে প'ড়ে আছে—কী ক'রে জানবে সে, তার জীবনের কত বিচিত্র, কত দূরস্পর্শী সম্ভাবনা? কেন সবাই কলকাতায় থাকতে পারে না? কলকাতার বাইরে কি আছে? মিসেস্ গুপ্তর 'দেশ' কলকাতায়—তাও দক্ষিণ কলকাতায়—সীমাবদ্ধ; তাঁর নিজের ইচ্ছে মত যদি সব হ'ত, তা হ'লে বাঙলাদেশ এক বৃহত্তর ও

সুন্দরতর কলকাতায় পরিণত হ'ত—কাল্‌চার-মহীরুহের বিশাল ছায়ায় যেখানে সবাই সুখী, সবাই ভালো।

'এখন কলকাতাতেই থাকবে তো?' বলতে বলতে গাড়িটা রোল্যাণ্ড রোডে তাঁর বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকলো।

* * *

লাল, চওড়া সিঁড়ি দিয়ে মিসেস্ গুপ্তর পেছন পেছন ওপরে উঠতে উঠতে দু'দিন আগে দেখা বায়োস্কোপের ছবি রমেশের আবার মনে পড়লো; এত ঐশ্বর্য্য সিনেমার বাইরে সে কখনো চোখে ত্যাখে নি। এ কোথায় এলো সে? স্বপ্ন। স্বপ্নের চেয়েও বেশি। এই বাস্তব তার স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছে। সিঁড়িগুলো ঝক্‌মক্ করছে; একবার নীচের দিকে তাকাতে সেখান থেকে ম্লান একটা মুখ তার দিকে ফিরে তাকালো—উস্‌কোখুস্‌কো চুল কপালে এসে পড়েছে। পাছে আছাড় খেয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সাবধানে, আস্তে আস্তে সে সিঁড়িগুলো পার হয়ে এলো।

সিঁড়ির পাশেই বসবার ঘর; দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে মিসেস্ গুপ্ত বললেন, 'যাও-বোসো গে।'

রমেশ নিজেই টের পেলে না, কখন সে ঘরে ঢুকে হাতের কাছে যে আসনটা পেয়েছে, তাতেই ব'সে পড়েছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তার চারদিকে তাকাতে লাগলো। ঠিক সেই সিনেমার ঘরের মত—না, তার চেয়েও সুন্দর। কত রকম জিনিষ—সবগুলোর সে নামও জানে না। সে যেখানে বসেছে, রীতিমত একটা গর্ত্ত হ'য়ে গেছে। নানা আকৃতির কুশানের ছোট একটি পাহাড়। আল্‌গোছে, সে দু'আঙুল দিয়ে একটা স্পর্শ করলে। কী নরম—

নিশ্চয়ই সিল্কের? তার পায়ের নীচে পুরু কার্পেট—ছিছি, জুতো পরেই সে চ'লে এসেছে; তার জুতো ভরা তো কাদা—দিলে বুঝি ঘর নোঙ্‌রা করে। জুতোটাকে বাইরে রেখে এলেই হ'তো। তার জামা-কাপড়েও এখানে ওখানে কাদার দাগ—কী বিশ্রী! ওই নিয়ে সে এখানে ব'সে পড়লো! ছি-ছি—

'এই যে,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মিসেস্ গুপ্ত বললেন, 'কেমন লাগছে এখন? একটু ভালো?' পাখার রেগুলেটরটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রমেশ দেখলে, তাঁর সঙ্গে আর একজন দেবী এসেছেন; ঠিক তাঁরি মত দেখতে, শুধু তাঁর চাইতে বয়েস কম এবং তাঁর চেয়েও সুন্দর। হাঁ ক'রে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর হঠাৎ সচেতন হ'য়ে মুখ নামিয়ে নিয়ে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠল।

'এখনো তোমার কাঁধের ব্যথা আছে?'

ব্যথাটা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল; ও কথা শুনে যেন একটু ফিরে এলো। মাথা নেড়ে সে বললে, 'না।'

'অমন জড়সড় হয়ে বসেছো কেন? মেয়েকে নিয়ে মিসেস্ গুপ্ত তার উল্টো দিকের একটা সোফায় বসলেন, 'আরাম ক'রে বোসো না।'

তাই তো! ও রকম জবুথবু হয়ে ব'সে থাকা—কী বিশ্রী! এ সব জায়গায় এসে গা এলিয়ে দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বসতে হয়। সে চেষ্টা করলে তাই করতে। কুশানগুলোর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে জুতো থেকে পা খুলে সে ওপরে তুলে বসল। হঠাৎ তার লক্ষ্য হ'লো, তার পায়ের আঙুলগুলো কাদায় নোঙ্‌রা। ভীত, সন্ত্রস্ত, তাড়াতাড়ি সে পা নামিয়ে নিলে। তবু, স্বচ্ছন্দ

হবার ভাব ক'রে এমন অদ্ভুত ভাবে বসল যে খানিকপরেই তার মেরুদণ্ড উঠল টন্‌টন্ ক'রে।

'তুমি একটুও লজ্জা কোরো না, রমেশ', অন্তরঙ্গ সুরে মিসেস গুপ্ত বলতে লাগলেন, 'মনে করো যেন মাসীবাড়ি বেড়াতে এসেছো। আমি তোমার মাসী হই—তাই নয়, রমেশ? আর এ তোমার দিদি। বুঝলে?'

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে রমেশ একজন থেকে আর একজনের মুখে তাকালো। মাসী, দিদি। অসম্ভব। দেবী; সিনেমার পর্দার ওপর ছায়াচিত্র; স্বপ্ন; কল্পনা। তার অতীত, তার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় ঐশ্বর্য্যলোকের সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। মাসী—না, না, ও-সব কিছু নয়। তার এক বিধবা মাসী আছেন—তাদের গ্রাম থেকে ক্রোশ ছয়েক দূরে তাঁর বাড়ি। ছেলেবেলায় সে তাঁকে বাঘের মত ভয় করত। একবার ঠাকুরঘরের প্রসাদ চুরি করে খেতে গিয়ে তাঁর হাতে এমন মার খেয়েছিল যে জীবনে কখনো ভুলবে না। সেদিন গিয়েছিল দেখা করতে—এরি মধ্যে তিনি কী-রকম বুড়ো হ'য়ে গেছেন, মাথাটা প্রায় ন্যাড়া, সামনের দুটো দাঁত প'ড়ে গেছে—দেখতে ভয় করে। ঘরে কিছু ছিলো না; দুপুরের রোদে বেরিয়ে কোন্ বাড়ি থেকে যেন একটু ডাল আর দুটো বেগুন চেয়ে এনে তিনি তাঁর জন্য ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। এতখানি পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত তার মুখে কী অমৃতই লেগেছিল সেই ডাল আর বেগুনসেদ্ধ। মাসীমার নিজের সেদিন কিসের যেন একটা উপোস ছিল।

একজন চাকর এসে তার সামনের টিপাইয়ে ইস্ত্রী-করা কাপড়ে ঢাকা একটা ট্রে রেখে গেলো। একটা অদ্ভুত চেহারার কাচের গেলাশে গরম দুধ।

মিসেস গুপ্ত বললেন, 'খাও।'

'না, না', ব্যাকুল মিনতির স্বরে সে বলে উঠলো।

'খাও না, লজ্জা কী?' ফ্লরেন্স বললে।

'আমায় বাড়ি ফিরতে হবে', হঠাৎ রমেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'এত ব্যস্ত হয়েছো কেন ফেরবার জন্যে?' হেসে ফ্লরেন্স বললে, 'ভালো লাগছে না এখানে?'

'না, না, সে-জন্যে নয়', নিজেকে বোঝাবার চেষ্টায় রমেশ অস্থির হয়ে উঠল, 'মানে, দেরি হয়ে গেলে দাদা—দাদা বলে দিয়েছিলেন কিনা শীগগির ক'রে ফিরতে—' কী ক'রে কথাটা শেষ করবে, রমেশ বুঝতে পারলে না।

'এখনো তো কিছুই দেরি হয় নি—আমাদের সঙ্গে ব'সে একটু গল্প করবে না? কিন্তু তার আগে লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও তো।'

ফ্লরেন্স ভদ্রতার মাত্রা আর এক ডিগ্রী চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'একটু মুখে দিয়ে ত্থাখো তো; ভালো না লাগলে না-হয় খেয়ো না।'

কর্ত্তব্য পালন করবার ধরণে রমেশ ট্রে-র ওপরের কাপড়টা তুলে ফেললে। কত রকম খাবার! এর কোনো জিনিষ সে আগে কখনো দেখেছে বলেও মনে করতে পারলে না। হঠাৎ তার পেটের মধ্যে তীব্র ক্ষিদে চন্‌চন্‌ ক'রে উঠল। কখন দুপুরবেলায় সে ভাত খেয়েছে—তার ওপর সারাটা বিকেল হেঁটে বেরিয়েছে; এতক্ষণ খিদের কথা তার মনে ছিল না—কিন্তু এখন, এই মুহূর্ত্তে যেন আর সহ্য হচ্ছে না। গোগ্রাসে গিল্‌তে গিয়ে তার গলায় খাবার আটকে গেল; অস্পষ্টস্বরে সে বলে উঠল, 'একটু জল।'

ফ্লরেন্স উঠে গিয়ে নিজ হাতে তাকে জল এনে দিলে। বললে 'একটু আস্তে আস্তে খাও।' রমেশ আকণ্ঠ আরক্ত হয়ে উঠল। গাধা! ও-রকম করে কোনো ভদ্রলোক কখনো খায়! কিন্তু একবার তার খিদে যখন জাগ্রত হয়েছে, লজ্জাতেও তা প্রশমিত হ'লো না; জল খেয়ে নিয়ে এক এক করে সে সবগুলো খাবার খেয়ে ফেলল!

মিসেস্ গুপ্ত বললেন, 'এইবার দুধটুকু খাও। শরীর ভালো লাগবে।'

রমেশ হয়-তো একটু অতিরিক্ত শব্দ করে যথাসম্ভব কম সময়ে দুধটুকু শেষ করে ফেললে।

'এখন:ভাল লাগছে বেশ?'

এত তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করে রমেশ একটু ক্লান্ত, আচ্ছন্ন বোধ করছিল। মূঢ়ের মত অর্থহীন হেসে মাথা নাড়লে।

'ফ্লরেন্স', (বাইরের যে কোনো লোক উপস্থিত থাকলে মেয়েকে ফ্লরেন্স বলে ডাকা মিসেস্ গুপ্তর অভ্যাস; নিজেদের মধ্যে তিনি মেয়েকে মিনু বলে ডাকেন।) 'আজ যে নতুন রেকর্ডগুলো আনলুম, তা থেকে একটা দাও না, শুনি। রমেশ তুমি গান ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ' বলাই রমেশ উচিত মনে করলে।

'গান—গানের মত জিনিষ কি আর আছে?' আবেশে, মিসেস্ গুপ্তর চোখ অর্দ্ধনিমীলিত হয়ে এলো। 'একমাত্র গানের প্রভাবেই শরীরের বন্ধন থেকে আমাদের আত্মা মুক্তি পেতে পারে—তাই মনে হয় না তোমার? কী-রকম গান তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে?' কী-রকম গান? কী-রকম গান? একটা উত্তরের জন্য রমেশ আকাশ পাতাল খুঁজতে লাগলো। কিন্তু, 'উর্দ্দু একটা গজল

শোনো,' তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে মিসেস্ গুপ্ত বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য্য! শুনতে শুনতে তোমার মনে হবে, তোমার পা যেন মাটিতে নেই, তুমি যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছো। রবিঠাকুরের সেই কবিতা জানো তো?—যাই, যাই, ডুবে যাই, আরো, আরো ডুবে যাই,—ঠিক সেই রকম।'

কিন্তু রমেশের সে-রকম কিছুই মনে হ'লো না। সত্যি বলতে, গানটা সে ভালো করে শুনতে পায় নি। সারাক্ষণ, কত শীগ্‌গির সে এখান থেকে ছাড়া পাবে, কী করে সে বাড়ি পৌঁছবে, এই ভাবনা নিয়ে তার মন ছিল ব্যস্ত। মনে পড়ল, দাদা বলে দিয়েছিলেন যে পথ হারিয়ে গেলে একবার ট্র্যামের রাস্তায় পড়তে পারলেই হ'লো; যে কোন জায়গা থেকে ট্র্যামে ক'রে শেয়ালদা আসা যায়। আর, শেয়ালদা একবার পৌঁছতে পারলে বাকি পথটুকু সে হেঁটেই চ'লে যেতে পারবে। ভাগ্যিস তার পকেটে এখন দু'আনা পয়সা আছে; বৌদি কাল কতগুলো জিনিষ কিন্‌তে দিয়েছিলেন, তা থেকে বাচিয়েছিল। তেমন বেগতিকই যদি ছাখে ঝাঁ করে ট্র্যামে চ'ড়ে বসবে; যাবেই না হয় দু'আনার পয়সা—তবু বাড়ি তো পৌঁছতে পারেবে। ট্র্যামের রাস্তা, যে-কোনো ট্র্যামের রাস্তায় কি আন্দাজে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে না পড়তে পারবে!

একটা শেষ করুণ টানে কাঁপতে কাঁপতে গান থেমে গেলো। তাঁর উজ্জ্বল মুখ, উজ্জ্বলতর, রমেশের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগলো।'

'চমৎকার,' দুর্ব্বলভাবে রমেশ বললে।

'আর একটা শুনবে?' বিপদ থেকে রমেশকে তিনি নিজেই উদ্ধার করলেন, 'আচ্ছা, থাক্। বরং এসো এই ছবিগুলো দেখবে।' রমেশকে সর্ব্ববিধ কালচারে দীক্ষিত করতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এসো। ছবি তোমার খুব ভালো লাগে নিশ্চয়ই?' কোনো কোনো ছবির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, তা-ই নয়? আমারো তা-ই ইচ্ছে করে, কিন্তু জীবনে সময় এত কম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'এসো।'

রমেশকে উঠতে হ'লো। ফ্লরেন্সও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। দু'জনের মাঝখানে বন্দী, ঘরের দেয়ালের সবগুলো ছবি সে দেখে গেল। অন্যমনস্কভাবে—কারণ, একটা ছবিও তার মনকে টানছিল না। যীশুখৃষ্ট, মায়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশু, দু'সার গাছের মাঝখানে একটা রাস্তা, প্রকাণ্ড গোঁফ-ওলা, জাঁদরেল একটা টুপি-পরা লোক—ও-সব কেমন ছবি! কিন্তু জোর ক'রে সে ভালো লাগাবার চেষ্টা করলে, ভালো লাগাতে পারছে না বলে নিজের মূর্খতার, নির্ব্বুদ্ধিতার লজ্জায় মনে মনে সে প্রায় মরে গেল। তার দু'দিকে দেবীরা অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বসিত কথা ব'লে যাচ্ছেন; সমস্ত মন দিয়ে সে তা শোনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু থেকে-থেকে কেবলি তার বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। আজ একবার ভালোয়-ভালোয় পৌঁছতে পারলেই হয়—আর কখনো সে সন্ধ্যের পর বাইরে থাক্‌বে না। কখনো নয়। না জানি কত রাত হ'য়ে গেছে; দাদা হয়-তো আগুন হ'য়ে আছেন: 'একবার বাড়ি আসুক হতভাগা, ওকে বুঝিয়ে দেবো...'

মিসেস গুপ্তর রাফায়েল-স্তবের মাঝখানে সে হঠাৎ ব'লে উঠল, 'আমাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ, ফিরবেই তো; আর একটু ব'সে যাও।' মিসেস গুপ্ত একটু স'রে গিয়ে ফ্লরেন্সকে নিম্নস্বরে কী-যেন বললেন, ফ্লরেন্স ঘর থেকে চ'লে গেলো। 'আর একটু', আদরের সুরে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ছবিগুলো ভালো লাগলো তোমার? লাগলো? খুসি হ'লাম শুনে। আমার কাছে আরো ঢের ছবি আছে; আবার যেদিন আসবে, সব দেখবে। আবার আসবে তো? তোমার এই নতুন মাসীকে ভুলে যাবে না তো?' অস্পষ্ট ভাবে, রমেশ মাথা নাড়লে। 'বলো, আসবে।'

'আসবো।' এ-বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য যে-কোনো, যে-কোনো উপায়! তার শরীরটাও এখন ভালো লাগছে না, একটু বমি-বমি করছে। অতগুলো মিষ্টি তখন না খেলেই পারত।

'বই পড়তে তুমি খুব ভালবাসো—না, রমেশ?'

'খুব।' এ ছাড়া কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব মনে হ'লো না।

'আমাদের রবীন্দ্রনাথের অনেক বই তুমি পড়েছ—পড়ো নি?'

'কথা ও কাহিনী পড়েছি।' তারপর—তার অতীত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেকটা আন্তরিকভাবে ব'লে ফেললে, 'পুরাতন ভৃত্যটা চমৎকার।'

মিসেস গুপ্ত মনে-মনে হাসলেন। রমেশের জন্য তার দুঃখ হ'ল। আহা বেচারা—এখনো কী অন্ধকারে সে প'ড়ে আছে! কিন্তু আর বেশিদিন নয়—শীগ্‌গিরই তিনি তাকে আলোর জগতে নিয়ে আসবেন। এই ছেলেই হয়-তো এক কালে দেশের বিখ্যাত কৃতীদের মধ্যে একজন হবে। ভাবতেও তাঁর বুকের ভেতরটা জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে উঠল।

'তোমার নিশ্চয়ই আরো অনেক বই পড়তে ইচ্ছে করে?' তাঁর সব চেয়ে মধুময় কণ্ঠস্বরে মিসেস গুপ্ত বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই নানা বিষয় জানতে ইচ্ছে করে? মনে-মনে নিশ্চয়ই তুমি কলেজে পড়তে চাও—চাও না?'

'দাদা বলেছেন', অনুগত ছোট ভাইয়ের মত রমেশ বললে, 'আমার কলেজে প'ড়ে কাজ নেই—'

''কিন্তু কলেজে যে তোমাকে পড়তেই হবে, রমেশ। তোমার দেশ যে তোমাকে দিয়ে তা-ই চায়। বুঝতে পারছ না—ভালো লেখাপড়া শিখলে তুমি কত বড় হ'তে পারবে! তোমার দাদার যদি তাতে কোনো রকম অসুবিধে হয়', ব্যাপারটাকে তিনি যথাসম্ভব মৃদুভাবে বললেন, 'সে-জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তোমার কোনোরকম খরচ লাগবে না।' রমেশের আত্মসম্মানে যাতে ঘা না লাগে, সে-জন্য তিনি যত্ন নিলেন, 'আমার চেনা এক কলেজ আছে, সেখানে তোমাকে অমনিই নেবে; আর যা-কিছু, তার জন্যে তো আমিই আছি, তোমার নতুন মাসীমা—নেই কি? তোমার দাদাকে গিয়ে বোলো: 'আমার এক মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে—মিসেস গুপ্ত নাম—তিনি আমার কলেজে পড়বার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।' কেমন, বলবে তো?"

রমেশ বললে, 'আচ্ছা।'

'তা-হলে এই কিন্তু ঠিক রইলো আমাদের দু'জনের মধ্যে। দেখো, শেষটায় যেন ভুলে না যাও। দিনের বেলায় শীগ্‌গিরই একদিন এসো; যদি পারো, কালই এসো। আমি তোমাকে কলেজে নিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেবো। কলেজে পড়বে ভাবতে তোমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে না?' রমেশ বললে, 'নিশ্চয়ই।' তার বমির

ভাবটা ক্রমশই বাড়ছিল। পাছে সত্যি-সত্যি বমি হয়ে যায়, এই ভয়ে তার শরীরের রক্ত যাচ্ছিল হিম হয়ে।

'আচ্ছা, তুমি তাহলে একটু বোসো; আমি এক্ষুনি আসছি।' মিসেস্ গুপ্ত তাকে ঘরে একা রেখে চলে গেলেন।

এই সুযোগ। এ-সুযোগ হারালে আবার কতক্ষণের জন্য আটকা পড়ে যায় কে জানে? আস্তে আস্তে উঠে রমেশ ঘরের বাইরে গেল। তার বুক দুড়্‌দুড়্‌ করছিল; সম্ভাব্য দর্শকের চোখে কোনোরকম সন্দেহের উদ্রেক না ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সিঁড়ি দিয়ে সে নেবে গেল। নীচে দু'একজন চাকর-বাকর ঘোরাঘুরি করছে—কেউ তার দিকে একবার তাকালেও না। সাহস পেয়ে সে স্থিরপদে বাড়ির বাইরে চ'লে এল; তারপর আবার গতি বাড়িয়ে দিয়ে চট্‌ ক'রে ফটক পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। গাড়িটা যেদিক থেকে এসে ঢুকেছিল ব'লে তার মনে পড়ল—যা থাকে কপালে—আরো দ্রুতপদে সেই দিকে সে হাঁটতে লাগলো।

* * *

মার নির্দ্দেশমত ফ্লরেন্স আলমারি থেকে খানকয়েক বই বেছে রাখছিল; মিসেস্ গুপ্ত এসে সেগুলো একবার দেখলেন। ছোট স্তূপের মধ্যে একখানা সহজ বিজ্ঞানের বই জুড়ে দিলেন; কোলরিজ বদলে শেলির একটা ছোট ভল্যুম রাখলেন। 'এই ঠিক হয়েছে, চলো এবার।' বসবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'তোমার নতুন মাসীমার কাছ থেকে খানকয়েক—' কিন্তু তাঁর কথাটা শেষ হ'লো না; কোথায় সে?

'মিন্নু, এরি মধ্যে কোথায় গেলো ছেলেটা?'

খোঁজ নিয়ে লক্ষ্মণের কাছ থেকে জানা গেলো, সে চ'লে গেছে।

মিসেস্ গুপ্ত রীতিমত আহত হলেন।—'কী রকম ছেলে, দেখলি, মিন্নু? এত আদর যত্ন করলুম—শেষটায় কিনা একটা কথা না ব'লে চলে গেল! আমার কত ইচ্ছে ছিল—'

'সে কথা ব'লে আর লাভ কী, মা?' শুষ্কস্বরে ফ্লরেন্স বললে, 'যার যা হবার নয়, তাকে দিয়ে কি তা কখনো হয়? চ'লে গেছে, ভালোই হয়েছে; ঘর থেকে কোনো জিনিষ যদি তুলে না নিয়ে গিয়ে থাকে, তাই তোমার ভাগ্যি।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

সাংবাদিক মহলে থম্‌থমে ভাব। একটা ভাল খবর নাই—একটা জবর জুৎসৈ খবর। লোকে পড়িয়া অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও একটু হৈ-চৈ করে, দু'ঘণ্টার জন্যও হা-হুতাশ করে, বৈঠকখানায় চা খাইতে খাইতে বলে, 'কাগজখানা পড়েছ ত রাধু—?' আপিসে গিয়া বলে, 'আর শুনেছ যদুবাবু—?' কাঁহাতক জয়াকর-সকাশে রামস্বামীর দূতিয়ালী আর সাপ্রু-উইলিংডন সংবাদ লিখিয়া পাতা ভরানো যায়। তারপর আবার রামস্বামীর সঙ্গে রঙ্গস্বামীর নাম গুলাইয়া যায়। পাঠকদেরই বা দোষ কি, কত নাম মনে রাখিবে? সাংবাদিকেরা বরং সে-সব কথা ফেনাইয়া ফেনাইয়া লিখিতে চায়, তবু ত লিখিবার একটা বিষয়-বস্তু পায়। কিন্তু সম্প্রতি তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, পাঠকদের এ-বিষয়ে এতটুকু কৌতূহল নাই। নইলে মডারেটী ভাঙা কুলোর উপর চটাপট শব্দ করিলে, কে-ই বা কি বলে? এ সরকারও নয়, সুয়োরাণীও নয়।

* * *

সংবাদ-শিকারীরা বাতাসে ফাঁদ পাতিয়া—আকাশের চাঁদ নয়—পৃথিবীর সংবাদ ধরে। জালে পাখীটা-আসটা আটকাইয়া গেলেও লাভ। সম্প্রতি ফ্রী-প্রেসের ফাঁদে এমনি একটি খবর পড়িয়াছে। সে খবরের সঙ্গে রাজনীতি বা অর্থনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, মানব নীতির সম্পর্ক থাকিতে পারে। তবে আজকাল মানবধর্ম্মশাস্ত্রের মত মানবনীতির চল্‌ও সমাজে বড় নাই। সংবাদটি এই—

ঘটনাটি ঘটিয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায়: একদা এ-দেশটি জার্ম্মান শাসনে ছিল; এখন অবশ্য ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের অধীনে। ইউনিয়ন—কি-না ইউনিয়ন অফ সাউথ-আফ্রিকা, অর্থাৎ নাটাল,

ট্রান্সভাল প্রভৃতি প্রদেশের সম্মিলিত শাসনতন্ত্র। এখানে একটি একরত্তি দেশী রাজ্য আছে—ইউকুসন্বি। তার সর্দ্দারের নাম ইউপুম্বু। ইউপুম্বুর দুই স্ত্রী। বেচারা। এক স্ত্রী কোন কারণে পালাইয়া সেখানকার পাদ্রীদের আড্ডায় আশ্রয় নেয়। স্বামী আড্ডায় গিয়া স্ত্রীর স্বামিত্ব দাবী করে। বে-আদব। অতএব আদালতে শাস্তি হইল—জরিমানা ট্রেসপাসের চার্জ; মিশনারী আশ্রমে ঢুকিয়া স্ত্রীর দাবী করা অনধিকার-প্রবেশ। অনধিকার-প্রবেশের মত গুরুতর পাপ আর নাই।—হে শ্বেতাঙ্গ-আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, উহাদের পাপ ক্ষমা করিও না। Forgive not their trespasses। অতএব জরিমানা হইল দশটি গরু আর মহিষ। নির্ব্বোধ সর্দ্দার গোঁ ধরিল, জরিমানা দিবে না। যা-নয় তা-ই। ইউনিয়ন-সরকারের টনক নড়িল। তুচ্ছ ইউকুসন্বির তুচ্ছতম সর্দ্দার জরিমানা দিতে অস্বীকার করে! পিপীলিকার পালক গজাইয়াছে। একটা lesson, একটু শিক্ষা দিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সে-শিক্ষা আদিম অধিবাসীদের মনে চিরকাল কাজ করিবে। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকার বাতাস বাহিনীর সেনাপতি স্বয়ং—বিমানে বোমা এবং সাঁজোয়া-গাড়ীতে গুলি-গোলা লইয়া ছুটিল—শ্বেতাঙ্গের বোঝা নামাইতে। White man's burden ক্রমে-ক্রমে অত্যন্ত ভারি হইয়া পড়িয়াছে। সর্দ্দার মরিয়া। তার লোকজন দুই-চারিটা গুলি ছুঁড়িল। তারপর বিধ্বস্ত রাজ্য ছাড়িয়া সর্দ্দার ইউপুম্বু কোথায় চলিয়া গেল, কে জানে? ইউকুসন্বির হেলেন অর্থাৎ সর্দ্দারের স্ত্রী সম্ভবত মিশনারী-আশ্রমে সেলাই এবং বানান শিক্ষা করিতেছে, এখনকার দিনে নিরক্ষর হইলে আয়ার কাজ মেলে না।

১ম বর্ষ] ১লা আশ্বিন, ১৩৩৯ [১৪শ সংখ্যা

লক্ষ্যভেদ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

এমন কিছুই নয়।

স্বামী রোজ যে সময়ে কাজ হইতে ফিরেন, আজ ফিরিতে তার চেয়ে একটু দেরী হইয়াছিল। দেরী যে হইয়াছিল অমিয়া তাহা খেয়ালও করে নাই, নামজাদা মার্কিন নভেলিষ্টের নতুন বইয়ের পাতায় তার মন নিবিষ্ট ছিল। এমন সময়ে স্বামী টুপীটি খুলিয়া হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—ওঃ, আমার বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, ক্ষমা কোরো।

অমিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। স্বামীর দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—এটা কি রসিকতা না etiquette ?—তারপর সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

চ্যাটার্জ্জি সাহেব কিছুক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে নিজের পোষাক-কামরার দিকে প্রস্থান করিলেন।

এ যেন নাটকের একটা দৃশ্য চোখের উপর অভিনীত হইল। সুরুচিসঙ্গত গৃহসজ্জায় সজ্জিত কক্ষ। তরুণী গৃহকর্ত্রী স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া। স্বামীর আসিতে দেরী দেখিয়া একখানি বই লইয়া সময় কাটাইতেছেন। কক্ষান্তরে খাবার সাজাইয়া রাখিয়াছেন, স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিবেন। এমন সময় স্বামী আসিলেন। বড় দেরী করিয়াছেন, তাই একটু অনুতপ্ত। অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব, তবু মুখে ক্ষমাপ্রার্থীর ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাব। হয়ত ভাবিয়াছিলেন স্ত্রীর নিকটে ক্ষমা চাহিয়া মিষ্ট ভৎসর্না লাভ করিবেন, অথবা একটু হাসি। হঠাৎ কেমন করিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। এ নাটকের মধ্যে রৌদ্র রসের সম্ভাবনা কোথাও ছিল না। তবুও রৌদ্ররস আসিয়া পড়িল। ফলে মিলনান্ত নাটক বিয়োগান্ত হইয়া পড়িল।

কেন হইল তাহা বলিতে হইলে আগের কথা বলিতে হয়।

আজ ছয় মাস হইল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সুধীর চ্যাটার্জ্জির সহিত অমিয়ার বিবাহ হইয়াছে। অমিয়ার ইচ্ছাতেই বিবাহ হইয়াছে। অর্থাৎ অমিয়ার সঙ্গে দেখা হইবার পর হইতে বিবাহপ্রস্তাব ওঠা পর্য্যন্ত মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। তিনি

পাশ করিয়া বিলাত হইতেই মোটা মাহিনার চাকুরী পাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এই খবর প্রকাশ পাইবার পর হইতে মিঃ চ্যাটার্জ্জি যখন পরিচিত ও অর্দ্ধপরিচিত বিবাহযোগ্যা কন্যার মাতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আজ এ বাড়ীতে কাল ও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছিলেন, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেওয়ারিস ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন একদিন হঠাৎ অমিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হইল।

একঘর লোকের মধ্যে অমিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়াছিল কিনা আমরা জানি না, তবে তাঁর সম্বন্ধে সকল খবর তার জানা ছিল এটুকু আমরা বলিতে পারি। বাল্যবন্ধু দীপ্তি সেনের সঙ্গে অনেক দিনের পরে দেখা। তার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অমিয়া অন্যমনস্কভাবে মিঃ চ্যাটার্জ্জির ঠিক পিছনটাতে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি ও অমিয়াকে পাশাপাশি দেখাইতেছিল ভাল। দীপ্তির মোটে দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, এর মধ্যে সে বেশ মোটা, গোলগাল হইয়াছে, কালো রংটি চকচকে হইয়াছে, ছোট্ট, কালো কপালে সিঁদুরের টিপটি মানাইয়াছে ভাল। তার পাশেই অমিয়া, টকটকে রং, চোখা নাক-মুখ, পরিপাটি বেশ। চেহারায়, পোষাকে, চলনে, বলনে একটুও গরমিল নাই। দীপ্তির কি কথার উত্তরে সে বলিতেছিল,

—তোর যেমন কথা। He deserved to be snubbed। আভার মত মেয়েকে সে পেতে চায় কিসের জোরে—a loafer, vagabond.

দীপ্তি বলিল,—একটু আস্তে আস্তে বল্, সবাই শুনতে পাবে। তারপর তোর সেই যে নাম কি মিষ্টারের খবর কি ?

অমিয়া—আমার মিষ্টার এখনও গোকুলে বাড়ছেন।

দীপ্তি হাসিয়া ফেলিল,—এখনও বাড়ছেন, তবেই হয়েছে।

সে কনুই দিয়া অমিয়াকে একটু ঠেলিয়া দিল। এই সামান্য ঠেলাতে কি করিয়া অমিয়ার রুমাল তার হাত হইতে ছিটকাইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জির পায়ের কাছে পড়িল তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু বোঝা না গেলেও রুমাল মিঃ চ্যাটার্জ্জির পায়ের কাছে পড়িল। তিনি বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ রুমালখানি তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই অমিয়া মধুর হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। রুমাল পাইয়া আরও মধুর হাসিয়া বলিল--থ্যাঙ্কস্।

সেই মুহূর্ত্তে চারি চক্ষে মিলিল। তারপর হইল আলাপ। প্রথম দিনে অমিয়ার সঙ্গে, দ্বিতীয় দিনে তার মায়ের সঙ্গে, তৃতীয় দিনে তার ভাই-বোনদের সঙ্গে, তারপরে তার বাপের সঙ্গে। তারপরে হইল চায়ের নিমন্ত্রণ। চায়ের নিমন্ত্রণের পরে হইল টেনিস খেলিবার নিমন্ত্রণ। টেনিস খেলিতে খেলিতে ডিনারের নিমন্ত্রণ। ডিনার খাইতে খাইতে বায়স্কোপ দেখিবার নিমন্ত্রণ। একদিন সিনেমা, একদিন গান। রবি ঠাকুরের গান পিয়ানোর সঙ্গে। চ্যাটার্জ্জি সাহেব যা পান তাইতেই মহাখুসী। আরও যে চাহিবার আছে, আরও যে পাইবার আছে, তাহা তাঁর মনে হয় না। তা না হোক কিন্তু অমিয়ার চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে চিনিতে বাকি নাই। তিনি অতিশয় বিশ্বাসী লোক। কিন্তু অমিয়া তবুও তাকে একা

কোথাও যাইতে দেয় না। যদি পার্টি সিনেমা ভাল না লাগে অমিয়া তাঁর পাশে বসিয়া ক্যাজুরিনা এভিনিউ দিয়া গাড়ী চালাইতেও প্রস্তুত। মিঃ চ্যাটার্জ্জি কোন-কিছুতে আশ্চর্য্য হন না, আপত্তিও করেন না।

দুই এক মাসের আলাপের ফলে অমিয়া আবিষ্কার করিল মিঃ চ্যাটার্জ্জির একটি মহাদোষ আছে, সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে যাহা একেবারে অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। মিঃ চ্যাটার্জ্জি অত্যন্ত মুখচোরা, বাড়াবাড়ি রকমে মুখচোরা। গোঁফ উঠিবার পরেও যে-সকল অল্পবয়স্ক পুরুষমানুষের এই মুখচোরা-দোষ কাটে না, সময়ে সময়ে তাহাদের নিয়া মেয়েদের বড় বিপদে পড়িতে হয়। অবশ্য তাই বলিয়া অভদ্রতা কেহ পছন্দ করে না, অমিয়াও করে না। মনে আছে একবার দার্জ্জিলিং যাইবার পথে ঘুম ষ্টেশনে এক ইংরেজ ছোক্‌রা কুয়াসায় যেন পথ দেখিতে পাইতেছে না এই ভাণ করিয়া তার গায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ে। অমিয়ার বিলি কুকুরের লোহার শিকলের আস্বাদ পাইয়া তার বিয়ারের নেশা এক সেকেণ্ডে কাটিয়া গিয়াছিল, চোখটা কানা হইয়াছিল কিনা কে জানে? কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে সকলেই যাহা বলে সে-সব কথা বলিতেও কি তাঁর ভদ্রতা-জ্ঞানে বাধে? অমিয়াকে সে-সময়ে যদি কেহ বলিত যে সে মিঃ সুধীর চ্যাটার্জ্জির প্রেমে পড়িয়াছে তাহা হইলে সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু তার প্রসাধনের বৈচিত্র্য, মিঃ চ্যাটার্জ্জির জন্য ব্যস্ততা, নিজের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি বিমুখ ভাব—এ সব দেখিয়া অমিয়ার ভায়েরা তাকে ঠাট্টা করিত! আসল কথা, অমিয়া নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও চ্যাটার্জ্জি সাহেবকে হয়ত সত্যই ভালবাসিয়া

ফেলিয়াছিল। কেনই বা বাসিবে না? মিঃ চ্যাটার্জ্জি লোফারও নন, ভ্যাগাবণ্ডও নন। বেশ মোটা মাহিনা পান, নিজের গাড়ীও আছে। ক্যাডিলাক অবশ্য নয়, ক্যাডিলাক অমিয়ার বাবারও নাই, কিন্তু বুইকই বা মন্দ কি?

শেষে প্রার্থিত দিন আসিয়া পড়িল। চ্যাটার্জ্জি সাহেব প্রোপোজ করিলেন! সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে অমিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে প্রোপোজ করাইল। তবে ফল ত সেই একই, যেই প্রোপোজ করুক না কেন? একজনের যদি কিছু ত্রুটি থাকে, অপরের কি সেটা সারিয়া লওয়া উচিত নয়? তা না হইলে তারা সংসার করিবে কেমন করিয়া? প্রোপোজ করাইয়া অমিয়া তাহা য়্যাকসেপ্ট করিল। পিতামাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন, বন্ধুরা অভিনন্দন জানাইল। তারপর একদিন পবিত্র হিন্দু মতে সুধীর চ্যাটার্জ্জি ও অমিয়া মিত্র পবিত্র বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

অমিয়া মুক্তি পাইল, চ্যাটার্জ্জি সাহেবকেও মুক্তি দিল। সত্য কথা বলিতে কি, অষ্টপ্রহর ঐ মুখচোরা, অতিশয় ভদ্র ভাবী-বরের উপর দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সে বাস্তবিক একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আভা, বেলা, মিনা, মিলি যার ইচ্ছা এখন মিঃ চ্যাটার্জ্জির দিকে নজর দিক, ফ্লার্ট করুক, অমিয়া চ্যাটার্জ্জি কিছু গ্রাহ্য করে না।

তারপর অমিয়া স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। সে এক রকম নির্ব্বাসন বলিলেও চলে বাংলার বাহিরে এক পার্ব্বত্য

অঞ্চলে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাংলো। সহর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে সেই বাংলোতে থাকিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে কাজ করিতে হয়। খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীকে বাঁধিতে হইবে, তারপর লোহার লাইন বসিবে, সেই লাইনের উপর দিয়া সরকারের গাড়ী যাইবে। সে-নদীও সে-বাংলো হইতে দশ মাইলের কম নয়।

নববিবাহিতা পত্নীকে এ হেন কর্ম্মস্থানে আনিবার জন্য মিঃ চ্যাটার্জ্জি অনুতপ্ত হইলেন। প্রথম উচ্ছ্বাসের জোয়ার কাটিয়া যাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিতে লাগিলেন একি করিলেন তিনি! এ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে অমিয়া কি করিয়া থাকিবে? এখানে থিয়েটার নাই, বায়স্কোপ নাই, সোসাইটি নাই,—নিজের সুখের জন্য একটি মেয়েকে স্বার্থপরের মত কেন এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন? একবার তার দিকটা চিন্তা করিয়াও দেখেন নাই। মিঃ চাটার্জ্জি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, তিনি যে কত স্বার্থপর অমিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এই চিন্তা করিয়া তিনি আরও বেশী লজ্জা বোধ করিলেন। এদিকে স্বামীর কর্ম্মস্থানে আসিয়া অমিয়ারও একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া সে মুক্তির আরাম পাইল, না—নূতন বন্ধনের পীড়া অনুভব করিল, তাহা যেন সে নিজেই স্থির করিতে পারিল না। অমিয়ার দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

অমিয়ার সঙ্গে দেখা হইবার পর হইতে সর্ব্ব বিষয়ে তাঁকে পথ দেখাইয়াছে অমিয়া। কোন্ সময়ে কোন্ সুট পরিলে তাঁহাকে smart দেখায় তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়া তাঁহার ভিতরকার

পোষাক নির্ব্বাচন শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাহাকে বুঝাইয়াছে যে শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায় নাই বলিয়াই যে ল্যাম্প-পোষ্টের মত খাড়া দাঁড়াইতে হইবে তার কোন মানে নাই, দেখিলে লোকে মনে করিবে তিনি এখনও green আছেন এবং তাই মনে করিয়া অযথা সুবিধা লইতে চেষ্টা করিবে। কোন মেয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেই যে তার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। একটু হাসিলেই সে মনে করিবে যেন তোমার উপর তার দখল জন্মিয়া গিয়াছে। বিবাহিত পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে বেশী আড্ডা দিতে নাই, তারা কেবল লোককে বকাইয়া দেয়, ইত্যাদি শতপ্রকার উপদেশ শুনিতে শুনিতে বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই অমিয়ার উপর নির্ভর করা মিঃ চ্যাটার্জ্জির অভ্যাসের মত হইয়া গিয়াছিল।

একসঙ্গে হোটেলে গিয়া কি খাওয়া হইবে তার অর্ডার নিজে না দিতে পারিলে যে-অমিয়া তুষ্ট হইত না এবং কোন্ জিনিষটা বেশী খাইলে মিঃ চ্যাটার্জ্জির অসুখ করিবে অক্লেশে যে বলিয়া দিত, বিবাহ হইবার পরেই সেই অমিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এমন উদাসীন্য অবলম্বন করিল কেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

সকালে কাজে যাইবার জন্য ন-টার মধ্যে খাইয়া তিনি গাড়ীতে উঠিতেন। গাড়ী রওনা হইলে পাইপ ধরাইয়া, ঠেস দিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া তিনি ভাবিতে চেষ্টা করিতেন। অসমান পাহাড়ী পথে গাড়ী চলিত, হেলিয়া-পড়া দুই-চারিটা গাছের সরু ডাল গাড়ীখানার নির্ম্মম গতির কথা মনে করিয়া আগে হইতেই থর থর করিয়া কাঁপিতে সুরু

করিত, কোন ডাল হইতে একটি লতা তার অবিন্যস্ত অঞ্চলের মত রাস্তার উপর দুলিত, গাড়ী দেখিয়া সেও ডালের মতই কাঁপিত। মিঃ চাটার্জ্জি চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিতেন। অমিয়াকে এখানে আনাতে কি সে রাগ করিয়াছে না দুঃখিত হইয়াছে? ভাল লাগিতেছে না এ-কথা ত সে স্পষ্ট করিয়া বলে না। বরং একএকদিন তার ব্যবহারে মনে হয় সে বেশ আছে। একদিনের কথা তাঁর মনে হইল। তিনি পোষাক পরিতেছিলেন, হঠাৎ অমিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাঁর পোষাক পরা দেখিল। তিনি কামিজ পরিতে উদ্যত হইলে টানিয়া কামিজটা কাড়িয়া লইল, তারপর ছেলেমানুষের মত তাঁর হাতের পেশী টিপিয়া দেখিল, হাত ভাঁজ করিলে পেশী কেমন ফুলিয়া ওঠে তাহা দেখিল, দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'রেগুলার স্যামসন!' তারপর তাঁর কাধের উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—আমাকে একটু আদর কর। সময়ে সময়ে অমিয়া বড়ই ছেলেমানুষী করে।

আবার সময়ে সময়ে তাহার মাথায় কি যে অদ্ভুত আইডিয়া আসে ভাবিলেও হাসি পায়। কয়েক দিন আগে গাড়ীতে বেড়াইতে বেড়াইতে তার সখ হইল হাঁটিয়া বেড়াইবে। হাঁটিতে হাঁটিতে দুইজনে একটা ছোট টিলার মাথায় উঠিলেন। একটা আলগা পাথরে অমিয়া পা রাখিতেই আচমকা সেটা গড়াইতে লাগিল। অমিয়া পড়িয়া যাইবার আগেই তিনি তাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন। পাথর খানা টিলার ঢালু না বহিয়া নীচে গড়াইতে লাগিল। অমিয়া বড় কাঁপিতেছিল। কোলে করিয়াই তাকে তিনি খানিকটা দূরে লইয়া গেলেন। একটা সমান জায়গায় নামাইয়া দিয়া বলিলেন,—একটু রেষ্ট

নাও, বড্ড ভয় পেয়েছ। অমিয়া কাঁপা গলায় তাঁহাকে বলিল,—বোসো। তিনি বসিলে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিল। তারপর চোখ বন্ধ রাখিয়াই বলিল,—তোমার গায়ে খুব জোর আছে, না? আচ্ছা, দেখি কেমন পার, আমাকে একেবারে পিষে দাও দেখি, যাতে হাড়গুলো ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে যায়, আমি মরে যাই। তিনি ধমক দিলেন,—কি নার্ভাস তুমি, একটু য়্যাকসিডেণ্টের ভয়েই মাথা গুলিয়ে গেছে!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি চোখ বন্ধ করিয়া এই সব ভাবিতে লাগিলেন। তারপর তাঁর গাড়ী গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া গেল, মাদ্রাজী য়্যাসিষ্টাণ্ট ছুটিয়া আসিয়া মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিল, কাজের কথা আরম্ভ হইয়া গেল।

এমনি ভাবে দিন যায়। সংসার নিয়ম মতই চলে, কিন্তু সে-সংসারকে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর সংসার বলিয়া কাহারও মনে করা কঠিন। মিঃ চ্যাটার্জ্জির মনে অনুতাপের মাত্রা যেমন বাড়ে অমিয়ার সঙ্গে ব্যবহারে সঙ্কোচও তেমনি বাড়িয়া চলে।

অমিয়া কি স্বামীকে ভালবাসে না? ভালবাসা কথাটা অমিয়া নভেল-নাটকে বিস্তর পড়িয়াছে, কথাটার বিলাতী অর্থ সে বুঝিত, সেই অর্থে যা বুঝায় সেটা স্থূল ও সত্য অনুভব করিবার জিনিষ। চ্যাটার্জ্জি সাহেবের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা দেখিয়া সে সত্যই

আকৃষ্ট হইয়াছিল। খেয়ালমত সে মাঝে মাঝে স্বামীকে সাজাইয়া দিত, এবং তখন এই দীর্ঘদেহ বলবান লোকটির সে-ই একমাত্র মালিক ইহা মনে করিয়া পুলকিত হইত। কিন্তু যেদিন হইতে এই মোটা মাহিনার, সুশ্রী, ভদ্র, বলবান লোকটির মালিক হইবার সংগ্রামে আভা, মিনা, মিনি কোংর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে জয়লাভ করিয়াছে, সেদিন হইতে তার প্রাণের ভিতরের উৎস যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধি হইবার পর হইতে অমিয়ার সমস্ত উদ্যম প্রকাশ পাইত একটি প্রচেষ্টাকে উপলক্ষ্য করিয়া, কি-করিয়া অন্য মেয়েদের সে ছাড়াইয়া যাইবে। চেহারা ছিল তার সুন্দর। বিলাতী প্রসাধন দ্রব্যের সাহায্যে মাজিয়া-ঘষিয়া সে চেহারাকে আরও সুন্দর করিয়াছিল। পোষাকের পারিপাট্য তার অসাধারণ। কত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয়ে, কত সাধনায়, যে এই পারিপাট্যের জ্ঞান বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা সে-ই জানিত। এই সুন্দর পোষাকে সুন্দরী মেয়েটির দিকে চোখ না ফিরাইয়া পারিত না। কিন্তু এই সুন্দর পোষাক ও সুন্দর চেহারাকে আরও বিচিত্র ও লোভনীয় করিয়াছিল, অমিয়ার হাসিবার ভঙ্গী, অমিয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী, অমিয়ার চলিবার ভঙ্গী। একএকটি যেন দিগ্বিজয়ের একএকটি অব্যর্থ অস্ত্র। আমরা অমিয়াকে আগুনের সঙ্গে তুলনা দিব না, বিদ্যুতের সঙ্গেও তুলনা দিব না। এ সব তুলনা পচিয়া গিয়াছে। অমিয়া হাসিত, খুব মিষ্টি করিয়াই হাসিত। কিন্তু যার উপর এই হাসির জ্যোৎস্না ক্ষরিয়া পড়িত, তার পরণে অকস্‌ফোর্ড ব্যাগস্‌ আছে কিনা আগে সে তাহা দেখিয়া লইত, তার টাই স্মার্ট কিনা তাহা

দেখিয়া লইত। এটা হইল আদি পর্ব্বের কথা। তারপরের যুগে অমিয়াকে মিষ্টি হাসি হাসাইতে হইলে কেবল পোষাক ও চেহারা উত্তম হইলেই যথেষ্ট ছিল না, পদ-গৌরব ও অর্থ-গৌরবের কৌলীন্য আবশ্যক হইত। মিষ্ট চাহনি, মিষ্ট হাসি, মিষ্ট কথা, অমিয়া কোন-কিছুতেই কৃপণতা করিত না। সঞ্চয়ের প্রাচুর্য্যে মেঘ যেমন করিয়া বারি বর্ষণ করে তেমনি করিয়া অমিয়া চাহনি, হাসি ও কথা বিলাইত— পাত্র বিশেষে। শুধু তার চাঁদের মত রূপালী রং দেখিয়া কত যুবকের মাথা খারাপ হইয়াছে। তার সুন্দর মুখ হইতে বক্র হাসির সঙ্গে উচ্চারিত—silly কথাটি শুনিবার জন্য কত যুবক অভব্যতা করিবার কত অসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে।

কত প্রার্থী আসিল, কত প্রার্থী ফিরিয়া গেল। অমিয়ার চাহনি, অমিয়ার হাসি, অমিয়ার কথা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। দিগ্বিজয়ের অভিযানকে প্রাণের বিনিময় বলিয়া ভুল করিয়া কত হতভাগ্য আহত, নিহত হইল। তারপর? তারপর সেই পুরাতন কাহিনী।

কিন্তু ফ্রক ছাড়িয়া সাড়ী পরিবার পর হইতে ধীরে ধীরে, বৎসরের পর বৎসর, প্রথমে অজ্ঞাতসারে, তারপরে জ্ঞাতসারে, এবং শেষে সঙ্কল্প করিয়া যে-প্রচেষ্টা চলিতেছিল, সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রাণের সমস্ত শক্তি যে-সাধনাকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর প্রাণের দ্বিতীয় আশ্রয় মিলাইবার শিক্ষা ত তাহাকে কেহ দেয় নাই।

পর্ব্বতের কোলে বাগান-ঘেরা ছোট বাংলোটিতে অমিয়া যখন স্বামীর সঙ্গে বাস করিবার জন্য আসিল, তখন তার মন খুসিতে ভরিয়া উঠিল, স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল,—আইডিয়াল ! অমিয়া নিজের বাসস্থান দেখিয়া কি বলিবে ভাবিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার কথা শুনিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

হাসিখেলায় দুইচারিদিন কাটাইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি কাজে মন দিলেন। কিছুদিন চলিয়া গেল। তার পরেই মনে হইল কোথায় যেন কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হইল আমরা সে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি। শেষে আসিল সেইদিনের নাটকীয় ব্যাপার।

অমিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহাদের প্রকাশ্য ঝগড়া এই প্রথম। কিন্তু কেন ঝগড়া হইল? ভাবিতে ভাবিতে অমিয়া আবিষ্কার করিল যে, সে তার স্বামীকে ঘৃণা করে। সে আবিষ্কার করিল এই লোকটিকে কোন দিন তার ভাল লাগে নাই। সে তার সামনে আসিয়া মোটা-মাহিনার চাকুরীর জাঁক দেখাইয়া তাকে হস্তগত করিয়াছে। এই লোকটিকে কোন মেয়ের ভাল লাগিতে পারে না। জুলুম করিয়া সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছে। তাকে ভাল করিয়া ভাবিবার সময় পর্য্যন্ত দেয় নাই।

অমিয়া স্থির করিল, সে আর এইরকম স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে পারে না—She must go away, positively go away from here। হঠাৎ তার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল তার স্বামীর চেহারা—বাঁ হাতে টুপী, সঙ্কুচিত ভাব, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে ছেলেমানুষের মত কমনীয়তা। অমিয়ার ভিতরটা একটু দুলিয়া উঠিল।

রাত্রে মিঃ চ্যাটার্জ্জি যখন খাইবার টেবিলে আসিলেন, তার পূর্ব্বেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অমিয়ার সঙ্গে পরিচিত হইবার পর এই প্রথম তিনি স্বাধীন ভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অমিয়া এখানে থাকিতে চাহে না, বাস্তবিক পক্ষে এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। একা থাকিতে থাকিতে তার টেম্পার খারাপ হইয়া গিয়াছে। যত শীঘ্র হোক তাকে এখান হইতে পাঠাইতে হইবে। একবার মনে হইল, অমিয়াকে ছাড়িয়া তিনি একা কি করিয়া থাকিবেন?

মিঃ চ্যাটার্জ্জি যখন অমিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তার বাবার কাছে তার করা হইয়াছে তাকে নিয়া যাইবার জন্য তার কোন ভাইকে পাঠাইতে, তখন অমিয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। তার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তার খুব শীত করিতেছে; একটা রুক্ষ, অর্থশূন্য দৃষ্টি তার চোখে।

রাত্রে মিঃ চ্যাটার্জ্জি ড্রইংরুমের একটা আরাম-চেয়ারে শুইয়া ছিলেন, মাঝ রাত্রে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁর মনে হইল, তাঁর কাঁধে যেন কে একখানা হাত রাখিয়াছে। তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু তাঁর বুঝিতে বাধা হইল না যে অমিয়া তাঁর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি উঠিয়া বসিতে অমিয়া বলিল,—শোবে এস।

মিঃ চ্যাটার্জ্জির মনে হইল অমিয়ার স্বর বিষণ্ণ। কি ব্যাপার ঘটিয়াছে সহসা তাঁর মনে হইল না। তিনি উঠিয়া অমিয়ার সঙ্গে শয়নকক্ষে গেলেন।

অমিয়া স্বামীকে ঘৃণা করে, তাঁর সঙ্গে একত্রে সে থাকিবে না স্থির করিয়াছিল, এইটুকু আমরা জানি। তারপরে কি হইল ভাল করিয়া বলিতে পারিব না। তার বাইশ বৎসরের জীবন ব্যাপী উদ্যমের ফলে যে-লক্ষ্যে সে পৌঁছিয়াছিল, সেই লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কোন্ পথে জীবনকে চালিত করিবে তাহা কি সে স্থির করিতে পারিল না? সমাজে প্রেষ্টিজ হারাইবার ভয়ই কি তার উদ্যত ক্রোধকে শান্ত করিয়া ফেলিল? যথার্থ রাগ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের মসৃণতাকে কর্কশ করিয়া তুলিতেও যার আপত্তি নাই, সেইরূপ চরিত্রের দৃঢ়তা কি তার ছিল না? অথবা স্বামীর প্রতি প্রেমই অবশেষে জয়ী হইল?

যথার্থ কারণ আমরা বলিতে পারিব না। এইমাত্র আমরা জানি যে অমিয়ার ভ্রাতা যথাসময়ে আসিয়া কয়েকদিন খুব বেড়াইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। অমিয়া বাংলার ফটক পর্য্যন্ত তাঁকে আগাইয়া দিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

স্তব্ধ হও। ধীরে কথা কও। যেরাবেদা জেলের যে শান্ত মৃদু ঋজু কণ্ঠস্বর, কারাগারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া, গুর্জরের প্রান্তর পশ্চাতে ফেলিয়া, ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া, সপ্তসাগরপারে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সেই অপরূপ বাণী কাণ পাতিয়া শোন। বুদ্ধি দিয়া বিচার করিও না, হৃদয়াবেগ দিয়া বিচার করিও না। একদিন আসে, যখন প্রয়োজন, উপায়, কৌশল, রাজনীতি—সকলই জীর্ণ বস্ত্রের মত খসিয়া পড়ে। শুধু মানুষ থাকে, আর দেবতা থাকে। নরকণ্ঠের দৈববাণীতে স্বর্গের দেবতা সচকিত হইয়া ওঠে। সে বাণী মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে, দিক হইতে দিগন্তরে আনাগোনা করে। তার অর্থ শব্দকে অতিক্রম করিয়া যায়। তার ইঙ্গিত মরণ অতিক্রম করিয়া জীবনের পরপারে পৌঁছায়। সে বাণী মরে না। চিরদিন বাঁচিয়া থাকে। অমৃত সে বাণী। শুধু বিশ্বমাঝে অমৃতের পুত্রগণ সে বাণী শুনিতে পায়।

*   *   *

ম্যাকডোনাল্ড আর গান্ধী। জানিবার মত দুই চরিত্র। কিন্তু দুই চরিত্রে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন অপরিতৃপ্ত সঞ্চয়, আরএকজন অপরিসীম ত্যাগের ভিতর দিয়া পৃথিবী জয় করিতে চায়। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, কামনা আর ত্যাগের সংঘর্ষে স্বার্থময় সংসারে কে জয়ী হয়, কে জানে? তবু আকাশ স্পর্শ করিয়া আদর্শ জাগিয়া থাকে। গগন হইতে পুষ্পবৃষ্টি হয়। পদতলে পৃথিবীর

হৃদয়পদ্ম শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া ওঠে। সংসারী বুঝিতে পারে না। তবু অনুভব করে।

*   *   *

এ প্রভেদ ব্যক্তিগত নয়—সমাজগত, দেশগত, সংস্কারগত। এ প্রভেদ লৌকিক নয়। ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ। ভারতবর্ষ ও ইয়োপের প্রভেদ। ভারতবর্ষ বৈরাগ্যে মহৎ, কর্ম্মে প্রশান্ত। ইয়োরোপ প্রখর, উদ্দাম, দুরাকাঙ্ক্ষ। পাওয়ার অন্ত নাই, তবু চাওয়ার আশা মেটে না। প্রয়োজন অশেষ, তাই আয়োজনেরও সীমা নাই। তাহার পীড়িত ক্ষুধিত লোলুপ আত্মা ভালমন্দ নির্ব্বিচারে সমস্ত জগৎ আত্মসাৎ করিতে চায়। বাহিরের দিকে তার দৃষ্টি। ভারতের অন্তর্মুখী চক্ষু আপনাকে জানিতে চায়। সে মনে করে, আত্মচরিতার্থতা লাভ করিলে সকলই লব্ধ হইল। প্রত্যক্ষ বিশ্ব অপরীক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে। সংসার আপনার পাওনা আদায় করিয়া লয়। হয়ত কড়া-ক্রান্তিটুকুও ছাড়ে না। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হয় না। জীবন অপেক্ষা জীবনের আদর্শ মহত্তর। ক্ষণিকের অপেক্ষা চিরন্তন বৃহত্তর।

১ম বর্ষ] ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯ [১৮শ সংখ্যা

মেজদার ডায়ারী

শ্রীমতী রুক্মিণী সেন

নিদ্রার গভীরতা পরিমাণ করিতে হইলে নিদ্রাকালীন মশক অথবা ছারপোকার দংশন উপভোগ করা চাই। এ জীবনের সজীবতা পরিমাণ করিতে হইলে মাঝে মাঝে বিপদের সম্মুখীন হওয়া চাই। সরল সহজ স্বচ্ছন্দ সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ আমার কাছে আদর্শ জীবন-যাত্রা বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা, বেরিবেরি, আর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার ইত্যাদি শ্রেণীর বিপদ সব সময় লাগিয়াই আছে। আমার ঐ-শ্রেণীর বিপদের উপর মোটেই লোভ নাই।

সত্য কথা বলিতে গেলে, বিপদ বলিতে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপারসমূহের কথাই বলিতেছি। রোমান্স। অসাধারণ ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র রোমান্স।

এ-হেন রোমান্সের সহিত মূলাকাৎ করিবার জন্য চিরকাল আমি বিশেষ-রকমে লালায়িত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ঐ রোমান্স বস্তুটি কোনদিন আমার উপভোগ্য হইল না। ওটা চিরকাল উপন্যাসের নায়কনায়িকাদের একচেটে সম্পত্তি! সেখানে দেখি ধনীর প্রাসাদ হইতে গরীবের কুঁড়ে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ওর ছড়াছড়ি। একটির পর একটি ঘটনা চলিতে থাকে—চিত্রের মত—অবাধে, সুন্দররূপে, অপরূপবেশে সজ্জিত হইয়া।

অবশ্য রোমান্সের রূপান্তর রহস্য হইতে যে আমি একেবারে বঞ্চিত তাহা নয়। হাওড়া ও শিয়ালদহ অঞ্চলে একাধিকবার রহস্যজনক ভাবেই আমার পরিধান হইতে মনিব্যাগ সমেত পকেটের অন্তর্ধান হইয়াছে। কিন্তু এমন রহস্য তো বিশেষ রুচিকর নয়। বরং ভবিষ্যতে এরূপ রহস্যের হাতে আর না পড়িতে হয়, এই প্রার্থনাই করি। অবসর পাইলেই বিলাতী গল্পপুস্তকে অপূর্ব্ব রহস্যকাহিনী পাঠ করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হই। দেশের উপন্যাসেও এ বিষয়ের কম্‌তি নাই। কলিকাতার অলিতে-গলিতে অদ্ভুত কাণ্ড, অঘটন ঘটনা। ভাবিয়া উৎফুল্ল হই। কিন্তু, হে ঠাকুর! আমার চিরপরিচিত কলিকাতা সহরের পথে-ঘাটে দিনে-দুপুরেই যখন এরূপ ভীষণ রহস্যের মেলা বসিয়া যায়, তখন তাহার প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে আমা-হেন রহস্যপ্রিয় ব্যক্তিকে কি হেতু বঞ্চিত কর? ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, সারা সংসার রহস্যময় হইয়া পড়িল।

এ-হেন রহস্য-বাসরে আবির্ভূত হইলেন—কাপড়ের মোট কাঁধে আমার রজক মহাশয়। রহস্য-হন্তারক সাক্ষাৎ গন্ধ!

হঠাৎ নজর পড়িল সদ্য-ধৌত শুভ্র জামা-কাপড়ের মোটের উপরিস্থিত এক লাল সিল্কের ব্লাউসের প্রতি।

তারপর ধীরে ধীরে ধোবার নিকট হইতে ঐ সুন্দর ব্লাউসটির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের সন্ধান পাইলাম। আরও ধীরে ধীরে নিজের পকেট হইতে বাহির করিলাম একখানি পাঁচ টাকার নোট। বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রজকপুঙ্গবের কাছে আমার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া প্রথমে সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মাত্র। কিন্তু আমার হস্তস্থিত মহাশক্তিশালী কাগজখানির প্রভাবে তাহার মুখ পরক্ষণেই হাসিতে ভরিয়া গেল। ধোবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ওদের কাপড় সব ঠিক হ'য়ে আছে কি? সে জানাইল,—সব ঠিক আছে। তাহাকে নোটখানি দিয়া বলিলাম,—আমি কাল সকালে কাপড় নিয়ে সেই বাড়ীতে যাব। সে একটু ভীত কণ্ঠে যে-উত্তর প্রদান করিল তাহার অর্থ এই,—হুজুর, সকালবেলা আমরা গেলে বাঙালীরা অকারণে বড় চটিয়া যায়। অতএব কাপড় লইয়া যাইবার পক্ষে প্রভাত প্রশস্ত কাল নহে।

ইস্, কি কুসংস্কার! বর্ত্তমান ভারতের লাট যদি এই কুসংস্কারটার উচ্ছেদ সাধন করেন, তাহলে বোধ হয় তিনি লর্ড বেন্টিকের মতই নাম রাখিয়া যাইবেন। যাহারা এত করিয়া আমাদের বস্ত্র শুভ্র, নির্ম্মল, উপভোগ্য করিয়া তোলে, তাহাদের প্রতি এরূপ আচরণ কি অন্যায়! শুধু তাই নয়, রজকিনী রামী না থাকিলে বৈষ্ণব-সাহিত্য

থাকিত কোথায়? ধোবাকে বলিলাম,—আমি সকালবেলাতেই যাব।

আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সভ্যের অপেক্ষা হেয় নয়। উদ্দেশ্য—প্রথমত, ঐ সুন্দর ব্লাউসের সুন্দরী অধিকারিনীকে ফরসা কাচানো কাপড়-জামা দিয়া সাহায্য করা; দ্বিতীয়ত, ধোবার পরিশ্রম কিঞ্চিৎ লাঘব করা; তৃতীয়ত, অভাগা বাঙালী সমাজকে কিছু শিক্ষা দেওয়া।

সকাল হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই কাপড়ের মোট বহিবার আনন্দে ছুটিয়া আসিলাম—উড়েপাড়ায় সুখন-ভবনে।

আধঘণ্টার মধ্যে সুখনলাল সুদক্ষ রূপসজ্জাকারীর মত আমাকে এক সুন্দর রজকে রূপান্তরিত করিল। একখানা ময়লা কাপড়ের উপর একটি আধ-ময়লা পিরান গোছের জামা, দুই কানে দুইটা ময়লা রূপার আংটা; ছিদ্র না থাকার দরুণ চাপিয়া আটকাইয়া দিল।

গাধার পিঠে চড়িয়া কাপড় লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু গাধা চালনা করিবার বিশেষ দক্ষতা না থাকায়, সে ইচ্ছা দমন করিলাম।

কাপড়ের মোট ঘাড়ে করিয়া এলগিন্ রোডের উপর সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট রায় বাহাদুর শচীন সেনের সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখীন হইলাম। এইটাই রজকপ্রবরের—আপাতত আমার—মক্কেলের অর্থাৎ খ'দ্দেরের বাড়ী।

কি আশ্চর্য্য! রোমান্সের এই প্রথম অবতারণাতেই বক্ষ দ্রুত তালে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। মনে পড়িল, যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে। পৃষ্ঠে লাঠি বাজিবে না তো?

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজিল। আর ইতস্ততঃ না করিয়া সাহসভরে রাম নাম করিতে করিতে গেটের মধ্য দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। প্রথম সাক্ষাৎ দারোয়ানের সঙ্গে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার বাজখাঁই গলা হাঁকিয়া উঠিল,—আরে, এৎনা সবেরে কাপড়া লেকে কেঁও আয়া ?

কি মধুর সম্ভাষণ! যাহা হউক নির্ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই কাপড়ের মোটটাই যথেষ্ট। দারোয়ান বেটাকে কেয়ার করিলাম না। সটান সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলার একটি হল ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। প্রবেশ মাত্র সুমধুর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল। জাহাজ হইতে আমেরিকার উপকূল লক্ষ্য করিয়া কলম্বাসও আচম্‌কা এত আনন্দ পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ঘরটি বেশ বড় ও আধুনিকভাবে সজ্জিত। মাঝখানে একখানি বৃহৎ শ্বেত পাথরের গোল টেবিল ঘিরিয়া সাতখানা চেয়ার। চেয়ারে বসিয়া আছেন চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা। সকলেরই হাতে চায়ের পেয়ালা। টেবিলের উপর একখানি বড় কেক্ ভাগ করিয়া কাটা।

উপবিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যে সৌম্যভাবাপন্ন সুপুরুষ প্রৌঢ় ভদ্র-লোককে দেখিয়াই চিনিলাম, ইনিই গৃহস্বামী রায় বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা অ্যাডভোকেট্। আর তিনজন—যুবক, সুবেশ, সুদর্শন। আর, এক প্রৌঢ়ার পাশে দুটি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন দুই তরুণী। দুই বোন বলিয়া মনে হইল। সুন্দর! কি উজ্জ্বল তাহাদের রূপ। আনন্দ যাহাকে দেখিয়া হইল, তিনিই হইতেছেন কনিষ্ঠা তরুণী, দ্যুতিমান মধ্যমণি

সম সমস্ত ঘরটির শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। কবিতার উৎস, নভেলের প্রাইম ফ্যাকটর।

প্রবেশ করিবামাত্র সাত জোড়া চোখের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি একসঙ্গে পড়িল আমার উপর। একটু থতমত খাইয়া ভুলিয়া তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া এক নমস্কার করিলাম। পিঠ থেকে কাপড়ের পোঁটলাটা মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল। কর্ত্তা সকৌতুকহাস্যে সেই প্রৌঢ়ার অর্থাৎ গিন্নির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সকালেই ধোবার মুখ দেখ্‌লে; আজ তোমার ক্যাস-বাক্সে বোধ করি কিছু উঠবে না।"

ঝঙ্কার তুলিয়া প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিলেন, "মুখপোড়া আর আসবার সময় পেলে না।" আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুখনের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে আস্‌ছিস্? সুখনের তুই কে? এত সকালে এলি কেন?" চটপট্ জবাব দিলাম (খোট্টা ভাষায়),—আমি সুখনের দেশপ্রত্যাগত ভাই; রামচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে রামরাজাতলায় যাইতে হইবে বলিয়া সুখন আমাকে সকালেই পাঠাইয়া দিয়াছে।

একটি যুবক—কিশোর বলিলেই চলে—এতক্ষণে চা খাওয়া সাঙ্গ করিয়া আমাকে শাসাইয়া বলিল, "এৎনা দের্‌মে কাপড়া লায়গা তো হাম দোস্‌রা ধোবি বোলায়েগা।" চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ীতে ঢুকিবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে-সব মিষ্ট ভাষণে সম্ভাষিত হইতে ছিলাম, তাহাতে মনটা ক্রমশই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছিল। ডাইয়িং-ক্লিনিংএর বাবু-ধোবা হইলে কি আর এ রকম ব্যবহার লাভ করিতাম? হয়ত চা অফার করিয়া কোন্ না একটা চেয়ারই আগাইয়া দিত। কিন্তু সেই মেয়েটি তো ভাল-মন্দ কিছুই বলিল না।

কর্ত্তা এবং আর একটি যুবক দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন,—বেচারা যখন কাপড়গুলি আনিয়াছে, তখন ওগুলি তুলিয়া রাখ। কর্ত্তার দেরি হইয়া যাইতেছিল, তাই তিনি উঠিয়া গেলেন। কিন্তু কি সৌভাগ্য আমার, গিন্নি যে সেই মেয়েটির দিকেই চাহিয়া বলে, "যা মা জলি, কাপড়গুলো খাতার সঙ্গে মিলিয়ে তুলে রাখ্‌গে।"

জলি ! নামটা ভাল। একটু ইংরিজী ধাঁজের। কিন্তু কুকুরদের মধ্যেও ঐ নামটা প্রচলিত আছে শুনিয়াছি।—নাঃ। এ নিশ্চয় অন্য কোনও নামের অপভ্রংশ হইবে।

মেয়েটি ঈষৎ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "না মা, আমি পারব না, দিদিকে বল। ঐ তো সুকুমার-দা বসে রয়েছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করনা, আজ কলেজে কত পড়া আছে।"

গিন্নি একটু হাসিয়া বলিলেন, "অঞ্জলি যে আজ রাঁধবে। তুই যদি রাঁধিস তাহলে অঞ্জলি না-হয় কাপড় নেবে। আর, আজকে তো আর কাপড় দেওয়া হবে না। লক্ষ্মীটি যা।"

সৌভাগ্য ফস্‌কিয়া যায় দেখিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। মুখে একটুখানি কাষ্ঠ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "চলিয়ে না দিদিমণি, বহুৎ দেরী নেহি হোগা।"

যে যুবকটিকে তার সুকুমারদা বলিয়া চিনিলাম, তিনি বলিলেন, "যাও বিজলি, কাপড়গুলো তো নিতে হবে। আমি ততক্ষণ তোমার ছোড়দার সঙ্গে একটু গল্প করছি।"

বাঃ, বেশ নাম দুটি, বিজলি আর অঞ্জলি !

পাশের একটি ঘরে খাতা মিলাইয়া কাপড় নেওয়া হইতেছিল। কিন্তু কি মুস্কিল! মেয়েটি খাতা দেখে আর বলে,—এটা আনিস নি, ওটা আনিস নি; আমার সেই ব্লাউসটা? বাবার গরদের সুটটা আবার কবে দিবি?

ধোবার উপর প্রচণ্ড রাগ হইল। বেটা, তুই নিশ্চয় ইচ্ছা করিয়াই আমাকে এমন ফাঁদে ফেলিয়াছিস। কাপড় কাচিয়াছিস, কিন্তু দিবার সময় সবগুলি একসঙ্গে দিতে পারিস নাই। সে উপস্থিত না থাকায় নিজেকেই অগত্যা অপরাধী মনে করিয়া অভ্যাস বশতঃ মেয়েটিকে বলিয়া ফেলিলাম, "মাপ করবেন।"

চমকিয়া উঠিয়া মেয়েটি আমার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। এইবার বুঝি সব ধরিয়া ফেলে। তারপর নিশ্চয় প্রহার।

ব্যস্ত হইয়াই বলিলাম,—"কাহে দিদিমণি, হাম তো জরুর ধোবি হায়।"

বিজলি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাইয়ে থাকে।

তবুও বলিলাম, "এ কেয়া বাত, হামকো ধোবিকো মাফিক মালুম নেহি হোতা?"

ব্যাকুল আগ্রহে নিজেকে রজক প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখিয়া সে একটু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "না।"

বলিলাম, "ই-ত বড়া দুস্কুকা বাত হায়, তব্ কিস্‌মাফিক লাগ্‌তা দিদিমণি?"

চপল মেয়েটি মৃদু হাসির মাধুরীতে ঘরটি ভরাইয়া দিয়া রক্তিম মুখে বলিল, "গাদ্ধাকো মাফিক।"

বলিয়াই পলাইল।

বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেলাম। মুখের উপর এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী আমাকে গাধা বলিয়া সম্বোধন করিল! মনে পড়িয়া গেল কারাকক্ষে ওস্‌মানের মুখের উপর আয়েষার বাণী। কিন্তু এটা কি ভাব? সাইকলজিতে একে কি বলে? রাগ না অনুরাগ?

তারপর আর সে-বাড়ীতে থাকিবার ভরসা বড় রহিল না। অনেক কাপড়-জামা বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। তার উপর মেয়েটি বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছে। এখনই গৃহিণী আসিয়া পড়িবেন।

প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গেছে। রজকপুঙ্গবেরও আর বহুদিন দেখা নাই। মাঝখানে একদিন সুখনের বাড়ীতে চাকর পাঠাইয়াছিলাম; আমার চাকর তাহার দেখা পায় নাই। আমি এখন ডাইয়িং-ক্লিনিংএই কাপড় কাচাই। দিন পঁচিশ পরের ঘটনা। লিখিতে সত্যই আমার লেখনী বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ব্যাপারটি কিছু করুণরসাত্মক। সন্ধ্যাবেলা দু'একটি বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া লেকের ধারে বায়ু সেবন করিতেছিলাম। এবং গম্ভীরভাবে কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড, তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স, উদয়শঙ্কর, অজন্তাচিত্রের নৃত্যভঙ্গী, এমনি-সব গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা চালাইতেছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য নিবদ্ধ হইল এক ব্যুইক প্রেসিডেণ্ট এইট-সিলিণ্ডারের উপর। আমাদের খুব নিকটে আসিয়া কারখানি

থামিয়া গেল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে গাড়ীর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিভাসিত হইতে লাগিল। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। শোফার দরজা খুলিয়া দিলে গাড়ী হইতে যাঁহারা নামিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

লাল সিল্কের সাড়ী আর সেই ব্লাউজটি পরিয়া প্রথম নামিল বিজলি। তারপর একে একে নামিলেন—অঞ্জলি, সুকুমারদা, ছোড়দা ও বড়দা। সকলেরই দৃষ্টি আমাকে অনুধাবন করিল। বহুকালের ফেরার আসামীর সাক্ষাৎ মিলিলে পুলিসের দৃষ্টি যেরূপ হয়, এঁদের দৃষ্টিও সেই রকম উজ্জ্বল। চট্ করিয়া স্থান কাল ও পাত্র হিসাবে আমার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে হইল যেন বিজলি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। যেমন দেখিয়াছিলাম সেইরকম। মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই সুস্পষ্টভাবে শুনিলাম, বিজলি তার ছোড়দাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঐ দেখ ছোড়দা, তোমার সেই ভাল জামাটা প'রে এসেছে। ইস্, একেবারে বাবু বনে গেছে!"

বন্ধুরা অবাক হইয়া আমার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। লজ্জায় চুপ করিয়া রহিলাম। ভুলিয়া গেলাম আবার কর্ত্তব্য। ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছোড়দা আমার পানে আগাইয়া আসিতে লাগিলেন। কি করি? একবার ভাবিলাম, কোনও দিকে দৃক্পাত না করিয়া চোঁচা দৌড় দিই। এহেন অপমানজনক অভিনয়ের শেষ হইয়া যাক্। কিন্তু তা আর করিলাম না। সকলে কি মনে করিবে? তা ছাড়া, পলিসিটা নেহাৎ ছিঁচ্কে-চোরের মত।

ছোড়দা বজ্রমুষ্টিতে আমার জামার বুকের অংশ ধরিয়া বলিলেন, "সাবাস! একদম্ বাবু বন্‌গিয়া? বোলো শুয়ার, তোমারা ভাই কাপড়া লেকে কিধার ভাগা?"

লজ্জায় ঘৃণায় মুখ নীচু করিয়া রহিলাম। বড়দা ছোড়দাকে বকিয়া উঠিলেন, "আঃ অজিত, রাস্তার মাঝে কি ছোটলোকের মত করছিস্!" বন্ধুদের দিক হইতেও সাড়া পাওয়া গেল। তারা আমার এই অযথা অপমানের তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। হায়, এরাতো জানে না যে ইহা আমার স্বহস্তরোপিত রোমান্স-বৃক্ষের ফল। এই রহস্যের যখন উদ্ঘাটন হইবে, তখন এই বন্ধুরাই বা কি ভাবিবে, আর ঐ ভদ্র গৃহস্থরাই বা কি মনে করিবে? পাগল, না বদমাইস্?

হে রহস্য, হে রোমান্স, তোমরা চিরকাল নভেলের নায়ক নায়িকার একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া থাকো; ঐখানেই তোমাদের মানায়। আমাদের মত গরীবের জীবনে ওটা সয় না। সহজ, পরিচিত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রাই আমাদের ভাল।

যাহা হউক, এ রহস্যের যবনিকা পতন হইল সাবলীল হাস্য কৌতুকেই।

সকলের সম্মুখে আমাকে প্রমাণ করিতে হইল, আমার সাত পুরুষে সুখনের ভাই নয়, এবং ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহই রজকের ব্যবসা অবলম্বন করে নাই, এমন কি ডাইং-ক্লিনিংএর ব্যবসা পর্য্যন্ত নয়। বন্ধুরা হইলেন আই-উইট্‌নেস্।

সব ভাল যার শেষ ভাল। আমার কাহিনীটিও ভাল কারণ এর শেষটি ভাল।

তারপর আবার একদিন সকালে এলগিন রোডের সেই বৃহৎ বাড়ীটিতে যাইতে হইল। এবার আর পোঁটলাপুটলি লইয়া নয়। বেশ একটু সৌখীন রকমের সাজ-পোষাক করিয়াই গিয়াছিলাম।

শ্রীমতী বিজলির বিশেষ অনুরোধে এখনও যাই। আর, আপনারা কেহ যদি নাপিত চাকর বা ঐরকম আরকিছু সাজিয়া সেই-বাড়ীতে সেই-ঘরে গিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে সাতখানির জায়গায় আটখানি চেয়ার হইয়াছে; এবং কর্ত্তা, গিন্নি, ছেলে, মেয়ে, স্কুমারদা ইত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া, আমি ঘর আলো করিয়া দুই তিন পেয়ালা চা একলাই সাবাড় করিতেছি। এখনও বিরাট 'টি-টেবল্ কনফারেন্সে' নানারকম আলাপের সঙ্গে আমার অভূতপূর্ব্ব রোমান্সের আলোচনা কখনও কখনও আসিয়া পড়ে এবং একটা উচ্চ হাসিতে সমস্ত ঘরটি মুরখিত হইয়া উঠে। কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে পিনাল কোডের ফল্স্ ইম্পার্সোনেশন চার্জ্জের ডেফিনিসন আওড়াইয়া যান। প্রতিবাদ জানাইয়া বলি, দোষ উভয় পক্ষের! তার উপর চোর ও গাধা সম্বোধনে মানহানি করা এসব তো অধিক।

রস-ভঙ্গ করে বিজলি। সে বলে, "বেশ করেছি, গাধা বলেছি, চোর বলেছি।" আবার ফস্ করিয়া টেবিল থেকে আমার চায়ের পেয়ালাটা কাড়িয়া লইয়া যায়। আমার দিদিদের কাছে সে নাকি খবর পাইয়াছে যে ডাক্তার আমাকে বেশী চা খাইতে বারণ করিয়াছে। সব বোগাস্। অঞ্জলিদি নিজের হাতের তৈয়ারী গরম

গরম মাছের কচুরি আমাদের পরিবেশন করেন। অঞ্জলিদি তো আর স্কুল-কলেজ পড়া অতি-আধুনিক চালবাজ মেয়ে নয়। অবশ্য দিদি পড়াশুনা গান সেলাই ইত্যাদি বেশ ভালই জানে, কিন্তু বাড়ার রান্না-বান্নার সবটা বাবুর্চি বা বামুনের হাতে ছাড়িয়া দেয় নাই।

আমার বাড়ীর সকলের সঙ্গে ওদের বেশ ঘনিষ্টতা হইয়াছে। আমারও ওদের বাড়ী যেতে আর কোনও বাধা নাই। তার উপর বিজলির হুকুম মানিতেই হয়।

বন্ধুত্বের অধিকার যথেষ্ট। কিন্তু এখনও প্রোপোজ করিনি, কি জানি সফলকাম হব কি না। ছোড়দার বন্ধু সুকুমারদা রহিয়াছেন যে। থাক্‌গে, না-হয় ভবিষ্যৎ কিছু রহস্যাচ্ছন্ন থাকুক্‌। স্বভাবগত রসজ্ঞপ্রিয় আমি, রোমান্সের সঙ্গে আবার দেখা হইতে পারে তো? এবার সুকুমারদা রহিলেন আমার রাইভ্যাল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মৃত্যুতে দেশসেবার ক্ষেত্র হইতে একজন খাঁটি বাঙালী অন্তর্হিত হইলেন। এই দরিদ্র ঋজুপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ স্বচেষ্টায় যে প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের হৃদয়ে একদা যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ দুর্লভ। বলিতে গেলে সাংবাদিক-রূপেই তিনি জীবন আরম্ভ করেন। 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী'র সহিত শ্যামসুন্দরের সাপ্তাহিক 'প্রতিবাসী'ও বাঙালীর আদরের বস্তু হইয়াছিল। স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এক নূতন সুর এবং শ্রী লইয়া দৈনিক 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব—এই সংবাদপত্রসেবী দেশভক্তের হৃদয়েও সাড়া জাগাইয়া তুলিল। বাংলা এবং ইংরেজী—উভয় ভাষার উপর তাঁহার যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' এবং অরবিন্দের 'বন্দেমাতরমে'র তিনি একজন প্রধান এবং নিয়মিত লেখক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগেও তিনি কাজ করিতেন। শ্যামসুন্দর দুইবার রাজবন্দী হন। দেশসেবায় তাঁহার ভীতি দ্বিধা অথবা ক্লান্তি ছিল না। দারিদ্র্য তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার সম্পাদিত 'সার্ভেণ্ট' পত্রের নির্ভীক উক্তি দেশের মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া এই হ্রস্বকায় শ্মশ্রুল ব্রাহ্মণ যখন বে-পরোয়া ভঙ্গীতে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিতেন, সেই কৌতুকমূর্ত্তির সন্দর্শনে কোন বিদেশীর মুখ

হয়ত প্রথমে ঈষৎ হাস্যে উদ্ভাসিত হইত, কিন্তু তারপর সেই তেজস্বী দেশসেবকের মুখনিঃসৃত আন্তরিক অগ্নিগর্ভ বাণীর পরিচয় লাভে তাহার মস্তকে আপনিই শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত।

* * *

জীবনের সকল ক্ষেত্রে অসংখ্য শক্তি এবং প্রতিভার একত্র আবির্ভাব যে-যুগে অত্যল্প কালের মধ্যে নবীন বাংলা গড়িয়া তুলিল, পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সেই যুগের ধীমান্ পুরুষ। কোঁতের শিষ্য কৃষ্ণকমলের কাছে নিখিল-মানব ছিল আরাধনার বিষয়। বিদ্যাসাগরের ছাত্র তেজস্বী কৃষ্ণকমল সমাজে সংসারে কাহাকেও ভয় করিতেন না। নিন্দাপ্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া তিনি আপনার কাজ করিয়া যাইতেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার অধ্যাপনা এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সুলেখক ছিলেন। সেকালের 'জ্ঞানাঙ্কুর'পত্রে প্রকাশিত তাঁহারই অনূদিত 'পৌলবর্জ্জিনীর উপাখ্যান' কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৌতূহল উদ্বুদ্ধ এবং কল্পনা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। 'প্রকৃতিবাদে'র কোষকার বিদ্যাসাগরের প্রিয়শিষ্য রামকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার অসাধারণ শক্তি লইয়া অকালে অন্তর্হিত হন। কৃষ্ণকমল ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমলের সেকালের কথা লোকে উপন্যাসের ন্যায় আগ্রহে পাঠ করে। বিরানব্বই বৎসর বয়সে, বাংলার আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া পাইবার প্রথম যুগের শেষ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

* * *

বেশী দিন আগে নয়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সরস ছোট গল্প পাঠকসাধারণের চিত্তবিনোদন করিত। প্রভাতকুমারের পরলোকগমনের তিন চারি মাস পরেই 'মানসী'র প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা এবং সম্পাদক সঙ্ঘের অন্যতম ফকিরচন্দ্রের দেহত্যাগে সাহিত্য সমাজ ক্ষুব্ধ। প্রৌঢ় বয়সেও ফকিরচন্দ্রের মনের তারুণ্য এতটুকু অন্তর্হিত হয় নাই। 'মানসী'র প্রথম প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাংসারিক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যসেবায় বিরত হন নাই। ইদানীং তাঁহার সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী 'মানসী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত।

* * *

৪ঠা আশ্বিন। ২০শে সেপ্টেম্বর। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই দিনটি লিখিত থাকিবে—স্বর্ণাক্ষরে না রক্তাক্ষরে? ভবিষ্যতের কথা কে জানে? তবে এ কথা জানি, এই বিরাট আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইবার নয়। এই জীবনদানের সাধনা জীবন জাগাইয়া তুলিবে। অভূতপূর্ব্ব এই পরীক্ষা। রাজনৈতিক শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ নাই, ডিপ্লোম্যাসির ক্ষেত্রে ইহার অভিজ্ঞতা নাই, সামাজিক প্রথায় ইহার প্রচলন নাই। উপায়জ্ঞেরা নিরুপায়, কৌশলীরা ম্রিয়মান। যাহা জ্ঞাত, পরিচিত, আচরিত—তাহা বারণ করা চলে, বাধা দেওয়া চলে, উৎসাহিত করাও চলে। যাহা নূতন, অঘটিত, অচিন্তিতপূর্ব্ব, তাহা লইয়া কে কি করিবে, লোকে তাহা ভাবিয়া পায় না।

* * *

আজ জীবনের মঞ্চে একটি মাত্র লোক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গান্ধী। আর সকলে নীচে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব মানুষের কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছে। কাহারও নয়ন অবনত, কাহারও চক্ষু বিস্ফারিত। যতগুলি বৃহৎ ধর্ম্ম আজ জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাদের উদ্ভব এসিয়ায়। প্রাচ্যের বাণী পুরাতন হয় না। প্রাচ্যের পরমতীর্থ ভারতবর্ষ। বুদ্ধের করুণা হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ জীবনকে চরিতার্থ করিয়াছে। যুগে যুগে ভারতবর্ষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে। যুগে যুগে নবজীবন জাগিয়া ওঠে। সন্ধিক্ষণের অন্ধকার কাটিয়া যায়। আলোর প্লাবনে হৃদয় বিপ্লাবিত হয়। সে আলো সূর্য্যের নহে, চন্দ্রের নহে, গ্রহতারকার নহে। সে আলোর তুলনা নাই। অলোকসম্ভব আলোকে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়। মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

দিনপঞ্জী

১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, পঁচাত্তর বৎসর বয়সে, এনোফিলিস বাহিত ম্যালেরিয়া-বীজাণুর আবিষ্কারক স্যার রোণাল্ড রস দেহত্যাগ করিয়াছেন।

* * *

৩১শে ভাদ্রের স্থগিত শরৎ-বন্দনা—রবিবার, ২রা আশ্বিন যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

* * *

১৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার মহাত্মার অনশনব্রত সম্পর্কে মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা, গৃহে গৃহে উপবাস এবং প্রার্থনা, নগরে নগরে সভা সমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছে।

*　　*　　*

মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখিয়াছেন।

*　　*　　*

১৯শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে হিন্দুনেতৃসম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

*　　*　　*

২০শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

*　　*　　*

পূজার অবকাশের পর আমাদের কোন্ গল্প বাহির হইবে, তাহার বিজ্ঞাপনী 'আনন্দ-বাজার' এবং 'বঙ্গবাণী' পত্রে দ্রষ্টব্য।

১ম বর্ষ] ১২ই আশ্বিন, ১৩৩৯ [শারদীয়া সংখ্যা

প্রেমচক্র

পরশুরাম

এখনো বল্ হাব্‌লা।

হাঁ হাঁ, আমি বলচি তুমি ফেলে দাও মামা।

কিন্তু লোকে কি বলবে ?

ভালই বলবে।

তোর মামী ?

মামী খুশী হবে, তুমি দেখো।

তুই না-হয় একবার ওপরে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

তা আসচি। তুমি ততক্ষণ বেশ ভিজিয়ে নরম ক'রে রাখ।

হাব্‌লা ওপরে গেল। আমি বুরুশ ঘষতে লাগলুম। হুকুম এলেই জয়-মা-কালী ব'লে চোপ বসাব।

কিন্তু শুভকর্ম্মে অনেক বাধা। হাব্লার ছোট ভাই বঙ্কা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে বললে—ওকি হচ্চে মামা ?

কি আবার হবে, গোঁপটা ফেলে দেব।

বঙ্কা বললে—গোঁপ এখন থাকুক। দাও ধাঁ ক'রে একটা গল্প লিখে। একটা মাসিক পত্রিকা বার করচি, 'চিরন্তনী'।

ক মাস বার হবে ?

চিরকাল। এ পত্রিকা মরবে না, তুমি দেখে নিও। দস্তুর-মত এষ্টিমেট ক'রে আট-ঘাট বেঁধে নামা হচ্চে। পঁচিশজন নামজাদা লেখকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট্ করেচি। প্রতি সংখ্যায় উনিশটা গল্প, পাঁচটা সোজা প্রেম, দশটা বাঁকা প্রেম, চারটে লোমহর্ষণ। প্রথম সংখ্যা প্রায় ছাপা হয়ে এল, কেবল শেষ ফর্মার লেখাটা জোগাড় হয়ে ওঠেনি তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েচি। দাও চট্পট্ একটা লিখে।

কেন, তোর কন্ট্রাক্টারদের কাছে যা না।

তাদের খোশামোদ করবার আর সময় নেই, তুমিই একটা লিখে দাও, আজই চাই কিন্তু।

এমন সময় হাব্লা ফিরে এল। মুখ-খানা হাঁড়ির মতন ক'রে বললে—মামী রাজী নয়।

কি বললে ?

বললেন খবরদার। মামা, অমন মুষড়ে গেলে চলবে না কিন্তু। প্রতিশোধ নিতে হবে, ভীষণ প্রতিশোধ। আমি বলচি তুমি দাড়ি রাখ, দিব্যি মুখ-ভরা দাড়ি, নিরঞ্জন সিংএর মতন।

বঙ্কা অস্থির হয়ে বললে—আঃ, কেবল গোঁপ আর দাড়ি। তার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ সৃষ্টি করবার আছে। মামা, তুমি অন্য চিন্তা ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখ।

হাব্‌লা বললে—তোদের সেই পত্রিকাটার জন্যে বুঝি ?

বঙ্কা জবাব দিলে না। সে তার দাদাকে গ্রাহ্য করে না, কারণ হাবলা একটু সেকেলে গোছের, আর বঙ্কা হচ্চে থাজ্জা-তরুণ। আমি বললুম—বঙ্কার পত্রিকার এক ফর্মা খালি রয়েচে, তুই একটা লেখা দে না হাব্‌লা।

হাব্‌লা বললে—কবিতা চায় ত দিতে পারি। পুঁটুর বিয়ের জন্যে একটা লিখেচি, তাই একটু অদল-বদল ক'রে দিলে চলবে।

বিয়ের পদ্যে হাবলার হাত খুব পাকা। তার বন্ধুরা বলে, এ লাইনে ও-ই এখন সম্রাট্‌। হাব্‌লাদের রাবণের বংশ, জেঠতুতো খুড়তুতো পিসতুতো মাসতুতো মামাতোর অন্ত নেই, তার সমস্ত তাল সামলায় শ্রীমান্‌ হাবুলচন্দ্র। বছরের মধ্যে গোটা-পাঁচেক হৃদয়বাণী, গণ্ডা-দুই মর্ম্মোচ্ছ্বাস, ছ-সাতটা প্রীতি-উপহার, তাকে লিখতেই হয়। ভাষা ছন্দ ভাব, তিনটেই বেশ ষ্টাণ্ডারডাইজ ক'রে ফেলেচে। আজি কি সুন্দর প্রভাত, নীল নভে পূর্ণচন্দ্র উঠিছে, মলয় মৃদু হিল্লোলে বহিছে, কুসুম থরে থরে ফুটিছে, হৃদয়ে সাহানা রাগিণী বাজিছে। কেন এসব হচ্চে ? কারণ, আমাদের স্নেহের পুঁটুরাণীর সঙ্গে শ্রীমান্‌ চামেলীরঞ্জন বি-এস-সির শুভ পরিণয়। অতএব হে বিভু, তুমি প্রচুর মধুলেপন ক'রে এই দুটি তরুণ হিয়া জুড়ে দাও।

কিন্তু বঙ্কার তা পছন্দ নয়। বললে—ওসব সেকেলে ছড়া একদম চলবে না।

হাবলা বললে—আলবৎ চলবে। এই কবিতাই কিছু অদল বদল ক'রে দিলে আধুনিক হয়ে দাঁড়াবে। দু-চারটে ভূমা, গোটা-তিন অবদান একটু রুদ্র-শিহরণ—

বঙ্কা তিড়্‌বিড়্‌ ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—না না না। তোমার ও পচা কবিতা একদম চলবে না। মামা, তুমি গল্প লেখ. বেশ ঘোরালো প্লট চাই, শীগ্‌গির দিতে হবে কিন্তু।

বললুম—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

ছবিও চাই কিন্তু।

বলিস কি রে? আমার চোদ্দ-পুরুষ কখনো ছবি আঁকেনি।

বাঃ, সেই যে তুমি কত রকম চিত্তির-বিচিত্তির ক'রে দাবার ছক আঁকতে?

কথাটা ঠিক। চার বার বি-এ-ফেল হবার পর বাবার উপরোধে দিন-কতক ইঞ্জিনিয়ার ঘোষ কোম্পানির আপিসে প্লান আঁকা শিখি। কত রকম যন্ত্র, কত রকম রঙ। তাই দিয়ে মনের সুখে দাবার ছক আঁকতুম। ঘোষ-সায়েব দেখেও দেখতেন না, পিতৃবন্ধু কিনা। বঙ্কা সেই থেকে ঠাউরেচে আমি একজন আর্টিষ্ট। তাই হোক, একটু চেষ্টা করলে যদি একাধারে লিখিয়ে আর আঁকিয়ে হতে পারি ত মন্দ কি? বঙ্কাকে বললুম—কাল সন্ধ্যাবেলা আসিস, দেখি কি করতে পারি।

পরদিন সন্ধ্যে হতে না হতে বঙ্কা এসে হাজির। সঙ্গে আবার তার ছোটবোন চিংড়িকে এনেচে। সে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, গল্প আর ছবির একজন মস্ত সমঝদার। জিজ্ঞাসা করলুম—হাব্‌লা এল না?

বঙ্কা বললে—দাদা ভীষণ চটেচে। বললে, দেখি আমাকে বাদ দিয়ে তোদের পত্রিকা ক-দিন চলে। দাদা ম্যালেরিয়া-বধ কাব্য সুরু করেচে, এঁড়েদহ-হিতৈষীতে ক্রমশপ্রকাশ্য। যাক্, তুমি চট্‌পট্ প'ড়ে ফেল মামা। লেখাটা এখনি ছাপাখানায় দিতে হবে, ছবির ব্লক করাতে হবে। নাও, আরম্ভ কর।

আরম্ভ করলুম।—

কাল—সত্যযুগ। স্থান—নৈমিষারণ্যের ঋষিপাড়া। পাত্র—তিন ঋষিকুমার, হারিত জারিত আর লারিত। পাত্রী—তিন ঋষিকন্যা, সমিতা জমিতা আর তমিতা।

বঙ্কা বললে—সত্যযুগে গেলে কেন? আধুনিক যুগ হলেই বেশ হ'ত, প্রেমের পথে কোনো বাধা পেতে না। যদি বর্ত্তমান যুগধারার সঙ্গে তোমার পরিচয় না থাকে, তবে বৌদ্ধ মুঘল আমল চালাতে পারতে।

বললুম—তুই কতটুকু খবর রাখিস? যদি হৃদয়ের অবাধ প্রসার আর কল্পনার উদ্দাম প্রবাহ দেখাতে হয়, তবে সত্যযুগে প্লট ফাঁদতেই হবে।

চিংড়ি বললে—যেমন কচ আর দেবযানী।

ঠিক। চিংড়ি তুই সব জানিস দেখচি।

চিংড়ি খুশী হয়ে উত্তর দিলে—মামা, তুমি কারও কথা শুনো না, চালাও সত্যযুগ।

চালাবই ত। শোন্।—হারিত ভালবাসে সমিতাকে, কিন্তু সমিতা চায় জারিতকে। আবার জারিত চায় জমিতাকে, অথচ জমিতার টান লারিতের ওপর। আবার লারিত ভালবাসে তমিতাকে, কিন্তু তমিতার হৃদয় হারিতের প্রতি ধাবমান।
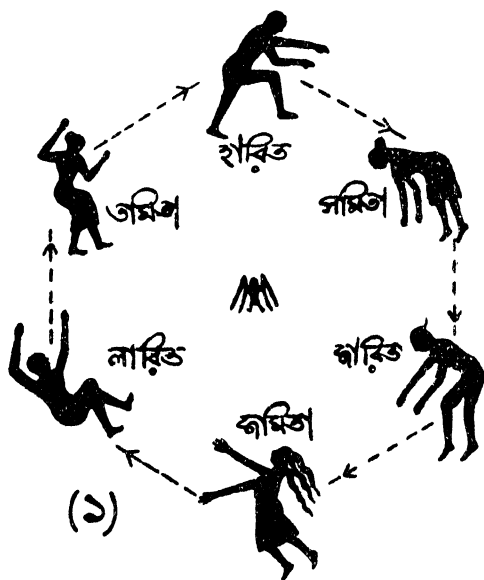
বঙ্কা বললে—ভয়ঙ্কর গোলমেলে প্লট, মনে রাখা শক্ত।

মোটেই না। এক নম্বর চিত্র দেখ।

চিংড়ি বললে—উঃ, করেচ কি মামা! এযে ইটার্নাল ট্র্যাঙ্গ্‌লের বাবা, হোপলেস হেক্সাগন। আচ্ছা মামা মধ্যিখানে এটা কি এঁকেচ, চামচিকে?

চামচিকে নয়। ইনি হচ্চেন খোদ কন্দর্প। অতনু কিনা, তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝা যাচ্চে না। লেন্স দিয়ে দেখলে টের পাবি. ওঁর দুই হাতে দুই ধনুক, তার ছিলের এক প্রান্ত খোলা, তাই দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে সপাসপ্ চাবুক লাগাচ্চেন, আর প্রেমচক্র বন্‌বন্ ক'রে ঘুরচে।

(২)

চিংড়ি বললে—বন্‌বন্ সেকেলে ভাষা। বাঁইবাঁই লেখ।

ঠিক। প্রেমচক্র বাঁইবাঁই ক'রে ঘুরচে। এই চক্রের বাইরে আর একটি মূর্ত্তি আছেন, তিনি হলেন ভুণ্ডিল ঋষি। ব্রহ্মচর্য্য শেষ করার পর গৃহী হবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ঋষিকন্যাই এঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, কারণ, ভুণ্ডিল যেমন

মোটা তেম্‌নি গম্ভীর, আর তাঁর বয়স প্রায় চার-হাজার বৎসর, অর্থাৎ এখনকার হিসেবে চল্লিশ। অবশেষে তিনি বুঝলেন যে এই দৃশ্যমান জগৎটা নিছক মায়া, আর নারী সেই মায়াসমুদ্রের ভুড়ভুড়ি, তাদের আকার কাছে কিন্তু বস্তু নেই। তখন তিনি আশ্রম ত্যাগ ক'রে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কঠোর তপস্যা সুরু করলেন। দু-নম্বর চিত্র দেখ।

একদা বসন্ত সমাগমে যখন বনভূমি রমণীয় হয়ে উঠেছে, অশোক কিংশুক পলাশ পুন্নাগ প্রভৃতি তরুরাজি পুষ্পভারে নমিত হয়েচে, ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কূজন বুড়ো বুড়ো তপস্বীদের পর্য্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত ক'রে তুলেচে, তখন এক মধুর অপরাহ্ণে সমিতা জমিতা আর তমিতা তিন সখীতে মিলে গোমতী-তীরে বায়ু সেবন করতে করতে মনের কথা আলোচনা করছিল। ঠিক সেই সময়ে হাত তিরিশ পিছনে একটি আম্রকাননের অন্তরালে হারিত জারিত আর লারিত ঘাসের ওপর ব'সে আড্ডা দিচ্ছিল। জারিত বলছিল —

চিংড়ি বললে— ঋষিকন্যাদের সাজ কি রকম তা লিখলে না?

হচ্চে হচ্চে। সত্যযুগে বস্ত্র বড়ই দুর্ম্মূল্য ছিল। ঋষিকন্যারা একখানি সাধাসিধে খাপী বল্কল পরিধান করতেন, আর একখানি সৌখিন মিহি বল্কল গায়ে তেড়চা ক'রে বাঁধতেন। মাথায় কাপড় টানবার উপায় ছিল না, লজ্জা প্রকাশ করবার দরকার হ'লে কিঞ্চিৎ জিহ্বা প্রদর্শন করতেন। উঁচুদরের মুনি-ঋষিরা, যাঁরা রাগ-দ্বেষ-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে উঠতেন, তাঁদের কিছুই দরকার হ'ত না;

তবে তাঁরা লোকালয়ে যেতে পারতেন না, কুকুর ঘেউ-ঘেউ করত। সাধারণ ঋষিরা বল্কলই ধারণ করতেন কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের ব্যবস্থা ছিল বেল-কাঠের কৌপীন।
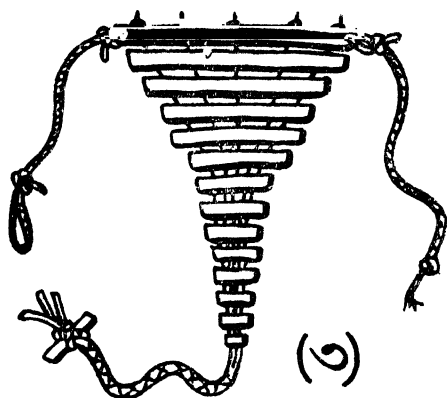
বঙ্কা বললে—বেল-কাঠের?

হাঁ। কর্ত্তারা বলতেন, তোদের এখন ব্রহ্মচর্য্যের সময়, বেশী বিলাসিতা ভাল নয়; তোরা বেদ পড়বি, ধেনু চরাবি, কাঠ কাটবি, বনে-বাদাড়ে ঘুরে হরদম বল্কলছিঁড়বি। কাঁহাতক যোগাব? তার চেয়ে কাঠের কৌপীন পরিধান কর্, তোদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে টিকবে।

বঙ্কা বললে—কিন্তু কাছা দেবে কি ক'রে?

কেন দেবে না। তিন নম্বর চিত্র দেখ।

চিংড়ি বললে—ও! রোল-টপ টেবিলের মতন।

ঠিক বুঝেছিস। চিংড়ি, তোর মাথা একদম ক্লিয়ার। তারপর শোন্। জারিত বলছিল—সখা, প্রাণ যে যায়!

লারিত বললে—তাই ত দেখচি। কি একগুঁয়ে মেয়ে সব! আরে, আমাদের ভালই যদি বাসিস তবে অমন গুলিয়ে ফেললি কেন? কিন্তু একটা কথা না ব'লে থাকতে পারচি না। তমিতার জন্যে ম'রে আছি দাদা; কিন্তু জমিতা যে আমাকে চায় তাতে আনন্দও হয়। আহা, যদি দুটিকেই পেতুম!

হারিত ঘাড় নেড়ে বললে—ঠিক, ঠিক। পঞ্চশরের কি বিচিত্র লীলা!

লারিত বললে—আচ্ছা হারিত-দা, ওদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাক্ষস বিবাহ করলে কেমন হয়?

হারিত বললে—দূর বোকা, আমরা যে ঋষির সন্তান। হয় ব্রাহ্মবিবাহ না হয় গান্ধর্ব্ববিবাহ, এ ছাড়া অন্য বিধি নেই। চল্, আর একবার ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি।

ওদিকে নদীর ধারে পায়চারি করতে করতে জমিতা বলছিল—সখী, যৌবন যে যায়!

তমিতা উত্তর দিলে—যায় যাক্ গে, তা ব'লে ত দ্বিচারিণী হতে পারি না। হৃদয় যাকে চায় না, তাকে মাল্যদান করব কি ক'রে? কিন্তু লারিত বেচারার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়, কেনই বা আমাকে চায় সে!

জমিতা বললে—অতই যদি দরদ, তবে গলায় মালা দিলেই পারিস। আমারও এক জ্বালা হয়েচে—কেনই বা মরতে সেদিন বেনারসী বল্কলটা পরেছিলুম, জারিত বেচারার ত দেখে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু লারিত-দার কোন পছন্দ নেই, কেমন যেন এক রকম।

তমিতা বললে—আহা চটো কেন জমিতা-দি, লারিতকে ত আর কেড়ে নিচ্চি না। তাকে আজীবন ভাই বলতে পারি, দাদা বলতে পারি, ঠাকুরপো বলতে পারি, কিন্তু প্রাণনাথ বলতে শুধু হারিত-দা।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সমিতা বললে—কিন্তু সে যে আমাকেই চায়। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে!

এমন সময় তিন বন্ধু এসে উপস্থিত। হারিত সম্ভাষণ করলে—কিগো বরবর্ণিণীরা, কি হচ্চে?

তমিতা একটু জিহ্বা-বিলাস ক'রে বললে—এই যে, আসুন. নমস্কার।

হারিত বললে—আর কত কাল আমাদের কষ্ট দেবে, দয়া কি হয় না? সমিতে একবারটি হাঁ বল!

জারিত জড়িত স্বরে বললে—জমিতে, সাড়া দাও!

লারিত হাঁকলে—তমিতে, আমি যে তোম্মার তরে ম'রে আছি প্রিয়ে!

তমিতা স'রে গিয়ে বললে ও হারিত-দা, দেখনা কি বলচে!

হারিত বললে—অন্যায় কিছু বলে নি। তুমি লারিতকে ধন্য কর, জমিতা জারিতকে করুক, আর সমিতা আমাকে।

সমিতা বললে—সে হ'তেই পারে না। আমাদের হৃদয় বিলি ক'রে ফেলেচি, তার আর নড়-চড় নেই।

হারিত বললে—একটা রফা করা যায় না? ভগবান্ কন্দর্পকে না-হয় মধ্যস্থ মানা যাক।

জমিতা আর তমিতা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। কিন্তু সমিতা তাদের বুঝিয়ে দিলে—দেখাই যাক না কন্দর্প কি বলেন, আমরা ত আর নিজেদের মত বদলাচ্চি না।

কন্দর্প নিকটেই ছিলেন, মিনিট পাঁচেক আবাহন করতেই দেখা দিলেন। সব শুনে বললেন—দেখ, এ বিসংবাদ তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। আমার কি-ই বা ক্ষমতা, শুধু প্রজাপতির আদেশে পঞ্চবাণ মোচন করি। তার আঘাত যদি তোমাদের পছন্দ-সই না হয় ত আমি নাচার।

লারিত বললে—আপনি প্রেমচক্রে একটা উল্‌টো পাক লাগিয়ে দিন না।

হারিত বললে—দূর গর্দ্দভ, তাতে শুধু উল্‌টো বিপত্তি হবে। আমি চাইব তমিতাকে, তমিতা চাইবে লারিতকে—এই রকম বিপরীত অবস্থা দাঁড়াবে।

সমিতা কন্দর্পকে বললে—আপনি অতি বেয়াড়া লোক, ছ-টি নিরীহ তরুণ-তরুণীকে খামকা চরকি ঘোরাচ্চেন। কি সুখ পাচ্চেন এতে ?

জমিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—আমরা অভিশাপ দেব কিন্তু, তখন মজা টের পাবেন।

তমিতা কিল তুলে বললে—লাগাও না দু-চার ঘা লারিত-দা।

বেগতিক দেখে কন্দর্প চট্ ক'রে স'রে পড়লেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েচে। হারিত বললে—আজ আমরা বিদায় নি, রাত্রে আবার বৃহদারণ্যক আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে। কাল বিকেলে এসে ফের আমাদের আবেদন জানাব।

ঋষিকুমাররা চলে গেলে সমিতা অনেকক্ষণ ভেবে বললে—দেখ, কন্দর্প বেঁচে থাকতে এই প্রেমচক্রের ঘুরপাক থামবে না। চল আমরা মহাদেবকে গিয়ে ধরি, তিনি আর একবার মদনভস্ম করুন।

জমিতা মেয়েটি খুব হিসেবী। বললে—উঁহু: সেই ভস্ম যদি ভুবন-মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তবেই চিত্তির, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন প্রেম গজিয়ে উঠবে। একবারে সাবাড় না করলে নিস্তার নেই।

তমিতার উপস্থিতবুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে বললে—ভগবান্ রাহুকে ধর, তিনি কপ্ ক'রে গিলে ফেলুন।

সমিতা আর জমিতা লাফিয়ে উঠে বললে—সেই খাসা হবে। চল এক্ষুনি রাহুর কাছে যাই।

মেয়েরা সাঁ ক'রে রাহুর কাছে চ'লে এল।

বঙ্কা বললে—ছাই গল্প হচ্চে। শাস্ত্রের কথা না হয় মেনে নিলুম যে রাহু একটা গ্রহ, আকাশে থাকে। কিন্তু মেয়েরা তার কাছে যাবে কি ক'রে? যত সব গাঁজাখুরি।

চিংড়ি ধমক দিয়ে বললে—তুমি থামো ছোড়-দা। এটা যে সত্যযুগ সে খেয়াল আছে? প'ড়ে যাও মামা।

রাহু তখন আকাশে নিরিবিলিতে ব'সে পাঁজি দেখছিলেন। মেয়েদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই? চট্ ক'রে ব'লে ফেল, আমার সময় বড্ড কম।

সমিতা হাত জোড় ক'রে বললে—প্রভু, আমরা প্রেমে পড়েচি।

রাহু ফিক্ ক'রে হেসে বললেন—মাইরি? তা আমাকে কেন? আমি শূন্য পথে ধাই, চাঁদ-সূয্যি খাই, প্রেমের আমি কিবা জানি। দেখচ ত, আমার শুধুই মুণ্ডু, তাতে প্রেম হয় না। প্রেম চাও ত ইন্দ্রাদি দেবতার কাছে যাও।

সমিতা নিবেদন করলে—প্রভু, আপনাকে হৃদয় দেব এমন ভাগ্য আমরা করিনি। আমরা মানুষকেই ভালবেসেচি, কিন্তু কন্দর্প সমস্ত ওলট-পালট ক'রে দিচ্চেন। তিনি ধ্বংস না হ'লে আমাদের স্বস্তি নেই। আপনি কৃপা ক'রে তাঁকে গ্রাস করুন।

রাহু মাথা নেড়ে বললেন—সইবে না, সইবে না। চাঁদ পর্য্যন্ত আমার হজম হয় না, গিলতে না গিলতে বেরিয়ে যায়। কন্দর্প খেলে পেট ফাঁপবে।

তমিতা বললে—পেট ত আপনার দেখচি না।

রাহু ধম্‌কে বললেন—হাঁ, তুই সব জানিস! আধ্যাত্মিক উদর শুনেচিস? আমার তাই।

জমিতা বললে—প্রভু, তবে আমাদের তিনটিকে ভক্ষণ করুন, বেঁচে আর সুখ নেই।

রাহু একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—হজমের কি আর শক্তি আছে রে! শুধু লঘুপথ্য খেয়ে বেঁচে আছি, হ'ল একটু চাঁদের কুচি, হ'ল বা গরম গরম এক কামড় সূয্যি। আচ্ছা, কাছে আয়, দেখি একটু তোদের গাল চেটে।

তমিতা বললে—কি যে বলেন!

তবে এলি কি করতে? যা, এখন পালা, আমার খাবার লগ্ন হ'ল।

রাহু তাঁর লকূলকে গোঁপ দিয়ে খপ্ ক'রে পূর্ণচন্দ্র ধরলেন, তারপর তাতে একটু মাখন মাখিয়ে কামড় দিলেন। চার নম্বর চিত্র দেখ। মেয়েরা সে করুণ দৃশ্য সইতে পারলে না, ছুটে পালাল।

মহামুনি ঔড়ব হচ্ছেন নৈমিষারণ্যের বড় আশ্রমের কুলপতি। তাঁর দশ-হাজার শিষ্য, বিশ-হাজার ধেনু। যজ্ঞশালায় রোজ আড়াই-শ মণ নীবার ধানের চাল রান্না হয়, আর তিন-শ ঝুড়ি উড়ুম্বরের তরকারি। ঔড়ব অত্যন্ত রাশভারি ঋষি, আশ্রমবাসীরা তাঁর ভয়ে তটস্থ।

সকাল বেলা হারিত জারিত আর লারিত বেদাধ্যয়ন করতে এসেচে। ঔড়ব জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন—হারিত।

আজ্ঞে।

এসব কি শুনচি? তোমরা নাকি আশ্রমকন্যাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? জানো, এটা হচ্ছে তপোবন, ইয়ারকির জায়গা নয়? এখন তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যের সময়, সে খেয়াল আছে?

সত্যযুগে মিথ্যে কথা লোকে বড় একটা কইত না। হারিত হাত জোড় ক'রে স্বীকার করলে—প্রভু, আমরা অপরাধ করেচি।

তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তিনজনে গোমুখী তীর্থে চ'লে যাও, নিরন্তর গোসেবা, সদ্যোজাত গোময় আহার, কবোষ্ণ গোমূত্র পান, এই ব্যবস্থা। তাতে চিত্তশুদ্ধি পিত্তশুদ্ধি পাপমোচন একযোগে হবে। একটি বৎসর নৈমিষারণ্যের ত্রিসীমায় এসো না।

হারিত জারিত আর লারিত গুরুদেবের চরণবন্দনা ক'রে বিষণ্ণ মনে বিদায় হ'ল।

একদিন প্রাতঃকালে কন্দর্প হিমালয়ের পাদদেশে কিন্নরমিথুন শিকার করতে গেছেন। ইতস্তত বিচরণ করতে করতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা মস্ত উই-ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েচে, তার ওপর পোকা বিজ্‌বিজ্‌ করচে। কেমন সন্দেহ হ'ল। গোটা দুই বাণের খোঁচা দিতেই পনের ইঞ্চি মাটির স্তর খ'সে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠরব শোনা গেল—অহো, কুসুমশর কি দুঃসহ!

কন্দর্প বললেন—ভুণ্ডিল মুনির গলা শুনচি না?

বল্মীকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ভুণ্ডিল বললেন—আমার তপস্যা ভঙ্গ করলে কেন হে? ভস্ম ক'রে ফেলব।

কন্দর্প বললেন—আরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখন গোসা রাখ। বেজায় কাহিল হয়ে গেছ যে। নাও, এই দিব্য মকরন্দটুকু খেয়ে ফেল। গায়ে বল পাচ্চ? বেশ বেশ, আর একটু খাও। তারপর, কিসের জন্য তপস্যা হচ্ছিল?

ভুণ্ডিল উত্তর দিলেন—তপস্যা আবার কিসের জন্য করে? মোক্ষলাভের জন্য।

মোক্ষ এখন থাকুক। দিব্যকান্তি চাও? তপ্তকাঞ্চনবর্ণ চাও? রমণীর মন হরণ করতে চাও?

ভুণ্ডিল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন—কিন্তু তপস্যার কি হবে?

তপস্যা এখন থাক না। দিন-কতক ছুটি নাও, ফুর্তি কর।

ভুণ্ডিল ভেবে দেখলেন, এ রকম ত অনেক মহামুনিই ক'রে থাকেন, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ব্যাসদেব। তাতে আর দোষ কি? বললেন—আচ্ছা, রাজি আছি কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয়।

কন্দর্প বললেন—তাই হবে। আমি বর দিচ্চি, ভুবনমোহন রূপ ধারণ কর। বৎসরান্তে আবার স্বমূর্ত্তি ফিরে পাবে, তখন যত খুসী তপস্যা কোরো, কেউ বাধা দেবে না।

ভুণ্ডিলের আপাদমস্তকে একটা তারুণ্যের প্লাবন ব'য়ে গেল। কাঁচা-পাকা জটাজূট উড়ে গিয়ে মাথায় ভ্রমরবিনিন্দিত কৃষ্ণ কেশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গজিয়ে উঠল। একটা অদৃশ্য ক্ষুর চর্‌চর্ ক'রে মুখমণ্ডল নির্লোম ক'রে দিলে, রইল শুধু দু-পাশে দুটি চিত্তহারী জুল্‌পি। ছাতা-পড়া নড়া দাঁত খটাখট্ উপড়ে গিয়ে নতুন দু-পাটি দন্তরুচিকৌমুদী ফুটে উঠল। কটিতটে শুভ্র পট্টবাস জড়িয়ে গেল, কাঁধে চড়ল আপীত উত্তরীয়, গলায় মল্লিকার মালা, হাতে মোহন মুরলী, সর্ব্বাঙ্গে দিব্যকান্তির পলেস্তারা। ভুণ্ডিল একটি লম্ফ দিয়ে

হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—ভো বিশ্বচরাচর, আমি আছি, তোমরাও আছ।

কন্দর্প বললেন—অতি খাঁটি কথা। আচ্ছা, এইবার ওই সুদূর নৈমিষারণ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর।

ভুণ্ডিল তাই করলেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—অহো, কি দেখলুম!

কি দেখলে?

তিনটী পরমাসুন্দরী গোমতী-জলে স্নান করচে।

প্রাণে পুলক জাগচে?

জাগচে।

হিয়ায় হিল্লোল উঠচে?

উঠচে।

চিত্ত চুলবুল করচে?

করচে।

চিংড়ি বললে—মামা, এইখানটা ভারি গ্রাণ্ড্ লিখেচ কিন্তু।

আমি বললুম—হুঁ হুঁ, এখনি হয়েচে কি। পরে দেখবি আরো মধুর আরো মর্ম্মস্পর্শী। তারপর শোন্।—

কন্দর্প বললেন—ভুণ্ডিল।

আজ্ঞে।

কোন্‌টিকে পছন্দ হয়?

ঠিক করতে পারচি না যে

আচ্ছা, ওই যেটি তন্বী দীর্ঘকায়া, পদ্মকোরকবর্ণা, রাজহংসীর মতন যার গলা ?

অতি সুন্দর।

আর যেটি সুমধ্যমা, চম্পকগৌরী, মদমুকুলিতাক্ষী, দোহারা গড়ন টুক্‌টুকে ঠোঁট ?

চমৎকার।

আর ওই বেঁটেটি শ্যামাঙ্গী, চঞ্চলা, চকিতমৃগনয়না, বেশ মোটা-সোটা, টেবো-টেবো গাল ?

ওটিও খাসা।

ব'লে ফেল কোন্‌টিকে চাও।

আজ্ঞে তিনটিকেই।

কন্দর্প ভুণ্ডিলের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাধু ভুণ্ডিল সাধু! তবে আর দেরি কোরো না, সোজা নৈমিষারণ্যে চ'লে যাও, গোমতীর তীরে ব'সে ওই বাঁশীটি বাজাও গে।

সমিতা জমিতা আর তমিতা বিকেলবেলা গোমতীর ধারে ব'সে নৈমিষারণ্যের বিখ্যাত চিঁড়েভাজা খাচ্চে। হঠাৎ একটা করুণ বেসুরো বাঁশির আওয়াজ কানে এল। সমিতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলে, একটি লোক কশ্যপ-ঘাটে ব'সে তাদের দিকে চেয়ে বাঁশি বাজাচ্চে।

সমিতা বললে—কে ওই তরুণ ? আগে ত দেখিনি কখনো।

জমিতা বললে—কেন বাঁশি বাজাচ্চে কে জানে। কেমন যেন উদাস সুর।

তমিতা বললে—সুন্দর চেহারাটি কিন্তু।

সমিতা বললে—তোর হারিত-দার চেয়ে সুন্দর?

তমিতা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে—কি যে বল! হারিত-দা জারিত-দা লারিত-দার চাইতে বুঝি কারও সুন্দর হ'তে নেই!

মেয়েরা অন্যমনস্ক হ'য়ে আড়চোখে দেখতে লাগল। আচ্ছা চিংড়ি, আড়চোখে চাওয়া কি রকম ক'রে আঁকতে হয় জানিস?

(৫)

চিংড়ি বললে—খুব সোজা। একটা আণ্ডা আঁকা। মাথায় ইচ্ছে-মত চুল বসাও কপালে নিরেনব্বুই লেখ, তার নীচে একটা কাত-করা বিসর্গ, তার নীচে একটা পাঁচ। যদি দাঁত দেখাতে চাও তবে চুয়াল্লিশ বসাও। আর যদি মোনা-লিসার ধরণের নিগূঢ় হাসি ফোটাতে চাও, তবে আট লেখ।

বাঃ, ঠিক হয়েচে। পাঁচ নম্বর চিত্র দেখ। তারপর শোন্।—

একটি বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেল। হারিতরা প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে তীব্র আশা আর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে নৈমিষারণ্যে ফিরে এল। মেয়েদের সংবাদ কি? তারা কি এখনও নিজেদের গোঁ বজায় রেখেচে? এই বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের

ফলে তারা কি প্রেমের সোজা পথটি খুঁজে পায় নি, মনে একটুও প্রতিদান-স্পৃহা জাগেনি? হবেও বা।

কিন্তু খবর যা শুনলে তা মর্ম্মান্তিক। সমিতা জমিতা তমিতা তিনজনেই ভুণ্ডিলকে মাল্যদান করেচে। হা রে কন্দর্প, এই কি তোর মতলব ছিল? প্রেমচক্রে বৃথাই এতদিন ঘুরপাক খাওয়ালি? হায় হায়, কেন তারা মেয়েদের মতেই সায় দেয়নি? আর মেয়ে-তিনটেরও ধন্য রুচি, শেষে কিনা ভুণ্ডিল!

হারিত মাথা চাপ্‌ড়ে বললে—ওঃ স্ত্রী চরিত্র কি কুটিল! ওদের কিস্‌সু বিশ্বাস নেই।

জারিত হাত নেড়ে বললে—একেবারে যাস্‌সেতাই!

লারিত দাড়ি ছিঁড়ে বললে—তিনটে বস্‌সর নাহক্ ভুগিয়েচে মশাই।

তিন উদ্দাম প্রেমিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল ভুণ্ডিলের বাড়ি। ব্যাটাকে ঠেঙিয়ে মনের জ্বালা দূর করতে হবে, তাতে মহামুনি ঔড়ব ভস্মই করুন আর তির্য্যগ্‌যোনিতেই পাঠান।

ভুণ্ডিলের কুটিরে কেউ নেই, শুধু প্রাঙ্গণে একটি আশ্রম-ব্যাঘ্রী তৃণ ভোজন করচে আর তিনটি হরিণশিশু তার স্তন্য পান করচে। এই স্নিগ্ধ শান্ত আশ্রমসুলভ দৃশ্য দেখে ঋষিকুমারদের হুঁস হ'ল যে অহিংসার কাছে কিছু নেই। হারিত ব্যাঘ্রীটিকে একটু আদর ক'রে সঙ্গীদের বললে—যা হবার তা ত হয়ে গেছে, দৈবই সর্ব্বত্র বলবান্। মিথ্যা ঋষিহত্যা ক'রে কি হবে, চল আমরা গোমুখী-তীর্থে ফিরে গিয়ে যোগাভ্যাস করি।

সংসারে বীতরাগ হ'য়ে তারা আবার উত্তরমুখে চলল। কিন্তু দৈবের মতলব অন্য রকম। একটু যেতে না যেতে তারা দেখতে

পেলে, বটগাছের তলায় একটা উই-ঢিব, সমিতা জমিতা আর তমিতা তার উপর ঝাঁটা চালাচ্চে।

একটি সলজ্জ ম্লান হাসি হেসে তমিতা বললে এই যে, আসুন, নমস্কার। ভাল আছেন ত?

হারিত বললে— ভদ্রে, একি?

অবনতমস্তকে সমিতা উত্তর দিলে এই ঢিবির মধ্যে আছেন। কাল বিকেল পর্য্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। যেমন সূর্য্যাস্ত হ'ল, অমনি হঠাৎ কেমন একটা কাঁপুনি ধরল, আর চেহারাটাও বিকট কালো মোটা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একরাশ জটা আর মুখ-ভরা বিশ্রী দাড়ি-গোঁপ। আমরা ত ভয়ে পালিয়ে গেলুম। তারপর খুঁজে খুঁজে পেলুম এই বটতলায়, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তপস্যা করচেন। অনেক ডাকাডাকি করতে একবার চোখ মেলে চাইলেন, ধমকে বললেন—খবরদার, ভস্ম ক'রে ফেলব। দেখতে দেখতে সর্ব্বাঙ্গে উই লেগে মাটির প্রলেপ জ'মে গেল, দেখুন না একদিনেই আগা-পাস্তলা চাপা প'ড়ে গেছে। আমরা কি আর করি, তিনজনে ঝাঁটা বুলিয়ে উই তাড়াচ্চি।

হারিত বললে—না না না, অমন কাজও কোরো না, তাতে ওঁর তপস্যার হানি হবে। উই অত্যন্ত হিতকারী জীব, বাহ্য বিষয় রোধ ক'রতে অমন আর জুটি নেই।

জারিত বললে—উই-মাটি ভেঙে গিয়ে যদি হাওয়া ঢোকে, তবে চ'টে গিয়ে বিলকুল ভস্ম ক'রে ফেলবেন।

সারিত বললে—ওঃ, কি জোচ্চোর হৃদয়হীন তপস্বী, তিন-তিনটি তরুণীকে ভাসিয়ে দিলে।

তমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—ওগো সেই বাঁশিতেই সর্ব্বনাশ করেচে।

জমিতা গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকলে—ও হারিদ্দা জারিদ্দা লারিদ্দা!

হারিত বললে—ভয় কি, আমরা তিনজনেই আছি। ওঁকে আর ঘাটিয়ে কাজ নেই, সমাধিস্থ হয়েই থাকুন। তোমরা আমাদের সঙ্গে হিমালয়ে চল সেখানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করা যাবে।

কিন্তু আমরা যে সতী, হারিত-দা।

আমরাই কোন্ অসৎ। চল চল, বেলা ব'য়ে যায়।

বঙ্কা বললে থামলে কেন মামা, তারপর?

তারপর আর নেই। তোর মামী শেষটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েচে।

আঃ, মামীর কোনো আক্কেল নেই।

চিংড়ি বললে—এ মামীর ভারি অন্যায় কিন্তু। সত্যযুগে কী না হতে পারে? তা তোমার ত মনে আছে, শেষটা মুখে মুখেই বল না, আমি লিখে নিচ্চি।

উঁহু, একদম ভুলে গেছি, যে তোর মামীর ধমক।

বঙ্কা বললে—তোমার মরাল করেজ কিচ্ছু নেই। দাও আমাকে, আমিই শেষ ক'রব।

স্ত্রী-বুদ্ধি

শ্রীজলধর সেন

১

নদীর নাম ইছামতি। ইছামতিকে খাল বললে ইহার মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করা হয়, আবার নদী বললেও পদ্মা. মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি বিশালকায় নদীর নামের অপব্যবহার করা হয়। তা হোক, ইছামতিকে নদীই বলি। এই নদীতে বারোমাস জল থাকে—এমনি এক-হাঁটু-ডুবু জল নয় অনেক জল থাকে; চৈত্র বৈশাখ মাসেও বড় বড় হাজার দেড়-হাজার মুনী মহাজনী নৌকা এই ইছামতি দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করে। আর বর্ষার সময় ত কথাই নেই—অনেক সময় নদীর তীর ছাপাইয়া গ্রামের মধ্যেও জল প্রবেশ করে, স্রোতের বেগ প্রবল হয়। মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গনও লাগে।

এই ইছামতি নদীর দু-পারে দু-খানি গ্রাম। একখানির নাম নাজিরগঞ্জ, আর একখানির নাম নবাবগঞ্জ। আমরা প্রত্নতত্ত্ব-বিদের মত ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, এই নাজিরগঞ্জে কখনও কেহ নাজির ছিলেন না; আর নবাবগঞ্জে নবাব ত দূরের কথা, একজন সরকারী পেয়াদাও কখনও বাস করে নাই। তবে ইছামতির অনুগ্রহে এই দু-খানি গ্রামকেই 'গঞ্জ' বলিতে পারা যায়। নবাবগঞ্জে প্রতি শনিবারে হাট বসে, নাজিরগঞ্জের হাট বসে মঙ্গলবারে।

নদীর তীরে যেখানে হাট বসে, নবাবগঞ্জের সেখানে আট দশ খানা বাঁধা দোকান আছে। আর সব হাটুরেরা বেলা আটটা থেকে আসতে থাকে, সারাদিন কেনাবেচা করে; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা ডিঙি নৌকায় চড়ে ঘরে ফিরে যায়। নাজিরগঞ্জের হাটে কিন্তু একখানিও বাঁধা দোকান নেই। মঙ্গলবারে হাটুরেরা আসে, যার যার নির্দ্দিষ্ট চালাঘরে বা অনাবৃত আকাশ-তলে ব'সে বেচাকেনা করে; হাট ভাঙ্গলে যে যার ঘরে চলে যায়; মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে পরের মঙ্গলবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কোন কেনা-বেচাই হয় না হাটতলা খাঁ খাঁ করতে থাকে।

এই গ্রাম দুটির একটা বিশেষত্ব আছে। গ্রামের নাম দুটি মুসলমানী হলেও নাজিরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জে মুসলমানের বাস একবারে নাই। নবাবগঞ্জের বাজারে যে দু-তিনজন মুসলমানের দোকান আছে, তারা ঐ গ্রামের অধিবাসী নয়—দু-তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে তাদের বাস। তারা প্রতিদিন বেলা আটটা নটার সময় ডিঙ্গী নৌকায় চড়ে গঞ্জে আসে, আবার সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে নৌকায় হাত-পা ছড়িয়ে গান ধরে—

"আমার পরাণ কাঁদে বাড়ী যাই যাই কৈরা রে এ"

সেই গানের করুণ স্বরে ইছামতি নেচে ওঠে—নদীতীরস্থ গ্রামগুলির বিরহিনীদের প্রাণে কি ভাবের সঞ্চার হয়, তা এই বৃদ্ধ লেখক কি ক'রে বলবে।

নবাবগঞ্জে মুসলমান ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর হিন্দুরই বাস আছে —ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন, নবশাখ আছেন, গোয়ালা আছেন, নমঃশূদ্র আছেন, জেলেমালো আছেন। অবস্থা প্রায় সকলেরই সমান। তবুও ওরই মধ্যে, যে পাঁচ-সাত ঘর গোয়ালা আছেন,

তাঁদেরই অবস্থা খানিকটা সচ্ছল—দুধ, দই, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামে এবং স্বগ্রামে যোগান দিয়ে তারা দু পয়সা পায়। দূর স্থান থেকে মহাজনের লোক এসেও ঘৃত নিয়ে যায়

নাজিরগঞ্জে যে মুসলমানের বাস নেই, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এ গ্রামে গোয়ালা ছাড়া অন্য জাতের লোকই নেই। চল্লিশ ঘর গোয়ালার বাস এই গ্রামে। নাজিরগঞ্জের হাটে এই গায়ালাদেরই একাধিপত্য। হাটের মালিকও ঐ গ্রামের রাধাচরণ গোপ। সে-ই বলতে গেলে গ্রামের মণ্ডল। চল্লিশ ঘর গোয়ালা রাধু ঘোষের কথায় ওঠে বসে বললেই হয়।

প্রতি বছরই নবাবগঞ্জের অধিবাসীরা হাটতলায় বারইয়ারী দুর্গোৎসব করে থাকে পাঁচ ছ বছর থেকে এই বারইয়ারী পূজা চলে আসছে। গ্রামে যে পাঁচ সাত ঘর গোয়ালা আছে, তাদেরই অবস্থা অন্যের অপেক্ষা ভাল তারাই বেশী চাঁদা দেয়; সুতরাং এই পূজায় তারাই কর্তৃত্ব করে এবং তাদেরই পুরোহিত এই পূজায় পৌরহিত্য করে আসছেন।

পুরোহিত রামরেণু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাস এই নবাবগঞ্জেই। তিনি নবাবগঞ্জ ও নাজিরগঞ্জের সমস্ত গোয়ালার পুরোহিত। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এতগুলি যজমানের বাড়ী ক্রিয়া সম্পন্ন করা তাঁর মত প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়; এইজন্য তিনি পর্ব্বোপলক্ষে কয়েকজন ঠিকে পুরোহিত নিযুক্ত করতেন। তারা যজমানের বাড়ীতে যা দক্ষিণা ও দ্রব্যাদি পেত তার অর্দ্ধাংশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিত, আর তিনি নিজে যে সব বাড়ীর ক্রিয়া করতেন সেখানকার প্রাপ্য ষোল আনাই তিনি পেতেন। পর্ব্বোপলক্ষে এই সকল যজমান নির্ব্বাচনের ভার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

হাতে ছিল না ; সে ভার গ্রহণ করতেন তাঁর গৃহিনী যজমানদের মা-ঠাকুরুণ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সোজা কথায় যাকে নিতান্ত গো-বেচারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলে. রামরেণু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাই ছিলেন। সংসার-ধর্ম্ম, আয়-ব্যয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন এই মা-ঠাকুরুণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেখানে যা পেতেন, বাড়ীতে এনে ব্রাহ্মণীর হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতেন বটে, কিন্তু কৈফিয়তের হাত থেকে নিস্তার পেতেন না। এই প্রায় পঞ্চাশ ঘর গোয়ালা যজমানের কার কি অবস্থা, কে কেমন দাতা, তা বোধ হয় ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপেক্ষা তাঁর ব্রাহ্মণীই বেশী জানতেন। তাই, কোন বাড়ীর ক্রিয়া শেষ করে বেলা তৃতীয় প্রহরে অভুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদি নিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন ঘরে ফিরে আসতেন, তখন মা-ঠাকুরুণ প্রত্যেক জিনিসটি তন্ন তন্ন করে দেখতেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্যবাণ। হ্যাঁ, শিবু ঘোষের বাড়ী থেকে তুমি সওয়া সের মোটা চেলের নৈবিদ্যি কোন্ আক্কেলে নিলে বল ত ? আর এই পাঁচ-হাত শাড়ী ! একবার চোখ তুলেও দেখলে না ? আর যে সিধে দিয়েছে, অতি গরীবেও তা দেয় না। তোমাকে কি তারা কাঙ্গালী বিদেয় করেছে। আর দেখ ত, দই দিয়েছে কি না একটা ভাঁড়ে, এক হাঁড়ি দইও দিতে পারে নি। দক্ষিণে কি না আটগণ্ডা পয়সা ! মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারলে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভয়ে বিনয়নম্রবচনে বলেন, জান ত ব্রাহ্মণী, আমি কখনই কোন কথা বলতে পারিনে। যজমান যা শ্রদ্ধা করে দেয়, তাই হাসিমুখে নিয়ে আসি। আপত্তি আমি

করতে পারিনে। আর জান ব্রাহ্মণী, কার জন্যই বা উপার্জ্জন করব—ছেলে মেয়ে নেই যে তাদের মুখ চেয়ে উপার্জ্জন করব; সঞ্চয় করব। তাই, যে যা দেয় নিয়ে আসি। দুটি মানুষের অভাব ত বেশ পূরণ হচ্চে ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ পুরোহিতের লোভ রিপুটা দমন করাই বিধেয়।

ব্রাহ্মণী একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।—তা-হলে আর সংসারধর্ম্ম করা কেন? সন্নিসী হয়ে বনে গেলেই হয়। তোমাকে আমি আর বুদ্ধি দিতে পারলাম না। আজ তিরিশ বছরের ওপর তোমার ঘরে এসেছি, বয়সও কম হোলো না; তুমিও বুড়ো হয়ে গেলে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চলতে তা হলে এতদিনে তোমার কোঠা-বালাখানা হোতো, ঐশ্বর্য্য হোতো। আর দেখ না, আমাদের কি অবস্থা! সবই অদৃষ্ট!

হ্যাঁ, হ্যাঁ ব্রাহ্মণী, সবই অদৃষ্ট! যাক, দিন ত চলে যাচ্ছে, আর ভাল ভাবেই চলছে; কিছুরই ত অভাব বোধ হয় না।

ব্রাহ্মণী তখন রাগে আরও জ্বলে ওঠেন; শতমুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা এবং নিজের পোড়া অদৃষ্টের দোষ দিতে থাকেন।

দুই গাঁয়ের লোকেরা, বিশেষতঃ গোয়ালা যজমানেরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যেমন ভক্তি করেন, ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী এই মা-ঠাকুরুণকে তেমনই ভয় করেন। তাঁর কথার জ্বালায় সকলে অস্থির। গাঁয়ের ছেলেরা ত তাঁর নামই দিয়েছে—জমাদারণী।

২

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ ছিল যে, গয়লার ছেলে পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্ব্বে সাবালক হয় না। এখন অবশ্য সে প্রবাদ অনেকটা নিরর্থক হয়েছে। তা হলেও, গোয়ালারা যে অন্য জাত অপেক্ষা ভাল মানুষ, ঘোরপেঁচ বোঝে না, এ কথা কিন্তু ঠিক। নাজিরগঞ্জের গোয়ালারাও সম্পূর্ণ এই প্রকৃতির ছিল। তারা জাত-ব্যবসা করত, সদাসন্তুষ্ট ছিল, নিশ্চিন্ত-মনে, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করত।

হঠাৎ একবার তাদের মধ্যে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার হোলো--নাজিরগঞ্জের গোয়ালারা ছোট বড় সবাই একদিন সাবালক হয়ে উঠল। তারা ছ সাত বছর নবাবগঞ্জের বারইয়ারী দুর্গাপূজা দেখে আসছে। শুধু দেখা নয়, পূজার তিন রাত্রি সমস্ত রাত জেগে, মাথায় চাদর জড়িয়ে কবিগান শুনেছে; গাঁয়ের সকলে ছেলে মেয়ে নিয়ে নবমী পূজার দিন নবাবগঞ্জে হাটখোলায় বারইয়ারী তলায় দৈ-চিড়ের ফলার করে এসেছে; বিজয়া-দশমীর দিন নূতন কাপড় প'রে ঠাকুর বিসর্জ্জনে যোগ দিয়েছে; সন্ধ্যার পর বাড়ীতে এসে যথারীতি প্রণাম আলিঙ্গন মিষ্টিমুখ করেছে। কোন দিন তাদের মনে অন্য ভাবের সঞ্চার হয় নি।

যে বৎসরের কথা বলছি, সেবার ২৭শে আশ্বিন দুর্গোৎসব। আশ্বিন মাসের পয়লা কি দোসরা তারিখে নাজিরগঞ্জের কয়েকজন গোয়ালার মনে খেয়াল উঠল যে, নবাবগঞ্জের মত এবার তারাও দুর্গোৎসব করবে। নবাবগঞ্জের বামুন, কায়েত, গয়লাদের চাইতে তারা কম কিসে? তারা পূজা করতে পারে আর নাজিরগঞ্জের

চল্লিশ ঘর গোয়ালো মিলে পূজা করতে পারে না? তা হবে না, এবার তারাও পূজা করবে; এবং যাতে নবাবগঞ্জের অনুষ্ঠানের উপর টেক্কা দিতে পারে, তার ব্যবস্থা তারা করবেই করবে। তারা একদিন সকলকে দই চিড়ে খাওয়ায়, এরা তিন দিনই খাওয়াবে; দুঃখী কাঙ্গালী বিদায় করবে; তারা তিনদিন কবিগান দেয়, এরা যাত্রাগান দেবে। পারবে না কেন? ধনবল জনবল কিছুতেই তারা নবাবগঞ্জের চাইতে খাটো নয়। এই কথাটা তাদের মাথায় এতদিন প্রবেশ লাভ যে কেন করেনি এর জন্য তারা আশ্চর্য্য বোধ করল।

তখন গ্রামময় সাজসাজ রব পড়ে গেল। উৎসাহ দেখে কে? গাঁয়ের গৃহিনীরা, বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত এই উৎসাহ-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাতে লাগল। সে দিন শনিবার। স্থির হোলো যে পরদিন রবিবার বিকেলে সবাই মিলে একটা সভা করে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করল যে, বিস্তীর্ণ হাটখোলায় সকলে সমবেত হবে। অপর কয়জন বলল, তাতে কাজ নেই, দশ গাঁয়ের লোক ত আর ডাকা হচ্চে না; নিজেদের গাঁয়ের সবাই মিলবে, তাতে হাটখোলা কেন, গ্রামের প্রধান রাধাচরণ গোপের বাড়ীতেই সভা হবে। এতে তাঁকে বিশেষ সম্মান করা হবে। আরও এক কথা, গ্রামের মেয়েদের যে রকম উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তাতে হাটতলায় সভা হ'লে কেউ কেউ হয় ত যেতে পারবেন, কিন্তু বৌ ঝিরা যেতে পারবেন না। অতএব রাধু ঘোষের বাড়ীতেই সভা হওয়া স্থির হোলো। বারইয়ারী ব্যাপারে যারা পাণ্ডাগিরি করতে অভ্যস্ত, তারা কোমরে চাদর জড়িয়ে গ্রামময় এই শুভ সংবাদ

প্রচার ও সকলকে রবিবার অপরাহ্ণে রাধু ঘোষের বাড়ীতে সমবেত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন যথাসময়ে সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হোলো। সে দিন তিন ক্রোশ দূরে মনসাডাঙ্গার হাট ছিল; কিন্তু এ সভার কাজ ছেড়ে নাজিরগঞ্জের কোন গোয়ালা মনসাডাঙ্গার হাটে গেল না।

এ ত আর বাবু-লোকের পোষাকী সভা নয় গোয়ালাদের নিজেদের সভা; সুতরাং সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি মামুলী কোন নির্ব্বাচনই হোলো না। স্বয়ং গ্রামের মোড়ল শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোপ মহাশয় যখন উপস্থিত, তখন তিনিই সকল ব্যাপারের কর্ত্তা হবেন।

রাধু ঘোষের ছেলে পরিতোষ নবাবগঞ্জের স্কুলে বছর পাঁচেক পড়েছিল, সুতরাং এ কার্য্যে সেই-ই লেখাপড়ার ভার নিল। পরিতোষ রবিবার প্রাতঃকালেই তার বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে চাঁদার একটা তালিকা তৈরী করেছিল। গ্রামের কার কি অবস্থা, কে কেমন দাতা, রাধু ঘোষের তা অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর পরামর্শ মত, কে কত টাকা নগদ দেবে, কি-পরিমাণ দুগ্ধ দধি ক্ষীর ঘৃত দেবে, তার ফর্দ্দ করেছিল। সভা বসবামাত্রই সকলে এক বাক্যে এবারই খুব ঘটা ক'রে পূজা করার পক্ষে মত দিল; কেহ কেহ কলিকাতা থেকে যাত্রার দল আনবার মত স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করল।

তারপর রাধু ঘোষের আদেশ মত পরিতোষ চাঁদার তালিকা পাঠ করল। সকলে একমনে যার যার দেয়ের পরিমাণ শুনল। হরিশ ঘোষ বলল,—কৈ, কি কি বাবদে কত খরচ হবে, তা ত পড়লে না পরিতোষ।

রাধু ঘোষ বললেন, —আগে আয়টা ঠিক হোক, তারপরে ত ব্যয়ের ফর্দ্দ হবে। আগে থাকতে কি ব্যয় ঠিক করা যায়?

তখন রামেশ্বর বললে, পরিতোষ বাবাজি চাঁদার যে ফর্দ্দ পড়ল, তা অলেহ্য হয় নি, ঠিকই হয়েছে। এমন একটা বেরদ্ কাজে বেশী পয়সারই দরকার। তবে আমি একটা কথা বলছি, কোন আপিত্যি করছিলেন। দশ জ্ঞাতিঠাকুর মিলে যা রায় করবেন, তাতে কি আপিত্যি করা চলে? তা-হলেও আমি একটা নিবেদন করি। এই আমার দিয়েই ধর না। আমার নামে নগদ দশ টাকা চাঁদা, পনর সের দুগ্ধ, আধমন দই, দশ সের ক্ষীর, চার সের ছানা ধরা হয়েছে। এ যে অলেহ্য হয়েছে তা আমি বলছি না; মায়ের পূজোয় এ ত দিতেই হবে। তবে কথা কি জানেন ঘোষের পো, এই পনর সের দুধটা একটু বেশী মনে হচ্চে। নির্জ্জলা পনর সের দুধ যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ সের চল্‌তি দুধের ধাক্কা। সকলের সম্বন্ধেই ঐটে বিবেচনা করতে বলি। দুধ নির্জ্জলা হয় না, আমাদের গয়লার শাস্তরে ও কথা লেখে না। ঐ নির্জ্জলা কথাটা বাদ দেওয়া হোক, আমাদের যার যার নামে যা লেখা হয়েছে, তাই আমরা দেব, কি বল ঘোষের পো।

কথাটা নিয়ে একটু বাদানুবাদ হয়ে এই স্থির হোলো যে, নির্জ্জলা অর্থ প্রতিমণ সাড়ে সাত সের ইছামতি। তার অধিকের জন্য মা দুর্গার দিব্বি।

তারপরই অন্য সব ব্যবস্থা ঠিক হোলো। পূজার তিন দিন যারা উপস্থিত হবে, সকলকে খাওয়ানো হবে, দুঃখী কাঙ্গালীও বাদ যাবে না। নবাবগঞ্জওয়ালারা চারটে ঢাক আনে, এখানে তার তিনগুণ বারোটা ঢাক আসবে, বাজনায় নবাবগঞ্জকে ভাসিয়ে

দিতে হবে। তবে কলিকাতা থেকে যাত্রা আনার দুরাশা ত্যাগ করতে হোলো; সে বহুব্যয়সাধ্য। তার পরিবর্ত্তে হরিপুরের মহেশ তলাপাত্র যে নূতন যাত্রার দল করেছে, সেই দল আনা হবে এবং দুই একদিনের মধ্যেই একজন গিয়ে সমস্ত ঠিক ক'রে বায়না দিয়ে গিরিমণ্ট লিখিয়ে নিয়ে আসবে।

তারপর একজন বলল যে, পূজার ভার পুরোহিত রামরেণু ভট্টাচার্য্যকে নিজে নিতে হবে; তিনি যে এখানে ঠিকে পুরুত পাঠিয়ে দিয়ে নবাবগঞ্জের পূজায় নিজে ব্রতী হবেন, তা কিছুতেই হবে না। তাঁকে অবিলম্বে সংবাদ দিয়ে আনিয়ে এ কথাটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। সবাই সোৎসাহে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাদের এই প্রথম অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে তাদের কুল-পুরোহিতকে স্বয়ং উপস্থিত থাকতেই হবে।

সেই রাত্রিতেই একজন নবাবগঞ্জে গিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরদিন অপরাহ্নে নাজিরগঞ্জে আসবার কথা বলে এলো।

৩

পরদিন বিকেলবেলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাজিরগঞ্জে রাধাচরণ গোপের বাড়ী উপস্থিত হলেন। দেখেন, অনেকেই সেখানে আছেন এবং পূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্চে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন গ্রহণ করলে রাধু ঘোষই প্রথম কথা উত্থাপন করল। এবার তারা যে সমারোহে পূজা করবে, এ কথা শুনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন; এবং এ কার্য্য যে তাহাদের অতীব কর্ত্তব্য সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

তখন উপস্থিত একজন বললেন, ঠাকুর মশাই, আপনি আমাদের পুরোহিত ; আপনার অনুমতি না নিয়ে ত আমরা এমন কাজে হাত দিতে পারি নে। তাই আপনার পায়ের ধূলো আমরা চেয়েছিলাম। আরও একটা কথা এই যে, আমাদের এই প্রথম পূজা, আপনি আমাদের কুল-পুরোহিত। এ পূজায় আপনাকে উপস্থিত থাকতেই হবে। আপনি ঠিকে পুরুত পাঠাতে পারবেন না, তা তিনি যতই ভাল লোক হোন না কেন। আপনাকে আসতেই হবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন,—তোমারা যা বলছ, তা ত অযৌক্তিক নয়। তোমরা সকলে আগ্রহ প্রকাশ ক'রে এই প্রথম দুর্গোৎসবের আয়োজন করছ, এতে আমার উপস্থিত থাকা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এ কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু, আমাদের গ্রামের পূজার ব্যাপারে এই ছয় বৎসর আমি ব্রতী আছি। সে পূজাব যারা প্রধান উদ্যোগী তারাও তোমাদেরই মত আমার বহুদিনের যজমান। আর তোমরা এ কথা বেশই জান যে, যজমানের মধ্যে আমি ছোট-বড় ভেদ করি না, বেশী প্রাপ্যের দিকেও আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। সব যজমানই আমার সমান স্নেহের পাত্র, আমি সমভাবে সকলেরই মঙ্গল, সকলেরই হিত কামনা করে থাকি। এ অবস্থায় আমার গ্রামের পূজার যারা অধিনায়ক, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। তোমাদের এই প্রথম পূজা, এ পূজায় আমার ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য, এ কথা তারা কি আর বুঝতে পারবে না। সুতরাং তারা এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সম্মত হবে, আমি তাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধির ব্যবস্থা করব ; তোমরা কোন চিন্তা কোরো না।

উপস্থিত একজন ব'লে উঠল,—তাদের অনুমতির অপেক্ষা আমাদের করতে হবে, আপনি কি এই কথা বলছেন ঠাকুর মশাই?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন, এই শোন কথা। তোমরা তাদের অনুমতিই বা চাইতে যাবে কেন, তাদের অনুমতিরই বা অপেক্ষা করবে কেন? এতে যে তোমাদের অপমান করা হয়, তা কি আর আমি বুঝিনে।

রজনী ঘোষ ব'লে উঠল,—অত ঘোর-প্যাঁচ কথা বুঝিনে ঠাকুর মশাই। সোজা কথা বলছি, আপনাকে আসতেই হবে। আমরা কোন কথা শুনব না। চল্লিশ ঘর যজমানের কথা আপনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। যদি করেন, তা-হলে কেমন ক'রে আপনাকে নিয়ে আসতে হয় তা আমরা জানি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমন দুর্ব্বাক্য শুনেও রাগ বা অভিমান করলেন না—তাঁর যে সে স্বভাবই নয়। তিনি হেসে বললেন,—শোন রজনীকান্ত, একটা গল্প বলি। কোন স্থানের এক মহা প্রতাপশালী কায়স্থ জমিদার প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করতেন না। তাঁকে প্রত্যহ পাদোদক দেবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ মাইনে করা ছিল। সেই ব্রাহ্মণ একদিন স্থানান্তরে গিয়েছিল কর্ত্তা পাদোদক পান না। চারিদিকে লোক ছুটলো ব্রাহ্মণ খুঁজতে। পথের মধ্যে এক ভিন্নস্থানের ব্রাহ্মণের সঙ্গে জমিদার ভৃত্যদের সাক্ষাৎ হোলো। তারা ব্রাহ্মণের পাদোদক চাইল। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি জীবনে কাহাকেও পাদোদক দিই নাই, তোমাদেরও দেব না। ভৃত্যেরা জমিদারের কাছে গিয়ে এই কথা নিবেদন করতেই তিনি রাগে অধীর হয়ে বললেন,—কি এত বড় কথা। তোমরা গিয়ে সেই ব্রাহ্মণের মাথায় দশ ঘা জুতো মেরে পাদোদক

আদায় করে আনবে। রজনীকান্ত, তোমার কথাটাও সেই জমিদারের কথায় মতই হোলো। এই ব'লে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

গ্রামের মণ্ডল রাধাচরণ গোপ বললে,—ওহে, তোমরা চুপ কর। ঠাকুর মশাই স্বীকার করেছেন ; তাঁর কথার নড়চড় হবে না, কোন চিন্তা কোরো না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কোন কথা না ব'লে সে দিনের মত বিদায় হলেন। নদী পার হয়ে সোজা বাড়ীতে না গিয়ে একেবারে নয়ান ঘোষের বাড়ীতে গেলেন। তাকে সমস্ত কথা খুলে বলতে সে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল—কি এত বড় কথা! তারাই আপনার যজমান, আমরা কেউ নই? কিছুতেই আপনাকে নাজিরগঞ্জে যেতে দেব না ; আমাদের পূজাই আপনাকে করতে হবে। তাদের যা ক্ষেমতা থাকে, তাই যেন করে। আমরা তাদের ভয় করিনে। বলে পাঠাবেন, আপনি যাবেন না। যাক্ না ঐ চল্লিশ ঘর যজমান, আমরা সাত আট ঘরে মিলে আপনার অভাব পূরণ করব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অকূল সাগরে পড়ে গেলেন। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথই দেখতে না পেয়ে ঘরে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। ব্রাহ্মণী ঠাকুরের এই অবস্থা দেখে মনে করলেন, তাঁর শরীর বুঝি অসুস্থ হয়েছে। তিনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন, অসুখ ত শরীরের হয় নি গিন্নী, অসুখ মনের। এই ব'লে তাঁর বিপদের কথা আগাগোড়া বললেন।

ব্রাহ্মণী সমস্ত বিবরণ শুনে বললেন,—তাইত, এই গয়লারা দেখছি ভারি গোলে ফেলেছে। তা, তুমি অত ভেবো না ঠাকুর।

তুমি কখনও কারও অনিষ্ট করনি, ভগবান তোমার সহায় হবেন।

ভট্টাচার্য্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—আর ভগবান, গিন্নী ; গোয়ালার ঘরে যে স্বয়ং ভগবান বিকিয়ে আছে ; এ বিপদে তিনি এই গরীব ব্রাহ্মণের দিকে চাইবেন না। এখন দেখছি, হয় নাজির-গঞ্জের এতকালের যজমানদের আশা ছাড়তে হবে, আর না হয় এই বৃদ্ধ বয়সে পূর্ব্বপুরুষের ভিটের মায়া ত্যাগ করতে হবে। উপায়ান্তর নেই, গিন্নী।

ব্রাহ্মণী বললেন, তুমি ভয় পেও না, নিরাশ হোয়ো না ঠাকুর ! এর প্রতিবিধানের একটা পথ হবেই হবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আছি।

ভট্টাচার্য্য বললেন, তুমি যে আছ তা আমি ভুলিনি, কিন্তু, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

ব্রাহ্মণী বললেন,—তুমি নিশ্চিন্ত হও ঠাকুর ! সব দিক রক্ষা হবেই হবে। এখন ওঠো, সন্ধ্যা আহ্নিক করে নেও। মানদা বামনা এখনও মরেনি, বেঁচে আছে। দেখ, তুমি ত জান, কাল আমাকে নাজিরগঞ্জে নিয়ে যাবার জন্যে স্বরূপ ঘোষ পালকী পাঠাবে, তার নাতির অন্নপ্রাশনে আশীর্ব্বাদ করতে হবে। সেখানে কাল গিয়ে সকলের হালচাল আগে বুঝে আসি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোমার সব দিক যাতে বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা হবেই হবে।

ব্রাহ্মণী স্বামীকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু কি যে করা যাবে তা তিনিও ভেবে স্থির করতে পারলেন না ; সারা রাত জেগেও কোন পথ পেলেন না। তাইত, কি করা যায় ?

৪

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় স্বরূপ ঘোষ পালকী পাঠিয়ে দিল। সারা পথ ব্রাহ্মণ কন্যার ঐ একই চিন্তা—কি করা যায়!

স্বরূপ ঘোষ পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিশেষ কোন ঘটা করে নি; প্রতিবাসী এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত অন্য লোককে নিমন্ত্রণ করে নি। চারটার মধ্যেই লোকজন খাওয়ানো শেষ হয়ে গেল।

তখন স্বরূপ ঘোষের স্ত্রীকে একান্তে ডেকে নিয়ে ভট্টাচার্য্য গৃহিনী কোন রকম ভণিতা না করে বললেন, শোন বৌ, তুমি যদি দিব্বি কর যে, আমার নাম প্রকাশ করবে না, তা হোলে তোমাকে একটা খবর দিয়ে যাই।

ঘোষের স্ত্রী তার পায়ে হাত দিয়ে বলল,—ও কি কথা মা-ঠাকরুণ! আপনি যা বলবেন সেই যে দিব্বি; তার উপরে কি আর দিব্বি চলে?

ব্রাহ্মণী বললেন,—এ তোমারই উপযুক্ত কথা। তোমাদের আমরা বড়ই ভালবাসি, নিতান্ত আপনার জন ব'লে মনে করি, তাই বড়ই ব্যথা পেয়ে সংবাদটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। কাল রাত্রিতে তোমাদের গাঁয়ের একটা গোপন বৈঠকে স্থির হয়ে গেছে যে, গাঁয়ে যে পূজো হচ্চে, তাতে তোমাদের কাছ থেকে চাঁদা বা জিনিসপত্র নেওয়া হবে না, তোমাদের নিমন্ত্রণও করা হবে না। শুধু তোমরা নয়, তোমাদের পাড়ার নিতাই ঘোষ, অমূল্য ঘোষ, ও-পাড়ার কেবলরাম, হরেকৃষ্ণ, আরও দু'তিনজনকেও দলে নেওয়া হবে না, পূজা ব্যাপারে তোমাদের একঘরে করা হবে।

কথা শুনে ঘোষের স্ত্রী ত অবাক হয়ে গেল,—এমন কি অপরাধ আমরা করেছি যে, আমাদের এমন সাজা হবে ?

ব্রাহ্মণী মলিনমুখে বললেন, সে সব কথা বলতে আমার ঘৃণা বোধ হয়, সে সব পাপ কথা আমার মুখ দিয়ে বের হতে চাচ্ছে না। কিন্তু কি করব, কথা যখন বললামই, তখন সবটাই বলি। তোমাদের অপরাধ এই যে, তোমার বিধবা মেয়ে বিজয়ার নামে নাকি নানা কলঙ্ক রটেছে ; তাই দুর্গাপূজায় তোমাদের সংস্রব থাকলে মা নাকি পূজাই নেবেন না। নিতায়ের বোনের, অমূল্যের ভাদ্রবৌয়ের, কেবলরামের পরিবারের, হরেকৃষ্টর পিসির, এই রকম আরও কার কার কলঙ্কের জন্যই এ ব্যবস্থা হয়েছে। গোপনে সংবাদ পেয়ে আমার প্রাণে যে কি আঘাত লেগেছে তা আর বলতে পারিনে। এমন অপমান তোমাদের কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়, তাতে পূজো হোক আর নাই হোক। কেমন, ঠিক কথা বলছি কিনা ?

স্বরূপ ঘোষের স্ত্রী বাঘিনীর মত গর্জ্জন করে বলল, কি এত বড় কথা ! কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখে নেব। আমাদের অপমান ! আমাদের একঘরে করা ! আমাদের মেয়েছেলের নিন্দে ! এর যদি না শোধ তুলতে পারি,—তা হলে আমি ভীমনাথ গয়লার মেয়েই নই। এখনই সকলকে ডেকে এর একটা বিহিত করছি মা-ঠাকরুণ।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী বললেন,—অত উতলা হোয়ো না গয়লা-বৌ। আজ তোমার নাতির অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। আজকের এই শুভদিনে আর একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে কাজ নেই। পূজো ত কালই হচ্ছে না। তারজন্য তাড়াতাড়ি কি ?

ঘোষের পত্নী বলল,—পূজো ! পূজো কিছুতেই হ'তে দেব না, এ আপনাকে ব'লে রাখছি মা-ঠাকরুণ। এত অপমানের পরও আবার আমরা পূজো করব, এ কথা আপনি মনেও করবেন না। দেখে নেব ঐ রাধু গয়লার মোড়লী। কিছু বলিনে, তাই ওদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। আমরা না জানি কি ? ঐ যে রাধু ঘোষ দেখছেন মা-ঠাকরুণ, ওর ভাই-ঝি—

ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী বাধা দিয়ে বললেন, ও-সব পাপ কথা মুখ দিয়েও বার করতে নেই গয়লা-বৌ ! আর আমাকেই বা বলতে হবে কেন ? আমি সবই জানি। রাধু ঘোয়ের ঘরের খবরও জানি ; ঐ যে রজনী ঘোষ, তারও ভাই-বৌয়ের কথা জানি ; রামেশ্বরের মেয়েটা সে বছর কি কাণ্ডটাই না করল ! যাক সে কথা। যাতে তোমাদের মান বজায় থাকে, তাই কোরো। এমন কথা সব যখন উঠেছে, তখন ঐ পূজোর সংস্রবেও তোমরা যেও না, এই আমার কথা। দেখ বৌ, আমি যে এ খবর তোমাকে দিয়ে গেলাম, এ কথা যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয় ; সকলেই আমাদের যজমান, বুঝলে। আর, যাদের যাদের নাম উঠেছে, সকলকেই বোলো ; তোমরা বড় বড় কয় ঘর যদি এক হও, তা-হলে আর পূজো হবে না।

গয়লা-বৌ বলল, আপনার নাম করতে যাব কেন ? এমনই কাল ঢাক বেজে উঠবে। এ অপমানের শোধ ভাল করেই নিতে হবে।

তা-হলে আমি এখন উঠি, বেলা গেল। গয়লার মেয়ে, গয়লার বৌয়ের মত কাজ কোরো, অপমান কখন সহ্য কোরো না। —এই ব'লে ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী বিদায় হয়ে গেলেন।

তারপর আর কি? নাজিরগঞ্জে একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার। কিসে যে কি হোলো, এ কথাটা সত্য কি না, কে তার বিচার করে? সব নিরক্ষর গোয়ালা একেবারে ক্ষেপে গেল। কি আস্পর্দ্ধা, মেয়েদের নামে কলঙ্ক দেওয়া। সত্য মিথ্যা নানা অপবাদ প্রচার হ'তে লাগল। ভীষণ দলাদলি আরম্ভ হোলো। দুর্গাপূজা ত বন্ধই হোয়ে গেল। তখন প্রথমে গালাগালি তারপর হাতাহাতি, মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কে কার কথা শোনে? যে রাধা চরণ গোপের গ্রামে অখণ্ড প্রতাপ ছিল, সে প্রতাপ সপ্তাহের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাধাচরণ নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য অনেকের কাছেই গেল; কেহ তাহার কথায় কর্ণপাতও করল না। স্বয়ং রামরেণু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও দুইদিন নাজিরগঞ্জে গেলেন; মিলনের জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। কেহই তাঁহাকে পর্য্যন্ত আমল দিল না। কেমন করে যে এমন শান্ত গ্রামের অধিবাসীরা এমন চঞ্চল হয়ে উঠল, নিরীহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তা বুঝেই উঠতে পারলেন না। তিনি নিরাশ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন,—নাজিরগঞ্জে কি দেখে এলে ঠাকুর?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বললেন,—কেন যে এমন হোলো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ব্রাহ্মণী বললেন,—তা যদি বুঝতে পারবে, তা-হলে তুমি এতদিনে রাজা হয়ে যেতে। তোমাকে বলেছিলাম ঠাকুর, মানদা বামনী এখনও বেঁচে আছে। এ গোল আমিই বাধিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ওদের পূজাটি বন্ধ হবে; ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে, তা আমার মনে হয়নি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে ব্রাহ্মণী। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন কাজ করা মহা অপরাধ ব্রাহ্মণী, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এর চাইতে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে দিনপাত করাও যে পরম প্রার্থনীয় ছিল। এর জন্যই ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণ বার-বার বলে গিয়েছেন—"স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

নাম-রূপ

শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়

বয়সে আমাদের চেয়ে বিশ বচরের বড় হলেও খুড়ো ছিলেন সকলেরি সমবয়সী। পশ্চিমে জন্মেছিলেন ব'লে বাপ নাম রেখেছিলেন প্রতীচী, অর্থাৎ প্রতীচী বাঁড়ুয্যে। নানা বিদ্যার জোরে শেষ দঁড়িয়ে যান 'প্রডিজি' (Prodigy) বাঁড়ুয্যে;—এটি তাঁর স্বোপার্জ্জিত নাম। আমরা তাঁকে 'প্রডিজি' খুড়োই বলতুম।

অমন অসময়ের বন্ধু আমাদের আর জোটেনি। মন খারাপ হলেই তাঁকে খুঁজতুম। তাঁর একটা গল্প শুনলেই কাল-বৈশাখীর মেঘও কেটে যেতো।

সেদিন গিয়ে দেখি—খুড়ো বিমর্ষ,—উদাস। তয়েরি তামাক—আত্মহত্যা করছে!

শুনলুম—"সব থাকতেও ছেলেকে মানুষ করবার পথ জুটলো না, বাপের-ব্যাটা বানিয়ে যেতে পারলুম না—দিনও গেল। এ সব আমারই পাপের ফল! মিছে-গপ্পো শোনানো ছাড়া, আর কি এমন পাপ করেছি, তাওতো স্মরণ হয় না। সেটাও আজ থেকে ছাড়লুম।"

মেঘ কাটাতে এসে—এ কি বজ্রাঘাত!

আমরা কাতর ভাবে যেই বলেছি—"তা-হলে আর কার কাছে..."

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—“ও কি? আমি কি এমন বলেছি যে...না না তা কেন, তোরা কেন...তা সত্যিগপ্পোও তো আছে। তামাক সাজ্,—আজ নিজের কথাই শোনাই ...

বাঁচলুম। চট্ তামাক সেজে হাজির করলুম।

খুড়ো একটান টেনেই হাসিমুখে বললেন—“এই যে অ্যাকেবারে ধরিয়েই দিয়েচিস, বেশ। ছাখ্—এতদিন গল্পে কেবল মেয়েদের দুর্দ্দশাই করে আসা হয়েছে। ওঁরা মা-দুর্গার জাত, এবার আবার দোলায় আসছেন,—তোরা ভালো থাকলে বাঁচি।

কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, বুঝতে পেরে বললেন—“আমি তো মুখে বলেই খালাস রে, তোরা যে আবার লিখে মরিস। খালাসই বা কই, তা হলে আর লালগোপালের জন্যে, যাক্, এখন সত্যি ছাড়া মিথ্যে আর এক রত্তি নয়। কবে আছি কবে নেই—নিজের কথাই আজ শোন্ -

জোরে একটান টেনে, ‘হায় রে সে-কাল’ বলে আরম্ভ করলেন—

রেওয়াজ না থাকায় যদিও এ-কালের লোক আর তা পারেনা, কিন্তু মনে রাখিস, যা বলচি তা প্রসন্ন গোয়লিনীর দুধের চেয়েও নির্জ্জলা এবং খাঁটি সত্য।

বাবার নিযুক্ত তিন তিন জন মাষ্টার আমাকে মানুষ করবার আশা ত্যাগ করে এবং নিজেরা অমানুষ হয়ে পড়বার ভয়ে স্বেচ্ছায় তাড়াতাড়ি চাকরি ত্যাগ করে একে একে যখন সরে পড়লেন,—

জুতো চাদর ছড়ি পড়েই রইলো, ফিরে যাবার জন্যে তাগাদা পর্য্যন্ত করতে সাহস পেলেন না,—বাবা বিষম চিন্তায় পড়ে গেলেন।—

—ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ী বসে থাকলে সমূহ বিপদের কথা! যেহেতু তারা প্রখর বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় এবং তা কাজে লাগাবার উপায় করেই নেয়। ইতর আর ভদ্রে তফাৎ এইখানেই,—তারা সেটা পারে না। তদুপরি লেখাপড়া যোগ হলে তো কথাই নেই,—বসুন্ধরা কাঁপে থরথরি।—তবে রাজ-বুদ্ধি অসীম, তাই স্কুল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে—ফজদ্বরী আদালত, ফায়ার ব্রিগেড্, পুলিশ প্রভৃতি 'অ্যান্টিডোট্' বানিয়ে—ব্যালেন্স্ রেখে চলেছেন, প্রজাদেয় মুখ চেয়ে।

যাক্, কোন মাষ্টার আর ঘেঁষল না। বেণী মাষ্টার ব'লে বেড়ান, শ্বশুরের জুতোর দোকান থাকলে না হয় চেষ্টা পেতুম,—নিত্যই গায়েব হয়।

বাবা 'ইন্‌করিজিব্‌ল্'—দমলেন না। বললেন—ভগবানের রাজ্যে উপায়ের অভাব নেই—তিনি দয়াময়। আর্ট-স্কুল হয়েছে, ছেলের ওদিকে টেষ্টও লক্ষ্য করেছি,—শীগ্‌গির শাইন্ করতে পারবে।—দালানের ছ্যালে তার প্রমাণও যথেষ্ট রয়েছে।

ভর্ত্তি করে দিলেন। দেখি আমার মতো আরো আটটি রয়েছে,—ঘটী বাটী আঁকছে। তারা ট্যাবৃচা চেয়ে, ঠোঁটে হাসি টেনে খুসি জানালে। আহা, সে কি আর্টিষ্টিক টান্,—তোরা তা দেখিস নি! ও কাজে angle of vision দরকার কিনা।

মাষ্টার বোর্ডে কি আঁকছিলেন, বললেন—বোসো।

একটি ছেলে, মাথা না তুলে, মৃদুকণ্ঠে বললে—'ওয়েল্‌কম্।' দ্বিতীয় শোনালে,—'নবগ্রহ কমপ্লীট !'—নয়নে নয়নে হাস্য বিনিময় হয়ে গেল,—অর্থাৎ পাকা-দেখা।

স্বস্থান পেয়ে বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করলুম। করবারই কথা ; কারণ সপ্তকোটি বঙ্গসন্তানের মধ্যে বাছাই করা এক গোত্রের নয়টি মেলা গেল—যারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের অ্যাঞ্জিলো ব্রাদার্স দাঁড়াবে। কোন্ যুগে একবার নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়ও জুটেছিল।

তারপর—স্কুলে যাই আসি ; জলখাবার পয়সায় বার্ডসাই খাই, মডেল দেখে মানকচু আঁকি। মাষ্টার আমাদের সঙ্গে করে জু দেখাতে নিয়ে যান,—পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় করেও দেন। বেশ লাগে। আবার নিজেরাও—লাল দীঘি, গোল দীঘি, হেদোয়—'নেচার ষ্টডি' করতেও যাই !

ক্রমে হাত সরতে লাগলো,—যা আঁকি একটা কিছু দাঁড়ায়। সে বচর ইঁদুর এঁকে প্রাইজ পেলুম। সত্বর বাহনের কোটা শেষ ক'রেই—দেব-দেবী আঁকার পালা পোড়লো। বিশু চট্ গণেশ এঁকে বাহবা নিলে—অর্দ্ধেকটা সড়গড় ছিল কিনা।

সেই সময় মা বললেন,—"এখন তো কিছু আর আটকায় না, দে না বাবা একখানি বেশ ধ্যান-শুদ্ধ মা-কালীর ছবি এঁকে। ঘরে দেব-দেবীর একখানা এমন মূর্ত্তি নেই যে সকালে উঠে নমস্কার করি।"

বউঠাকরুণের কাছে (কারণ বউদিরা তখন জন্মান নি) ধ্যানটা শুনে, আর্টের অনুকূল কথাগুলি নোট করে নিলুম,—যেমন, করাল-বদনা, বিকট-দশনা, লোল-রসনা, ভয়ঙ্করী, ইত্যাদি।

তবে আর শক্তটা কি? তদ্ভিন্ন আমি বাধামুক্ত,—সত্যিকার দেব-দেবী তো কেউ দেখেন নি। লেগে গেলুম এবং তা সম্পূর্ণ হবার আগেই, মায়ের কৃপায়, সহজেই ধ্যানশুদ্ধ দাঁড়িয়েও গেল। তবে, সন্ধ্যার পর ছবির দিকে চাইতে আর সাহস হ'ল না;—স্ফূর্ত্তিতে বেরিয়ে পড়লুম।

ছোট বোনটা গোল বাধালে। পিদ্দীমের মিটমিটে আলোয় কি করতে ঘরে ঢুকে বেজায় চেঁচিয়ে ওঠে। তাতে বাবা পর্য্যন্ত ছুটে যান এবং ছবিখানি দেখেন।

বেড়িয়ে এসে বাড়ী ঢুকচি, শুনতে পেলুম বাবা মা'কে বলচেন "বউমা আসন্ন-প্রসবা, ও-ছবি যেন বাড়িতে রাখা না হয়"...ইত্যাদি। বুঝলুম—ধ্যানশুদ্ধ দাঁড়িয়েছে।

যাক্—সে অনেক কথা। তারপর, সহজেই মার্কা-ম্যানের কাজ পাই, প্যাকিং কেসে আর বস্তায় মার্কা মারি, উপরন্তু সাইন বোর্ড লিখি,—তুলি ছাড়িনি।

এখন আর সে দিন নেই বাবাজি,—পঞ্চাশ বচরে কী উন্নতিই হয়েছে। তখন ছিল মোটা কাজ,—এখন ভিজে মিহি-সাড়ী পর্য্যন্ত আঁকা চলছে। কি চমৎকার! তাইনা লালগোপালকে ওই লাইনে দেবার জন্যে আমার ছটফটানি—ও খুব পারবে। ওতে ওর টেষ্ট রয়েছে।—থাকবে না? Heridity—inherit করে বসে আছে যে! দেখবি ও আবার কি করে,—light, more light ফেলবেই ও।—

আর কি জানিস,—সরে আয় বলি (অনুচ্চ কণ্ঠে)—Real কলা আদায় করতে, ওকে এখন দূর-বিদেশে পাঠানই দরকার। বাবা গত হয়েছেন, সংসারে আমিই এখন ছেলের

বাপ। বাবার কর্ত্তব্য আমাকে অর্শেছে। সংসার এবং গ্রামকে নিরঙ্কুশ করবার ভার এবার আমার ওপর।—লালগোপালকে দূরে পাঠাতে না পারলে - নিকট দূর হয়ে পড়বার আভাস দিচ্ছে। বাবা কিছু রেখে গিয়েছেন, এখন থাকলে আমাকেই কি ঘরে রাখতেন!— যাক্...

—ভাবলুম, জাপান নয় ইটালি, দুটোই কলাবিদ্যার মহাপীঠ। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প রয়েছে, ইটালিতেও স্বয়ং বিশু ভায়া (ভিসুভিয়স্)—দুটোই সুবিধের জায়গা। শেষ জাপানই পচন্দ করলুম, —ওখানে দুটো chance বর্ত্তমান। আমাদের বুদ্ধদেবের প্রভাবও রয়েছে, ভাগ্যে থাকে মহানির্ব্বাণ মিলতে কতক্ষণ ..

এই পর্য্যন্ত বলে খুড়ো পেল্লেয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন...

আমরা চিত্রার্পিতের মতই চিত্র-কথা শুনছিলুম, 'কেন—কেন, কি হল খুড়ো?' করে উঠলুম।

—ভাগ্য রে ভাগ্য!

—'নিজ নিজ কর্ম্ম হ্রদে আপনি মানব ডোবে ভাসে'...

—তামাক সাজ্—বলচি...

২

'কলা-পরিচয়' পত্রিকায় দেখলুম, ঘুঘুড়ির প্রিয়কুসুম বাবু জাপান হতে চিত্রশিল্পে ডবল ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরেছেন। সবিস্তার স্বকর্ণে শুনতে ছুটলুম তাঁর কাছে এবং জানালুম আমার ইচ্ছাটা ও লালগোপালের টেষ্ট।

তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—"ছেলেটি দেখতে কেমন ?"

এ কথার উদ্দেশ্য বুঝনুম না ;—বাড়িতে বোধ হয় অরক্ষণীয়া জমেছে। বললুম -"এই আমারই ছেলে—যেমন হওয়া উচিত"...

"ফেয়ার কলার নিশ্চয়ই !"...

"এ অনুমান কোন সাহসে করছেন ? তবে আমারি মত jet-fair বটে"—

কুসুম বাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই,—"চা খান—বলছি" ..

* * *

—সংক্ষেপেই বলি। আসল কথাটা পুরোই পাবেন। চার বছর আগে জাপানে যাই—কিছু একটা শিখতে। তার পূর্ব্বেও কয়েকজন গিয়েছিলেন। সেখানে ভদ্র গৃহস্থপরিবারে, বিদ্যার্থীরা ইচ্ছা করলে, থাকতে পায়, বাড়ীর মত যত্নও পায়। তাদের সুখ শান্তি অভাব অভিযোগের দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাঁরা—কথাবার্ত্তায়, আলাপে যত্নে, তাঁদের পরিবার ভুক্ত করে নেন, বাড়ীর অভাব অনুভব করতে দেন না।

—আমিও সেইরূপ একটি ভদ্র পরিবার মধ্যে স্থান পাই। সেখানে পূর্ব্ব হতেই আরো দু'তিনটি বাঙালী যুবক—কহ্লারকলি রায়, অরুণ আর জ্যোৎস্না কুমার, আশ্রয় পেয়েছিল। বেশ সুবিধাই হ'ল।

—গৃহকর্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে সঙ্গে করে এসে, একটি বড় 'হলে' আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে, জিনিষ পত্র সুন্দরভাবে

গুছিয়ে দিয়ে গেলেন। —হাসতে হাসতে বললেন, যখন দরকার হবে, এই পর্দা টেনে দিলেই, ৩।৫টি স্বতন্ত্র কক্ষ হয়ে যাবে।"

আমি ঠিক ওই বিষয়টাই ভাবছিলুম,—এক ঘরে যে বড় অসুবিধে হবে। চিন্তা গেল।

—কর্ত্রী বললেন—"আমার এই মেজ মেয়ে 'সুষিমা', এই পাশের কামরাতেই সর্ব্বক্ষণ থাকে। —সিল্কের ফুল আর পাখা তয়ের করে। এ-ই তোমাদের হুকুম মত কাজকর্ম্ম করে দেবে। দরকার হ'লেই একে ডেকো; নিজেরা কষ্ট পেওনা, নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে থেকো." ইত্যাদি।

—বেড়ানো, ব্যায়াম, কি কি দর্শনীয় আছে, সবই বলে গেলেন। শেষ বললেন "ঠিক নিজেব বাড়ী ভেবো,—এখানে মা, বোন, ভাই, সবই পাবে। কোনো সঙ্কোচ রেখ না,—তাতে আমাদের দুঃখ আর লজ্জা দেওয়া হবে,—অপমানও করা হবে।"

ঠিক যেন আপন মা। এঁরা ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন, —গ্রামারের বালাই নেই। আমার বড় ভাল লাগলো।

—সারা বাড়িখানি যেন ছবির মত, তকতক ঝরঝর করছে। ফুলে ক্রিপারে সুবিন্যস্ত—সাজানো। ঘরের মেজেয়—সুন্দর মাদুরের ম্যাটিং করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

—সুষিমা দোরের বাইরে, একটি আঁকা ছবির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল। তার মা তাকে নিজেদের ভাষায় অনেক কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন! বেশ বুঝলুম—আমাদেরি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে।

* * *

—সুষিমা এতক্ষণ মুখ টিপেই ছিল,—যেন হাসির পূর্ব্বরাগ। অরুণ-কিরণ স্পর্শে যেমন অসংখ্য কুঁড়ি একসঙ্গে ফুটে হেসে ওঠে, তার চঞ্চল হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু অরুণের দিকে চেয়েই একেবারে সশব্দে ফুটে পড়বার উপক্রমেই—সে ছুটে পালালো।—

—পরক্ষণেই একজোড়া সুদৃশ্য স্যাণ্ডাল এনে, আমার পায়ের কাছে রাখলে। -

কহ্লার বললে "আপনার ও-জুতো খুলে, ওই ওখানে বাক্স রয়েছে, ওইতে রাখুন। বাইরে ব্যবহারের জুতো প'রে ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ, ওই স্যাণ্ডাল পায়ে দিন।"

অরুণ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেমন দেখছেন?"

কি কেমন সেটা না বুঝে বললুম-"ভালই ত লাগছে। মা-টি সত্যিই মায়ের মতন; মেয়েটি,- তা ও-বয়সে, ভিন্ন দেশের নূতন লোক দেখলে, ও রকম একটু আগ্রহ-দৃষ্টিতে দেখেই থাকে"...

—মেয়েটি দাঁড়িয়েই ছিল। অরুণ সহাস মুখে তাকে বললে—"এখন আমরা চারজন হলুম।" সে বললে—"আমার তো একই মনে হচ্ছে" বলেই হাসি চেপে চঞ্চলপদে চলে গেল।

—বললুম—"কাজ বাড়লো বলে ও 'কেয়ার' করে না। দেখচো কতো তফাৎ! আমাদের দেশের হলে কত গজগজ কোরত।"

শুনে—কহ্লার আর অরুণ হো হো ক'রে হেসে উঠলো, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লো।

তবে হাসির কথাটা কি ছিল বুঝতে না পেরে, আমি তাদের দিকে মূঢ়ের মত চেয়ে বললুম—"অতো হাসলে যে?"

অরুণ বললে—“মাপ করবেন, আপনি আমাদের বড় বঞ্চিত করেছেন”...

শুনে চমকে গেলুম,—“ক্যানো বলো দিকি? এই তো ভাই তোমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ”...

অরুণ বললে—“আপনি জেনে শুনে কিছু করেন নি, আমাদের অদৃষ্টে ঘটে গেছে। আমরা তিনজনেই এক-রঙা অর্থাৎ কালা আদমি। সুষিমা তাই নিয়ে কেবলি নানা প্রশ্ন করে—“তোমাদের এ রকম রং ক্যানো,—তোমাদের দেশের সকলেরি রং কি এই রকম?—কি ক’রে হোলো!—আচ্ছা, সাবান মাখলে যায় না?—আমাদের চেরির সাবান?” ইত্যাদি—

জ্যোৎস্নাকুমার বললে—“কথাগুলি সরল হ’লে দুঃখ ছিল না—দুষ্টুমিভরা। ওর ওই—‘একই মনে হচ্ছে’ বলার অর্থ আলাদা।—বোঝেনা ওটা আমাদের আঘাত করে”...

অরুণ বিরক্ত হয়ে বললে—“থামো থামো, তোমায় আর অত sympathetic toneএ explain করতে হবে না...

আমি বললুম—“যাক ও-কথা ভাই, কিন্তু আমি তোমাদের বঞ্চিত করলুম কিসে?”

কহ্লার অরুণের দিকে চাইলে। চাউনিটা—হাস্য আর সঙ্কোচ মিশ্রিত। পরে অরুণ বললে—“প্রিয়কুসুম বাবু ব’লে কলকেতার সান্নিধ্যবাসী একজন যুবক আসছেন, এ সংবাদ এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই পাই। নাম ও স্থান—আমাদের খুব আশা আনন্দ বাড়ায়। এবং সেই জোরে সেদিন সুষিমাকে বলেছিলুম,—এইবার দেখতে পাবে আমাদের দেশের লোকের রং কেমন।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি কিন্তু আমাদের লজ্জিত আর হতাশই করেছেন। দেখচেন না ওর ভাব গতিক!”

শুনে হো হো ক'রে হেসে—লজ্জাটা পাৎলা ক'রে নিলুম। বললুম—“ছেলেমানুষ আনন্দ পায়, একটু হাসে হাসুক না। ও-অপরাধ তো আমাদের জগৎ-জোড়া। ভাববেন না—শুনে এসেছি এমন লোক আসছেন, সকলের হাসিই থেমে যাবে।

“কে—কে মশাই?”

স্বয়ং রবিবাবুর আসবার কথা হচ্ছে, জাপান থেকে বিশেষ অনুরোধ গিয়ে পড়েছে...

শুনে অরুণ লাফিয়ে উঠলো। জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে ‘চিত্রাঙ্গদা’ বার করে ফেললে। কহ্লার বললে—পাঁচসিকের হরিরলুট দেবো মশাই।

* * *

—আমি চিত্র-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ভাষা শিখতে লেগে গেলুম। তাতে গৃহকর্ত্রী, সুষিমা, সকলেই আমার প্রতি একটু স্বতন্ত্র সম্মানের ভাব দেখাতে লাগলেন, সাহায্যও করলেন। জাপানী কথা বুঝতে আর কইতে তিন মাস নিলে অবশ্য মোটামুটি। ভাষাটির প্রতি শ্রদ্ধা আপনিই এলো—অতি ভদ্র ভাষা। জাতটির অভিধানে একটি অশ্লীল কথা পাবেন না;—গালাগাল বা তিরস্কারের স্বতন্ত্র শব্দ পর্য্যন্ত নেই। তিরস্কারব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে—‘বাকা’ অর্থাৎ ‘বোকা’ই একমাত্র শব্দ! আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

—সুষিমাকে আমি 'সিষ্টার' বলতুম, সে তাতে ভারী খুসী। তবু, ছলে কৌশলে আমাদের বদ-রংটা বাতলে দিতে ছাড়তো না। একদিন তাকে বেশ গম্ভীর ভাবে, জাপানী ভাষায় বুঝিয়ে দিলুম— "তুমি এ রংয়ের মহিমা বুঝবে না, ও-নিয়ে হাসতে নেই সিষ্টার। বুদ্ধদেব তোমাদেরও দেবতা, আমরা তাঁরই দেশের লোক। তাঁর রংই আমাদের পরম প্রিয় ও প্রার্থনীয় রং। তাঁর চেয়ে ফর্সা হলে আমাদের তাতে অপরাধ হয়, নিন্দাও হয়। ও নিয়ে হাসি তামাসা করতে নেই সিষ্টার—তাতে পাপ হয়।"

শুনে তাড়াতাড়ি সে জানু পেতে ব'সে, বারবার তথাগতকে প্রণাম করলে। দিন কতক খুব সামলে চললো।—পারবে ক্যানো, বয়সের দোষ, আবার যে কে সেই। অবশ্য—আমার সামনে নয়।

* * *

কহ্লারের কোটে কি ক'রে খানিকটে কালি লেগে গিয়েছিল। সুষিমা সপ্তাহে দু'দিন সব সাবান-কাচা ক'রে দিত। বেচারী কোনো রকমে সে রং তুলতে পারে নি। সেটা হাতে ক'রে এসে বেশ গম্ভীর ভাবে তাকে বলেছে "তুমি কি দুঃখে—উপার্জ্জনের উপায় শিখতে এতদূরে এসেছ! তথাগত কৃপা করে তোমার দেহ-গত কোরে এমন বস্তু দিয়েছেন যা দু'খানা সাবান দু'ঘণ্টা ঘোষেও উঠল না, আর তুমি কি না এই দুর্লভ বস্তুর সদ্ব্যবহার করচ না! কি লেখায়, কি প্রেসে, কি পেণ্ট্ হিসেবে— এর কদর কতো! আমাদের দুর্ভাগ্য ঘামের কোনো দামই নেই"...

কহ্লারের সঙ্গে এই রকমের খুটিনাটি তার লেগেই থাকতো। আজ সে সইতে না পেরে, কোটটা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে,

আমার কাছে এসে হাজির,—“থাক্ মশাই দেশালাই বানাতে শেখা-শেখার আগেই জ্বলুনি ফিরতেই হল দেখছি। কই আপনার রবিবাবু তো এলেন না”...

বললুম—“খবর এসেছে—চারুশশী বাবু ব'লে একটি যুবক কাল আসছেন. আমাদের মেসেই উঠবেন। তাঁর কাছে রবিবাবুর সংবাদ নিশ্চয়ই পাবো। চাই কি চারুশশী বাবুকে দিয়েই কার্য্য সিদ্ধি হ'তে পারে - অমন নাম” ..

* * *

চারুশশী এলেন এবং সকলকে চম্‌কেও দিলেন,—আমার চেয়েও—প্রগাঢ়! তাতে সুষিমার মুখের লালিমাই বাড়লো, আর আমাদের—কালিমা!

আধা অন্তরালে গিয়ে সুষিমা দেখি—ভীষণ ভক্তিনতভাবে, হাঁটু গেড়ে, চারুশশীর উদ্দেশ্যে—প্রণাম করলে। বেশ গম্ভীর। দুরন্ত কিছু আশা করে আমরা সশঙ্ক ছিলুম। —Crisis over.

আমি উঠে যেতেই বললে—“ব্রাদার্,—উনি বুঝি তথাগতের নিকট বংশগত?”

তার দুষ্টুমি-ভরা শান্ত ভাব দেখে, কথা কইবো কি—হেসে ফেললুম।

তাতে অরুণ আর কহ্লার জ্বলে গেল, এবং আর এখানে থাকবে না, সেটা serious ভাবে জানালে। অনেক করে রুকৃলুম,—“এতদিনের পরিশ্রম ব্যয় আর সময়, এই সামান্য কারণে নষ্ট করতে নেই,—আর একটা ‘চান্স’ দাও”......

অরুণ সবার তরুণ, বললে—"আপনার সহিষ্ণুতাকে সাবাস মশাই,—আড়াই বছরেও আপনার আত্ম-সম্মান আঘাত পেলে না। এ রকম হেয় হয়ে থাকা—ভালো লাগছে ?"......

বললুম—"সে কি হে, একটি অজ্ঞান মেয়ের কথায় এতো অতিষ্ঠ হতে আছে কি ? সে আমাদের খুবই আপনার মত মনে না করলে কি এতটা......। আচ্ছা, কখনো তার কথায় ঘৃণার সুর পেয়েছ কি ?" .....

জ্যোৎস্না হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—"মশাই সর্ব্বনাশ হয়েছে ! চারুশশী বাবু কলেজে যাবার সময়—সুষিমাকে কি জানি কি বলে গেছেন, তাতে সে ওঠেনি, খায়নি, গুম্ হয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে। আমার সাহস হলনা,—আপনি একবার দেখুন"......

শুনে আমি চম্‌কে গেলুম,--তিনি আবার কি বললেন ? ভদ্রলোকের বাড়ী, ভদ্রলোকের মেয়ে, সত্যি সত্যি তো ঝি-চাকর নয়। বিশেষ সমঝে কথা কইতে হয় .....। চারুশশী একটু চঞ্চল লোক,—মেজাজটাও মিঠে নয়, বেশ তিরিক্ষি।

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লুম। গিয়ে দেখি--সুষিমা একটা মোড়ার উপর বসে, দ্যালের পানে মুখ ফিরে আছে। জাপানী মেয়েদের কপোল কিঞ্চিৎ মাংসল হয়, বায়ুপূর্ণ বেলুনের মত দেখাচ্ছে। কেশের প্রিয় পারিপাট্য নষ্ট হয়েছে। ব্যাপার কি ?

ভীত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে, সান্ত্বনার কিছু ঠিক করতে না পেরে, সস্নেহে তার পিঠে হাত দিয়ে বললুম,—"সিষ্টার, তুমি আজ আমাদের চা খেতে দিলে না ? এমন করে' বোসে কেন,—অসুখ করেছে কি ?"......

একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো! সর্ব্বনাশ,—পিঠে মৃদু মৃদু হাত বুলুতে বুলুতে বললুম—"একি! কি হয়েছে সুষিমা! তুমি সর্ব্বদা হাসো খ্যালো, তোমাকে এরূপ দেখে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে সিষ্টার! আমাকে বলো ভাই, যেমন ক'রে পারি আমি তার প্রতিকার করবো।"

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—"তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমি আজই 'হারাকারি' করবো, এ প্রাণ রাখবোনা। আমাকে চারুসি (চারুশশী) আজ 'বাকা' বলেছে! আমি আর বাঁচতে চাই না।" সঙ্গে সঙ্গে গুম্‌রে গুম্‌রে কান্না!

কি বিপদ! 'বাকা' অর্থাৎ 'বোকা' বলেছে ব'লে প্রাণ রাখবে না! আর বাড়ীতে আমরা নিত্য সাতবার ক'রে বাছা বাছা চোকো চোকো বিশেষণ বহন করে এবং হেসে আজো বেশ বেঁচে আছি ও দিব্যি বাঁচিয়ে রেখেছি!

—এদের কাছে আত্মহত্যাটা অতি সোজা জিনিষ,—তাতে নাকি গৌরব বৃদ্ধি করে।—সত্যই ভয় পেলুম। যাদের আত্ম-সম্মান বোধ এতো মিহি, যাদের তিরস্কারের পুঁজি একমাত্র 'বাকা', এবং সেইটিই চরম ও মোক্ষম, আমাদের কাছে তাদের একদিন বেঁচে থাকাও যে বিস্ময়কর!—

—আমার জাপানী-জবানে, অনেক ক'রে তাকে বোঝালুম,—"চারুসি জাপানী ভাষা মোটেই জানে না, ও কথার মানেও বোঝে না। সে জাপানী কথা ক'য়ে, তোমার কাছে ওস্তাদি দেখাতে গেছে। অজ্ঞকে তোমার ক্ষমা করা উচিত সিষ্টার! বিদেশে আমাদের কে আছে, তোমরা দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছ, তোমরা অবুঝের কথায় রাগ করলে আমরা কোথায় যাবো? সে সত্যিই

ও-কথার মানে জানে না। সে আমাদের সকলের চেয়ে কালো কিনা—তাই, তার বুদ্ধিও কম।......

এইবার, মনের মত কথা শুনে, সুষিমা হেসে ফেললে, বললে—'আমারও তাই মনে হয়।"

বাঁচলুম, বললুম—"কখন এসেছি, তেষ্টায় ম'রে যাচ্ছি যে সিষ্টার।"

সে তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছে—ছুট্‌লো। ফাঁড়া কাট্‌লো।

* * *

চারুশশী উৎফুল্ল মুখে লাফাতে লাফাতে একখানা দীর্ঘপত্র হাতে ক'রে এসে বললে এই দেখুন,—"রবিবাবুর আসতে এখনো বিলম্ব আছে, কিন্তু কুছ্‌ পরোয়া নেই,—মাভৈঃ! সুষিমার গরিমা এইবার চুরমার। এই দেখুন,—মাই ডিয়ার নুটবিহারী কি লিখেছে।—তার শ্যালক সরোজকান্তি আসছে,—আমাদেরই সঙ্গে থাকবে। সে জোড়াবাগানের আখড়ার topman,—জোড়াসাঁকোর সাবিত্রী-সত্যবানের প্রাণস্বরূপ। তাকে অ্যাপিয়ার হ'তে দেখেই, মিসেস্‌ ফ্রেজার মুগ্ধ হয়ে আড়ষ্ট! That same সরোজকান্তি আসছে"......

কহ্লার সাগ্রহে "কবে—কবে?" করে উঠলো। জ্যোৎস্না নিশ্বাস ফেলে বললে—"উঃ, তিন বচর যা-করে কাটিয়েছি! যাক্—যাক্—ফেরবার আগে যে ভগবান মুখ রক্ষা করলেন—এই যথেষ্ট। Better late.......

চারুশশী বললে—"এই বেস্পতিবার 'কোমাগাটা মারু' এসে যাবে। সন্ধ্যে নাগাদ তাকে নাও না"......

অরুণ আমার দিকে চেয়ে বললে —"আপনার রবিবাবু তো প্রায়ই বেড়ান্, বেড়াতে ভালও বাসেন, —জার্ডিনের বাড়ির কেরানী নন যে ছুটি চাই। সেই আসবেন, একটু আগে এলে আমাদের" ..

কহ্লার বললে —"ও দুখ্খু করে আর কি হবে, তাঁর কথা এখন ভুলে যাও ভাই। দেখো সরোজকান্তিই সুষিমার ভ্রান্তি ভেঙে দেবে"......

অরুণ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো —"ভুলে যাও বললেই বুঝি হ'ল! 'পোলিটিকেল ইকনমির' পাতা খুলে বসেছি —মাথায় কিন্তু খেলছে —

"ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছে শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

ভোলবার কি আর ওষুধ আছে মশাই,—একেবারে কালে কেটেছে! —হুঁঃ সুষিমা 'শ্যাম সমারোহের' কদর বুঝবে কি?

* * *

বৃহস্পতিবার বৈকালে, সরোজকান্তি সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আসছেন।

অরুণ সুষিমাকে ডেকে, বেশ একটু স্ফূর্ত্তির স্বরে বললে,— "আজ আমাদের একটি নূতন ফ্রেণ্ড আসছেন—সেটা মনে আছে তো? সব যেন ঠিক ঠিক থাকে; তিনি একটু stylish লোক, সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন"......

সুষিমা সহজভাবেই বললে,—'এক্‌ট্রা' সোপ্‌ ক-খানা রাখবো ?”

অরুণ বাংলায় বললে—“শুনলেন দুষ্টার কথা ?”

আমি হেসে ফেললুম।

চারুশশী বললে,—“হাসছেন কি মশাই! আপনি দেখছি”......

কহ্লার কাল বললে—“আরো ঘণ্টা তিনেক ফর্‌ ফর্‌ ক'রে নিক্‌”... ..

সুষিমা একমুখ হাসি টিপে চলে গেল।

অরুণ লাল মেরে উঠলো—“উঃ—দুর্ব্বিসহ! চলুন বাইরে একটু ঘুরে আসি,—অতিষ্ঠ করেছে”......

বললুম—“সেই ভালো কথা। ওর কথার অতো মূল্য দাও ক্যানো? ওর স্বভাবটাই—রহস্য-প্রিয়। সেদিন চারুশশী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ফেরাচ্ছিল,—ও আমাকে ডেকে দেখিয়ে, মহা চিন্তিতভাবে বললে, চিরুসির ভয় করছে না? তুমি বারণ করো।” —ও ওই-সব ভালোবাসে,—ছেলে মানুষী বুদ্ধি যায়নি। ওতে রাগ করতে আছে ?”

চারুশশী রুষ্টভাবে বললে, –“না –আদর করতে হয়! আপনিই তো ওকে আরো মাথায় তুললেন।”

বললুম—“আর কতক্ষণের জন্যে ভাই! সরোজকান্তি এলো ব'লে। চলো একটু বেড়িয়েই আসা যাক্‌”......

ঘণ্টা দুই যেন ছবির রাজ্যে বেড়িয়ে এলুম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চা খেয়ে দু'টো কথা কইতে কইতেই সরোজকান্তি এসে

পড়বে। তারপর সুষিমাকে কি-ভাবে কি কি বলা হবে---অরুণ আর জ্যোৎস্না তারির মওলা আরম্ভ করে দিলে।

আমি বললুম -"ছেলে মানুষ ওইতে আনন্দ পায়, ওই নিয়ে আমোদ করে, তাকে অতটা আঘাত দিতে নেই। মিটেই যখন যাচ্ছে,—কাজ কি ?" ....

অরুণ উত্তেজিত ভাবে কি বলতে যাবার মুখেই, সুষিমা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে—আমাদের সামনে রেখে, আপন মনে, বাঁ হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলির ডগায় ঘা মেরে মেরে—ওয়ান্ টু, থ্রি, ফোর্, এবং সজোরে ফাইভ্—বলতে বলতে চলে গেল।

অরুণ বললে—"দেখলেন ?"

বললুম—"বোধ হয় কিসের হিসেব করছে"......

অরুণ, "ওর মাথা করছে !—আজ থেকে পাঁচ কাপ্—সেটা মনে আছে—জানালে। কাল সকালে আর"......

*　　　*　　　*

জাপানে অনেক বাড়িতেই দুটি ফটক থাকে। বাগানের গেট ঠেললেই ভেতরে ঘণ্টি বাজে। অমনি ভিতর থেকে, গেট সংলগ্ন 'তার' টেনে দিলেই, প্রথম গেট খুলে যায়। 'তার' টানার পরই বাড়ির একজন, দ্বিতীয় গেটটি খুলে দেবার জন্যে, দ্রুত গিয়ে, দ্বারের ভেতর-পিটে অপেক্ষা করে। বার-পিটে আগন্তুকের সাড়া পেলে, সে দোরের চাবি খুলে দিয়েই, তাঁকে স্বাগত অভিবাদন জানিয়ে নেবার জন্যে, দ্বার থেকে দু'পা পেছিয়ে জানু পেতে হাত জোড় ক'রে বসে। এই প্রথা।

সুষিমা চা দিয়ে গেছে—মাত্র মিনিট তিনেক হবে। বাইরে ঘণ্টির শব্দ হ'ল। বুঝলুম সুষিমাও ছুটে গেল। আমাদের উৎফুল্ল মুখ-চাওয়া-চাউইও হয়ে গেল।

"God is great" বলে অরুণ লাফিয়ে উঠলো..."নিশ্চয়ই সরোজ কান্তি" ..

বললুম..."আহা ..চা-টা পাঁচ মিনিট পরে খেলে, . এক সঙ্গেই হোতো ..

কহ্লার বললে..."second roundএ আপত্যি কি।...In honour of and for health of our long expected সরোজ কান্তি বাবু"...

অরুণ আমার দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখে বললে—"এইবার" ..

সঙ্গে সঙ্গে এক ঢেউ-খেলানো বিকট চীৎকার—কঁ্যা অঁ্যা-ইঁ-ইঁ-উঁ. কানে এসে চমকে দিলে...

চারুশশীকে বললুম—"ত্থাখো ত্থাখো, আলো নিয়ে যায়নি বুঝি! শীগগির লাণ্ঠান নিয়ে—তুমিই যাও চারু"...পেছনে পেছনে আমিও গেলুম...গিয়ে যা দেখলুম,...পিলে চমকে দিলে!.. গাঢ় নীল বর্ণের কোট প্যাণ্ট পরা, কালো 'হাই হ্যাট' মাথায়. একটি বলিষ্ঠ কাফি জোয়ান—সহ এক মুখ সঘন দাড়ি গোঁফ—মূঢ়বৎ দাঁড়িয়ে!

সুষিমা সেই নত জানু অবস্থায়—চিৎ হয়ে অজ্ঞান!

"Your name please,...(মশায়ের নাম) !"

"সরোজ কান্তি সামন্ত"...

* * *

খুড়ো চোখ বুঝে নীরব। একটু পরে নিশ্বাস পড়লো। চোখ চেয়ে...

"একি! যাসনি? এখনো যে বোসে? যা যা রাত হয়েছে। আশ্বিনে হিম, মা দোলায় আসছেন...যা...যা। চুল বিগড়োবে না.. মাথায় কাপড় দে প্রবোধ, ..শোবার আগে ফিরিয়ে নিলেই ঘুম হবে।...

...এক কাজ করিস না কেনো,...বাবরিদার একটা পরচুলো পরলেই হয়,—টুপির কাজ করে, হিমও লাগে না। থিয়েটার দেখিস নি—রাজপুত্তুরের মত দেখায়।...যা. যা রাত হয়েছে...

নব আনন্দমঠ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

উপক্রমণিকা

গ্রে ষ্ট্রীটের উপর সেই চারিতলা বাড়ীখানি এখনও ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু স্বদেশীর ইতিহাসে এমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার মত একটুকু স্থান সে কখনও পাইবে কি? নব আনন্দমঠের আদি আস্তানার উল্লেখ করিতে হইলে, এই বাড়ীখানিরই কথা বলিতে হয়; কিন্তু সে কথা এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তো বলিতে শুনিলাম না! 'রাম-নবমী' নাটকের প্রথম অভিনয় যাঁহার বাটীতে হইয়াছিল, তাঁহার নাম রামশেখর না হইয়া যে রামকিশোর হইবে, এ অমূল্য তথ্য এতদিন পরে সম্প্রতি 'সংবাদ প্রভাকরে'র ফাইল হাঁটকাইয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে নব আনন্দমঠের জন্মস্থান লইয়া যখন ভাবী গবেষকগণের মধ্যে মতভেদের তুমুল সংগ্রাম বাঁধিবে, তখন 'সংবাদ প্রভাকরে'র ন্যায় এখনকার কোন্ বাঙ্গালা কাগজ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে?

যাহা হউক, বাড়ীখানি বাহির হইতে বেশ জমকালো বোধ হইলেও বড় নয়। প্রত্যেক তলায় একখানি করিয়া ঘর। একতলার ঘরে এক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি ছিল। দোতলার ঘর ভাড়া লইয়াছিল--এক থিয়েটারের দল। তাহারা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেখানে রিহার্সেল দিতে আসিত। তেতলার ঘরেই স্বদেশী

সঙ্ঘের কার্য্যালয়। আর চারিতলার ঘরটি সর্ব্বদাই চাবি বন্ধ থাকিত। শুনা যায়, ভয়ানক ভূতের উপদ্রব হেতু সে ঘরের ভাড়াটিয়া জুটিত না। কথাটা সত্য হইলেও হইতে পারে, তবে ভূত-প্রকৃতির পক্ষে সেটা সঙ্গত বা স্বাভাবিক নয়। কারণ, দোতলার নৃত্য, গীত ও অ্যাকটিং এবং তেতলার ওজস্বিনী বক্তৃতা বাড়ীটিকে নিত্য যেরূপ গরম করিয়া তুলিত, তাহাতে ভূতের বংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবার কথা। আরও একটা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত ঘেঁসাঘেঁসি বাস-সত্ত্বেও ভূত-সঙ্ঘের সহিত স্বদেশী সঙ্ঘের কখনও সংঘর্ষ হয় নাই; ইহা বোধ হয়, অহিংস উপদ্রবেরই ফল। অহিংস উপদ্রবে মানুষ বিগড়ায় বটে, কিন্তু ভূতে বশীভূত হয়।

অহিংস উপদ্রব মন্ত্রের মর্ম্ম অবশ্য সকলে বুঝে না, কিন্তু যাহারা বুঝে, তাহারা মত্ত হইয়া উঠে। তাহারা মারিতে ভয় পায় বটে, কিন্তু মরিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। এই জন্যই বোধ হয়, ভূতেরা উহাতে ভীত না হইয়া বরং উহার ভক্ত হইতেই ভালবাসে!

যাহা হউক, এই মন্ত্র যেদিন অপর সকল মন্ত্রকে দমাইয়া দিয়া স্বদেশী সঙ্ঘের ঘরটিকে সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রিত করে, সেদিন কে মনে করিয়াছিল যে, উহার মধ্যে অত মজা ও অত শক্তি একসঙ্গে নিহিত আছে? বাস্তবিকই সেদিন—বাঙ্গালার এক সাংঘাতিক স্মরণীয় দিন! বেশ মনে পড়িতেছে, সেদিন শনিবার ছিল। বেলা চারিটার সময় ঘরটি সদস্য সমাবেশে পূর্ণ হইয়া গেল। গুরুজি ঘরের মাঝখানে একটি অতি ক্ষুদ্র চৌকিতে বসিয়াছিলেন। পরণে তাঁহার খদ্দরের তৈয়ারী এক ছোট লুঙ্গী, মাথায় গান্ধী টুপি, কিন্তু গা একেবারে আদুড়। তাঁহার আশে-পাশে সতরঞ্চির উপর সারি দিয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অঙ্গে খদ্দর ছাড়া কিছু ছিল

না। ঘরে দুইখানি ইলেকট্রিক পাখা বোঁ-বন্ বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল। এই শব্দে ঘরের সকলে যেন অনন্তের ধ্বনির এক আস্বাদ অনুভব করিতেছিলেন! যদিও চা খাইবার সময় বলিয়া কেহ গা ভাঙ্গিতে-ছিলেন, কেহ বা হাই তুলিতেছিলেন, কিন্তু কেহ কোন শব্দ করিতে-ছিলেন না। এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—"আমার নেতা হইবার বাসনা কি পূর্ণ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই সঙ্ঘ-সরোবর আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল,—"তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল,—"পণ আমার এই দেহ!"

প্রতিশব্দ হইল,—"দেহ তুচ্ছ; পৌরাণিক যুগে দধীচি ও শিবি রাজা উহা দান করিয়াছিলেন। উহাতে কোনও নূতনত্ব নাই। এ যুগে উহা একেবারেই অচল।" তখন পুনরায় মনুষ্য-কণ্ঠ কাতর স্বরে জানাইল,—"তবে আমার জীবন উৎসর্গ করিব।"

পুনঃ প্রতিশব্দ হইল,—"জীবনও তুচ্ছ; পদ্মিনী হইতে স্নেহলতা পর্য্যন্ত এদেশের অনেক মেয়েই উহা দিয়াছে, এবং এখনও দিতেছে। উহা হিষ্টিরিয়ারই লক্ষণ।"

তখন আবার সেই মানুষের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল,—"তবে প্রভু ভক্তি।"

জলদ্ গম্ভীর স্বরে ইহারও উত্তর আসিল,—"উহা রস-বিশেষ। উহাতে নেশা হয়, উহা মানুষকে বিহ্বল করিয়া তুলে। উহার গাছ থাকিলে, আমি সে বৃক্ষ-বংশ ধ্বংস করিবার জন্য উপদেশ দিতাম। তা'ছাড়া, আরও এক বিপদ আছে। উহার তেমন অধিক প্রচলন দেখিলে গভর্ণমেণ্ট, উহাকে আবগারি বিভাগের অন্তর্গত করিয়া উহার

উপর শুল্ক (Duty) বসাইতেও পারেন। অতএব, উহার নাম আর মুখে আনিও না।”

ইহা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে স্তম্ভিত হইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল,—“তবে প্রভু চিরদিন যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহাই করিব! দিনরাত হাটে মাঠে সর্ব্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইব।”

গুরুজি এতক্ষণ গম্ভীর ছিলেন; এইবার কিন্তু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—“সব চেয়ে তুচ্ছ কাজ যদি কিছু থাকে, তবে ঐ বক্তৃতা দেওয়া। যে উহা দিতে জানে না, সে-ও উহা দিয়া থাকে।”

ভক্তটি এবার ভ্যাঁক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—“আর কি আছে? আর কি করিব?”

তখন উত্তর হইল,—“অহিংস উপদ্রব!”

এমন সময় কোথা হইতে এক বিড়াল আসিয়া সেই ঘর হইতে একটি ইঁদুর মুখে করিয়া পলাইল! প্রাচীর-গাত্রে যে টিক্‌টিকিটি ছিল, সে-ও ইতিমধ্যে এক তেলাপোকাকে ধরিল!

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র সিংহ ডাক্তারী করেন। পূর্ব্বে যে ডিস্পেন্সারির কথা বলিয়াছি, মহেন্দ্রই তাহার মালিক। কিন্তু তাহার ব্যবসার অবস্থা আদৌ ভাল নয়। সহরে রোগ বাড়িলেও তাহার পসার বাড়ে না। যে সামান্য সংখ্যক রোগী আসে, তাহাদিগকে ঔষধের সঙ্গে পথ্যের খরচা দিতে পারিলেই ভাল হয়। তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী একদিন বলিল,—“এরূপে আর কতদিন চলিবে?”

মহেন্দ্র।—ভাবিতেছি, ডিস্পেনসারি তুলিয়া দিব। তিন মাসের ঘর-ভাড়া দিতে পারি নাই। এদিকে কম্পাউণ্ডারটিও বিনা বেতনে আর কাজ করিতে চাহিতেছে না। কাল হইতে সে আসিবে না বলিয়াছে।

কল্যাণী।—না আসুক, ক্ষতি নাই। আমিই তোমার কম্পাউণ্ডারের কাজ করিব।

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"বাঙলা কা বহুৎ তামাসা, আওরাৎ কম্পাউণ্ডার বন্ যাগা!"

কল্যাণী।—তা হোক, ভয় নাই! তোমাকে সেজন্য কেহ 'কাঙ্গালীচরণ ডাক্তার' বলিবে না। আমার কথা রাখ; অন্যমত করিও না। দেখিও, ইহার ফল ভাল হইবে।"

ফল যে ভাল হইবে, মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। এ নারী-প্রগতির যুগে কোন্ বোকাই বা তাহা না বুঝে? বিশেষতঃ ব্যবসা-রাজ্যে মন্দাগ্নি ঘটিলে, এরূপ ব্যবস্থা অনেক সময় অব্যর্থ মুষ্টিযোগেরই কার্য্য করে। তবু কিন্তু মহেন্দ্রের মনে একটু কাঁচা সঙ্কোচ দেখা দিল! মহেন্দ্র বলিল,—"সেটা কিন্তু ভাল দেখাইবে না।"

কল্যাণী।—পয়সার মাপকাটিতেই এ বাজারে সব জিনিষের ভাল-মন্দ বিচার হয়। পয়সা আসিলে সব ভাল দেখাইবে। তুমি চন্তা করিও না।

মহেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিল না। পরদিন প্রভাতে সে দেখিল যে তাহার কল্যাণী তাহার ডাক্তারখানা আলো করিয়া বসিয়া আছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এরূপ পুরুষকারের পরিবর্ত্তে যেরূপ পুরস্কার পাওয়া প্রার্থনীয়, মহেন্দ্র তাহা পাইল। ক্রমে রোগীর ভিড়ে তাহার

ঘর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। মহেন্দ্র কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহার অচল ফাউন্টেন পেন সচল হইয়াছে দেখিয়াই সে খুসী! হাত আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও সে অনবরত প্রেস্‌ক্রিপসানের পর প্রেস্‌ক্রিপসান লিখিয়া যাইত। ইহা শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, এইরূপ ব্যবস্থা-পত্রের ফলে বহু রোগী অবশ্য ইহলোক হইতে বিদায়-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সে অনুমান আদৌ সত্য নহে। মহেন্দ্র সরকারের চিকিৎসাতেও রোগী মরিয়াছে সত্য, কিন্তু মহেন্দ্র সিংহের নামে সে অপবাদ কেহ কখনও দিতে পারিবেন না। মহেন্দ্র জানিত যে, তাহার ঘরে যাহারা আসে, তাহাদের সকলেরই এক রোগ। কাজেই ব্যবস্থা-পত্র লিখিবার সময় তাহাকে একটুও ভাবিতে হইত না। কোনও রোগী রোগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভড়কাইত না। খুব গম্ভীরভাবেই বলিত,—"Art Disease।" রোগীরা ভাবিত, ইহা বোধ হয় Heart Disease-এরই ছোট ভাই। স্বামীর কথায় কল্যাণীর হাসি আসিলেও তাহা চাপিয়া লইয়া সে রোগীকে বলিতে—"nervous হইবেন না। এক শিশি ঔষধেই ফল পাইবেন।"—রোগী একমুখ হাসিয়া বলিত,—"যে আজ্ঞে!" কিন্তু মনে মনে ভাবিত, এতক্ষণে ঔষধের দাম উসুল হইল। মহেন্দ্রও মনে মনে হাসিয়া বলিত—"বেটা wounded হইয়াছে!—আবার উহাকে আসিতে হইবে।"

যাহা হউক, কল্যাণীর অনেককালের সাধ এইবারে পূর্ণ হইল। মহেন্দ্র একখানি মোটর গাড়ী কিনিলেন। কল্যাণী মহেন্দ্রকে বলিল,—"গাড়ী দেখিয়া আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু আমি উহাতে এখন চড়িতে পারিব না।"

মহেন্দ্র।—"সে কি! তোমার জন্যই কিনিলাম, তুমি চড়িবে না তো কে উহাতে চড়িয়া বেড়াইবে?"

কল্যাণী। তুমি। তোমার যেরূপ রোগী জুটিতেছে, তাহা অনেকটা আশাপ্রদ বটে; কিন্তু মনে রাখিও, কোনও রোগীর বাটী হইতে এ পর্য্যন্ত একটিও call আসে নাই। যাহাতে তাহা আসে, তাহারই এবার উপায় করিতে হইবে?

মহেন্দ্র।—আমি মোটরে চড়িয়া বেড়াইলেই কি তাহার উপায় হইবে?

কল্যাণী।—হাঁ! তাহা হইলেই লোকে ভাবিবে, শুধু ঘরে নয়, বাহিরেও তোমার বিস্তর রোগী। আমি সে সময় ডিস্পেনসারিতে বসিয়া থাকিব। রোগী আসিলে বলিব, তুমি ডাকে গিয়াছ। এইরূপ করিতে করিতে আপনা হইতেই call আসিবে।

মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল। আর কোনও উত্তর দিল না।

কিন্তু এবার কল্যাণীর কৌশলে কোনও সুফল ফলিতে দেখা গেল না। লোকে প্রত্যহ মহেন্দ্রকে মোটরে দেখিতে লাগিল বটে, কিন্তু রোগী দেখিবার জন্য তাহাকে কেহ বাড়ীতে ডাকিল না। ডিস্পেন-সারিতে বসিয়া কল্যাণী প্রত্যহ ভাবিত, আজ নিশ্চয়ই একটা ডাক আসিবে, কিন্তু ডাক আসার পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে চাঁদার জন্য চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল!

মহেন্দ্রও ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এমনভাবে মিছামিছি আর কতদিন সে মোটরে ঘুরিবে? কিন্তু কল্যাণী এখনও একদম দমে নাই। বলে,—"ধৈর্য্য ধর! সবুরে মেওয়া ফলিবে।"

ঠিক মেওয়া ফলিবার লক্ষণ কি না বলিতে পারি না ; তবে একটা নূতন রকমের লক্ষণ একদিন দেখা গেল !—বেলা তখন নয়টা হইবে। মহেন্দ্র যেমন প্রত্যহ বাহিরে যায়, সেদিনও তেমনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। কল্যাণী ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে একটি যুবতী আসিয়া তাহার সম্মুখের চেয়ার টানিয়া বসিল। কল্যাণীর ইহাতে একটু বিস্মিত বা বিচলিত হইবারই কথা ! কেন না, ইতিপূর্ব্বে সে-ঘরে কখনও কোনও স্ত্রীলোক পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু কল্যাণী তখন মেওয়া ফলনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। কাজেই কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত না হইয়া নব আগুন্তকাকে সে জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি কি ডাক্তারবাবুকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন ?”

যুবতী হাসিয়া বলিল,—“না, উপস্থিত ডাক্তারবাবুকে প্রয়োজন নাই। তাঁর স্ত্রীকেই আমাদের প্রয়োজন। —কাণ টানিলে মাথা আপনিই আসিবে !”

এরূপ অপ্রত্যাশিত বাক্যের উত্তরে কল্যাণী কি বলিবে, প্রথমে স্থির করিতে পারিল না। পরে একটু ভাবিয়া বলিল,—“আমাকে আপনাদের কি প্রয়োজন ?”

যুবতী বলিল,—“তোমাকেই প্রয়োজন কল্যাণী। আজ হরতাল। এখনি তোমাকে ডিস্পেন্সারী বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে বড়বাজারে পিকেটিং করিতে যাইতে হইবে।”

কল্যাণী দেখিল, সে যুবতী তাহার নাম জানে ! অথচ সে তাহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিল—“আপনার নাম ?”

যুবতী।—আমার নাম শান্তি। আমি ‘নারী-পিকেটিং-সমিতি’র সভানেত্রী। এই বাড়ীরই তেতলার ঘরে জীবানন্দ থাকেন। তাঁর কাছে তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে আমাদের দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতে আসিয়াছি।”

কল্যাণী।—আপনিই কি তবে ডাক্তার দত্তের স্ত্রী।

যুবতী।—আগে তাই ছিলাম বটে। এখন জীবানন্দের সহিত আমার civil marriage হইয়াছে।

কল্যাণী।—Civil marriage,—না criminal marriage?”

এ কথায় যুবতী একটু গম্ভীর হইল, বিরক্তও হইল। বলিল,—“সে কথা তোমাকে পরে বুঝাইব। এখন ঘর বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে চল!”

কল্যাণী।—‘ঘর বন্ধ করিতে পারি; কিন্তু স্ত্রীলোক হইয়া পিকেটিং করিতে যাইতে পারিব না।’

যুবতী।—স্ত্রীলোক হইয়া কম্পাউণ্ডারী করিতে পার, আর পিকেটিং করিতে পার না? ঐ দেখ, ‘বন্দেমাতরম্’ গান গায়িতে গায়িতে কুড়িজন স্ত্রীলোক আসিতেছে। তুমি যদি যাইতে না চাও, তাহা হইলে তোমাকে উহারা জোর করিয়া লইয়া যাইবে। অতএব গোলযোগ করিও না। গোলযোগ করিলেও কোনও সুবিধা হইবে না। ভাবিতেছ, মহেন্দ্রবাবু এখনই আসিয়া পড়িবেন; কিন্তু সে শর্করায় বালি মিশ্রিত করিয়াছি। মহেন্দ্রবাবুকে পথ হইতেই Call দিয়া আমাদের একজনের বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তোমাকে লইয়া গেলে, তবে তিনি ছাড়া পাইবেন।”

ইতিমধ্যে সেই কুড়িটি মেয়েও ডাক্তারখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী বুঝিল, মোগলের হাতে সে পড়িয়াছে।

কাজেই কোনও উচ্চ বাচ্য না করিয়া ডাক্তারখানার দরজাটি বন্ধ করিল। শান্তি তখন কল্যাণীর হাত ধরিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। মেয়েরা সকলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিল। শান্তি তাহাদিগকে বড় বাজার-অভিমুখে যাইতে বলিয়া মোটরে হর্ণ দিল। মোটরও চলিতে আরম্ভ করিল, আর সেই সঙ্গে কল্যাণীর কর্ণে শান্তির কণ্ঠ-স্বর সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল।—

দড়বড়ি গাড়ি চড়ি কোথা তুমি যাও রে।
পিকেটিং-রণে যাই, আমে না ফিরাও রে।
হরি বল, আল্লা বল, আর বল খৃষ্ট,
সব ভেদ দূর হয়ে দল হবে পুষ্ট।
দোকানে দোকানে যাব, নাহি হয়ো রুষ্ট,
গৃহ-সাধ নাহি আর—জেল-জয় গাওরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ডিস্পেনসারির দরজায় কুলুপ ঝুলিতেছে। ভাবিল, কল্যাণী এত বেলা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া না থাকিয়া গৃহে গিয়া ভালই করিয়াছে। ডিস্পেনসারির চাকরটাকে দিন দুই হইল, দোতলার থিয়েটার-ওয়ালারা এক্টর করিবার লোভ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। সে থাকিলে, অবশ্য ডিস্পেনসারিও এতক্ষণ খোলা থাকিত। কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে সেটা সম্ভবপর নয় মনে করিয়া মহেন্দ্র তখনই তাহার মোটর গাড়িকে গৃহপানে ছুটাইল। গৃহে আসিয়া কিন্তু সে যাহা দেখিল,

তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল, বাড়ীর বুড়া চাকরটি গৃহ-দ্বারে বসিয়া ঝিমাইতেছে, কল্যাণী তখনও ফিরে নাই। বাড়ীর ভিতর গিয়া মহেন্দ্র কয়েকবার 'কল্যাণী কল্যাণী' করিয়া চীৎকার করিল, কিন্তু কোথায় কল্যাণী!—কে উত্তর দিবে? ঘরে বসিয়া ভাবিয় কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র আবার বাহিরে আসিল। ডিস্পেনসারিতে গিয়া সেই বাটীর লোক-সাহায্যে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিবে, এই বিবেচনায় পুনঃ সেই দিকে চলিল।

এবার ডিস্পেনসারির সম্মুখে মহেন্দ্রের মোটর থামিবামাত্র তেতলার ঘর হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—"মহেন্দ্র সিংহ, উপরে আইস।"

এই বাক্যে মহেন্দ্রের প্রাণে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি মোটর হইতে নামিয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি তেতলার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, এই ব্যক্তিই তাহাকে ডাকিয়াছে। কাজেই কোনও উত্তর দিবার প্রয়োজন-বোধ মনে না করিয়া মহেন্দ্র দ্রুতপদে তেতলার ঘরে গমন করিল।

তেতলার ঘরে সেই ব্যক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন ছিল না। মহেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া সে বলিল,— "বল ভাই, বন্দে মাতরম্।"

মহেন্দ্র বিরক্ত হইল। ভাবিল, লোকটা পাগল নাকি? লোকটা কিন্তু মহেন্দ্রকে পুনরায় গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় কহিল,—"বল ভাই, বন্দে মাতরম্।"

এবার মহেন্দ্র একটু ভয় পাইল! পাছে সে কামড়ায়, এই ভাবিয়া সিঁড়ির দিকে পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করিল!

লোকটীও তখন একটু অগ্রসর হইয়া মহেন্দ্রের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, —"পলাইবে তো স্ত্রীর সন্ধানে এখানে কেন আসিয়াছিলে? আসিয়াছ যখন, তখন 'বন্দে মাতরম্' বলিবে না কেন? 'বন্দে মাতরম্' বলিবে না তো কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন?

মহেন্দ্র কাতরভাবে বলিল,—' আজ্ঞে, আপনি যাহা বলাইবেন, আমি সমস্ত বলিব। কিন্তু তার আগে দয়া করিয়া আমার স্ত্রীর সংবাদটুকু দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।"

ইহার উত্তরে সে বলিল, —"একটা সামান্য সংবাদের উপর যে প্রাণের থাকা ও না-থাকা নির্ভর করে, সে প্রাণের আবার মূল্য কি? মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমাকে পুরুষ মনে করিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, পুরুষ হইলেও তুমি কাপুরুষ!"

মহেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, তাহার নাকে এক ঘুঁসি মারিয়া তখনই তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে কেমন কাপুরুষ! কিন্তু সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিলে কল্যাণীর সন্ধান-লাভের আশাটুকু সম্প্রতি তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া মহেন্দ্র নিজেকে সামলাইল। সামলাইয়া চলাই সংযম। অতএব সংযম অবলম্বনপূর্ব্বক মহেন্দ্র বলিল, —"আপনার নিকট যে সংবাদের জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা যখন পাইলাম না, তখন এখানে থাকিয়া আর লাভ কি? আমি চলিলাম।"

লোকটী বলিল,—"তোমাকে যাইতে হইবে না। যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, কল্যাণীর সংবাদ পাইলেই তুমি আমার আজ্ঞামত বাক্য বলিবে, তখন তোমাকে সে সংবাদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। জানিয়া রাখ, আমারই নাম জীবানন্দ। শান্তি আমার

পত্নীর নাম। সেই শান্তির সঙ্গেই তোমার স্ত্রী বড়বাজারে পিকেটিং করিতে গিয়াছে।"—ইহা শুনিবামাত্র মহেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

জীবানন্দ বলিল,—"মহেন্দ্র সিংহ, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি এবার তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।—বন্দে মাতরম্ বল!

মহেন্দ্র।—তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমাকে আমি খুন করিব।

জীবা।—তুমি রাগ করতে পার, যত ইচ্ছা উপদ্রব করিতে পার, এমন কি নিজের গালে নিজে চড়ও মারিতে পার। কিন্তু আমাকে খুন কিছুতেই করিতে পার না। কারণ, উহা অহিংসা নীতির বাহিরে।

এমন সময় সহসা ভবানন্দ আসিয়া বলিল,—"শান্তি ও কল্যাণী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রভু তোমাদিগকে ডাকিতেছেন।"

তাহা শুনিয়া মহেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

জীবানন্দ বলিল,—"মহেন্দ্র কাঁদিও না। ইচ্ছা করিলে আমিও তোমার মত কাঁদিতে পারি, কিন্তু কিছুতেই কাঁদিব না। যাহাদের স্ত্রীর ছবি কাগজে কাগজে কাল বাহির হইবে, আজ তাহারা কাঁদিবে কেন? মহেন্দ্র যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। প্রভু যাহা বলিবেন, আমাদিগকে এক্ষণে তাহাই করিতে হইবে।"

এই বলিয়া জীবানন্দ ভবানন্দের গলা ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিল। অগত্যা মহেন্দ্র তাহাদের অনুগমন করিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা আমাকে ইহাদের দলে ভিড়াইবার জন্য এত ব্যগ্র কেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দুপুর রৌদ্রে তিন জনে ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। মহেন্দ্র নীরব ; শোক-কাতর ; কিছু কৌতুহলী।

ভবানন্দ সহসা আপন মনে 'বন্দে মাতরম্' গীত আরম্ভ করিল। ভবানন্দের গলা মিষ্ট। মহেন্দ্র গীত শুনিতে শুনিতে কিছু অন্যমনস্ক হইয়াছিল ; কিন্তু যেই শুনিল, ভবানন্দ গাহিতেছে,—

"তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মসজিদে।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—"মসজিদ কথাটা কোথায় পাইলেন ?"

ভবানন্দ।—প্রভুর কৃপায় ঐরূপ হইয়াছে। আগে উহা সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্গীত ছিল, এখন উহা বিশ্ব সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। মুসলমান-ভাইরাও উহা গায়িতে এখন সঙ্কোচ বোধ করে না।

মহেন্দ্র।—তোমাদের ধর্ম্ম কি ?

ভবানন্দ।—আমরা সকলেই বৈষ্ণব।

মহেন্দ্র।—বৈষ্ণব ? টিকি নাই, মালা নাই, হরি নাম নাই, তোমরা কিরূপ বৈষ্ণব ?

ভবানন্দ।—আমরাই পূর্ণ ও প্রকৃত বৈষ্ণব। তুমি যে বৈষ্ণবের কথা বলিতেছ, সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। উহাতে অহিংসা আছে বটে, কিন্তু উপদ্রব নাই, উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। গীতা-পন্থীরাও প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। উহাদের মধ্যে উপদ্রব আছে সত্য, কিন্তু উহারা হিংসা বর্জ্জন করিতে পারে না। উহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মও

অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। আমরা উভয়ের সার বস্তুটুকু লইয়া পূর্ণ বৈষ্ণব হইয়াছি। কথাটা বুঝিলে?

মহেন্দ্র। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি।

ভবানন্দ। নবযুগের ধর্ম্মে নূতন কথা ছাড়া আর কি শুনিবে?

মহেন্দ্র। তোমাদের গুরু কে?

ভবানন্দ। আমরা গুরুকে গুরু বলি না, প্রভু বলি। ঐ দেখ, গাছতলায় দাঁড়াইয়া প্রভু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

গড়ের মাঠের ধারে এক বৃক্ষ-তলে সত্যানন্দ প্রভু সত্যই দাঁড়াইয়া ছিলেন। জীবানন্দ ও ভবানন্দ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মাঠ কাঁপাইয়া দিল। মহেন্দ্র তাহাদের দেখাদেখি সত্যানন্দের পদধূলি লইল বটে, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বলিল না।

সত্যানন্দ প্রথমে মহেন্দ্রের সহিত কোলাকুলি করিয়া পরে জীবানন্দ ও ভবানন্দকে আলিঙ্গন দানে তুষ্ট করিলেন।

মহেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবানন্দ বলিল,—"প্রভু, ইনিই ডাক্তার মহেন্দ্র সিংহ!"

সত্যানন্দ তখন হাস্যমুখে বলিলেন—"তাহা এঁর শুষ্ক মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি। বৎস মহেন্দ্র, তুমি কল্যাণীর জন্য চিন্তিত হইও না। আমি সংবাদ পাইয়াছি, সে ও শান্তি এখন পরম সুখে হাজত বাস করিতেছে। পরে মাস তিনেকের জন্য জেল-বাসেরও ব্যবস্থা হইতে পারে। এখন তুমি আমাদের ব্রত গ্রহণ কর।"

মহেন্দ্র।– যে ব্রত-ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণীকে হাজত বাস করিতে হয়, সে ব্রত আমি গ্রহণ করিব না।

সত্যানন্দ এবার উচ্চ কণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "বৎস, সীতা নহিলে কি রাম রাবণ-জয়ী হইতে পারিতেন? সুভদ্রা সারথি হইয়া রথে না বসিলে কি অর্জ্জুন সুভদ্রা-স্বামী হইতে পারিতেন? নারীকে বর্জ্জন করিয়া ভূতপূর্ব্ব সত্যানন্দ আনন্দমঠ গড়িতে গিয়াছিলেন, তাই তাঁহার আনন্দমঠ একদম মাটি হইয়া গেল। আমি তাহা করি নাই, তাই কল্যাণীর দৌলতে তোমাকে পাইয়াছি। আমার এখানে নারী-ভেদ, জাতি-ভেদ প্রভৃতি কোনও রূপ ভেদের নাম-গন্ধ রাখি নাই।

মহেন্দ্র।—সে যাহা হউক, আগে প্রভু আপনি আমার কল্যাণীকে আনিয়া দিন, তারপর আপনাদের ব্রত গ্রহণ করিব। কল্যাণী নহিলে আমার ডাক্তারখানা উঠিয়া যাইবে।

সত্যানন্দ।—পুলিশ ছাড়িয়া দিলেই তোমার কল্যাণীকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। তখন আর তোমাকে ডাক্তারী করিয়া খাইতে হইবে না। তুমি ভবিষ্যতে মেয়র হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহেন্দ্রের মন একটু নরম হইল বটে, কিন্তু জীবানন্দ বলিয়া উঠিল,—"সে কি প্রভু? আপনি যে বলিয়াছিলেন, এবার আমি মেয়র হইব।"

সত্যানন্দ।—হাঁ, তোমরা উভয়েই ঐ পদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইও। তাহাতে শান্তি ও কল্যাণী—এ দু'জনেরও বল-পরীক্ষা হইবে। তাহাদের বল-অনুযায়ী যেরূপ দল সৃষ্টি হইবে, সেইরূপই ফল ফলিবে।"

এইটুকু বলিয়া সত্যানন্দ সহসা আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—'ঐ দেখ, ভারতে যত প্রকার ভেদ-নীতি প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত শূন্যাকার হইয়া আকাশে মিশিয়া

যাইতেছে। আর উহার পরিবর্ত্তে, ঐ দেখ, দল-ভেদের অপরূপ মূর্ত্তি আকাশ ভেদ করিয়া প্রকট হইতেছে। উহারই ডাক-নাম—দলাদলি। বন্দে মাতরম্ উহার মন্ত্র। দ্বন্দ্বে মাতনম্ উহার উপচার। ছন্দে বাচনম্ উহার কাম্যফল। ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে পারিলেই স্বরাজ্য-লাভের পথ প্রশস্ত হইবে। তোমরা সকলে ঐ মহাবলশালী দল-দেবতাকে একবার ভক্তিভরে প্রণাম কর।

বলা বাহুল্য, সকলে তখন সেই যুগ-ধর্ম্মের দেবতা-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে গড়ের মাঠ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আশ্বিন আসে আনন্দ লইয়া, আশা লইয়া।

অকাল-বোধনে দৈবী শক্তি উদ্বোধিত হইয়াছিল। সে কবে? কোন্ ত্রেতা যুগে? কোন্ স্মরণাতীত সপ্তমী তিথিতে? সেই জাগ্রত দেবতা কি আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? দীর্ঘ নিদ্রা, অনন্ত নিদ্রা। তারপর যুগযুগান্ত কাটিয়া গেছে। কোথায় গেল বিদেহ? কোথায় গেল উত্তর-কোশল? কোন অযোধ্যায় কি রামচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব হইল না? বন্দিনী বৈদেহীকে উদ্ধার করিতে কোন রঘুবীর কি পূজার আয়োজন করিল না? জাগো দুর্গা, জাগো ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জাগো জগদ্ধাত্রী! কে উচ্চারণ করিবে সেই সঞ্জিবনী মন্ত্র, যাহার প্রভাবে জীবনে জীবনে অমৃতের সঞ্চার হইবে? কে জ্বালিবে পঞ্চপ্রদীপ, যাহার আলোকে হৃদয় প্রদীপ্ত হইবে? কাহার শঙ্খধ্বনির সাড়ায় মূর্চ্ছিত প্রাণ সচেতন হইয়া উঠিবে?

* * *

যাঁহার শান্ত বাণীর মধ্যে শুধু দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু আড়ম্বর ছিল না; যাঁহার সঙ্কল্পের মধ্যে শুধু অপরিসীম সমবেদনা ছিল, কিন্তু নিরুদ্ধ রোষ ছিল না; যাঁহার ব্রতগ্রহণের মধ্যে অপরাজেয় আত্মত্যাগ ছিল, কিন্তু উদ্যত আক্রোশ ছিল না,—তাঁহার বাণী জয়ী হইয়াছে, তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ব্রত সফল হইয়াছে।

* * *

চরিত্রের কাছে রাজনীতি, ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মাভিমান নত হইয়াছে। সাংসারিক লাভ ইহাতে বেশি-কিছু হয় নাই আসন্ন ক্ষতির প্রবাহ সংবরিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পার্থিবতা তুচ্ছ, দম্ভ দর্প পদগৌরব জলবুদ্বুদ মাত্র, যে ক্ষেত্র আজিকার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যে ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি নগণ্য, সেই ক্ষেত্রে ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে, অন্যত্র নয়।

* * *

আত্মা যাঁহার মহৎ, সে-ই আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। মহাত্মার প্রতিজ্ঞা সার্থক হইয়াছে, দেশাত্মার সাধনা সিদ্ধ হইবে কবে? গান্ধীর অনশন-ব্রত সমাপ্ত হইল, এক সুকঠিন ব্রত জাতি আজ গ্রহণ করিল মাত্র। সাধ তাহার আছে, সাধ্য কতখানি—কে জানে! দুঃসাধ্য-সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়া যে দুঃসাহসের পথে পদার্পণ করিল, পন্থা তাহার মঙ্গলময় হোক। মন্দিরের দ্বার খুলিয়াছে, মনের দ্বার উন্মুক্ত করিতে যেন বিলম্ব না হয়?

* * *

অভ্যাস সংস্কারে দাঁড়াইয়া যায়। অনাদি কালের অভ্যাস, আবহমান কালের অভ্যাস। যুক্তির বিরুদ্ধে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তির মানসকেও, জাতির মানসকেও। মনে হয়, আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী নহি। এক অলঙ্ঘনীয় প্রভাব চিত্তবৃত্তিকে চালিত করে। সে ধারার গতিমুখ

পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে বিরাট আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন হয়। আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়া আত্মশুদ্ধি জন্মগ্রহণ করে।

* * *

Give us this day our daily bread। ইহা সামান্ত প্রার্থনা নহে। অন্ন, দাও অন্ন দাও। পৃথিবীর প্রাচুর্য্যের মধ্যে বুভুক্ষু আমরা,—আমরাই শুধু উপবাসী থাকিব? এই প্রার্থনার কাতর আর্ত্তনাদে পৃথিবী আজ মুখরিত। বিদেশের কথা ভাল জানি না, ভারতবর্ষে অভাব বুঝি চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল। চেষ্টাহীন, চিন্তাহীন, তেজোহীন, বলহীন হৃদয়,—ভাল করিয়া চাহিবারও সাহস নাই।

* * *

সংসারে প্রয়োজনকে মিটাইবার চেষ্টা অহরহ চলে। এই চেষ্টাই জীবন এবং চেষ্টার সমাপ্তিতে মৃত্যু। এই প্রয়োজনের ক্ষুধা নানা-রূপে, নানা-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেহের মধ্যে সে অন্নের জন্য, আরামের জন্য, সুখের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য; আত্মার মধ্যে সে শান্তির জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য হাহাকার করিতেছে। ক্ষুধা চীৎকার করিয়া বলিতেছে 'চাই, চাই, চাই.' 'যাহা ছিল তাহা চাই, যাহা আছে তাহা চাই, যাহা নাই তাহাও চাই।'

* * *

আমাদের সাহিত্যে কি শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পরিচয়ই লাভ করিব? জাতির জীবন এবং ব্যক্তির জীবন কি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত নয়? নিজের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ নই।

আপনি ও পর লইয়া মানুষের জীবন। যেখানে সে আত্ম-সর্ব্বস্ব, সেখানে সে অপরিণত, অপরিপূর্ণ। আমাদের সাহিত্য ব্যক্তিগত বেদনার ভারে নিপীড়িত। আধুনিক রুষ-সাহিত্যে জাতি-জীবনের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা চলিতেছে। জীবনের একটি দিকই সেখানে বৃহত্তর হইয়াছে। সুষমার অভাবে সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের বাণী যে সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে তাহার আভাস কোথায়? ব্যক্তির বেদনার নিবেদনেই কি আমাদের সাহিত্য সমাপ্ত হইবে? বাহ্যিক বলিয়া বস্তু এবং ঘটনার মূল্য অল্প নয়। বাহিরের ঘটনা মনকে নাড়া দেয় বলিয়াই, সে সাড়া দিয়া ওঠে। দেশ, কাল, ঘটনা এবং সমাজের মধ্যে সূচিত হইয়া সাহিত্য তাহাদের অতিক্রম করিয়া যায়।

* * *

কে জানিত, বান্ধবী বেড়াইতে আসিয়াছে। আর একদিন সে আসিয়াছিল। লেখায় ব্যস্ত ছিলাম, লক্ষ্য করি নাই, অন্য সকলের সহিত সে কথা কহিয়াছে, আমার সহিত কথা কহে নাই। হঠাৎ মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া গেলাম। ঝড় বহিয়া গেল।—

— ছি ছি, লেখকদের সঙ্গে পরিচয় রাখতে নেই। একটা কথার কথা বলেছি, তা না-ছাপালে চলত না? ব্যঞ্জনা করি আমারা? না? (এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হইল। হাঁ হাঁ, মনে পড়িতেছে বটে অলঙ্কারশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্যঞ্জনা শব্দটা, মেয়েদের কথা বলিতে গিয়া, হঠাৎ লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। কথাটা নিতান্ত সরলভাবেই ব্যবহার করিয়াছিলাম, আজ বান্ধবীকে

সে-কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? বাক্যের অর্থ সময়ে সময়ে শব্দার্থকে ছাড়াইয়া যায়, একটা কিসের যেন ইঙ্গিত সেখানে ধ্বনিত হইতে থাকে. আলঙ্কারিকেরা ইহাকেই বলেন রসের ব্যঞ্জনা। জানি এ-ব্যাখ্যা বান্ধবীর বাক্যের কাছে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। চুপ করিয়া রহিলাম।)—সহজ কথাকে এমনি সাজিয়ে লেখ, মনে হয়, তোমাদের সঙ্গে কথা না কইলেই ভাল হয়। হাসতে পাব না। তার এক সৃষ্টিছাড়া আখ্যা দেবে। চাইতে পাব না। তার এক দৃষ্টি-কটু ব্যাখ্যা হবে। লিখতে জানো বলেই যেন কলমের কালি না ছিটোলে চলে না। কবি!—মেয়েদের কাঁদুনে বলে কত ঠাট্টা কত লেখকই না করে গেছে। কবিতা আর কান্না—এ দুটোর মধ্যে তফাৎটা কোথায়? একটা নোনা আর একটা মিষ্টি বলে বিদ্রূপ করবে, তা জানি। তবু জেনো মেয়েরা চোখের জল ফেলে, আর পুরুষেরা কাব্য লেখে।—

বলিয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিল। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, মেয়েদের এই ভ্রূভঙ্গ জিনিষটা আজো ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। এ অনেকটা মিষ্টিক কবিতার মত। অনেক অর্থই হয় অথবা কোন অর্থই হয় না।

* * *

'ছোটগল্পে'র শারদীয়া সংখ্যার প্রচ্ছদপটখানি শিল্পীশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা। ছবিখানির বৈশিষ্ট্য মনকে সচকিত করিয়া তোলে। জীবনপ্রদীপের আলোর ছটায় কবি কত

সুখ-দুঃখ, কত বিরহ-মিলনের কাহিনী রচনা করিয়া চলে। কত বিচিত্র লেখনী -ক্ষরিত মসীবিন্দু মানস-সাগরে চিন্তার তরঙ্গ তোলে। সেই তরঙ্গের আন্দোলন কবির মস্তিষ্কেও সাড়া জাগায়। কবি রক্তাক্ষরে হৃদয়ের অনুভূতিকে রূপায়িত করিয়া রস-সৃষ্টি করে।

দিনপঞ্জী

২৪শে সেপ্টেম্বর, আপোষ-নিষ্পত্তির পর নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত বিরলা মিটমাটের কথা নিবেদন করিলে, মহাত্মা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার গণ্ডে মৃদু চপেটাঘাত করেন। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু-মধুর হাস্যে তাঁহার উপবাস-খিন্ন মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়।

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বরের চূড়ান্তরূপে গৃহীত মীমাংসা, তারযোগে প্রধান মন্ত্রী, বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট বিজ্ঞাপিত হয়।

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বর, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সহ রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিতে পুণা যাত্রা করিয়াছেন।

* * *

২৩শে সেপ্টেম্বর, নিউ-ইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যের জন্য আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দ্বারা তিনি সাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বর, রাত্রি ১১টার সময় একদল লোক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসাম-বেঙ্গল-ইনষ্টিটিউট ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে। কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান অল্প-বিস্তর আহত এবং এক বৃদ্ধা মহিলা নিহত হন। আক্রমণকারীদের মধ্যে এক পুরুষ-বেশিনী বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বালিকার নাম প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার।

* * *

পূজার পর দুই সপ্তাহ 'কথক সঙ্ঘে'র কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। অতএব 'ছোট গল্পে'র পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ৫ই কার্ত্তিক।

১ম বর্ষ] ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [illegible] সংখ্যা

পত্রপাঠ

শ্রীযোগানন্দ দাস

অমলা বলিল, দেখ, নরনারীর সমান অধিকার থাকা দরকার।

ভবকান্ত বলিল, নিশ্চয়ই।

—নিশ্চয়ই মানে? তোমার ঐ নির্ব্বিকার ভাবটা আমি মোটেই পছন্দ করি নে। তোমরা পুরুষমানুষেরা হঠ্ বলতেই যেখানে ইচ্ছে চলে যাবে, যা খুসী তাই করে বেড়াবে, আর মেয়েদের বেলাতেই মনুর বচন আর খনার বচন আর রাজ্যের যত বচন আওড়াবে, এ আমার দু'চক্ষের বিষ। কেন, আমি একলা যেতে পারব না কেন?

ভবকান্ত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, না একলা যাওয়ার কথা ত বলছি না। তুমি একলা পুরীতে থাকবে আর আমি একলা কলকাতায় থাকব, সেই কথাই বলছিলাম আর কি। মুখির মা'র ওপর ভার দিয়ে যাচ্ছ। সে বুড়ো মানুষ, পারবে কি সব?

—পারবে না কেন? একজনের কাজ করতে ক'জন লোক লাগে? আর আমিই বা একলা থাকতে যাব কেন? অসিতাদিরা রয়েছেন, তাঁদের ওখানেই ত থাকব। শরীরটা একটু ভাল হলেই চলে আসছি।

ভবকান্ত চুপ করিল।

২

অমলা বেথুন হইতে বি-এ পাশ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল। কলেজে থাকিতেই "নরনারীর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" সম্বন্ধে ডিবেটিং ক্লাবে একটি ওজস্বী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নাম করিয়াছিল, এবং পরে সেই প্রবন্ধ কুমারী অমলা মুখার্জ্জী নামে হাফ্‌বাস্ট্ ফটো সম্বলিত হইয়া "জাগো নারী" পত্রিকার ছাপা হয়। প্রবন্ধ বাহির হইবার পর অমলা অযাচিতভাবে কলেজের অবিবাহিত ছাত্র ও বিপত্নীক প্রৌঢ়দের নিকট হইতে অজস্র প্রশংসা পত্র লাভ করে।

সেই সময় ভবকান্ত কেমিষ্ট্রীতে এম-এস্‌সি ও য়ুনিভার্সিটিতে ল পড়িতেছে। অমলাদের বাড়ীর পাশেই মেস্, তিনতলার ঘর,

বেশ হাওয়া খেলে। ভবকান্তের উত্তর শিয়রের জানালা ও অমলার দক্ষিণের দরজা প্রায় রুজু-রুজু। দরজার সামনেই ছোট একটু ছাদ, তার সামনে একখানি সরু বাঁধানো গলির ব্যবধান মাত্র।

অমলা কখনো মেসের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না। নিজের দরজা খোলা রাখিয়াই ভবকান্তের জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিত ও গুন্ গুন্ করিয়া গান করিত।

ভবকান্তও অমলার দিকে দৃক্‌পাত করিত না। খোলা জানালার পাশে টেবিলে বসিয়া রস্কো শর্লেমারের ইনঅর্গ্যানিক্ কেমিষ্ট্রীর পাতার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া থাকিত।

অমলার চুল বাঁধিতে বিয়াল্লিশ মিনিট লাগিত এবং এক ঘণ্টাতেও ভবকান্তের ইনঅর্গ্যানিক্ কেমিষ্ট্রীর একটা পাতা আয়ত্ত করা হইয়া উঠিত না।

বহু দিন পর্য্যন্ত কলিকাতার পত্রাদি না পাওয়াতে সহসা একদিন ভবকান্তের নিজস্ব মাতুল ও অভিভাবক আন্দুলনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভবকান্তের মেসস্থ কক্ষে আগমন করতঃ অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া ভাগিনেয়ের সঙ্গসুখ উপভোগ করিলেন, ও যাইবার কালে উত্তুরে হাওয়ার আশু বিপদ সম্বন্ধে যথাবিহিত উপদেশ দিয়া চিন্তান্বিতকলেবরে টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পরে, কলিকাতা সহরের অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া একদিন সটান্ অমলার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহারই কিছুদিন পরে অমলার সহিত ভবকান্তের বিবাহ হয়।

৩

দুই বৎসর কাটিয়াছে। সুখেই কাটিয়াছে। অমলা সবুজ রংয়ের পশমের গুলি কিনিয়া আনিতে বলিলে ভবকান্ত নীল রংএর বল্-লজকুষ্ আনিয়া হাজির করে, শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' আনিতে বলিলে ভুলিয়া Recent Advances in Chemistry কিনিয়া আনে।

তথাপি দুইজনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে নাই। সন্ধ্যা হইলে আজিও দুইজনে দোতলা বাসে উঠিয়া একসঙ্গে All Quiet on the Western Front দেখিতে যায় এবং ইণ্টারভ্যালের সময়ে ভবকান্ত অমলাকে তিন ঠোঙা সল্টেড্ বাদাম ভাজা কিনিয়া দিয়া এক ঠোঙা নিজে লইয়া নিমীলিত নেত্রে চিবাইতে থাকে।

এই দুই বৎসর দু'জনের একত্রই কাটিয়াছে, ছাড়াছাড়ি হইবার প্রয়োজন ঘটে নাই। কারণ অনার্সে এম-এস্‌সি ও কৃতিত্বের সহিত ল পাশ করিলেও ভবকান্ত পেশা হিসাবে কবিতা লেখে (অর্থাৎ লিখিয়াই মাসিক পত্রিকায় পাঠায় ও অমনোনীত-মার্কা দাগিয়া ফেরৎ আসিলে দ্বিগুণ উৎসাহে লেখে) এবং অবসর সময়ে কেমিক্যাল্ সোসাইটীর জর্ণ্যাল্ পড়ে। পৈত্রিক কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকায় মেছুনীর সঙ্গে দেড় পয়সার দর কষাকষি করিয়া আঁশ জলের ছিটা খাইতে হয় না।

সুতরাং অধিকাংশ সময়ে বাড়ীতেই কাটে। পত্নী রান্নাঘরে যাইলেই যেটুকু বিরহ, নতুবা বিচ্ছেদের অন্য কোনও গুরুতর আশঙ্কা নাই।

এমন সময় পুরী হইতে অসিতাদি লিখিয়া পাঠাইলেন,—

ভাই অমি, আমরা গ্রীষ্মের ছুটীতে এখেনে এসিচি, তুইও আয় না। কত দিন তোকে দেখি নি, বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোর 'উনিটিকেও না হয় নিয়ে আসিস্ আঁচলে বেঁধে, একটু সমুদ্রের লোনা জল আর খোলা হাওয়া খেয়ে যাবেন। সত্যি ভাই, সমুদ্র যে কি জিনিষ, না দেখলে বুঝতে পারবি না। সায়েবগুলো যখন স্নান করে তখন দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। কি চমৎকার! নিটোল, বলিষ্ঠ গঠন, লাল টকটক্ করছে। আর মেমগুলো তেমনি বেহায়া! তুই আয়, আসবি ত? তোর অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইলুম। আজ তবে ৮০। ইতি

তোর ভুলে-যাওয়া অসিতাদি
(সত্যি নয়?)

পুঃ সমুদ্রের ঝড় কি ভীষণ সুন্দর দেখ্‌তে!

পুঃ পুঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় আসিস্ !!

অসিতাদি কলেজে অমলার দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। দুইজনে অত্যন্ত ভাব। ক্লাস্ শেষ হইলেই দু'জনে কলেজগৃহ ছাড়িয়া ছাদঢাকা সিঁড়ির সাকো বাহিয়া একেবারে বোর্ডিং বাড়ীর দোতলায় গিয়া উঠিত ও টানা বারন্দার একটেরে বসিয়া গল্প করিত। অমলা কাঁদিলে অসিতাদি আদর করিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেন, ও অসিতাদি হাসিলে অমলা অকারণে আঁচলের কোণ পাকাইতে পাকাইতে ঢোক গিলিত। দুইজনে একরঙের এক পাড়ের সাড়ী পরিত ও একই ছিটের কাপড় দিয়া একই দর্জ্জির

কাছে ব্লাউজ প্রস্তুত করাইত। অসিতাদি একদিন দাঁত না মাজিলে অমলা তিনদিন মাজিত না।

সেই অসিতাদির ডাকও অমলা উপেক্ষা করিতে পারে না।

কিন্তু মুস্কিল বাধিল ভবকান্তের যাওয়া লইয়া। সম্প্রতি ভবকান্তের এক বন্ধু খবর আনিয়াছেন যে "কলহ" পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ হাতী ওরফে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ হাতী মহাশয়ের আপিস-মজলিশে যদি রোজ সন্ধ্যার পরে নিয়মিতভাবে হাজিরা দেওয়া যায় এবং সমাগত বন্ধুমণ্ডলীর সমক্ষে মাত্র আড়াই মাস কাল ধরিয়া "আপনি চমৎকার লেখেন, রবি ঠাকুরের পর কবি বলতে ত আপনিই" প্রত্যহ এই কথাগুলি মাত্র এগারোবার করিয়া বলা যায়, তবে কালক্রমে তাহার কবিতা উক্ত পত্রিকার উপরে হেড্‌পীস্, নীচে টেল্‌পীস্ ও দুইপাশে স্পেশাল্ বর্ডার দিয়া ছাপা হইবেই।

এ সুযোগ ভবকান্ত ত্যাগ করিতে পারিল না। বন্ধুর কথামত আজ দিন পনেরো যাবৎ সে এই সাহিত্য-সেবায়েৎ-সঙ্ঘে প্রত্যহ আনাগোনা করিতেছে। অবস্থাও কিঞ্চিৎ অনুকূল বোধ হইতেছে। একদিন শুধু ভবকান্ত ভুলক্রমে তাঁহার শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী "লগুড়" পত্রিকার সম্পাদক রাম বাঘ ওরফে শ্রীযুক্ত রামেন্দুভূষণ বাঘ মহাশয়ের একটি গল্পের কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া ফেলায় সম্পাদক মহাশয় আটাশ মিনিট কাল গম্ভীর বদনে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন এবং পাঁচ কাপের জায়গায় মোটে তিন কাপ চা খাইয়াছিলেন। ভবকান্তের প্লেটে সেদিন কচুরি পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে ভাজি মিলে নাই। তবে পরদিন আসরে

আসিয়াই মেসের ম্যানেজারের হাতে রামেন্দুভূষণ কিরূপে অতি কঠোরভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, ফলাও করিয়া সেই ঘটনা বর্ণনা করিলে পর গুমোট কাটিয়া যায়। এ সময়ে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া ভবকান্তের পক্ষে অসম্ভব। পনেরো দিন কাটিয়াছে, আর মাত্র দুই মাস বাকী।

কিন্তু অমলা নাছোড়বান্দা। সে যাইবেই। বিশেষতঃ চব্বিশ ঘণ্টা স্বামী সহ বাস করিবার বিরুদ্ধে ছিল সে। ইহাতে নারীর স্বাধীনতায় ব্যাঘাত জন্মে, মন পঙ্গু হইয়া যায়, এবং এক জায়গায় বসিয়া থাকিয়া এক্সারসাইজের অভাবে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বাস্থ্যের জন্যও বটে, তাহার একবার পুরী ঘুরিয়া আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর তা' ছাড়া পুরীতেই যদি না গেল, তবে বি-এ পাশ করিল কি জন্য?

এ কথার সদুত্তর ভবকান্ত দিতে না পারায় অমলার পুরী যাওয়াই সাব্যস্ত হইল।

যথাকালে হাওড়া ষ্টেশনে ভবকান্ত পত্নীকে তুলিয়া দিয়া আসিল। যাইবার সময়ে অমলা বলিল দেখ ঠিক সময়ে খাবে, ঠিক সময়ে শোবে, অনিয়ম মোটে করবে না। আর আমার জন্যে মিথ্যে ভেবে মন খারাপ কোরো না। আমার আসতে যদি দেরীই হয় অস্থির হোয়ো না। আমি চিল্কা, ভুবনেশ্বর সব ঘুরে টুরে আসব। সংসারচিন্তা থেকে কিছুকাল মনকে ছুটি না দিলে শরীর নষ্ট হয়ে যায়।

ঘণ্টা পড়িল।

—হ্যাঁ, আর বলছিলাম চায়ের সঙ্গে ছোলা ভিজোনোটা খেতে ভুলো না যেন। ঠিক মত কলি না বেরোলে মুখির মাকে ব'লে ভালো দেখে কাব্‌লী ছোলা আনিয়ে নিও।

ভবকান্ত একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ্ দেখাইল, হুইস্‌ল্ পাড়ল গাড়ী ছাড়িল।

অমলা জান্‌লায় দাঁড়াইয়া রুমাল নাড়িল, ভবকান্ত কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে গিয়া ভুলিয়া চশমা মুছিয়া ফেলিল।

৪

গাড়ী যখন ষ্টেশন ছাড়িয়া নিতান্তই চলিয়া গেল, ইঞ্জিনের চোঙার কুণ্ডলায়িত ধূম্রও আর দেখা যায় না, তখন আর একটি নিশ্বাস উদ্দেশে ত্যাগ করিয়া ভবকান্ত মন্থর গতিতে ফিরিয়া বাসে গিয়া উঠিল ও বাড়ী না যাইয়া সোজা সেবাইৎ-সঙ্ঘে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেদিন সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মাধিক্য হইয়াছে। বদ্ধনাসায় কাশিতে গিয়া যুগপৎ ডানচোখে অশ্রুপাত ও বামচক্ষু স্পন্দিত হয়। তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে তিনি আর বাঁচিবেন না। এইজন্য অদ্য বেলা দ্বিপ্রহর হইত অত্যন্ত চিন্তিত আছেন, অবশ্য মরার জন্য নয়, মরার পরের কথা ভাবিয়া। মরিবার পরে লোকে থাকে কি না সমস্যা তাহাই। কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ হাতী মরিয়াও যদি না লিখিতে পারেন তবে এ হতভাগ্য দেশের দুর্দ্দশা কি হইবে? সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল যে তাঁহার কিছুই হয় নাই, সামান্য সর্দ্দি মাত্র, দু'দিনেই সারিয়া যাইবে।

অবশেষে ভবকান্ত তাঁহার "স্বর্গ-ঢেঁকী" নামক নারদ ঋষির অনুকরণে লিখিত ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী গীতিকবিতাটি সুরসহযোগে তিনবার এবং অবলেন্দ্রনাথ নামক এক তরুণ সমালোচক তাঁহারই অপর একটি কবিতা "বেণীবন্দনা" সম্বন্ধে বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী অনিন্দিতা বসু যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছিল সেইটি বারোবার সভাস্থলে পাঠ করিয়া শুনাইবার পর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন।

ভবকান্ত গৃহে ফিরিয়া চিৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল ও বাম হাঁটু খাড়া করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ চরণ স্থাপন করতঃ গোড়ালীর অগ্রভাগ নাচাইতে লাগিল। সেবাইতের কাজ আর ভালো লাগিতেছে না। নেহাৎ তাহার কবিতা ছাপার অক্ষরে বাহির হইবে, নতুবা—

মুখি ওরফে মোক্ষদার মা রান্নাঘর হইতে ডাক দিল,—বাবা, খেতে এস।

মোক্ষদার মা'র বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে, বিধবা। বাঁ দিকের কাণটি কালা, সেই জন্য বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেহ গাল দিলে শুনিতে পায় না। যেদিন মেজাজ অত্যন্ত খারাপ থাকার জন্য আফিমের মাত্রা একটু চড়িয়া যায়, সেদিন সুক্তোয় নুনের বদলে চিনি ও আমের চাট্‌নীতে গুড়ের বদলে হলুদ দিয়া ফেলে। কারণ তখন তাহার মুখি সহসা পর্ণকুটীরের মেঝে খুঁড়িয়া সাত ঘড়া মোহর পাইয়াছে এবং হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে বলিতেছে, মা, এক ঘড়া মোহর নিবি? নে না, তিনমহালা বাড়ী তুলবি, পরের বাড়ী আর গতর খাটিয়ে খেতে হবে না।

সে সময়ে তুচ্ছ নুন হলুদের প্রভেদ ভুলিয়া গেলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

ভবকান্ত খাইতে বসিয়া দেখিল, উচ্ছে ভাজা মেঠাইয়ের মত লাগিতেছে, মাছের ঝোলে তিন ডজন ধানী লঙ্কা। পত্নীর সদ্য বিরহে কোনও রকমে সাশ্রুনেত্রে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া পড়িল। শুইতে গিয়া দেখিল, বিছানা ঝাড়া হয় নাই। পাছে বিছানায় ধূলা দেখিতে পায় এই জন্য বাতি নিবাইয়া পাশ বালিশ আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

ভবকান্তের দিন আর কাটে না। প্রত্যহ দুইবেলা ট্যাড়স্ সিদ্ধ, খেসারির ডাল, লবণহীন কুমড়োর ছেঁচ্‌কি ও সলবণ বীচে পটলের অম্বল খাইয়া খাইয়া তাহার পেটে চড়া পড়িয়া গেল। মুখির মাকে কোন কথা বলিয়া লাভ নাই। আস্তে বলিলে শুনিতে পায় না বলিয়া চটিয়া উঠে, জোরে বলিলে 'আমার মুখিরে—' বলিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে। অগত্যা নীরবে কুমড়ো ও পটল সেবনান্তে যদুনন্দন কবিরাজের "আশ্চর্য্য হজমীগুলি"র সাহায্যে হজম করে এবং দৈবাৎ রাস্তার এ ফুটপাথে কুমড়োওয়ালা বা পটলওয়ালা দেখিলে একেবারে ঐ ফুটে চলিয়া যায়।

একবার সন্ধ্যার সময়ে এক রেস্তঁরায় সবে চা খাইতে বসিয়াছে এমন সময়ে হোটেলের ছোকরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাবু, আর কিছু দেব, চপ, কাটলেট, মামলেট, ডেভিল, পটলের দোর্ম্মা—

অনাস্বাদিত চায়ের পেয়ালা ফেলিয়া রাখিয়া ভবকান্ত বেগে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, আর কখনো সে রাস্তা দিয়া চলে নাই।

দিনে পটলের অম্বল খাইয়া ও রাত্রে পাশ বালিশ সম্বল করিয়া ভবকান্তের বিরহ যাপন ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতে লাগিল।

৫

এমন সময়ে পুরীতে অমলার কাছে একখানি চিঠি গিয়া পৌঁছিল। চিঠিখানি এইরূপ—

প্রাণের অ (অমলার সংক্ষিপ্তসার),

তুমি আর কত দিন ওখানে থাকবে? মুখির মা'র রান্না খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। রোজ রোজ বেলে মাছের বাটীচচ্চড়ি খেয়ে পেটটা প্রায় থালার মত চ্যাপ্টা আর গলাটা গেলাসের মত লম্বা হয়ে এসেছে।

তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে, সেরেছো ত? শীগগীর চলে এস, একলা আর ভাল লাগছে না। ইতি

তোমারই ভ।

ইহারই পনেরো দিন পরে ভবকান্ত একখানি পত্র পাইল—

প্রিয়তম ভ,

তোমার চিঠি পেলাম। একটু বেড়াতে এসেছি শরীর সারাবার জন্যে, তোমার আর তর সইছে না বুঝি? মুখির মাকে একটু বুঝিয়ে বলে দিলেই ত পার, ও সব ঠিক করে দেয়। এখনো আমার যেতে ২ মাস দেরী আছে। তুমি অত ব্যস্ত হোয়ো না।

আশা করি ঠিক মত চলছ অনিয়ম কিছু করছ না। আজ বড্ড তাড়াতাড়ি, অলিতাদিরা চক্রতীর্থে বেড়াতে যাবেন, আমার জন্তে সব অপেক্ষা করছেন। ভালবাসা জেন আর -। ইতি

তোমার ল।

ভবকান্ত আবার পড়িল, ফিরিয়া পড়িল, নূতন করিয়া পড়িল। 'এখনো আমার যেতে ২ মাস দেরী আছে।' কি করা যায়? এক নম্বর মাদ্রাজী র' নস্য বাম নাসায় এক টিপ ও দক্ষিণ রন্ধ্রে একেবারে তিন টিপ লইয়া প্রাণপণে টান দিল, সাত সাতটা আসল হাঁচি বাহির হইয়া গেল কিন্তু একটা উপায়ও বাহির হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ছোট বোন সুরবালাকে চিঠি লিখিতে বসিল। সুরবালা স্বামীর কাছে নৈহাটীতে থাকিত, দুইটি সন্তান, একটি কোলে।

চিঠি পাইয়া সুরবালা কোলের ছেলেটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি দাদার নিকটে চলিয়া আসিল এবং আসিয়াই আদ্যোপান্ত ব্যপারটা বুঝিয়া লইল। অতঃপর দাদার সহিত দেড়ঘণ্টাকাল অতি নিবিষ্ট-ভাবে আলাপ করিয়া ছেলে-কোলে পাশের বাড়ী চলিয়া গেল।

পাশের বাড়ীতে একটি বৃদ্ধ বাস করিতেন। বাড়ীর অন্য বাসিন্দার মধ্যে তাঁহার একমাত্র সুন্দরী নাতিনী উষা। বয়স উনিশ, বিবাহ হয় নাই, স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ার কোর্সে কেমিষ্ট্রিও আছে। উষা স্যাণ্ডালও পরে, আলতাও দেয়, এবং মধ্যে মধ্যে ভোঁতা চাবির পিছনে করিয়া দুই ভ্রূর ঠিক মধ্য স্থলে চীনা সিঁদুরের টিপও কাটে। অমলার সহিত উষার আলাপ হইয়াছে। অমলাও উষাদের বাড়ী যায়, উষাও অমলাদের শোবার

ঘরে আসে। পাশের বাড়ী সুবাদে ঊষা অমলাকে দিদি ও ভবকান্তকে দাদাবাবু বলে। কখনো কখনো ভবকান্তের চশমা লুকাইয়া রাখে ও বৈদ্যুতিক সংযোগে কি করিয়া জলযান ও অম্লযানে মিলিয়া চকিতে বারিবিন্দুর সৃষ্টি করে সেই তত্ত্ব না বুঝাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত চশমা ফেরৎ দেয় না। সুরবালা যখন দাদার বাড়ী বেড়াইতে আসিত সেই সময়ে ঊষার সহিত তাহার আলাপ হয় ও ক্রমে সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দুইজনেই সমবয়সী ও বর্ত্তমানে পরস্পরের বকুল ফুল।

দুই সখীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিভৃতে আলাপ হইবার পর, 'তবে ভুলিসনে ভাই, বকুল ফুল' বলিয়া সুরবালা ছেলে কোলে উঠিল ও দাদার বাড়ী আসিল এবং 'কিছু ভেবো না দাদা' বলিয়া আশ্বাস দিয়া জনকরাম চাকরকে সঙ্গে লইয়া ছেলে কোলে স্বামী ভবনে ফিরিয়া গেল।

৬

পুরীর সমুদ্র একটি অদ্ভুত জীব। দিনের বেলায় যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তরঙ্গ শীর্ষগুলি মাথার উপর আসিয়া অনন্তনাগের সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করে এবং সুবিধা পাইলেই তাহার প্রবল অন্তঃস্রোত জলের তলায় তলায় শতবাহু মেলিয়া ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন নিজের ভাবনা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনও ভাবনা ভাবিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। আবার রাত্রির অন্ধকারে যখন সেই সমুদ্রেরই প্রান্তশায়ী বেলাভূমির অতি নিকটবর্ত্তী মানুষকেও চিনিতে পারা যায় না, এবং তাহারই

অদূরে অশ্রান্ত-গর্জ্জমান জলরাশির বুকে সারি সারি আলোর মালা গড়াইয়া আসিয়া বালির উপর ভাঙিয়া পড়ে, নিবি নিবি করিয়াও যেন নিবিতে চায় না, তখন শত চেষ্টাতেও আর মনকে আপনার গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। তখন যে কাছে নাই, আলোকোজ্জ্বল তরঙ্গের মাথায় চড়িয়া অন্ধকারের মধ্যে পাড়ি দিয়া তাহারই কাছে একবার ঘুরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে।

৭

দিনের বেলাটা অমলার খুব আনন্দে কাটে। সকালে সমুদ্রের মধ্যে দুইঘণ্টাব্যাপী স্নানযাত্রা করিতে, দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে মোচার খোলার মত নৌকায় চড়িয়া নুলিয়াদের মৎস্যশীকার হইতে প্রত্যাগমনদৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে এবং বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত বালুকারাশি শীতল হইলে দল বাঁধিয়া কখনো আঠারো-নালা, কখনো চক্রতীর্থে ঘুরিয়া আসিতে সময় দিব্য কাটিয়া যায়। দিনের বেলার স্বাধীনতা অবাধ, তখন নর-নারীর অধিকার চিন্তা, বহু সমস্যা, বহুতর সমাধান ভিড় করিয়া আসে। কিন্তু সমুদ্রতীরে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় যখন রাত্রি নামিলেই অমলা প্রমাদ গণে। যাহা ভাবিতে চায় না, তাহাই ভাবাইয়া তুলে।

এখনো ভুবনেশ্বর, চিল্কা বাকী। তাহার উপর আবার সারনাথ যাইবার প্রস্তাবও উঠিয়াছে। নাঃ, এখন সংসারচিন্তা কিছু নয়, এই করিয়াই নারী জাতি অধঃপাতে গিয়াছে। কি দাসত্ব, কি বন্ধন, কি মোহ! আরও দেড়মাসের আগে সে ফিরিবার নামও করিবে না।

আগে চিল্কা যাওয়া হইবে। আজ সোমবার, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা স্থির। ফর্দ্দের জিনিষের মধ্যে তাহার অর্ডারী রেডিয়ম্ স্নোর পরিবর্ত্তে হিমানী আসিয়াছে দেখিয়া অমলা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই বুদ্ধিজীবীর একই পর্য্যায়ে ফেলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে ঝি আসিয়া তাহার হাতে দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখে, একখানি লিখিয়াছে সুরবালা, অপরখানি উষা।

সুরবালার পত্র

ভাই বৌদি,

কেমন বেড়াচ্ছ? পুরী বেশ জায়গা, না? ওঁকে ভাই কত দিন ধরে সাধছি, চল না একবার পুরী বেড়িয়ে আসি, তা ভাই যে কুঁড়ে, একটুখানি কি নড়তে চান? জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখবার ইচ্ছে যে কতদিন থেকে আছে, দেখি কপালে যদি থাকে।

তা ভাই তুমি কবে আসবে? সে দিন দাদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। যা দেখলাম ভাই, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল না। আমার মনে হয় তোমার পত্রপাঠ চলে আসা উচিত। বৌদি ভাই, সত্যি বলছি রাগ কোরো না। যদিও আমার দাদা বটে, তাহলেও পুরুষমানুষকে একলা ফেলে রেখে গিয়ে তোমরা কি রকম ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পার বল ত? অবশ্য আমি খারাপ দিক থেকে কিছু বলছি না, তবে ঐ যে পাশের বাড়ীর উষা অত ঘন ঘন আসে, দেখলাম দাদার সঙ্গে খুবই ভাব, অবশ্য পড়া বলে নিতেই আসে, অন্য কিছু না—তা যাক্ গে।

তোমার শরীর কেমন আছে? সম্পূর্ণ সেরেছে? পুরীর জল হাওয়া শুনেছি খুব ভাল, খুব শিগগীরই শরীর সেরে ওঠে।

আমাদের এক রকম কেটে যাচ্ছে। ছোট খোকাটার আবার একটু সর্দ্দি জ্বর মতন হয়েছে, ডাক্তার বলেছেন দু'এক দিনেই সেরে যাবে।

আজ এইখানেই শেষ করি ভাই, উনি আবার ডাকছেন কেন দেখি। এক দণ্ড যদি কোথাও নড়েছি! আমার প্রণাম জেনো। ইতি সেবিকা

সুরো

হাতের ফর্দ্দ মাটীতে রাখিয়া অমলা দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলিল।

উষার পত্র

ভাই অমলাদি,

তুমি যে পুরী গিয়ে আমাদের একেবারেই ভুলে গেলে? পুরী কেমন জায়গা অমলাদি? সমুদ্রে খুব ঢেউ? রোজ স্নান কর? ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না? আর ঝিনুক? খুব ঝিনুক কুড়োও?

আমরা কলেজ খুলতে এখনো দেরী আছে। রোজ দাদাবাবুর কাছে পড়া ব'লে নিচ্ছি। সত্যি ভাই অমলাদি, দাদাবাবু এমন আমুদে লোক, এমন সব মজার মজার কথা বলেন। হেঁসে বাঁচি না।

আসবার সময়ে কিন্তু আমার জন্যে অনেকগুলো শামুক আর অনেক অনেকগুলো ঝিনুক আন্‌তে হবে, আর একটা সেই পাকানো বেত। দাদাবাবুকে খুব মারবো বলেছি।

আশা করি তোমার শরীর ভালো। আমরা বেশ ভালো। প্রণাম জেনো। ইতি

তোমার স্নেহের উষি

৮

হাঁটুর উপর হাত ও হাতের উপর চিবুক রাখিয়া অমলা চিন্তা করিতে বসিল। আজ সোমবার, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় যাত্রা। চিল্কা হ্রদ, সুন্দর দৃশ্য, হ্রদের গা দিয়া ট্রেণ যায়। অমলা জানালার বাহিরে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল, সম্ভবতঃ নুলিয়াদের মোচার মত নৌকা দেখিতেছে।

সামনের বারন্দা দিয়া অসিতাদি রান্নাঘরে যাইতেছিলেন অমলাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, হাঁ রে অমল, তোর কি হয়েছে? অমন ক রে রয়েছিস্ যে?

—না, কিছু না, মাথাটা বড় ধরেছে, বলিয়া অমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ও নিজের ঘরে কবাটে হুড়কো লাগাইয়া মুদিত চক্ষে বিছানায় শুইয়া পড়িল, বোধ হয় ঘুম পাইয়াছে।

কিছু পরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল।—

প্রিয়তমেষু,

আমি আর চিল্কায় গেলাম না। শুনিতেছি জায়গাটা অত্যন্ত গরম। পুরীতেও বর্ষা নামিয়াছে, শীঘ্রই কলেরা বাড়িবে। এখানে থাকাও নিরাপদ নহে। আমি দুই চারি দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিতেছি। মুখির মা বোধ হয় ঘরসংসার এত দিনে গোল্লায় দিয়াছে। ও একটা অপদার্থ আমি আগেই জানিতাম। এবার গিয়া সব ঠিক করিব। অন্য লোক দেখিতে হইবে। ইতি

অমলা

ইহারই তিনদিন পরে জবাব আসিল।

প্রাণের ল,

তোমার চিঠি পেয়ে আশ্চর্য্য হলাম। তোমার এই শরীর নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবার কি দরকার? একটু ভাল করে' সারিয়ে আসা উচিত। চিল্কা যদি ভাল না লাগে, অন্ততঃ ভুবনেশ্বরটাও ত দেখে আসা উচিত, পয়সা খরচ করে যখন অতদুর গেলেই।

আর যদি পার কণারকটাও একবার ঘুরে আসতে পার। ওখানকার সূর্য্যমন্দির খুব সুন্দর। কত কালের কত স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেরই ওসব দেখা কর্ত্তব্য।

আমার জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না। কোনও আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে মুখির মার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর রোজ রোজ বেলে মাছ রাঁধে না। কোনো দিন পোনা, কোনও দিন গল্‌দা চিংড়ী। কাল রাত্রে কই মাছের পাতুড়ি রেঁধেছিল। চমৎকার হয়েছিল। ও বাড়ীর উষা অনেক রান্না জানে কি না, সেই প্রায় দেখিয়ে টেখিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ওর নিজের তৈরী আচারও দিয়ে যায়। বিছানাটাও প্রায়ই ঝেড়ে দিয়ে যায়। মেয়েটি খুব লক্ষ্মী।

তুমি আমার সম্বন্ধে ভেবে ব্যস্ত হোয়ো না। আরো দিন কতক ওখানে থেকে শরীরটা ভাল করে সারিয়ে এস। ইতি

তোমারই ভ।

পুঃ হ্যাঁ, ভাল কথা। সেদিন উষা আমার একটা ছবি চেয়েছিল, তাই তোমার বড় ট্রাঙ্কটা খুলে খুঁজতে গিয়ে কাপড়ের তলা থেকে তোমার লেখা একটা ছাপা প্রবন্ধের ফাইল দেখলাম, "নরনারীর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।" তুমি এমন সুন্দর লিখতে পার জানতাম না ত। বিশেষতঃ ঐ জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে যেখানে লিখছ, "আজকাল দেখিতে পাই স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলিতে গিয়া অনেক নারী কেবল নারীর অধিকার, নারীর দাবীর কথাই জোর গলায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা নিরন্তর ভুলিয়া যান, আমাদের নিকট পুরুষদেরও দাবী আছে, দাওয়া আছে। নারীর চিত্তকে উদার করিতে হইলে পুরুষের দাবীকেও স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী যেখানে স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশিবার, নিভৃতে কথা কহিবার, এমন কি বাহিরে বেড়াইতে যাইবার অধিকার দাবী করে, তখন ইহাও মানিয়া লওয়া দরকার যে স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীর সহিত অবাধে মেলামেশা করিবার মুক্ত অধিকার স্বামীরও আছে। পরস্পরের প্রতি এইরূপ সহিষ্ণুতা, উদারতা, সাম্যভাব না থাকিলে অচিরেই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মৈত্রী নষ্ট হয়, গৃহে অশান্তি আসে, সংসার ছারখার হয়, সাজানো বাগান শুখাইয়া যায়।"

চমৎকার হয়েছে। এমন convictionএর সঙ্গে লেখা! উষাও তোমার লেখার প্রশংসা করছিল।

তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হোয়ো না। শরীর ভাল ক'রে সারলে তবে এসো। ভ।

৯

দুইদিন পরে।

বেলা দ্বিপ্রহর। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পথে লোক-চলাচল নাই। রাস্তার ওপারে পরীওয়ালা বাড়ীটার ছাদের আলিসার উপরে একটা কাক হাঁ করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছে। তাহারই পাশ ঘেঁষিয়া আর একটা কাক নীচের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে ঘাড় তুলিয়া সঙ্গীর দিকে অপাঙ্গে দেখিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নমুখী হইয়া ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতেছে কখন তাহার সঙ্গী ঠোঁট দিয়া তাহার পিঠ চুল্‌কাইয়া দিবে।

খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া ভবকান্ত অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে পরম আরামে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাস্যরেখা, কাল কৃষ্ণেন্দু বাবু বলিয়াছেন, এই মাসেই তাহার কবিতা পত্রিকাতে ছাপা হইবে। এত শীঘ্র তাহার সাধনার ফল ফলিবে, স্বপ্নেও সে ভাবে নাই। তাহার মন আজ প্রফুল্ল। প্রাত্যহিক ট্যাঁড়শসিদ্ধ ও কুমড়োর ছেঁচকিও তাহার সে প্রসন্নতা হরণ করিতে পারিতেছে না।

মনের আনন্দে গুন্ গুন্ স্বরে সদ্য শ্রুত একটি গজলের সুরে দাদরা তালে ভবকান্ত গান ধরিল—

মেঘের পরে মেঘ জমে——

—বাবু টেলিগ্রাফ।

চোখ মেলিতেই জনকরাম একটি চৌকা হলদে খাম হাতে দিল। খুলিতেই চোখে পড়িল—

STARTING TOMORROW STOP MADRAS MAIL STOP WAIT STATION

AMALA

হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ভবকান্ত বালিসের তলা হইতে একটি সিকি টানিয়া বাহির করিয়া জনকরামের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

যা এক্ষুণি যা বায়স্কোপ দেখে আয়।

ফ্যাল্‌ফ্যাল নেত্রে জনকরাম একবার প্রভুর দিকে ও একবার ঘড়ির দিকে তাকাইল—

সবে দেড়টা বাজিয়াছে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

বিজয়া। সেই দিন। অর্দ্ধস্মৃত অতীতের যেদিন ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। একদা যেদিন স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া রাজারা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিত। শঙ্খ বাজিত, ডঙ্কাধ্বনিতে দিগ্‌বিদিকে সাড়া পড়িয়া যাইত, অসম-সাহস আসিয়া রাজপুরের অসাড় জীবনকে নাড়া দিয়া যাইত, চীনাংশুকের কেতনে কেতনে চেতনা কাঁপিয়া উঠিত হৃদয় ছাপিয়া শিরায় শিরায় শোণিত নাচিয়া ছুটিত, কোষে কোষে অসি থাকিয়া থাকিয়া ঝনৎকার করিত, অস্ত্রে অস্ত্রে তড়িৎ চমকিয়া উঠিত। আকাশে বাতাসে কাহার আহ্বান ধ্বনিত হইত,

তিথি বয়ে যায়, আছ কে কোথায়, পিছে কি পড়িয়া রবে ?
আজি বিজয়ার জয় অভিযানে এস কে যাত্রী হবে !

* * * *

পলকে বিলাসপাশ টুটিয়া যাইত। কাণে কুণ্ডল মাথায় কিরীট, ললাটে রক্তটীকা পরিয়া, চক্ষে দীপ্তি, বক্ষে সাহস, অঙ্গে অস্ত্রলেখা লইয়া, রথী বিপদের পথে বাহির হইত। দুর্জ্জয় অভিলাষ। পথে পথে পৌরজনের জনতা। তুরঙ্গের ক্ষিপ্র গতি। হৃদয়ের গতি—ক্ষিপ্রতর। অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে গগনতল ধূম্র। শৃঙ্গে ডাকিতেছে, 'সমুখে সাহসী!' তুরী বাজিতেছে 'অগ্রে চল্।' তিথি অনুকূল। অজানা রাজ্য জয় করিতে কে পুর ছাড়িয়া দূরে যাইবে ?

* * * *

নিকটতর অতীত। অশ্বপৃষ্ঠে রাণা। সঙ্গে মৃগয়াগামী রাজ-অনুচর। স্কন্ধে তাহাদের ধনুঃশর। নিবিড় অরণ্য মথিত করিয়া ভয়াল ভল্ল হস্তে মৃগের পিছনে মৃত্যুর মত ছুটিয়াছে। শার্দ্দূল নিঃসাড়পদে গোপনে দূরে পলাইয়া যায়, মরুর প্রান্ত ঘুরিয়া

সিংহ বিবরে লুকাইতে চায়। উন্মাদ উল্লাস। জীবনের রশ্মি শ্লথ করিয়া পিছনে না চাহিয়া দূর মৃগয়ায় বিদ্যুদ্‌বেগে কে ছুটিবে ?

*　　*　　*

অকাল দেবার্চ্চনায় মানব-দেবতা রামচন্দ্র পূর্ণ মনস্কাম হইলেন। রক্ষঃ রক্ষামন্ত্র ভুলিল, মায়া শক্তি হরণ করিল। কিসের ছায়া—কৃষ্ণ, করাল ? স্বর্ণলঙ্কা শিহরিয়া উঠিল। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে যুগান্তরে কে আসিল ?— জাগো অযোধ্যা, দুয়ারে ভেরী বাজিতেছে, রঘুনাথ ফিরিয়া আসিল, দেরী করিও না, রাবণ-বিজয়ী বীরকে বরণ করিয়া লও।

*　　*　　*

অতীত—অতীত মাত্র। কিন্তু—

আজ সেই দিন, শত্রু মিত্র মিলি একত্রে সবে
নবজীবনের গরিমা-গর্ব্বে জগতে দাঁড়াতে হবে।
আপনার যারা হয়ে গেছে পর, এই মাহেন্দ্রক্ষণে
বক্ষে সবলে বাঁধিতে হইবে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে।
মর্ম্মহরণ প্রেমের মন্ত্রে - অসীম শক্তিময়,
অজানা জিনিয়া করিতে হইবে হৃদয়-দিগ্বিজয়।
বীরাষ্টমীর ব্রত পালিয়াছি—ভুবনবিজয়ী বীর,
সে ব্রত করিব পূর্ণ প্রভাতে এ পুণ্য দশমীর।
আর দেরী নয়, এসেছে সময়, ধ্বনিছে শঙ্খরবে—
আজি বিজয়ার জয়-অভিযানে এস—কে যাত্রী হবে !

*　　*　　*

হিন্দু মুসলমানের মিলনের ব্যগ্র চেষ্টা চলিতেছে। অন্তর যেখানে উন্মুখ, সেই প্রচেষ্টা মাত্র সাফল্য লাভ করে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আর্ত্তনাদ থামে নাই। ক্ষুদ্রতা কিছু দিন জয়যুক্ত হয়। পরিণামে বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্রত্ব বিলীন হইয়া যায়।

দিনপঞ্জী

১২ই অক্টোবর—বেলফাষ্ট সহরে পুলিশ ও বেকার শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল। পরে শান্তি স্থাপিত হয়।

১৫ই অক্টোবর—ভারতবন্ধু সমিতির সভাপতি কার্লহিথের অনুরোধক্রমে রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। যুক্তি-হীনতার উন্মত্ততায় গভর্ণমেণ্ট স্বীয় মর্য্যাদাকে লোকচক্ষে মসীলিপ্ত করিয়াছেন। অনুসৃত নীতির ফলে ভারতবর্ষ যুদ্ধবিগ্রহের অবস্থায় উপনীত।

১৫ই অক্টোবর—ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধির চেষ্টা পুনরায় বিফল হয়।

১৬ই অক্টোবর—বিভিন্ন মুসলিম দলের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। তদনুসারে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

১৯শে অক্টোবর - ডি ভ্যালেরা এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমরা যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষুকের বেশে উপস্থিত হইতাম, তবে হয়তো কিছু মিলিত। ফ্রী-ষ্টেট সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবকে তিনি শাইলক-মনোবৃত্তি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১ম বর্ষ] ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [১৭শ সংখ্যা

উপন্যাস

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কথার পিঠে কথা। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, ঋজু। কখনো দ্রুত, কখনো বা স্তব্ধতায় তার উচ্চারণ। আগাগোড়া প্রখর নিরাবরণ স্পষ্টতা। আবহাওয়াটি এত জীবন্ত যেন স্পর্শ করা যায়।

হিরণ্ময় নতুন নাটক লিখছে।

এর আগে সে উপন্যাসে হাত মক্স করেছে বহু, কিন্তু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কথার সার সাজিয়েও সে যেন গুছিয়ে ঠিক কথাটি বলতে পারে নি। উপন্যাসে কেবল কথার জনতা, টুকরো টুকরো শব্দ ঢেউয়ের মতো রেখার পর রেখা মেলে অদৃশ্য হতে থাকে;

নাটকের কথা তীরের মতো সোজা, রিভলভারের গুলির মতো নির্ভুল,—যেখানে এসে তা বেঁধে, সেখান থেকে আর তাকে উপড়ে নেওয়া চলে না। উপন্যাসে বহু কথা অবান্তর, নাটকে প্রত্যেকটি কথা অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসে অমিতব্যয়িতা ; নাটকে সংযম, কঠোরতা, কার্পণ্য। ভিড়ের সঙ্গে বাহিনীর তফাৎ। নাটক হচ্ছে সুসম্বদ্ধ অর্গানিজম্,—যন্ত্রের মতো প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, পারস্পরিক বশ্যতা। উপন্যাসে বিস্তার, নাটকে ঘনতা। উপন্যাসে চরিত্র উদ্ঘাটিত হয় বর্ণনায় ; নাটকে হয় কথোপকথনে, প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় ; উপন্যাসে আগে বিশেষণ, পরে বিশেষ্য ; নাটকে বিশেষ্য হচ্ছে আগে তাই তার চরিত্ররা স্পষ্ট, সীমাবদ্ধ এবং কাজেকাজেই প্রাণবন্ত। নাটকে রচয়িতার অনধিকার প্রবেশ নেই, তাঁর আত্মবিবৃতিতে তা আবিল হতে পারে না। উপন্যাসের হচ্ছে জীবন নিয়ে, নাটকের কারবার তার চেয়েও মারাত্মক—জীবিতকে নিয়ে। উপন্যাসের পাঠক তাই জীবনের চেয়ে অনেক দূরে, (যতো দূরে যেতে পারে, পাঠকের কাছে ততোই তা সুন্দর হয়ে ওঠে) ; নাটকের দর্শক জীবিতের একেবারে মুখোমুখি ব'সে, (যতো সামনে আসতে পারে দর্শকের কাছে তা ততোই সত্য হয়ে ওঠে)। নাটক রচনায় গ্রন্থকার নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত,—এঞ্জিনের অংশগুলি ঠিক ঠিক সন্নিবেশিত ক'রে তাদের সক্রিয় ও স্পন্দমান ক'রে তোলবার একটা যান্ত্রিক আনন্দ সে লাভ করে।

নতুন নাটক লেখবার আনন্দে হিরণ্ময় মত্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু বাঙলা-থিয়েটারওয়ালাদের কাছে বই চালানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার—তার তুলনায় নাঙ্গা-পর্ব্বত আরোহণ করা অনেক

সহজ। 'কোটেরি' ও 'ক্লিক্' পেরিয়ে যদি বা কখনো গ্রীন্‌রুমে ঢোকা যায়, ষ্টেজ্ পর্য্যন্ত আর পৌঁছুনো হয় না। বাঙালী দর্শকরা নেপথ্য থেকে এরি মধ্যে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে এ-বই চলবে না। এ নিতান্ত নাটক, নব-রসের একটা জগাখিচুড়ি নয়। কেন-না বাঙালী দর্শক একটি টাকা খরচ ক'রে পৃথিবীর যাবতীয় রস আস্বাদ করতে চায়—সব চেয়ে বীভৎসের প্রতিই তাদের পক্ষপাতিত্ব বেশী। ট্র্যাজেডির সঙ্গে অপেরার মিশেল হ'লে তবে এরা খুসি হয়। নায়িকার নাচ দেখতে না পেলে তারা নাটকের রস পায় না—কথা বলতে বলতে হঠাৎ উইংসের বাইরে হারমোনিয়ামের বাজ্‌নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে না উঠলে নাটক কী! হাততালি তখনই দিতে হবে যখন শুনবে হিন্দু-মুসলমানের একতা, বা দেশভক্তি নিয়ে অভিনেতার মুখে নাট্যকার তুমুল বক্তৃতা ফেঁদেছেন। মেয়েমানুষকে ধরে নিয়ে এসে পরের দৃশ্যে তাকে যদি মা বলে আরাধনা করা যায় তা হলে তো কথাই নেই।

আসলে নাটক কিন্তু এই জনসাধারণের জন্যে—যা সে চায় তাই তাকে পরিবেশন করতে হবে। এখানে নাটক উপন্যাসের চেয়ে সঙ্কীর্ণ, কেন-না উপন্যাসে লেখকের বিশেষ কিছুই দায়িত্ব নেই, এক মাত্র পেনাল-কোডের দুশো-বিরানব্বই ধারাটা এড়াতে পারলেই হ'লো, কিন্তু নাটক চালিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে দিতে হবে। অতএব যে নাটকে প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় টলমল করে ওঠবার সম্ভাবনা, তারই চাহিদা বেশী। এবং প্রেক্ষাগৃহে লোক আনবার কৌশল আয়ত্ত করতে গেলে বাঙলা-ভাষায় যা লিখতে হয় তাকে কোনো সভ্য ভাষায় নাটক বলে না।

উপন্যাস যে পাব্লিক্‌কে চিরকাল পরিহাস করে চলে, নাটক হচ্ছে তাদেরই জিনিস।

কিন্তু জন-সাধারণকে সনাতন কাল থেকে এখনো পর্য্যন্ত আর কতো প্রশ্রয় দেয়া চলবে? নাটক যদি লোকশিক্ষারই একটা অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, তবে তা তাদের রুচি গঠনেও বা সাহায্য করবে না কেন?

হিরণ্ময় লিখলে ট্র্যাজেডি—মাত্র তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত, সহজ ঘরোয়া জীবনের একটি টুকরো, আয়ুষ্কাল দশ বৎসরেরো কম পরিচ্ছন্ন পরিমিত কয়টি দৃশ্য ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্ঘর্ষের শেষে একটি পরিপূর্ণ প্রশান্তি।

থিয়েটারের ম্যানেজার বললেন,—বইটা আমাদের অপছন্দ হয় নি, তবে একটাও গান নেই কেন?

হিরণ্ময় হেসে বললে—সাধারণ জীবনে আমরা কথায় কথায় গান গেয়ে উঠি নাকি? আর গাইলেও আমাদের হয়ে অন্য কেউ আড়ালে ব'সে কখনো হারমোনিয়াম বাজায়?

ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে বললেন,—লোকে যখন তাই নিচ্ছে তখন আপনি একলা আপত্তি করলে চলবে কেন? বেশ তো, হারমোনিয়াম ভেতরে আনা যায় তেমন কয়েকটা দৃশ্য সাজান না। আর তাই যদি বা সম্ভব না হয়, তবে গোটা দুতিন দৃশ্যে একটা গাইয়ে ভিখিরিকে ঢুকিয়ে দিলেই চলে যাবে।

ম্যানেজারের এক পার্শ্বচর টিপ্পনি কাটলেঃ দু'একটা নাচ না থাকলে লোকে encore করবে কাকে?

হিরণ্ময়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ফ্যাকাশে গলায় বললে,—পরিবারের বউরা ঘোম্‌টা ফেলে দিয়ে নাচে কী করে বলুন?

পার্শ্বচর ঠাট্টার সুরে বললে,—কেন, নাচ তো আজকালকার শিক্ষার সংজ্ঞায় একটা আর্ট। মেয়ে দেখতে গিয়ে অনেকে নাচ দেখে পছন্দ করে আসে। তেমনি কয়েকটা ওরিয়েণ্টাল নাচ কোনো কায়দা করে ঢুকিয়ে দিন্ না। সিনারি নেই, আলোর কারসাজি নেই, নাচ নেই, গান নেই—কতোগুলো কথা শোনবার জন্যে পয়সা খরচ করতে লোকের ভারি দায় পড়েছে! কোনো দৃশ্যে সামান্য একটা পিস্তল ছোঁড়বার শব্দ পর্য্যন্ত নেই।

অসহায়, বিবর্ণ দৃষ্টিতে হিরণ্ময় ম্যানেজারের দিকে তাকালো। সত্যিকারের নাটকে আর মেলোড্রামায় কী তফাৎ, নাটকের ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়, এই সব গোড়ার কথা নিয়ে তর্ক করতে হবে জানলে হিরণ্ময় এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তো না, কিন্তু ম্যানেজারের গলার স্বরটা নরমই আছে ঠাহর ক'রে সে কতকটা আশ্বস্ত হ'লো।

ম্যানেজার বললে,—যাক, ওতে বিশেষ কিছু বাধবে না। ঘটনাটা বেশ জমাটি, শেষ পর্য্যন্ত লোকের কৌতূহল থাকবে। কথোপকথনগুলি বেশ স্মার্ট ও জায়গায় জায়গায় বেশ গভীর। আর সত্য কথা বলতে কি, কথোপকথনই হচ্ছে নাটকের আসল ক্রিয়া। তা ছাড়া 'সরযূ' যা হয়েছে—ও একটা Creation। সে-জন্যে আমি আপনাকে প্রশংসাই করছি, হিরণ্ময়বাবু। আমি এ-বই চালাবো, দেখি না দুয়েকখানা আধুনিক ধাঁচের বই নিয়ে কী দাঁড়ায়। কিন্তু,—

চলতে-চলতে হিরণ্ময় যেন হঠাৎ হোঁচট খেলে।

কিন্তু, গান আপনাকে খান চারেক ঢোকাতেই হবে। ডিস্‌পেপটিক দেশে খাঁটি দুধ চলে না, মশাই, জল না মেশালে লোকে হজম করতে পারবে কেন? দৃশ্যে খাপ খাওয়াতে না

পারেন, অন্ততঃ একটা অবান্তর ক্যারেক্টার সৃষ্টি করে নিতে হবে—হয় ভিক্ষুক নয় পাগলিনী। মাঝে-মাঝে ষ্টেজে ঢুকে গান গেয়ে যাবে।

হিরণ্ময় কঠিন গলায় বললে,—সে যে নিদারুণ ট্রেস্‌পাস, মশাই। নাটকের শুচিতা থাকবে না।

ম্যানেজারও নাছোড়বান্দা, পাণ্ডুলিপিটা হিরণ্ময়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—তা হলে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হিরণ্ময় বাবু,—তা হলে এ আমি নিতে পারব না। আমি নতুন লেখক নিয়ে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করে দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি এমনি অন্যায় গোঁ ধরে বসেন তবে আর উপায় কী বলুন। গোটা চার-পাঁচ তো গান—আমাদের রমেন রায় অনায়াসে লিখে দিতে পারবে। এতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তবে স্পষ্ট করে বলে রাখা ভালো শুধু-শুধু এতো বড় risk নিতে আমাদের কারুর মাথা-ব্যথা নেই।

হিরণ্ময়ের মুখ শুকিয়ে গেল। পাণ্ডুলিপিটা সে হাতে করে নিলে বটে, কিন্তু ভঙ্গিটাতে একটুও তেজ নেই—সে যে কিছু অপমান বোধ করছে তাও বিশেষ বোঝা গেল না। উপন্যাস হলে এ-অপমান সে দস্তুরমতো গায়ে মাখত, পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে সে আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াত না। উপন্যাস কেউ না নিলে সময়মতো নিজে ছাপবার স্পর্দ্ধা করা যায়; কিন্তু নাটকের বেলায় সে-স্পর্দ্ধা খাটে না। 'ষ্টেজড' না হওয়া পর্য্যন্ত তার কোনো দাম নেই—তার দাম বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়, রঙ্গমঞ্চে। অতএব নিতান্ত অসহায় মুখভঙ্গি করে হিরণ্ময় গান ঢোকাতে রাজি হ'লো।

কিন্তু রমেন রায়কে দিয়ে নয়, তা হলে সে-গান হবে নিতান্ত নাটুকে, নিতান্ত 'সখীর গান'। হিরণ্ময় নিজেই লিখবে যা-হোক। তাতে ম্যানেজারের আপত্তি নেই। কিন্তু গানগুলি যেন খুব বেশি সারগর্ভ না হয়, সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে। হিরণ্ময় আরেক সমস্যায় পড়ল। অক্ষর গুনে লাইন মেলানোই প্রাণান্তকর, তারপর ভাঙা লাইনকে সুর দিয়ে সম্পূর্ণ করা--ততক্ষণে আর একখানা ফুল-ড্রেস নাটক লেখা হ'ত। গানের জন্য আবার অনুকূল শব্দ চাই- ঠিক শব্দ না পেলে সুর আবার ঠিক খেলে না। সমার্থসূচক এত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরসমষ্টির শব্দ পাওয়াও কঠিন। হিরণ্ময় হাল ছেড়ে দিলে।

রমেন রায়ই অবিশ্যি তারপর গান লিখে সুর যোজনা করলে। সেই গান শুনে হিরণ্ময় তার মার মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়বার চোখের জল ফেললে। কিন্তু মৃত্যুর মতো এই গানও নিষ্ঠুর, অপরিবর্ত্তনীয়—তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খাটে না, তাকে শিরোধার্য্য করা ছাড়া আর উপায় নেই। ঠিক যখন প্রেমিক প্রেমিকা সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে, অমনি পিছন-দিকের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে অভিভাবকের আবির্ভাব হ'ল। পরকীয়া প্রেমের অসীম মাধুর্য্যের মাঝে ওয়ারেণ্ট হাতে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর! সব মাটি। গান ঢুকিয়ে সমস্ত নাটকের সুর গেল টুকরো টুকরো হয়ে।

তবু, এ-ছাড়া আর উপায় কী বলো! ম্যানেজার যে তবু 'ডায়ালোগ' বদলাতে বলেন নি, পাত্রীগুলিকে বিজাতীয় রকম সতী বা অমানুষ করে গড়বার বায়না ধরেন নি, তাতেই হিরণ্ময় যথেষ্ট আপ্যায়িত বোধ করছে। সরযূ ঠিক তেমনিই আছে, ভাগ্যিস্ গানগুলির একটাও তাকে গাইতে হবে না। হিরণ্ময়

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। সরযূর ওপর এই নাটকীয় ধর্ষণ সে সইতে পারত না। ম্যানেজারের সে দিকে সূক্ষ্ম রসবোধ আছে। কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ একটা ধরে বসলে হিরণ্ময় কী করতে পারত? না. সে দিক দিয়ে সে বেঁচে গেছে। কয়েকটা তো মাত্র অবান্তর. অসংলগ্ন গান। একটা গাজনের, একটা অন্ধ ভিক্ষুকের, আর গোটা দুই এক কীর্ত্তনওয়ালীর। নাটকের অন্তর্ভুক্ত হলেও সমালোচনায় এদের অনায়াসে অস্বীকার করা যাবে, যেমন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নাটকে অনেক জিনিস স্থান পায় না।

দেখতে দেখতে সারা সহরময় দেয়ালে দেয়ালে তিন-রঙা পোষ্টার পড়ল ঃ অতি আধুনিক নাট্যকার হিরণ্ময় সেন-এর "সরযূ" —পূজার আগেই মহাসমারোহে অভিনীত হবে। এ বেলার পোষ্টার ও বেলায় ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু "সরযূ"র পোষ্টার এতো প্রকাণ্ড যে সাত দিনেও তাকে নিশ্চিহ্ন করা গেল না। পূর্ণগ্রাস হবার আগেই দেয়ালে দেয়ালে আবার আরেক পশলা পোষ্টারের বৃষ্টি হয়ে গেল—এবারে তার নবতর সজ্জা. অক্ষর তো নয় অগ্নিমুখ বাণবর্ষণ। যে দেখে তারই চোখ দেওয়ালের ওপর থম্‌কে থাকে। বাসে ট্রামে জানলা ঘেঁসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার কারুই জো নেই —বাঙলা দেশে অভিনব কিছু একটা শিগ্‌গির ঘটছে এ সংবাদ তার চোখে এসে পৌঁছুবেই। দৈনিক সাপ্তাহিকগুলি এ খবরে মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো, পাব্‌লিশার মহলে প্রতিযোগিতার সাড়া পড়ে গেল। থিয়েটারের মাথায় ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর সাইন্ উঠল—সরযূ. বিকীর্ণ ধূলিজালের মতো হ্যাণ্ডবিল্ উড়তে লাগল—হিরণ্ময় সেন। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে, অতি-আধুনিকের প্রথম প্রত্যক্ষ অবতারণার

ঔজ্জ্বল্যে স্বর্গে মর্ত্তে আর এতটুকু শান্তি রইল না। প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারগুলি পেছনে পড়ে একেবারে চুপ, মুমূর্ষু। সেখানে কি না আজো চলছে 'ঘটোৎকচ বধ'।

যেদিন রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের প্রথম যবনিকা উঠবে সেই দিন (তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয় নি) বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে রেড্-লেটার ডে, সেইদিন থেকে সত্যিকারের নাটকের জন্ম। খ্যাতি বা অর্থের দিক থেকে নয়, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জীবনের এই নতুন সম্ভাবনা প্রথম সে উদ্ঘাটিত করে দেখতে পারবে ভেবে হিরণ্ময় রাত্রিদিন রোমাঞ্চিত হতে লাগল। এরি মধ্যে সে সহরের 'এলিট্'-মহলে পরিচিত হয়েছে, প্রকাশকেরা তার দরজায় ধন্না দিতে ব্যস্ত। সহরের কোন্ অঞ্চলে যে তার নামটা প্রাচীরপত্রে ঘোষিত হয় নি, সেটা প্রায় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার জিনিস হয়ে উঠেছে। হিরণ্ময় যেখানে যায়, বেহালা থেকে বরানগর, ধাপা থেকে বেতাইতলা—সর্ব্বত্র তাঁর বিজ্ঞাপন! উপন্যাস লিখলে কে তাকে চিনত, মাসিক-পত্রিকার গোড়ার দিকের পৃষ্ঠার এক কোণে তার নামটা মাত্র তখন স্মল-পাইকা য়্যাণ্টিকে শোভা পাচ্ছে। কী সঙ্কীর্ণ স্থান—পাঠকের নিভৃত কোঠায় একান্ত একাকী মুহূর্ত্তে তার নীরব কুণ্ঠিত উপস্থিতি—কল্পনার আকারে তার আবির্ভাব ব'লে কতো অস্পষ্ট, কতো দূরস্থিত; কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোয় বিপুল জনতার সম্মুখে তার উপস্থিতি কতো উজ্জ্বল, কতো প্রত্যক্ষ—জীবনের আকারে আবির্ভাব বলে কতো সে এখানে সম্পূর্ণ, ও সজীব, কতো অন্তরঙ্গ। জীবনের সঙ্গে নাটকের তুলনা না খাটলেও বিধাতার সঙ্গে নাট্যকারের সাদৃশ্য আছে। নাটকীয় চরিত্রগুলি তার হাতের ক্রীড়নক, তাদের প্রস্থান-প্রবেশের টাইম্-

টেব্‌ল সে-ই তৈরী করে। যেখানে তাদের চুপ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা চুপ করেই থাকবে, যতটুকু তাদের বলবার কথা, তার একচুল ব্যতিক্রম করবার উপায় নেই। তাদের কাছে হিরণ্ময় নিয়তির মতো অমোঘ, সৃষ্টির এই নির্দ্দয়তার আনন্দই তাকে অসামান্য গৌরব দিয়েছে। রাত্রে তার ঘুমের কুজ্ঝটিকায় সেই সব চরিত্রেরা পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়ায়, কথা কয়ে ওঠে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে ঘরের হাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। সে শুধু একলা হিরণ্ময়ের কাছে—তারা তারপর একদিন সমস্ত উৎসুক জনতার সামনে রেখায় ও গতিতে মূর্ত্তি গ্রহণ করবে।

একদিন যারা শুধু তার ভাবলোকে বিচরণ করত, তারা মূর্ত্তি গ্রহণ করবে মাত্র কৃত্রিম অক্ষরসন্নিবেশে নয়, তাদের প্রকাশ আর লোকাতীত নয় একান্ত প্রত্যক্ষ ও সীমাবদ্ধ, বাস্তব ও যথার্থ, স্থূল ও শারীর ;—তারা মূর্ত্তি গ্রহণ করবে পরিপূর্ণ জীবনের অনুপাতে। স্পষ্ট রঙ্গমঞ্চের ওপর। একেবারে চোখের সামনে। চরিত্রগুলির এই অসহনীয় প্রাণবত্তাই হচ্ছে হিরণ্ময়ের প্রধান গর্ব্ব।

রিহার্সেল সুরু হয়ে গেছে। ম্যানেজার হিরণ্ময়কে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

থিয়েটারে যাবার জন্যেই দুপুর বেলা হিরণ্ময় সাজগোজ করছিল, হঠাৎ সাইক্ল-পিওন তার নামের একটা টেলিগ্রাম এনে হাজির। একেই বলে নাটকীয় পটপরিবর্ত্তন। তার মার অসুখ অত্যন্ত বেড়েছে—তাকে কাছাকাছি ট্রেনে যতো সম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে। মার অবস্থার কথা শুনে মন বিমর্ষ হয়ে উঠলেও টেলিগ্রামখানার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের নাটকীয়তায় হিরণ্ময় মনে মনে না হেসে পারলে না। এবং সে-রাত্রেই সে ট্রেণ নিলে।

সারা রাস্তা তার দুঃসহ উদ্বেগে কাটল। মার কথা ভেবে নয়, তার নাটকের সরযূর কথা ভেবে। বস্তুত, নাটক অর্থ তো ভঙ্গি-বহুল অনর্গল আবৃত্তি নয়, জীবনের প্রতিরূপতার অর্থময় অভিব্যক্তি। কবিতায় ভাষাতীত সঙ্কেতের মতো নাটকের হচ্ছে স্পষ্ট, জীবন্ত অভিনয়। সত্যের সুন্দর ও সহজ একটি ভাণ। এই ভাণই হচ্ছে শিল্পচাতুর্য্যের মর্ম্মমূল। তার সরযূকে যে ভাণে-ভঙ্গিতে স্পষ্ট মূর্ত্তি দেবার স্পর্দ্ধা করছে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে হিরণ্ময় ক্রমে ক্রমে সন্দিহান হয়ে উঠল। কেমন তার চেহারা, কেমন তার ধ্বনি, কেমন না জানি তার ছন্দ! আর আর চরিত্রের জন্যে ততো সে ভাবে না, কিন্তু সরযূর প্রতি তার অসীম মায়া! কতো করে সে তাকে সৃষ্টি করেছে—অন্তত তার সম্বন্ধে সে বিধাতার মতো স্বেচ্ছাচারী হতে পারে নি। সে তার কল্পনোত্তমা, বিধাতার কাছে যেমন ঈভ্! যার রূপে ও কণ্ঠস্বরে সে প্রকাশিত হবে, উচ্চারিত হবে—মনে মনে তার একটা খসড়া ছবি এঁকে হিরণ্ময় দস্তুরমতো মীইয়ে গেলো। বাঙলা-ষ্টেজের অভিনেত্রীদের গুণপণা জানতে তো তার বাকি নেই। তাদের মধ্যে কে আছে তার সরযূর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে? নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঋজু ও দীর্ঘ আকৃতি এদের আছে কার? দুই বিশাল চক্ষুময় দীপ্তিতে, দুঃখের অবিচলিত কাঠিন্য ও প্রেমের সুগভীর স্তব্ধতা কে ফুটিয়ে তুলতে পারবে? ভাণ, নিদারুণ ভাণই বটে? স্থূলোদরী, পান-দোক্তা খেয়ে খেয়ে দাঁত তেঁতুল বিচির মতো কালো, উচ্চারণে কোথাও এতটুকু কৃষ্টির পরিচয় নেই, ভঙ্গিতে গণিকা-সুলভ অপরিচ্ছন্নতা—এদেরই মাইনে-করা কেউ সরযূর পার্টে নামবে ভাবতে হিরণ্ময় অস্থির হয়ে উঠল। তার সেই সরযূ—জীবনের অভিসারে বেরিয়ে ঘটনাচক্রে

যে একটা আবিল আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ে সেই অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করছে—তারই এই নাটকীয় পরিণাম! কোথায় আর তার সেই তেজ, সেই নিষ্ঠুরতা. সেই সৌন্দর্য্য! নাটক তো শুধু দৃশ্য-পরম্পরার অবিকল বিবৃতি নয়. জীবনের উদ্ঘাটন; তাই অভিনয়ের বেলায় চরিত্রানুগত আকৃতির অভাবটাই হচ্ছে নিদারুণ অশ্লীলতা! কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী বলো? বাঙলা ষ্টেজের অভিনেত্রীরা মাত্র অভিনেত্রী নয়, অভিনয়ের শেষে তাদের অতিরিক্ত অভিনয় করতে হয়। শরীরের প্রতি স্নেহ নাই, জীবনধারণে সামান্যতম মর্য্যাদাবোধ নেই। সারা জীবন তারা অভিনয়ই করে চলেছে। কিন্তু সরযূর বেলায় আর কাউকে পাওয়া যেত—যে অভিনয়ের শেষে আবার অভিনয় করতে বসত না! কথাটা মনে করে হিরণ্ময় ট্রেণের মধ্যেই হেসে উঠল। তবু রিহার্সেলের সময় উপস্থিত থাকতে পারলে অনেক সুবিধে হ'তো বৈ কি। স্বরূপ বা চেহারা বদলাতে না পারলেও দু একটা ভাব-ভঙ্গি বাৎলে দিতে পারত, উপদেশগুলি যাতে প্রতিপালিত হয় তাতে স্বয়ং নাট্যকারের ব্যক্তিত্ব জাহির করতে ছাড়ত না। অন্তত. আর যাই হোক, সরযূর সম্বন্ধে প্রস্তুত হতে পারত অনায়াসে।

অতো সব আবদারে কাজ নেই। নাটকটা যে নিয়েছে এতেই তার গ্রহদেবতাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ভিড়ের মধ্যে বহু কষ্টে ট্রেনে উঠতে পেরে এখন যে সে রীতিমতো গা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নিতে চাইছে।

* * *

মাকে একটু ভালোর দিকে ফিরতে দেখে হিরণ্ময় যেদিন কলকাতা এসে পৌঁছল সেদিন রাত সাড়ে সাতটার সময় তার নাটকের প্রথম রজনী। ম্যানেজার তাকে জরুরি টেলিগ্রাম করেছে। হিরণ্ময় যখন তার ফ্ল্যাট্‌-এ এসে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দুটো।

লোয়ার-সার্কুলার রোডে ফিরিঙ্গি-পাড়ায় একটা বিরাট কোর্টের দোতলার ওপর একখানা ঘর নিয়ে তার ফ্ল্যাট্‌। ঔপন্যাসিক হলে সে মেসে থাকতো, সঙ্কীর্ণ ফোর-সিটেড কোঠায়; কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে ঘরের একটি সম্পূর্ণতা চাই, আভ্যন্তরিক দৃশ্যের একটা নাটকীয় সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। আসবাবে বিছানায় চেয়ারে টেব্‌লে ঘরটি তার এমন কৌশলে সাজানো যে তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই হিরণ্ময়ের মনে হ'ল যেন নাটকের প্রথম দৃশ্যে সে এসে পড়েছে। চাকর যতক্ষণ আলনা-আলমারি সাফ করছে ততক্ষণে হিরণ্ময় স্নান করে নিলে। খাবার আসতে আসতে ষ্টেশন থেকে কেনা কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে সে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চোক বুলিয়ে নিতে পারবে। হাওড়া ষ্টেসন থেকে সুরু করে শেয়ালদার এই প্রান্ত পর্য্যন্ত দেয়ালে-দেয়ালে তার নাটকের নূতন পোষ্টার পড়েছে—সেই দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যটা, যেখানে সরযূ তার ঘুমন্ত স্বামীর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরুবার আগে স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে করুণ চোখে ক্ষমা প্রার্থনা করছে! চমৎকার ছবিটা, চমৎকার তার সেটিঙ্‌। চিত্রকর তার তুলিতে যতদূর গেছে, অভিনেত্রী তার আকারে বা ভঙ্গিতে তার এক ক্রোশের কাছাকাছিও আসতে পারবে না—তা হিরণ্ময় জানে, তবু—হিরণ্ময় ক্ষিপ্রহাতে সাপ্তাহিক—দৈনিকগুলি ঘাঁটতে বসল

দৈনিকগুলিতে পৃষ্ঠাজোড়া বিজ্ঞাপন—রোমহর্ষক বিশেষণের ছড়াছড়ি দেখে অতিস্তুতিতে হিরণ্ময়েরই নিজের লজ্জা করতে লাগল। সাপ্তাহিকগুলি এরি মধ্যে, না-দেখেই বইয়ের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—এ-নাটক নাকি রচনা ও অভিনয় দুদিক থেকেই হবে একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়! এ-উক্তিতে হিরণ্ময়ের সায় আছে, অন্তত রচনার দিক থেকে যে এ একটা 'ট্রায়াম্‌ফ্'—অভিনয় না দেখে তা বলবার অধিকার অন্য কাউকে দিতে তার আপত্তি নেই।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সহরের সমস্ত মোটার আজ উত্তরমুখো; হষ্টেল-মেস আজ ট্র্যামে-বাসে উঠে এল। এমন সন্ধ্যায় হিরণ্ময় কি না একেবারে একা। ফ্ল্যাটে থাকবার এই দোষ, সৃষ্টিকর্ত্তার দূরত্ব রাখবার এই অসুবিধা - তার জয়ে তার সঙ্গে কেউ গর্ব্ব করবার নেই। কলকাতায় এমন তার কোনো আত্মীয়দল নেই যাদের সে একটা বক্স দেয়, এমন কোনো বন্ধু নেই যাদের পাশ দিয়ে তাদের স্বাধীন সমালোচনার মুখ বন্ধ করে রাখে। সবায়ের সঙ্গে সে-ও আজ একজন নিরীহ দর্শক মাত্র। নিতান্ত সাদাসিধে পোষাক পরে সে-ও উত্তরমুখো চলেছে।

বক্স-অফিসে অসম্ভব ভিড়—পাঁচ টাকার কয়েকখানা টিকিট ছাড়া সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। কালকের ম্যাটিনিতে তিন টাকার কয়েকখানা এখনো আছে বটে। অসন্তুষ্ট হলেও দর্শকরা কেউ নিরাশ হবার পাত্র নয়—তাই, পাঁচ টাকারই দিন মশাই। গিস্ গিস্ করছে লোক, গিস্ গিস্ করছে গাড়ি। হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, হুলস্থুল। সোডা-লেমনেড, চা-চপ, প্রোগ্রাম। হিরণ্ময় একটা প্রোগ্রাম কিনলে। সাড়ি-ব্লাউজ, নাগরা-স্যাণ্ডেল, বেণী-ঘোমটা, গয়না-গাটি, কোলে আবার কাদের শিশু-সন্তান। সবায়ের দৃষ্টি এখানে ওখানে

ছিটিয়ে পড়ছে—হিরণ্ময় বারে বারে চমকে উঠতে লাগল কেউ তাকে চিনে ফেললে কি না। যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসছে; কারু লাল, কারু বা টিকিট হলদে, কেউ করছে টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে ঝগড়া। সবায়ের দেখাদেখি হিরণ্ময়ও হলের সমুখ-দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো—যেখানে সব চেয়ে নীচু ক্লাসের প্রবেশ পথ। চেকার টিকিট চাইলে। সে-কথাটা হিরণ্ময়ের খেয়াল ছিল না।

না, আর পাঁচ জনের সঙ্গে নিজের সে কোনো তফাৎ রাখবে না। সবায়ের মতো সে-ও একজন সাধারণ দর্শক মাত্র। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি টিকিট ঘরে গিয়ে একখানি পাঁচ টাকার টিকিট কিনলে; সিট্‌টা পড়ল একেবারে কোণের দিকে। প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য, সামনের দুটো লাইনে গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সমালোচকের ভিড়, দোতলায় মহিলাদের বিচিত্র প্রদর্শনী। সবায়ের থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখে হিরণ্ময় কেবল যবনিকোত্তলনের প্রথম মুহূর্ত্তটির অপেক্ষা করতে লাগল।

যেখানে সে বসেছে সহজে সেখানটায় কারু নজর পড়ে না। কিন্তু নিরীহ ও অপক্ষপাত দর্শক হয়ে চুপ করে কৌতূহলী হয়ে বসে থাকাও তার পক্ষে কষ্টকর—পর্দ্দা আর উঠছে না। কোথায় যেন কী গোলমাল হচ্ছে, অভিনেতাদের কেউ হয়তো সন্ধ্যাকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সরযুর পার্ট হয়তো তৈরি হয় নি। হিরণ্ময় ঘামতে সুরু করলে। সরযু! কার হাতে প’ড়ে না-জানি আজ তার অপমৃত্যু ঘটে! এবং অপক্ষপাত নিরীহ দর্শকের মতো নির্ব্বিচারে তাই তাকে মেনে নিতে হবে।

না, এতোক্ষণে ঘণ্টা দিয়েছে। হিরণ্ময়ের হৃৎপিণ্ডও সেই সঙ্গে ঘণ্টার মতোই বেজে উঠল। স্ক্রীন্ উঠে গেলো। ঘরময় সাগ্রহ নিস্তব্ধতা।

চাপা, ফিকে-সবুজ আলোয় ধূসর গোধূলি সূচিত হচ্ছে,—বইয়ে প্রথম দৃশ্যের মঞ্চসজ্জার যে নির্দ্দেশ ছিল তার একচুল অদলবদল হয় নি—দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটি থেকে সুরু করে মেঝের একধারে কুঁজোর মাথায় উপুড়-করা এনামেলের গ্লাসটি পর্য্যন্ত হুবহু। পাশে রান্নাঘরের উনুনে সবে যে আগুন দেওয়া হয়েছে তার স্পষ্ট আভাস। তেলওয়ালা কেরোসিন তেল দিয়ে মাথায় টিন চাপিয়ে উঠানের ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা তিন-নম্বর ফুটবল নিয়ে দুটি ছেলে—গায়ে ফতুয়া ও পরণে হাফপ্যাণ্ট—গোলমাল করতে করতে ঘরের মধ্য দিয়া চলে গেল। রান্নাঘরে দুটি টুং-টাং বাসন-কোসনের শব্দ। একেবারে অবিকল। একখানা একতলা বাড়িতে একটি দরিদ্র কেরানি-জীবনের এক টুকরো নিঃশব্দ ছবি।

এইবার আফিস্ থেকে সুরেশ ঘরে ঢুকবে—ঐ পাশের দরজা দিয়ে। সব হিরণ্ময়ের মুখস্ত। হ্যাঁ, ঠিক ঐ পাশের দরজা দিয়েই সুরেশ এল। দরজাটা খুলতেই রাস্তার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল—চীনেবাদামওয়ালা রোয়াকের ওপর ডালা নামিয়ে ডালমুট বেচ্‌ছে। সুরেশ গায়ের জামাটা খুলে ফেলে চেয়ারে বসল জুতোর ফিতে খুলতে। এইবার সরযূ আসবে। ওদিকের দরজা দিয়ে, একটু চঞ্চল পায়ে—স্বামীকে একটি নীরব প্রসন্ন হাসি উপহার দিয়ে ধীরে পায়ের তলায় বসে জুতোয় হাত দেবে। নিতান্তই মামুলি, সহজ, পরিচিত একটি দৃশ্য। হিরণ্ময় তার সর্ব্বাঙ্গ চক্ষুষ্মান ক'রে সরযূর প্রথম প্রবেশ-পথের দিকে চেয়ে রইল।

এই সরযূ! হিরণ্ময় যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনি। চমৎকার, অপরূপ! সংসারচারিণী গৃহলক্ষ্মীর ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন বেশবাস, পরিচর্য্যা-পরায়ণ কমনীয় হাতে দুইগাছি মাত্র শাঁখার চুড়ি, পায়ের পাতায় আল্‌তার দাগটি কবে থেকে ফিকে হ'য়ে এসেছে, একরাশ অযত্নপুঞ্জিত চুলের ওপর শিথিলএকটি ঘোমটা। মূর্ত্তিমতী দারিদ্র্য-শ্রী। লংক্লথের সেমিজের ওপর দেশী মিলের কস্তাপাড় একখানি আটপৌরে সাড়ি। কিন্তু দাঁড়াবার ভঙ্গিতে তার আত্মবোধের প্রচ্ছন্ন একটি তেজ হিরণ্ময় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, কৃশতায় রুচির, দুইটি দীপ্তিপরিপূর্ণ অগাধ চক্ষু সুরেশের থেকে স্বতন্ত্র। যা হিরণ্ময় চেয়েছে। ঠিক তার ট্র্যাজেডির নায়িকা। এমন মেয়ে রঙ্গমঞ্চে এলো কী করে?

তারপর সুরু হ'লো কথা। কথার পিঠে কথা। ঋজু উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ। সব হিরণ্ময়ের মুখস্থ। চেহারায় যদিও বা মেয়েটি অভিনেত্রী ছিল, কথায় সে অবিকল সরযূ, তার মানস-উর্ব্বশী। এই সব কথা সত্যিই যে সরযূর মুখ দিয়ে বলিয়েছিল কি না হিরণ্ময়ের এখন ক্রমে-ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। সেই কথার এত অর্থ ও সঙ্কেত ছিল বলে তার নিজেরই কোনো ধারণা ছিল না। কথাই চরিত্রকে সীমা দেয়, স্বকায়তা দেয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তি করে তোলে। মেয়েটি 'সরযূ'ব অভিনেত্রী নয়, মেয়েটি 'সরযূ'র ব্যক্তি। কেমন ধীরে ধীরে সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হচ্ছে। এ যে পরের অঙ্কে স্বামীর গৃহ ত্যাগ ক'রে সতীত্বের চেয়ে মহত্তর মনুষ্যত্বের সন্ধানে বহির্গত হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। এবং এ-মেয়ে বাঙালী মেয়ের মুখরক্ষা করতে কখনো আর স্বামীর ঘরে ফিরে আসছে না।

হিরণ্ময়ের সমস্ত চেতনায় যেন আগুন ধ'রে গেল। সরযূর এমন অভিব্যক্তি সে তার কল্পনার উত্তুঙ্গতম চূড়ায় উঠে কেবল আশা করতে পারত বইয়ের নিঃশব্দ পৃষ্ঠা থেকে, কল্পনার উত্তুঙ্গতম চূড়া থেকে তার সরযূ বাঙলা-রঙ্গমঞ্চের আবিল আবহাওয়ায় কী ক'রে নেমে এল? সেই পরিমিত ভঙ্গি, সেই কঠিন মর্য্যাদাবোধ, সেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ব্যবহার! সব চেয়ে প্রকাণ্ড বিস্ময়, বয়সেও সে সরযূর সমান, আকারে-ইঙ্গিতে কথায়-বার্ত্তায় সেই আভিজাত্য—অনুকরণে কোথায় এতোটুকু বিকৃতি নেই। সরযূর মতো তারো যৌবন ভোগ করতে চায় না, জয় করতে চায়—সর্ব্বাঙ্গে তার সেই অদম্য নিষ্ঠুরতা; হিরণ্ময় তন্ময় হয়ে গেলো। সে আর একজন সাধারণ দর্শক নয়, সে আর-সবায়ের মতো অভিনেত্রীকে দেখছে না, সে দেখছে তার সরযূকে।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, হাততালি দিয়ে একটি কথাকেও কেউ হারাতে চায় না।

প্রথম অঙ্কের কার্টেন পড়তেই ম্যানেজার প্রেক্ষাগৃহে নেমে এলেন জনতার ওপর নাটকের প্রভাব নির্ণয় করতে। হিরণ্ময় আর আত্মগোপন করতে পারলে না, তাঁর সামনে এসেই উদয় হ'লো।

—এ কী? আপনি এসেছেন কখন? বা রে, চুপটি ক'রে ওখানে একা বসে' আছেন? সে কী, টিকিট কেটে?

হিরণ্ময় হেসে বললে,—দর্শক হ'য়েই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সরযূকে দেখতে পেয়ে আর ভুলে থাকতে পারলাম না যে আমিই হচ্ছি ওর স্থষ্টিকর্ত্তা।

ম্যানেজার তার হাত ধ'রে টানতে-টানতে বললেন,—ছি, ছি, সে কী কাণ্ড! আস্থন, ভেতরে আস্থন আমার সঙ্গে। আমার

সঙ্গে একবার দেখা করতে হয়! আপনার জন্যে বক্স রেডি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন তো? সঙ্গে আর কেউ আছে?

—না। ম্যানেজারের সঙ্গে হলটা পেরিয়ে যেতে যেতে হিরণ্ময় বললে,—বইটা কেমন চলবে বলে মনে হচ্ছে?

তৃপ্ত কণ্ঠে ম্যানেজার বললেন,—ভালোই। বিজ্ঞাপনে কম খরচ করিনি মশাই। তারপর সরযুর পার্ট যা হচ্ছে, সুপার্ব। এখন কি? দেখবেন আরো পরে—লাষ্ট সিন্‌টার মতো তেমন দৃশ্য বাঙলা-নাটকে এ-পর্য্যন্ত কখনো প্লে হয় নি। দেখবেন!

ঢোঁক গিলে হিরণ্ময় বললে,—এই সরযুটি কে? কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে নয় তো?

ম্যানেজার হেসে উঠলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন,—পাগল! আমাদের বন্ধু এটর্ণি ননীমাধববাবুর রক্ষিতা। তা অভিনয় করে বটে। বিশেষ ক'রে এই 'রোলে' যা মানিয়েছে! চলুন, পারুলের সঙ্গেই আগে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই। আরো অনেকেই নাট্যকারকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত বটে, কিন্তু পারুলও কম ব্যস্ত নয়। ব'লে ম্যানেজার তাকে ঘুর-পথে ষ্টেজের মধ্যে নিয়ে এলেন।

পারুলের জন্যে আলাদা সাজঘর,—অন্য অভিনেত্রীদের সে সমগোত্রীয় নয়। ম্যানেজার হিরণ্ময়কে নিয়ে দরজার কাছে আসতেই প্রথমে দেখা হয়ে গেল ননীমাধববাবুর সঙ্গে—একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে সিগারেট টান্‌ছেন। তার সঙ্গে আলাপ সাঙ্গ করে, পাস্‌পোর্ট নিয়ে হিরণ্ময়কে ভেতরে ঢুকতে হ'লো। পারুল ততক্ষণে তার দ্বিতীয় অঙ্কের সাজগোজ শেষ করেছে। এই বার সে প্রথমে তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরছে—তাই

এখন তার পরিচ্ছদের একটু ঘটা। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে শেষবার সে মুখে পাউডার ঘসছিল।

ম্যানেজার ডাকলেন,—পারুল, তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই হচ্ছেন আমাদের নবীন নাট্যকার—হিরণ্ময় রায়।

পারুল ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন কেমন লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো। একটা চেয়ার টেনে দিয়ে অল্প একটু হেসে শুধু বললে,—বসুন।

ঠিক সরযূ! এতো সামনে এসেও হিরণ্ময়ের মোহভঙ্গ হ'লো না। সেই জ্যোতি যেন এরো উপস্থিতিতে সমান বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—আপনাকে এক বাটি চা এনে দিই, কী বলুন? বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ম্যানেজার দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পারুল বললে,—কেমন দেখছেন?

হিরণ্ময় মুগ্ধের মতো বললে,—নাটক কেমন জানি না, কিন্তু অভিনয় চমৎকার হচ্ছে। এত চমৎকার যে, সরযূর থেকে আপনাকে আলাদা করতে পারছি না।

বিবাহের কুমারীর মতো পারুল হঠাৎ ব্রীড়ায় আরক্তিম হয়ে উঠল। কুণ্ঠিত গলায় বললে,—কিন্তু নাটকীয় বস্তু না থাকলে অভিনয় করব কী! যাই বলুন, কোনো পার্টে আমি এর আগে এত 'য়্যাট হোম' 'ফিল' করিনি। আপনাকে সে জন্যে ধন্যবাদ।

হিরণ্ময় তার সস্মিত ও সুকুমার মুখখানির দিকে চেয়ে বললে,—আমার নায়িকা যে এমন শরীরী অভিব্যক্তি লাভ করবে তাও আমার ধারণার অতীত ছিল। ধন্যবাদ আপনাকেই আমার দেওয়া উচিত।

—না, আপনি জানেন না। পারুল স্নিগ্ধ স্বরে বললে,—আমি প্রায় দশ-এগারো বছর ধরে নায়িকার পার্টে নামছি, কিন্তু এর আগে অভিনীত চরিত্রের প্রভাব আমাকে এমন করে কখনো অভিভূত করে নি। দেখুন না, দ্বিতীয় অঙ্কে সরযূ কেমন দাঁড়ায়। আপনিও তা কোনোদিন ভাবতে পারেন নি, হিরণ্ময়বাবু। বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে পড়ে অল্প একটু হাসলে, যেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার সামনে এতোটা অহঙ্কার তার শোভা পায় না।

হিরণ্ময় দেখতে পেলে তার কথায় সেই দীপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ, মুখভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য—যে-লাবণ্য চামড়ার নয়, চরিত্রের। দীর্ঘচ্ছন্দ কৃশ দেহ তার আবেগের উজ্জ্বলতায় মৃদু-মৃদু কাঁপছে—দুই চোখ-ভরা তার সেই তীব্র সন্ধিৎসা। পারুল নয়, এটর্নি ননীমাধববাবুর রক্ষিতা নয়, এ তার কল্পনাচারিনী সরযূ, তার ট্র্যাজেডির নায়িকা।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘণ্টা পড়ল। হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে উঠে যাচ্ছিল, পারুল অপরূপ করে হেসে বললে, আমার 'এনট্র্যান্স' তো আরো পরে। আরো একটু বসুন। আপনার চা আসছে।

আমতা-আমতা করে হিরণ্ময় বললে,—সরযূর ওপর পক্ষপাত আমার বেশি বটে, কিন্তু নাটকের আর-সবায়ের সংস্পর্শে না এলে সে ফুটবে কী করে?

পারুল বললে,—রিহার্সেলে এসেই তো ওদের দেখে নিতে পারতেন।

হিরণ্ময় যাবার ভঙ্গি করে, হেসে বললে,—সেই সঙ্গে তো আপনাকেও দেখা হয়ে যেতো।

আবদারের সুরে পারুল বললে,—কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের পর আরেকটিবার আসবেন যেন। কেমন হয়, এ-কথা আপনি ছাড়া আর কারু মুখে শুনে আমি বিশ্বাস করবো না।

—নিশ্চয়। বলে হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ওখানে সরযু আছে বটে কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতাটি নিষ্প্রভ।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর পারুলের ঘরে গিয়ে হিরণ্ময় দেখতে পেলে পারুল একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছে, মুখে-চোখে অসম্ভব শ্রান্তি ও উত্তেজনা, ননীমাধববাবু ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা তার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত ব্যস্ত। স্বামীর পাশে শুতে যাবার সময় আরেকবার সরযূর সাড়ি বদলাতে হয়েছিলো, এইবারের সাড়িখানির ভারি মিঠে রং, বিদ্রোহের বদলে তাতে বরং ব্যর্থতার আভাস। হিরণ্ময়ের মনে হচ্ছিল তার সরযূর অব্যবহিত অন্তর্দ্ধানের পর এমনি অসহনীয় শ্রান্তিই হয়তো তাকে আচ্ছন্ন করে ধরেছিল—সে-কথা নাটকের কোনো জায়গায় লেখা হয় নি। এখন সরযূর জন্যে, বিশেষ করে তার এই শরীরিনী প্রতিমার জন্যে মমতার সে আর পার খুঁজে পাচ্ছে না।

তাকে দেখে সরযু চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে,—আসুন। কেমন দেখলেন এবার ?

হিরণ্ময় তার কী উত্তর দেবে ? শুধু বললে,—ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

নীলমাধববাবু মুরব্বিমানা করে বললে,—যা মশায় শক্ত পার্ট লিখেছেন। তায় আবার ওর হার্টটা দুর্ব্বল। আর এমন সিরিয়াস্‌লিই পার্টটা করছে। এবারের ইনটারভেলটা যেন বেশিক্ষণ দেওয়া হয়—ও আগে সুস্থ হোক।

পারুল উঠে বসল। বললে,—আপনাকে আমি আরো একবার ধন্যবাদ দিচ্ছি, হিরণ্ময়বাবু। এ পার্ট শুধু শক্ত নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর। খানিকক্ষণ এ-পার্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গেলে ভেতর থেকে কখন অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন হতে থাকে। সেই উগ্র নেশার ঝাঁজে আমার স্নায়ু-শিরা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। পরে ননীমাধববাবুর দিকে চেয়ে হেসে সে বললে,—ক্লাইম্যাক্সে উঠব আমি তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সরযূর সেই মহান পতনই আমার ঐশ্বর্য্য—মরব, তবু স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাইব না। না, আমি রেডি—ইন্‌টারভেল বেশিক্ষণ দেবার দরকার নেই।

সুরু হলো তৃতীয় অঙ্ক। সমস্ত জনতা ঝড়ের আগেকার সমুদ্রের মতো স্থির।..

যবনিকা পড়তেই ভিড় ঠেলে, কৌতুহলী দর্শক-সমালোচকের সপ্রশংস দৃষ্টি এড়িয়ে (ম্যানেজারের বিজ্ঞাপনের কায়দায় ততক্ষণে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে) হিরণ্ময় পারুলের ঘরের দিকে রওনা হলো। ঘর শূন্য। থিয়েটার শেষ হতেই ননীমাধববাবু তাঁর মোটারে করে পারুলকে বাড়ি নিয়ে গেছেন। অভিনয়ের অতিরিক্ত কোনো কাজ তার আর এখানে থাকতে পারে না।

* * *

তারপর যতদিনই তার বই বোর্ডে দিয়েছে ততদিনই হিরণ্ময় হাজির—এবার থেকে আর দর্শকের পার্টে নয়, স্বয়ং নাট্যকারের বেশে। তাই তার স্থান আর সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে নয়, পারুলের নিভৃত কোঠায়। অভিনয়ের শেষে ও আগে দুজনে তারা গল্প করে—ননীমাধববাবুর প্রভাব রঙ্গমঞ্চে খানিকটা শিথিল। এখানে পারুলের স্বাধীনতা বা প্রভুত্বের ওপর তাঁর তত হাত নেই। তাই তাঁকেও বিরক্তি চেপে রেখে হিরণ্ময়ের সঙ্গে সসৌজন্যে আলাপ করতে হয়।

হিরণ্ময় বলে: আপনাকে না পেলে আমার সরযূ ম্রিয়মাণ, কুণ্ঠিত হয়ে থাকত।

পারুল বলে: আর আপনাকে না পেলে আমার প্রতিভাও থাকত নিষ্প্রভ। এতদিন বাদে এই চরিত্রটির সঙ্গে নিজের কৃত্রিম একটা সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে আমি আমার মনে জীবনের গভীর একটি স্বাদ পাচ্ছি।

কথা শুনে হিরণ্ময় মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে হয় 'ষ্টেজ' থেকে ক্ষণকালের জন্যে বাইরে চলে এসেও পারুল সরযূর খোলস খুলে ফেলতে পারে নি। সর্ব্বাঙ্গে তার সেই আভা এখনো ছড়িয়ে আছে। অস্তমিত চন্দ্রের লাবণ্যে আকাশের স্বচ্ছতার মতো পারুলেরো জীবনে এখনো মৃত সরযূর সুন্দর পাণ্ডুরতা এসেছে। তার কথাগুলি যেন ননীমাধববাবুর রক্ষিতার কথা নয়, সেই মৃত্যু-অনুরাগিণী মহীয়সী সরযূর কথা। অন্তত তেমনি করে কথা বলতেই তাকে সে শিখিয়ে দিয়েছে—সে, হিরণ্ময়, সরযূ যার মানস-প্রতিমা!

হিরণ্ময় একদৃষ্টে তার সুকুমার, প্রতিভামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বয়সের একটি রেখাও তার চোখে পড়ে না। সর্ব্বাঙ্গে কোথাও তার এতটুকু কলুষ নেই, জ্বালা নেই। দুইটি চোখে গভীর আত্মদর্শনপিপাসা। অন্তত এমনি করেই সে তার সরযূকে দেখতে চেয়েছিল।

ডান হাতে একটা হতাশ-সূচক ভঙ্গি করে পারুল বললে— কিন্তু কতদিন এই অলৌকিক জীবন যাপন করবার সৌভাগ্য হয় সে সম্বন্ধে এখনিই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে হিরণ্ময় জিগ্‌গেস করলে ঃ কেন ?

—দেখছেন না এরি মধ্যে দর্শকের সংখ্যা দিন-কে-দিন কেমন পড়ে যাচ্ছে ? এ জিনিস কি সহজে কেউ নিতে চায় হিরণ্ময়বাবু ? আপনি যে সমাজের ভিৎ নড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ! তুচ্ছ কতগুলি মানুষের জনতায় যে নির্জ্জীব সমাজ, তার তুলনায় একটি জীবন্ত পূর্ণাঙ্গ মানুষ যে কত বড় এ কথা বুঝতে গেলেই যে বিপদ ! ম্যানেজার মশাই তো এরি মধ্যে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার জোগাড়।

এ ঠিক তার সেই সরযূর কথা ! পারুল সরযূকে এখনো অতিক্রম করতে পারছে না।

ঢোঁক গিলে পারুল আবার বলে ঃ কেবল রঙ্গমঞ্চে আমারই আপনি নূতন জন্মদান করলেন, হিরণ্ময়বাবু। সেজন্য আপনার কাছে আমি বাকি জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

হঠাৎ আবার তখনি থিয়েটারের ঘণ্টা বেজে ওঠে। পারুল ব্যস্ত হয়ে বলে ঃ এখানে বসে আপনার সঙ্গে আজো পর্য্যন্ত ভালো করে আলাপ করতে পারলুম না। একদিন আমার বাড়ি যাবেন

না। মঙ্গলবার বেস্পতিবার আমার একেবারে ফাঁকা। যাবেন, কেমন? কতোদিন থেকে বলছি। ঠিকানা তো আপনি জানেন।

আমতা আমতা করে হিরণ্ময় বলেঃ বাড়ী গিয়ে কী হবে?

পারুল হেসে বলেঃ বা, আপনাকে আমি নেমন্তন্ন করছি, যাবেন—এতো বড়ো প্রতিভাবান নাট্যকারের থেকে কত কি আমাদের শেখবার আছে। বলে তাড়াতাড়ি সে উইংস্‌এর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে আবার সে সরযূ হয়ে ওঠে।

থিয়েটারের শেষে আবার একটু তার সঙ্গে দেখা হয়। সে তখন ননীমাধববাবুর সঙ্গে মোটারে উঠছে। হিরন্ময়কে সামান্য একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে পারুল বললে সত্যি একদিন যাবেন। আসচে মঙ্গলবার। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। ব'লে আলগোছে হিরণ্ময়ের হাতের কটি আঙ্গুল ধরে পারুল করুণ মিনতিতে তার দিকে একটুখানি তাকালো। এখনো সে হয়তো সরযূ আছে।

তারপর মোটার দিলে ছেড়ে। পেছনের সিটে তার পাশে নীলমাধববাবু। হাতে তার একটা পানের ডিবে, গায়ে সিল্কের একটা চাদর, গয়নাগুলি সে ফের পরে নিয়েছে। একটি রেখায় সে আর সরযূ নয়।

কতদিন থেকেই পারুল হিরণ্ময়কে তার বাড়ি যেতে বলেছে। কিন্তু কেনই বা যে যাবে হিরণ্ময় ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। সেখানকার আবহাওয়ার অন্য রকম রং, অন্যরকম সেখানকার পারিপার্শ্বিকতা! সেখানে আর সরযূ কোথায়? সেখানে শুধু পারুলের একাধিপত্য—যে পারুল বয়সে জীর্ণ, বাস্তবতায় অপরিচ্ছন্ন ও স্থূল, আপন সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ববোধে একান্ত

বন্দিনী। সেখানে গিয়ে হিরণ্ময় কী দেখবে, কাকে দেখবে? সে প্রতিমা চায়, পুতুল চায় না। সে আর্টিষ্ট, তার কাছে জীবনের চেয়ে রঙ্গমঞ্চের রহস্য বেশি। সত্যের চেয়ে অপরূপতর এই ভাণ—এই অঙ্গসজ্জা, যে সজ্জায় পারুল তার বয়সের রেখা ও দিন যাপনের গ্লানিকে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছে; যে সজ্জায়, সে মধুর একটি কৃত্রিমতার আবরণে সে সরযূর অলৌকিক মহিমা অর্জ্জন করলে। হোক তা কৃত্রিম, কৃত্রিম না হলে সাহিত্য সুন্দর হয় কী করে? সাহিত্যের কাজ জীবনের মাত্র অনুকরণে, উদ্ঘাটনে নয়। অতএব সরযূকে বাস্তব জীবনের আয়তনে সে দেখতে চায় না। রঙ্গমঞ্চের পারুলই হচ্ছে সরযূ, পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়িয়ে সে হিরণ্ময়ের সম্বর্দ্ধনা নিক্!

*　　　*　　　*

যে বাঙালী মেয়ে এক রাত্রে স্বামীর গৃহত্যাগ করে চলে যায়, এবং শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যেও যে অনুশোচনায় গলে গিয়ে স্বামীর পায়ের তলায় এসে আছড়ে পড়ে না—এত যার নিষ্ঠুর বিদ্রোহ, তাকে নিয়ে নাটক জমবে—বাঙালী দর্শকদের নীতিজ্ঞান এখনো এতোটা অবনত হয় নি। পয়সা দিয়ে এই অন্যায় সমাজদ্রোহিতাকে কে সমর্থন করবে? অতএব গেল "সরযূ" বন্ধ হয়ে। লোকে যা নেবে না, উপন্যাস হলে তা বরং জোর করে চালানো যায়, কিন্তু নাটক চালানো যায় না।

অতএব "সরযূর" বদলে সেখানে রমেন রায়ের একখানি অপেরা খোলা হলো।

হিরণ্ময় দেখতে গিয়েছিল অবিশ্যি। তাকে আজকাল কেউ দরজায় বাধা দেয় না, সর্ব্বত্র তার অব্যাহত অধিকার।

অপেরাটির নাম "মন-কাড়াকাড়ি"—সবশুদ্ধ তার বত্রিশখানা গান। অগ্নি-নৃত্য, সর্প-নৃত্য, বাত্যা-নৃত্য, ধ্বংস-নৃত্য—মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে নৃত্য। অসিযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ। মেয়ে চুরি, জলে ঝাঁপ, পাহাড় থেকে পতন!

প্রথম দৃশ্যেই জমকালো একটা নাচ। ষ্টেজভর্ত্তি সখীর বন্যা উড়ন্ত তাদের বেণী, ঘুরন্ত তাদের ঘাগরা। রামধনুর টুক্‌রো।

নাচ সুরু হ'লো। হিরণ্ময় ঘাড় উঁচিয়ে দেখলে। দেখলে নৃত্যশীলাদের অধিনায়িকা হচ্ছে পারুল। সমস্ত শরীর লীলায়িত ক'রে সেও নাচছে লাফাচ্ছে, ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। মুখময় পেণ্ট, গা-ময় ঝলমলে উড়ুনি, ফিন্‌ফিনে ফিতে। শরীর দুর্ব্বল, রেখায় কদর্য্য লোলুপতা, চোখের চাউনিতে তরল স্ফূর্ত্তি! এই সেই সরযু! দৃঢ় ব্যক্তিত্বময় আবির্ভাব, দুর্দ্দমনীয় তেজ, কঠিন মর্য্যাদাবোধ—এই তার পরিণতি! হিরণ্ময় উঠে পড়ল।

গ্রীন্‌-রুমের ধারে পারুলের সঙ্গে তার একবার দেখা হয়ে গেল। পারুল খুসি হয়ে বললে,—এসেছেন? আমার ঘরে গিয়ে বসুন। মাইরি, চলে' যাবেন না যেন।

হাতে তার একটা গ্লাস। হিরণ্ময় বিরক্ত হয়ে ওটার প্রতি ইসারা ক'রে বললে,—ও কী?

পারুল খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল: ভারি তেষ্টা পায় গান গেয়ে। গলাটাকে একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি, শরীরটাও সঙ্গে-সঙ্গে চাঙ্গা হ'য়ে উঠছে। বসুন অনেক কথা আছে। এই সিনটায় আবার একটা একলা নাচ আছে। গ্লাসটা ধরুন না ততক্ষণ।

হিরণ্ময় সরে দাঁড়ালো। বাকিটা এক ঢোকে শেষ ক'রে শূন্য গ্লাসটা এক সখীর কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পারুল নাচতে

গেল। দ্রুত, সশব্দ করতালি ও হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়ল। আবার, আবার, আরো চাই। আরো।

হিরণ্ময় বুঝলে একেই বলে গুণগ্রহণ। প্রেক্ষাগৃহের বিশাল জনমণ্ডলী যখন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, তখন বুঝতে হবে তারা নিদারুণ বিরক্ত হচ্ছে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এখানে পদার্পণ করবে না বলেই তাদের নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা। একমুহূর্ত্তও তাদের চুপ করে থাকতে দেওয়া হবে না।

হিরণ্ময় ধীরে-ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

জনসাধারণের জন্যেই থিয়েটার, এবং এই জনসাধারণ সরযূকে চায় না, চায় পারুলকে।

নাটকের চেয়ে উপন্যাস তাই অনেক অভিজাত। হিরণ্ময় তাই এখন থেকে উপন্যাস লিখতেই মন দেবে। নায়িকা, তার অশরীরী, খণ্ডিত আবির্ভাবে সে আবিল নয়। জীবনের চেয়ে অতিরিক্ত, সত্যের চেয়েও সে সুন্দর!

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আজকাল মিলন লইয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেছে। অথচ মিলন শুধু আজকের নয়, কালকের নয়, দু'দিনের নয়, দু'বৎসরেরও ব্যাপার নয়। মিলন চিরকালের জিনিষ। যে-কাল গত, মিলন যেমন তাহার প্রার্থিত বস্তু ছিল, যে কাল আগত এবং যে ভাবী কালের স্বপ্ন রচনা করিতেছি, মিলন তাহারও তেমনি আরাধনার ধন। শুধু রাজনীতির নয়, শুধু সমাজনীতির নয়, ইহা মানব ধর্ম্মের বিষয়, হৃদয়ধর্ম্মের কাম্য বস্তু।

*　　*　　*

এই কাম্য ফল লাভ করিতে হইলে শুধু বাহিরের দিকে দেখিলে চলিবে না। সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে ইহাকে অন্তরে আমরা কতটা উপলব্ধি করিয়াছি হৃদয়ে কতটা গ্রহণ করিয়াছি। মন প্রস্তুত হইলে 'প্যাক্টে' আটকায় না।

*　　*　　*

হিন্দু—হিন্দু, মুসলমান মুসলমান, এমনি একটা ভাব দেশের বহুল অংশে প্রসারলাভ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। এ ভাব জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার না করিলেই ভাল হইত, কিন্তু যেখানে ভোট আছে, কৌন্সিল আছে, সরকারী চাকরি আছে, সেখানে এ মনোভাবের বিস্তৃতির অভাব আশ্চর্য্যের বিষয় হইত।

*　　*　　*

কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, তাহা হইতে উদ্ভূত যাহা তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। যে-দেশ

অনধীন সে-দেশের জলবায়ু এ মনোভাবের পক্ষে অনুকূল নয়। এ ভাব সেখানে জন্মিতে পারে, কিন্তু বাড়িতে পারে না।

* * *

আত্মনিয়ন্তা দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থাকে স্বাভাবিক ও সহজ বলা চলে না। অতএব এ-দেশে বিভেদাত্মক মনোভাব জন্মিয়াছে, বাড়িয়াছে, শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বলশালী হইয়াছে, দৃঢ়মূল হইয়াছে।

* * *

বাহিরের অবস্থা ফিরানো রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কাজ। 'প্যাক্টে' তাহা সম্ভবপর। মন ছুঁইতে হইলে ভাবপ্রচারের প্রয়োজন। সে কাজ কে গ্রহণ করিবে?

* * *

হিন্দুরা শিক্ষায় অগ্রসর। অতএব নিম্নপদ এবং অল্পবেতনের চাকরিগুলি তাহারা এতদিন অধিকার করিয়াছিল। কোন-কোন মুসলিম নেতার দৃষ্টি শুধু এই সরকারী চাকরির দিকে।

* * *

যে-অবস্থায় এবং যে-যুগে এই সরকারী চাকরি করিয়া জনকতক হিন্দু পদগৌরব এবং অর্থগৌরব লাভ করিয়াছিল, সে-দিন এবং সে-অবস্থা কি আর ফিরিয়া আসিবে? শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কল্পনা বৃথা। দেশ অগ্রসর হইয়াছে, কাল অগ্রসর হইয়াছে।

* * *

ইংরেজ—ইংরেজ। সে জু নয়, ক্যাথলিক নয়, প্রটেষ্টাণ্ট নয়। আমরা এমনিই ভাবি। ফরাসী—ফরাসী মাত্র, মার্কিন—

মার্কিন, জার্ম্মান—জার্ম্মান। ইহাদের কথা ভাবিতে হইলে ইহাদের ধর্ম্মের কথা আমরা প্রথম ভাবি না। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, শিখ নয়, খ্রীষ্টান নয়, ভারতবাসী ভারতবর্ষীয় মাত্র, এ-কথা কবে ভাবিতে শিখিব ?

* * *

ইহার জন্য শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন। নিরক্ষরতার উচ্ছেদ চাই। মানবধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোনরূপ শিক্ষা। সেই শিক্ষা মনকে সংস্কারের পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিবে। অন্তরের মুক্তিতে বাহিরের মুক্তি।

* * *

মালব্যজীর চেষ্টা প্রশংসনীয়। বাহিরের মিলন প্রার্থনীয়। মনের মিলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কে অগ্রসর হইবে ?

দিনপঞ্জী

১৬ই অক্টোবর—পণ্ডিত মালব্যের প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ-মীমাংসার আলোচনার উদ্দেশ্যে মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলন হইতে উনিশ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

* * *

৩রা নভেম্বর—এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান ও শিখের মিলন বৈঠক বসিবে।

* * *

ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য ব্যপদেশে লর্ড রেডিঙ আমেরিকায় গিয়াছেন। রেডিও-যোগে এক বক্তৃতায় তিনি জানাইয়াছেন, ইংরেজই ভাঙা ভারতকে জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

১ম বর্ষ] ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [১৮শ সংখ্যা

দেবী কিশোরী

শ্রীমনোজ বসু

খুব রাতে রমা টিপি-টিপি ঘরে ঢুকিয়া দেখে, আলো নিভানো কিন্তু হেমলাল জাগিয়া আছে। মশারী হাওয়ায় উড়িতেছে, বাহিরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না...হেমলাল বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতেছিল। রমার পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া একটু হাসিল।

তারপর অতিশয় সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাতে একখানা রেকাবী তুলিয়া ধরিল বধূর দিকে। রেকাবীর উপর সবুজ মখমলের সুন্দর একজোড়া চটি।

রমা বলিল—জুতো? কি হবে এতে?

হাসিমুখে হেমলাল কহিল—গলায় দিতে হয়, জান না ?

—মালা গেঁথে, তাইই উচিত। রমা ম্লানভাবে একটু হাসিল। একটু চুপ করিয়া কহিল—খবর শুনেছ ?

হেমলাল পুলকিত স্বরে কহিতে লাগিল—শুনি নি আবার ? মা'র চিঠি তোমার চিঠি একদিনেই পাই। সেই থেকে আসবার জন্য ছটফট করছি। বড় বাবুটাও হয়েছে তেমনি পাজি—এ-হপ্তায় নয় ও-হপ্তায় নয় করতে করতে এই দু-তিন মাস। ওঃ রমা, কি যে ভয় হয়েছিল, ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছে খুব রক্ষে—

স্বামীর স্নেহভরা কথায় রমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। হেমলাল বলিতে লাগিল—ষ্টেশনে টিকিট কিনে তারপর মনে হল, তাইত একটা কিছু নিয়ে যাওয়া ত উচিত; সামনের মাথায় এক জুতোর দোকান—তাই সই। নাও, তোমার বখশিস নাও গো—। বলিয়া হাসিয়া জুতাজোড়া আগাইয়া ধরিল।

রমাও হাসিতে গেল ; হাসিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িল। হেমলালের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

চোখ মুছাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে হয়েছে বলে কোন কথা হয়েছে বুঝি,—সত্যি কথা বল রমা, কেউ কিছু বলেছেন ?

রমা ঘাড় নাড়িল।

হেমলাল বুঝাইতে লাগিল—ওতে দুঃখ করতে নেই। সকলের মনের অবস্থাটা একবার বোঝ। পাড়ার মধ্যে আট-আটটা মেয়ে। এক অনুপমার বিয়ের দেনা এখনো সামলে ওঠা যায় নি। বৌদিদিদের কারো ছেলে হল না একটা। মা এবার বড্ড আশা করেছিলেন ; ডেকে হেঁকে বলতেন সব্বাইকে, দেখো ছোট বৌমার আমার—। কেন, তোমার সামনেই ত কতদিন।

রমা বলিল—হ্যাঁ।

—তবে দেখ। রাগ করা কি উচিত?

রমা বলিল—রাগ কিসের? রাগ অদৃষ্টের উপর। মা বলেছিলেন, ছোট বৌমারও যদি মেয়ে হয় আমি ঠিক কাশী চলে যাব। সত্যি সত্যি যখন তাই হল, শুনলাম কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি তাই দিন-রাত ষষ্ঠীর পায়ে মনে মনে মাথা খুঁড়েছি...সেই বড় যন্ত্রণার সময়েও ষষ্ঠীতলার দিকে কতবার যে প্রণাম করেছি—

হেমলাল জিজ্ঞাসা করিল, বোধকরি দুষ্টামি করিয়া—কোন্ সময়ে?

এ সব কথা বলিয়া ফেলিয়া রমা একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে। বিষণ্ণ মুখের উপর হাসি ফুটিল। হেমলালের স্বরের অনুকৃতি করিয়া মুখ নাড়াইয়া কহিল—কোন্ সময়ে? আমি জানিনে—যাও—

হেমলালের মন জুড়াইয়া গেল। বধূকে টানিয়া জোর করিয়া সে পাশে আনিয়া বসাইল। বলিল—যাক গে বাজে কথা; তোমার সে ষষ্ঠীর ধন কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে বল দিকি? আন তাকে—দেখব। বলিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার আলোয় রমার দিকে চাহিয়া রহিল। বলিতে লাগিল—ষ্টেশন থেকে যখন বাড়ী আসি ষষ্ঠীতলায় খুব সুন্দর চাঁপার গন্ধ পেলাম। জুতো খুললাম, রাত্রে আর তোমার ষষ্ঠী ঠাকরুণ ঠাহর করতে পারবেন না—ভাবলাম ভিতরে গিয়ে নিয়ে আসি গোটাকতক ফুল; শেষ পর্য্যন্ত সাহস হ'ল না সাপের ভয়ে। কেমন হ'ত বল দিকি—এই এখানে এখানে এখানে সব ফুল গুঁজে দিতাম—

রমা শিহরিয়া জিভ কাটিল।—ওমা, ও কি কথার ছিরি তোমার? ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা? না না—অমন সব বলতে নেই, গড় কর—বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি অসম্মানিত অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশে নমস্কার করিল।

বাড়ীটার পশ্চিমে আম-কাঁঠালের পুরাণো বাগিচা; সেটা ছাড়াইয়া গাঙের ঠিক উপরে ঘন বেত ও আগাছার ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বহু কালের একটী অশ্বত্থ গাছ—গাছ সেটাকে বলা উচিত নয়—এবং কেবল শুধু ঐ অশ্বত্থটি নয়, উহার চারিপাশের ছায়াচ্ছন্ন ভাঁট-কালকাসুন্দেগুলিও নাকি এই রকম যে একখানা ডাল ভাঙিলে তাহারা অবিকল কচি শিশুর মত কাতরাইয়া উঠিবে। দেশের দিনকাল দিন দিন বদলাইয়া যাইতেছে, এই লইয়া এখন কেহ কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কিন্তু এ অঞ্চলের বাইশখানা গ্রামের মধ্যে কোন দুঃসাহসী আজও কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। ঐ অশ্বত্থতলে নির্জ্জন গ্রামসীমায় কত কাল হইতে ষষ্ঠীদেবী তাঁর লক্ষকোটী সন্তান কোলে-কাঁখে লইয়া সংসার পাতিয়া আছেন। ঢাক ঢোল বাজাইয়া ষষ্ঠীর পূজা দিতে হয় না, বেশী মানুষ-জন সেদিকে যায় না, যাহাদের বয়স পারাইয়াও সন্তান হয় না কিম্বা যে আনাড়ী কিশোরীরা মাতা হইয়া হিমসিম খাইয়া যাইতেছে ষষ্ঠী তাহাদেরই দেবতা। ষ্টেশনের রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে সরু একটি পায়ে-চলার পথ—একজন মানুষ কোন রকমে অনেক কষ্টে কাপড় বাঁচাইয়া ঢুকিতে পারে,

জঙ্গল কাটিয়া ইহা কেহ করিয়া দেয় নাই। সুখে দুঃখে গৃহিণীরা বধূ ও কন্যাদের লইয়া ঐ পথে বৃক্ষদেবতার কাছে মানত করিতে যান, সেকালের বুড়ীরাও অমনি সেকালের বধূদের লইয়া যাইতেন, গ্রামের পত্তন হইতে এমনি চলিয়া আসিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া গ্রামলক্ষ্মীদের পায়ে পায়ে ঐ সঙ্কীর্ণ পথটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে।

খুব জাগ্রত দেবী এই ষষ্ঠী ঠাকরুণ—অসীম তাঁহার করুণা। তুমি অভুক্ত থাকিয়া পবিত্রমনে যদি আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকিতে পার, অশ্বথের একটি পাতা নিশ্চয় তোমার আঁচলে পড়িবে। পাতাটি মাথায় ঠেকাইয়া যত্ন করিয়া তুলিয়া আনিও।

যাহাদের নূতন ছেলে মেয়ে হইয়াছে, দিনে রাতে সবসময় ষষ্ঠী তাহাদের বাড়ী আনাগোনা করেন। ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে শিয়রে আসিয়া বসেন, ঘুমাইলে তাহার সহিত কত কি কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন; শিশুর বিপদ-আপদ সব-সময় পাহারা দিয়া ঠেকাইয়া বেড়ান। যতদিন ছেলে বড় না হয় ঠাকরুণের আর সোয়াস্তি নাই।

সর্ব্বমঙ্গলা ষষ্ঠী ঠাকরুণ—তাঁর সম্বন্ধে কোন রকম অসম্ভ্রমের কথা বলিতে নাই।

রমা প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল—অপরাধ নিও না দেবি, ছেলেপিলের অমঙ্গল না হয়…। স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল—তোমার বড্ড আধিখ্যেতা। আর ব'লো না কক্ষনো। বুঝলে?

হেমলাল বলিল—মেয়ে দেখব কখন? বখশিসটা আগামই দিলাম—দেখি, দেখি. জুতো পায়ে হ'ল কিনা—

হাসিয়া রমা কহিল—বখশিস বরঞ্চ কাল মা'র হাত দিয়ে দিও—পায়ে নয়, তিনি পিঠের উপর ঝাড়বেন।

কি যে বল, ছি-ছি—হেমলাল সাদরে বধূকে আবার টানিয়া আনিল। বলিতে লাগিল—বাড়ীসুদ্ধ সবাই বুঝি হেনস্থা করে। আমি কিন্তু একবিন্দু দুঃখিত হইনি। ভগবান যা দিয়েছেন তাই ভাল। কিন্তু মা জুতো মারতে পারেন, সত্যি সত্যি তুমি বিশ্বাস কর রমা? ঘরের লক্ষ্মী তুমি—এসব ভাবলেও যে পাপ হয়

—আর আমার বুঝি পাপ হয় না মশাই, যখন তখন আমার পায়ে হাত দেবে—

হেমলাল কথা বলিতে বলিতে কখন যে অলক্ষিতে পায়ে জুতা পরাইয়া দিতেছিল, রমা টের পাইয়া চমকিয়া পা গুটাইয়া লইল। বলিতে লাগিল—মাগো, কি দুষ্টু তুমি, আমায় ভালমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিকে জুতো পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। না—না—না—বলিয়া ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দৌড় দিল।

প্রথমে গিয়া বসিল, দূরের একটা চৌকীতে। সেটাও তেমন নিরাপদ নয় দেখিয়া খাটের ঠিক মাঝখানে বিছানার উপর পা দু'খানি সাড়ীর মধ্যে আচ্ছা করিয়া ঢাকিয়া আঁটিয়া সাঁটিয়া অনড় হইয়া বসিল।

দেখি, আহা ও রমা একটুখানি সরেই বস না ছাই—

—উঁহু—

রমার সহিত জোর জবরদস্তি করিয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাহারও পারিবার জো নাই। হেমলাল অতঃপর রীতিমত অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল।

শোন লক্ষ্মিটি, আমার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে—শুনবে না আমার কথা? এই একটা সামান্য কথা ত মোটে—কত লোকে স্বামীর জন্য কত কি করে থাকে—

অবশেষে হেমলাল গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

বাতাসে নৌকার পালের মত মশারী উড়িতেছে। এতবড় গ্রামখানির কোথাও একবিন্দু সাড়া-শব্দ নাই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া উঠানের দিকে একপাল শিয়াল ঝগড়া বাধাইয়া খ্যাক খ্যাক করিয়া উঠিল।

দুজনেই চমকিয়া তাকাইল। রমা বলিল—শেয়ালের কি ভয়ানক দৌরাত্ম্য হয়েছে, দিনদুপুরেও এইরকম করে মানুষ জন কিচ্ছু মানে না। আমি খুকীকে নিয়ে আসিগে মা'র কাছে রয়েছে, আলগা ঘর; তিনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণ—

হাত ধরিয়া রাগতভাবে হেমলাল কহিল—তার আগে.. শুনবে না আমার কথা?

না—বলিয়া জেদ করিয়া রমা দাঁড়াইল। বলিল—জুতো আমি নিজে পরতে জানি—দাও আমায়। এ কেমন ধারা বিদঘুটে সখ? শেষকালে যমদূত এসে নরকে নিয়ে যাক—বলবে, স্বামীকে দিয়ে যেমন জুতো পরিয়ে নিয়েছিলি হতভাগী,

—পাপ হবে না বলছি, তবু এক কথা একশ' বার—

রমা ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিল। —ওগো, আস্তে। ওই ওখানে মা ঘুমুচ্ছেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই একটু ?

হাত সরাইয়া শান্তকণ্ঠে হেমলাল কহিল—পা যদি তুমি না বের কর, আমি চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলব ; মাকে ডেকে তুলে বলব, রমা আমাকে লাথি মেরেছে—

—এত বড় সত্যিকথা বেরুবে মুখ দিয়ে ?

—সত্যি হোক মিথ্যে হোক—বলবই, যদি আমার কথা না শোন—

রমা বলিল—তাই ক'রো। তা'তে খুব সুখ্যাতি বেরুবে। মা ভাববেন, বৌ আর ছেলে কি ধনুর্দ্ধর হয়েছে আমার—

—শুনবে না তবে ? ওমা, মাগো—হেমলালের কণ্ঠ ক্রমেই উচ্চে উঠিতে লাগিল।

ভীত রমা তাড়াতাড়ি পা বাহির করিয়া দিল। রাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একেবারে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট বসিয়া পড়িল।

হেমলাল ইতস্ততঃ করিল, এই অবস্থায় এখন আর ঘাঁটাইবে কি না। জুতা জোড়া হাতে তুলিতেই দেখিল, না—ব্যাপার যা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, রমা আড়চোখে তাকাইতেছে, মুখে কৌতুকের দীপ্তি। দুই হাতে জোর করিয়া তার মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—শোন রমা, কি রকম জেদী তুমি ! পাপই যদি হয়...বেশত আমি কথা দিচ্ছি যতখানি খুসী আমার পায়ের ধুলো নিও—আমি কিচ্ছু আপত্তি করব না।

জুতা পরিতেই হইল, উপায় কি ? বধূর আপাদ-মস্তক সগর্ব্বে বারকয়েক চাহিয়া হেমলাল বলিল—কেমন মানিয়েছে, দেখ ত ?

মুখ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে রমা বলিল—ছাই।—

হেমলাল বলিল—তা বই কি! তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা—এ দেখবার ভাগ্যি থাকা চাই—বুঝলে? আয়নায় দেখে এসে ব'লো তারপর। সত্যি রমা, আমি ভাবি অনেক সময়, কত বড় ভাগ্যবান যে আমি—

রমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুচ্ছ করতে হবে না—ঘুম পায় না তোমার রাত যে কত হল—

হেমলাল কহিল—অত বড় পাপের বোঝা তোমার কাঁধে চাপিয়ে ঘুম আসে কি করে? প্রণাম করে পাপটা আগে খণ্ডন কর—আমি দাঁড়িয়ে আছি—

স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া রমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

হেমলাল তখন ডান হাত তুলিয়া রীতিমত আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছে। বলিল—এস, এস—নববস্ত্র নতুন জুতো এই সব পরলে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়

রমা ফিক করিয়া হাসিয়া আবার খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—না, আমি পারব না ওরকম করলে আমি কক্ষনো...ইঃ ভারী একেবারে আচার্য্যি ঠাকুর হয়েছেন—

হেমলাল অধীর হইয়া উঠিল।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরল যে—

—এসে শো'ও না তুমি।

—বেশ আমার দোষ নেই—বলিয়া হেমলাল খাটের উপর বসিল। বলিল—কিন্তু ভাল করলে না রমা, যমদূতগুলো কি রকম

গরম তেলের পিপেয় করে জ্বাল দেয় পটের ছবিতে দেখেছ ত ?... মেয়ে আন এবার—

রমা যেন খুকীকে আনিতেই ঐ ঘরে যাইতেছে এমনিভাবে দোরের দিকে মুখ করিয়া উঠিল। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চট করিয়া স্বামীর পা ছুঁইল এবং সেই হাত নিজের মাথায়। হেমলাল হাসিয়া কি বলিতে গিয়া দেখিল, রমা ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

সাদা জ্যোৎস্নায় মেজের উপর খাটের ছায়া, জানলার গরাদের ছায়া, দোলনার ছায়া, শিকার উপর সাজানো হাঁড়ি-মালসার ছায়া—ঘরময় যেন চিত্রবিচিত্র আলপনা দিয়া গিয়াছে। রমা মেয়ে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হেমলাল দেশলাই ধরিয়া যতবার দেখিতে যায়, কাঠি বাতাসে নিভে।

রমা বলিল—আলোটা জ্বালই না গো, ঘর অন্ধকার করে বসে আছ—আচ্ছা লোক. আমার ত গোড়ায় ঘরে ঢুকতেই সাহস হচ্ছিল না—

হেমলাল বলিল কি মনে হচ্ছিল বল দিকি ? ভূত ? যেন একটা ভূত এসে তোমার খাটের উপর বসে বসে চুরুট টানছে—না ?

রমা বলিল—গোয়ালঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে আমি এক পিদ্দিম তেল দিয়ে রেখে গেছি, বেশ দিব্যি তা নিভিয়ে বসে আছ—

—শুধু শুধু তেল পুড়বে কেন ?

প্রদীপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হেমলাল মেয়ে দেখিতেছিল। বলিল —হবে না? এখন থেকেই ত বুঝে সমঝে চলতে হবে। এখন আর সেদিন নেই, এখন আমি - বলিতে বলিতে গর্ব্বিত ভঙ্গিতে রমার দিকে চাহিল।

রমা বলিল—হঁ্যা, দিগগজ হয়েছ।

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মত বিছানার গায়ে লাগিয়া আছে। আরও খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া হেমলাল বলিল— কিন্তু এ যে স্বয়ং মহাকালী নেমে এসেছেন, উপায় কি হবে বল ত?

রমা মেয়ের দুপাশে দু'টি পাশবালিশ দিয়া পরম স্নেহে গায়ের উপর কাঁথা টানিয়া দিল। বলিল—তোমাদের চেয়ে ঢের ফর্শা .. আর বলতে হবে না—যাও, যাও—। ক্ষণপরে আবার বলিল— তোমরা কেউ ওকে দেখতে পারবে না, আমি তা জানি—। আমি তাই এখন থেকে—

গলায় যেন কি আটকাইয়া রমার কথা থামিল। অবনতমুখে একাগ্রে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

হেমলাল প্রশ্ন করিল - এখন থেকে কি—বল্লে না?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল—আমি যদি না বলি—

—বলো, বলো—

—বলছিলাম যে পিদ্দিমটা নেভালে কেন?

—বাতাসে আপনি নিভেছে; কিন্তু ও ত বাজে কথা—। খোপার পাশে ক'...গোছা আলগা চুল উড়িতেছিল, খপ করিয়া তাই ধরিয়া হেমলাল দিল এক টান। বলিতে লাগিল—বড্ড ইয়ে হয়েছ, কথা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কেমন?

—আঃ, লাগে লাগে—বলছি—বলিতে বসিতে শাস্তির যন্ত্রণায় রমা হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আমি এখন থেকে খুকীর বিয়ের পয়সা জমাচ্ছি, মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাদের—

—বটে ? কতগুলো হ'ল ?

—মোটে তিন চারটে—। রমা খুব হাসিতে লাগিল। বলিল—ও আমি পারিনে ; একদিন একখানা বই পড়ে ভয়ানক সঙ্কল্প করে বসলাম, রোজ একটা করে পয়সা জমাব। দিন পাঁচ সাত বেশ চলল, শেষে একদিন দুদিন কখনও বা তিন দিন বাদ পড়ে যায়। একদিন বাক্স খুলে দেখি বিস্তর জমেছে ; তখুনি রূপহলুদ ব্রতের সিঁদুর কিনতে দিলাম। এখন এই তিনচারটে আছে হয়ত—

সেদিনের সেই জ্যোৎস্নামগ্ন রাত্রিটি নিভৃত গ্রামপ্রান্ত দিয়া কত শীঘ্র কেমন করিয়া উড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তোমরা যাহারা সব ঘুমাইয়া ছিলে কিছুই তাহা জানিতে পার নাই। দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমে গাঙ-পারে ঢলিয়া পড়িল. ঝটপট করিয়া বাদুড়ের ঝাঁক ফিরিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে উঠানের বাতাবীলেবু গাছটি আবছা আঁধারে রহস্যাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।...আর একপাশে মেয়ে ঘুমাইয়া। প্রদীপের আলো কাঁপিতেছে। রমা ও হেমলাল পাশাপাশি বসিয়া আছে।

খুকী আবার কাঁদিতে লাগিল। এ ঘরে আসিয়া আরো দু'তিনবার কাঁদিয়া উঠিয়াছে। এবারে বড় ভয়ানক কান্না. রমা কিছুতেই শান্ত করিয়া উঠিতে পারে না।

হেমলাল বলিল—এ যে রূপকথার সুতোশঙ্খ সাপ। ঐ ত সুতোর মত একফোঁটা মানুষ—অত বড় শাঁখের আওয়াজ বেরুচ্ছে কি করে ? মেয়ের যেমন রূপ, গুণও তেমনি—

রমা বলিল - মেয়ে দেখতে মন্দ নয় গো. কালকে দিনমানে দেখো, এখন তুমি শুয়ে পড়—

হেমলাল মনের বিরক্তি আর সামলাইতে পারিল না। বলিল --শুয়ে কি হবে? সমস্ত রাতের মধ্যে আজ চোখ বুজতে দেবে না। এসে অবধি কেবল কাঁদছেই—একবার হাসতে দেখলাম না—

—আচ্ছা, তুমি ঘুমোও আমি বাইরে নিয়ে শান্ত করছি—বলিয়া বিবর্ণমুখে রমা মেয়ে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

চারিদিকে বেশ রোদ উঠিয়া গিয়াছে, হেমলাল সেই সময়ে চোখ মেলিল। দেখে, নীচে মেজের একপাশে খুকী ঘুমাইয়া আছে। রাত্রির অভিমানের এককেঁাটাও রমার মুখে লাগিয়া নাই। হাসিমুখে রমা ডাকিতে লাগিল - দেখ, ওগো দেখসে একবার—। ঘুমন্ত মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সগর্ব্বে রমা স্বামীকে দেখাইতে লাগিল--কত মাণিক ঝরছে ঐ দেখ—তুমি যে বলছিলে মেয়ে হাসতে পারে না...

আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু শিশু যখন ঘুমায় ষষ্ঠীদেবী শিয়রে আসিয়া বলেন—খুকী, তোর মা মরেছে রে ..। খুকী দেখে, মা যে তাহার পাশেই রহিয়াছে। দেবীর দুষ্টামি ধরিতে পারিয়া খুকী হাসিয়া ওঠে।

হাসিতে হাসিতে আবার দেখা যায় খুকী কাঁদিয়া উঠিল।

ষষ্ঠীদেবী তখন বলিতে থাকেন—মা নয়, ও খুকী মরেছে তোর বাবা...। বাবাকে খুকী কোন দিকে না দেখিয়া বাবার জন্য ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

দেবী আবার বলেন—ঐ তোদের ঘরে আগুন লাগল রে খুকী, .. সঙ্গে সঙ্গে খুকী চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া পড়ে।...

যতদিন ছেলেমেয়ের কথা না ফোটে দেবী তাহাদিগকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া খেলা দিয়া বেড়ান ; কথা বলিতে শিখিলে আর তিনি দেখা দেন না, পাছে কারও কাছে তাঁর কীর্ত্তি-কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

মেয়ে জাগিয়া উঠিয়াই কাঁদিতে লাগিল। রমা অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আমি ওঘরে নিয়ে যাচ্ছি...বলিয়া ভয়ে ভয়ে স্বামীর দিকে তাকাইল।

হেমলাল হাসিয়া বলিল—রাতে ঘুমের সময় যতটা রাগ হয় এখন অবশ্য তেমন হবে না ; কিন্তু আমি ভাবছি রমা, মেয়ে অত কাঁদুনে হলে কি করে চলে ? এ বাড়ীতে মেয়ের কিছু কমতি নেই যে কাঁদলে অমনি 'ষাট ষাট' করে বিশ পঁচিশ জন কোলে তুলে নাচাবে—

রমা বলিল—এমন ত কাঁদে না. ওর হয়ত পেট কামড়াচ্ছে... এত সাবধানে আছি আমি, একবেলা করে খাই সর্ব্বদা টিক টিক করে বেড়াচ্ছি. তবু হয়ত কিসে কোন অত্যাচার হয়েছে...ভোরবেলা মা তাই বকাবকি করছিলেন. আমাকে বলছিলেন—রাক্ষুসী—। বলিতে বলিতে অধোমুখে মেয়ের দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিল।

হেমলাল বলিল—কিন্তু তোমার খাওয়ার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কটা কি ?

—ও আমার দুধ খায়।

হঠাৎ হেমলাল রমার মুখ তুলিয়া ধরিল। রমা মৃদু হাসিয়া বলিল—দেখছ কি ? সমস্ত রাত জেগেছি—তাই অমনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমি তারপর সমস্তটা রাত ওকে নিয়ে রোয়াকে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। সকাল হয়ে গেলে তবে চুপ করল।... মা মিথ্যে কিছু বলেন নি; খাওয়ার কি অত্যাচার হয়ে থাকবে। আহা, কথা বলে বুঝিয়ে দিতে পারছে না—কি কষ্ট হচ্ছে দেখত বাছার !

আবার কি কাজে এঘরে আসিয়া হেমলালের সহিত দেখা হইল।

রমা বলিল—একটা সত্যি কথা বলবে ?

হেমলাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

—কাল বলছিলে, মেয়ে হয়েছে বলে তুমি দুঃখিত হওনি; খুকীকে দু'চক্ষে কেউ দেখতে পারে না, ও বড্ড অভাগী...তুমি বলছিলে তুমি মোটেই দুঃখিত হও নি—বলিয়া রমা ম্লান হাসি হাসিল।

হেমলাল বলিল—দুঃখ করে আর করব কি বল ? ভগবান যা দিলেন তা মেনে নেওয়াই উচিত—

—মুখ দেখে মায়া হয় না তোমার ? রমা স্বামীর দিকে দুটি চোখের আকুল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল—আচ্ছা, কি মনে হয় বল, তোমার কি ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয় যে ওর ভালমন্দ হয়ে যায় কিছু ?

চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, অনেক কষ্টে কোন রকমে সে কান্না ঠেকাইল।

হেমলাল বলিল—কাল সমস্ত রাত ঘুমোও নি, তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে রমা, যাও নেয়ে ফেলগে—তারপর দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও—

হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া রমা বলিতে লাগিল—তোমরা সব এক রকমের, আমি জানি—জানি। এই আমার জুতো এল, হেনো তেনো কত ছাইপাঁশ আসে, ওর নাম করে আনলে কিছু? সিকি পয়সা দামের একটা কিছু—পারলে আনতে?

হেমলাল কহিল—মনে ছিল না। নিয়ে আসব এইবার—

—আনতে হবে না তোমার। ও চায় না তোমাদের ভিক্ষের দান—আমি ওকে নিয়ে যেখানে হয় চলে যাব একদিকে বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ীর মধুর কণ্ঠ পূবের ঘর হইতে ভাসিয়া আসিল—অ বৌমা, ইদিকে এস বাছা, কুলের চেরাগ আবার জেগে উঠেছেন—পিণ্ডি গিলিয়ে দিয়ে যাও—

দুপুরে হেমলাল পাড়ায় বাহির হইয়াছে, রমা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, হেমলাল রাগ করিয়া খুকীকে যেন লাথি মারিয়া হন হন করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া খুকীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। খুকী বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। ক্রমে বেলা গড়াইয়া আসিল।

আবার রমা স্বপ্ন দেখিল, লাল চেলী-পরা হাসি-হাসি মুখ এক কিশোরী খুকীকে কোলে লইয়া বলিতেছে—রমা, নিয়ে চললাম তোর মেয়েকে, এ বাড়ীর কেউ ওকে দেখতে পারে না; এখানে থেকে মেয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে—

রমা যেন বলিল—কাল থেকে বড্ড কাঁদছে ভাই, মোটে দুধ খাচ্ছে না—কি যেন হয়েছে

—কই? কোথায়? বলিয়া কিশোরী মেয়ে তুলিয়া দেখাইল। কোলের মধ্যে পুটপুট করিয়া খুকী তাকাইতেছে, রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, ছোট্ট ছোট্ট হাত মুঠা করিয়া গালে দেওয়া, হাত সরাইয়া দন্তহীন মাড়ি মেলিয়া খুকী হাসিতে লাগিল। কান্না কোথায়?

—এস, আমার সোনা এস—বলিয়া হাত বাড়াইয়া রমা কোলে লইতে গেল। খুকী লাল চেলীর আড়ালে মুখ সরাইল। কিশোরী বলিল ও আর তোমার কাছে যাবে না বোন, আমি ষষ্ঠী ঠাকরুণ—ওর কষ্ট দেখে থাকতে পারলাম না, নিয়ে যেতে এসেছি...

বলিতে বলিতে মেয়ে লইয়া দেবী কিশোরী যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল। রমার ঘুম ভাঙিল। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখে, কোল খালি—সত্যই খুকী তাহার নাই।

সামনেই হেমলাল। অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে রমা জিজ্ঞাসা করিল—খুকী? আমার খুকী কোথায় গেল?

হেমলাল কিছু বুঝিল না। বলিল—তা কি করে বলব, আমি ত এই আসছি—

রমা ছুটিয়া একেবারে কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল লুকিয়ে রেখেছ নাকি? ঠাট্টা ক'রো না—সত্যি বল। আমি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি—কেউ নিয়ে গেছে নাকি?

হেমলাল কহিল—মা হয়ত নিতে পারেন, দেখ জিজ্ঞাসা করে--

মা'কে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন—হ্যাঁ, মেয়ে আমার তিন কুল উদ্ধার করবে, তাই লুকিয়ে রেখে সোহাগ করছি—

বাড়ীর প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কেহই কিছু জানে না। খুব খোঁজাখুঁজি সুরু হইল। উদ্বেগ-কম্পিত স্বরে হেমলাল বলিল—শেয়ালে নিয়ে যায় নি ত? আমি এসে দেখি, উনি ঘুমুচ্ছেন—দুয়োর খোলা হাঁ হাঁ করছে—

রমা মুখ গুঁজিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। শিয়ালের দৌরাত্ম্যের নানা ঘটনা বহুজনে বলিতে লাগিল। তখন ঘর দোর ছাড়িয়া আশপাশের জঙ্গল নাটাবন বাঁশতলা প্রত্যেক সন্দেহজনক স্থান—কোথাও খুঁজিতে বাকী রহিল না। রমার কাছে আসিয়া হেমলাল বসিয়া পড়িল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলিল—সত্যিই বুঝি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে রমা—

রমা মুখ তুলিতে গিয়া স্বামীর সে দৃষ্টি সহিতে পারিল না। বলিল—আমায় ফাঁসি দাও—ফাঁসি দাও - আমি হতভাগী মেয়েকে যমের মুখে দিইছি—

দুই হাতে মুখ চাপিয়া দ্রুতপদে রমা উঠিয়া গেল।

আলুথালু শোকাচ্ছন্ন বেশে সে ছুটিল। ছায়ান্ধকার আমবাগানের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করিল না, ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার উপর গিয়া পড়িল। সাড়া পাইয়া ভাঁটবনের দিক হইতে ক'টা শিয়াল

পলাইয়া গেল। আর রমার সন্দেহমাত্র রহিল না, এইখানেই তাহার খুকী পড়িয়া আছে, কাল রাত্রি হইতে বড় কান্না কাঁদিতেছিল—কাঁদিয়া আর সে জ্বালাইবে না। বেত ও বৈঁচির কাঁটা ঠেলিয়া পাগলের মত রমা সেই অপরাহ্নের আবছা অন্ধকারে বিরাট সহস্র-বাহু অশ্বত্থের মূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল—ও ষষ্ঠী ঠাকরুণ, আমার খুকীকে ফিরিয়ে দাও। তারপর ঘন ছায়ায় অস্পষ্ট ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল, উপর হইতে আকাশভেদী ডালের এখানে ওখানে কোটরের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীর লক্ষকোটী ছেলেমেয়ে সব তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। বাতাস আসিয়া ভাঁটবন দুলিতে লাগিল, উগ্র কটু গন্ধ…পাতার খস খস শব্দ, যেন কত লোক চারিপাশে নিঃশব্দে চলাফেরা করিতেছে। সেইখানে সেই ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া মাথা কুটিয়া কুটিয়া রমা কাঁদিতে লাগিল—আমার খুকী কোথায় আছে, বলে দাও দেবি, বলে দাও—

ঝুর ঝুর করিয়া অশ্বত্থের পাকা পাতা পড়িয়া তলা ছাইতে লাগিল। কতক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আবার সে পাগলের মত বাহির হইয়া আসিল।

হেমলাল খুঁজিতে আসিতেছিল। বলিল—কোথায় গিয়েছিলে? খুকী যে তোমার কেঁদে খুন হচ্ছে—

ঘরের মধ্যে অতি মধুর কান্নার আওয়াজ। ব্যাকুল আগ্রহে ঘরে গিয়া রমা ক্রন্দনরতা মেয়েকে বুকে লইল, অশ্রুচোখে হাসিয়া উঠিল। বলিল—কোথায় পেলে?

—মনোরমা নিয়ে গিয়েছিল।

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা ঘুম তোর বৌদি, এত ডাকাডাকি, কিছুতে সাড়া নেই। মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম, তবু টের পেলিনে। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তোকে চুরী করে নিয়ে যাব

হেমলাল রাগের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল—খবরদার। আজ তোর বৌদিকে কাঁদিয়ে বেড়ালি সারা বিকাল, আবার একদিন আমায় নিয়ে ঐ মতলব? বেরো—।

সকলে চলিয়া গেলে রমা কহিল—ও সাধু পুরুষ, কেবল আমি কেঁদেছি—তুমি কাঁদোনি?... নাও, তোমার মেয়ে নাও, আমি একা একা বয়ে বেড়াতে পারিনে—

হেমলাল সভয়ে এক পা পিছাইয়া কহিল—যাই কর, মেয়ে মাথায় দিও না, সাত মেয়ে হবে তা হ'লে—

সজল স্নেহদীপ্ত চোখে খুকীর দিকে চাহিয়া রমা কহিল—দেখ, মুখ দেখে মায়া হয় না তোমার? ওকে তোমার ভালবাসতে হবে। খু-উ-উ-ব—

———

সাময়িকী ও অসাময়িকী

পাঞ্জাবে তিনটি প্রধান সম্প্রদায় বর্ত্তমান—হিন্দু, শিখ ও মুসলমান। সংখ্যালঘু হইলেও সেখানকার হিন্দু এবং শিখ শিক্ষিত এবং প্রতিপত্তিশালী। পাঞ্জাবের শিখ জাতীয়তাবাদী। তাহারা বার বার বলিয়া আসিয়াছে. সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তাহাদের কাছে বড় কথা নহে. সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সামান্য এবং অস্থায়ী সুবিধার জন্য সাম্প্রদায়িক গণ্ডী রচনা না করিলে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কাছে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে রাজী আছে। যাহারা সাহসী তাহারা গ্রহণ করিতেও পারে, ত্যাগ করিতেও পারে।

* * *

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মুসলিম-সম্প্রাদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। যে যে প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘু, সেই সব স্থানে তাহারা আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থাকামী। অন্য প্রদেশে মুসলিম-সম্প্রদায় যে সুবিধা ভোগ কবিতে ইচ্ছুক. বাংলার হিন্দু তাহার প্রার্থী নহে। বাঙালী হিন্দু যুক্তনির্ব্বাচন চায়। যুক্ত-নির্ব্বাচনের যুক্তিযুক্ততা মুসলিম-সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে বলিয়াই মনে হয়। যে আপাত-স্বার্থ মনোরম বলিয়া বোধ হইতেছে, পরিণামে তাহা যে বিষম হইয়া উঠিবে. আজ এ কথা ভাবিবার অবসর তাহাদের আসিয়াছে।

* * *

প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে ভারতবর্ষের তিনটি মুখ্য সম্প্রদায়ের ত্রিধারা আসিয়া আজ মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলন সার্থক হোক। বৃহত্তর স্বার্থের আবেগময় স্রোতে তুচ্ছ সুবিধা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ভাসিয়া যাক। আজ যদি হিন্দু সকলই ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে কি? যাহাদের হাতে সকল সুবিধা গিয়া পড়িবে, তাহারা ত পর নয়, তাহারাও ভারতবাসী। ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে শুধু একটি কথা ভাবিতে হইবে, যে উদ্দেশ্যে এই স্বার্থত্যাগ, সাম্প্রদায়িক আত্ম-বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া সেই উদ্দেশ্য সত্যই সিদ্ধ হইবে কি না। অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে সেই মহত্তর প্রয়োজন যদি সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে কোন ত্যাগই আত্যন্তিক হইবে না।

* * *

সিন্ধু-বিভাগের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। এ প্রস্তাব যাহাদের পরিকল্পিত, তাহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেই চায়, প্রতিবাদে কি আসে যায়? ইহাকে উপলক্ষ করিয়া এক নূতন এবং অভূতপূর্ব্ব সমস্যা উদ্ভূত হইল। এই প্রদেশের এক দিক হিন্দুপ্রধান, আর এক দিক মুসলমানপ্রধান। অতএব মাঝখানে একটা লাইন টানিয়া দিলেই হইল, খণ্ডিত করিতে কষ্ট নাই। কিন্তু মুস্কিল হইল, খণ্ডিত সিন্ধুর মুসলিম বিভাগের শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে এবং বৎসরের পর বৎসর তাহা পরিচালিত করিতে যে টাকা লাগিবে, তাহা জোগাইবে কে? সিন্ধুর সেই টুকরাটি হইবে দরিদ্র। ব্যয়নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে কি বিভক্ত প্রদেশের অপর খণ্ড হইতে?

সমস্যা যাহারা স্থষ্টি করিবার তাহারা করিয়াছে, সমাধানের ভার অন্যের উপর।

* * *

মিলন ও ঐক্য প্রার্থনীয় বস্তু সন্দেহ নাই। এইটুকু শুধু মনে রাখিতে হইবে, তাহার প্রতিষ্ঠা প্যাক্টে নয়, চুক্তিতে নয়, বাগ্‌দানে নয়, রাজনৈতিক উপায়প্রয়োগেও নয়, মিলনের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে, শিক্ষিত করিতে হইবে, সম্প্রসারিত করিতে হইবে। বাহিরের বাঁধনে ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উন্মুখীনতা ঐক্যকে স্থায়ী এবং মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

দিনপঞ্জী

৩০শে অক্টোবর—রাঁচি হইতে সংবাদ আসিয়াছে স্যর আলি ইমাম সেই দিন প্রাতঃকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সহসা হৃদ-রোগের আক্রমণ এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

*　　　*　　　*

৩১শে অক্টোবর—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, বেকারদের আন্দোলনের ফলে দর্শকদের ভিড় না জন্মাইবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিপুল জনতা অভিযানকারীদের অনুগমন করিতেছে।

*　　　*　　　*

২রা নভেম্বর—লণ্ডন হইতে ফ্রী প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেণ্টীয় শ্রমিকদল তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিয়াছেন। তাহাদের সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, ভারতীয় কংগ্রেস যখন এই বৈঠকে উপস্থিত হইতেছে না এবং ভারতে বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া, শ্রমিকদল বৈঠকে যোগদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না।

১ম বর্ষ] ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯ [১৯শ সংখ্যা

উদ্বোধন ও বিসর্জ্জন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া কুবলয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিল— মুরা তখন গভীর মনোনিবেশ সহ সেদিনকার সংবাদপত্রখানা পাঠ করিতেছে। কুবলয়া গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিয়া মুরার পাশেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

মানুষটা যখন আসিয়াছিল তখন দৃষ্টি পড়ে নাই, চেয়ার সরানোর শব্দে সচকিত হইয়া মুরা মুখ তুলিল।

"মাগো, এমন চুপি চুপি এসেছ কুবলয়া, কিছু জানতে পারি নি। হঠাৎ তোমার চেয়ার টানার শব্দ শুনে এমনি ভয় হল যে কি বলব।"

কথাটা বলিয়া হাসিমুখে মুরা কুবলয়ার পানে তাকাইল।

কিন্তু চিরহাস্যময়া কুবলয়া আজ অস্বাভাবিক গম্ভীরা, মুরার হাসি আজ তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। গম্ভীর মুখে সে বলিল, "কাগজ পড়ে দেশ বিদেশের খবর জানা এখন থাক্, নিজেদের মধ্যে কি হচ্ছে সে খবর রেখেছ ?"

মুরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল, শুষ্কমুখে বলিল, "নিজেদের মধ্যে মানে ?"

কুবলয়া গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিল, "এদিকে একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হয়েছে যে, সেই জন্যেই এখন তোমার কাছে আসা। আমরা একটা মন্ত্রণা করি এসো, যেমন করেই হোক একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হবে।"

তাহার মুখ দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুরা ঠিক জানিয়া লইল ব্যাপারটা বড় সহজ নয়, সেই জন্য সে চেয়ারখানা কুবলয়ার দিকে সরাইয়া আনিল ; মুখখানা ঠিক কুবলয়ার মত গম্ভীর করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি বল তো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।"

অত্যন্ত সংক্ষেপে কুবলয়া বলিল, "ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ভালোবাসা—সোজা কথায় যাকে তোমরা বল লাভ্।"

মুরা বিস্ফারিত-চোখে বলিল, "ওঃ, লাভ্ সুইট লাভ্ ? কার—তোমার নাকি ?"

কুবলয়া ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "রাম বলো, ও সব ব্যাপারের মধ্যে আমি নই। আমাদের হিন্দোলকে দেখে

আজ মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে,—সত্যি আমার যেন কান্না এসে পড়েছিল। ছিঃ, এ রকম ব্যাপারও ঘটে।"

মুরা সোজা হইয়া বলিল, "হিন্দোল? কেন তার আবার কি হল? এই যে শুনেছিলুম তার সঙ্গে মর্ম্মর মিত্রের বিয়ের সব ঠিক হয়েছে। হিন্দোল যেমন তাকে ভালোবাসে, সেও নাকি তাকে তেমনি ভালোবাসে।"

বিকৃতমুখে কুবলয়া বলিল, "পোড়াকপাল তার ভালবাসার। কাল পর্য্যন্ত আমরা জানতুম মর্ম্মর হিন্দোলকে ভালবাসে, কিন্তু আজ সে ভুল দূর হয়েছে। মর্ম্মর নাকি কাল রাত্রে একখানা পত্র লিখে জানিয়েছে—সে বিয়ে করবে না।"

মুরার দুই চোখ দৃপ্ত হইয়া উঠিল, "বল কি?"

কুবলয়া বলিল, "আঃ, বেচারা হিন্দোল আর উঠছে না; কাল রাত হতে এই বেলা পর্য্যন্ত কিছু খায় নি। সত্যি বল কুবলয়া, কি অপমান, আর এ অপমান মর্ম্মর পুরুষ বলেই হিন্দোলকে করতে পারলে। হিন্দোল কখনো মর্ম্মরকে এমন ভাবে অপমান করতে পারত না, কারণ সে মেয়ে, তার এতখানি এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে পড়া চলত না।

মুরা নিঃশব্দে বসিয়া নিজের আঙ্গুলটা কামড়াইতেছিল, খানিকক্ষণ একটা কথাও বলিল না।

কুবলয়া বলিল, "দিন দিন দেশের ছেলেদের কি রকম স্পর্দ্ধা বাড়ছে দেখেছ? মেয়েরা নেহাৎ নরম কিনা, তাই তাদের নিয়ে যেন পুতুল খেলছে; যখন খুসি সাজাচ্ছে,

যখন খুসি লাথি মেরে দূরে ফেলছে। উঃ, মেয়েদের কি অপমান ?

মুরা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ দোষ মেয়েদেরই নয় কি কুবলয়া ? ওদের এই ফেসিলিটি দিয়েছে কারা, মেয়েরাই নয় কি ? মেয়েরা যদি ষ্ট্রিক্ট হ'তো, পুরুষের সাধ্য হ'তো এত কাছে আসবার, এই রকম ভাবে অপমান করবার ? সত্যি বলছি, হিন্দোল যদি প্রথমেই মর্ম্মরকে এই আঘাতটা দিত, তা হলে আমি তাকে মাথায় তুলে নাচতুম। পুরুষেরা মেয়েদের কত লাঞ্ছনাই না দিচ্ছে। এটা বিবেচনা করে মেয়েদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত।

কুবলয়া কহিল, "কি রকম ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, মতলব করি এসো।"

কুবলয়া ভাবিতে লাগিল ; মুরা তাহাকে বিরক্ত করিল না, নীরবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

কুবলয়া বলিল, "এক কাজ করা যাক্। এসো আমরা একটা দল গড়ে তুলি, এই দলে যারা আসবে তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে—কখনও তারা কেউ বিয়ে করবে না।"

মুরা হাসিয়া উঠিল,—"এ যে চিরকুমার সভার কল্পনা।"

কুবলয়া মৃদু হাসিল,—"চিরকুমার নয়, এর নাম হবে চিরকুমারী সভা।

মুরা বলিল, "এ সভার নিয়ম কি হবে ?"

কুবলয়া বলিল "রোস, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে সব ঠিক করে দেখাচ্ছি।"

মুরা উঠিল, বলিল, "হলেই আমায় খবর দেবে, আমি ততক্ষণ পড়াটা দেখে নিই গিয়ে।"

সে চলিয়া গেল।

বোর্ডিংয়ে বাস করে ত্রিশটি মেয়ে, সকলেই ছাত্রী; কয়েকজন ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে, কয়েকজন সিক্সথ্‌ ইয়ারে, এবং বাকি কয়জন থার্ড ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

বেচারা হিন্দোলের দুঃখে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত। সকলেই পুরুষ জাতির উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়াছে এবং কি করিয়া প্রতিশোধ দেওয়া যায়, এই জাতিটাকে জব্দ করা যায়, এই চিন্তা করিতেছে।

সে দিন রবিবারে, বোর্ডিংয়ে এই প্রথম চিরকুমারী সভার অধিবেশন।

প্রেসিডেণ্ট মুরা সেন, বক্তা অর্থাৎ বক্ত্রী প্রায় সকলেই। বাহিরের মেয়েও কতককগুলি উপস্থিত হইয়াছে।

বক্তা হিসাবে মনের আশা মিটাইয়া বলা যাইবে বলিয়াই কুবলয়া প্রেসিডেণ্ট হয় নাই।

তীব্র উদ্দীপনাপূর্ণ জ্বলন্ত ভাষায় সে মেয়েদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া গেল। পুরুষ যেমনভাবে মেয়েদের

সহিত খেলা করিয়া প্রতারণা করিয়া শেষে পলায়, সে সবিস্তারে সে-সব কথা জানাইয়া দিল।

অবশেষে সে বলিল, "পুরুষের স্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে উঠছে, কারণ ওরা জানছে—মেয়েরা হাজার লেখাপড়াই শিখুক, অতি সহজে তাদের ভুলানো যায়, তাদের জয় করা যায়। ওদের এই ভুল দূর করবার জন্যেই আজ আমাদের এই চিরকুমারী সভার প্রতিষ্ঠা। আশা করছি, সমবেত সভ্যাবৃন্দা আমার কথার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিবেন, এবং যাতে আমরা ওদের সমান চলতে পারি, সে জন্যে চেষ্টা করবেন।"

মেয়েয়া সকলেই স্বীকার করিল, চমৎকার পরিকল্পনা হইয়াছে।

বৈজয়ন্তী সরকার ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সভার নিয়মাবলী কি ?"

কুবলয়া বলিয়া চলিল, "আমাদের এই সভার নিয়ম এই—মেয়েরা জীবনে বিয়ে করবে না, কোনও ছেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবে না ; প্রতি শনিবারে এ সভার অধিবেশন হবে, সেই সভায় মেয়েদের কিছু না কিছু বলতে হবে। আরও একটা বিশেষ নিয়ম এই রইল—কোনও বিবাহিতা মেয়ে বিয়ের অনুপকারিতা সম্বন্ধে এখানে বক্তৃতা দেবেন।

সকলে বলিয়া উঠিল—"সাধু সাধু।"

কুবলয়া একখানি খাতা টেবিলে রাখিয়া বলিল, "আপনারা কে কে আমাদের এই সমিতিতে যোগ দেবেন. তাঁদের প্রত্যেককে মাসে এক আনা হিসাবে চাঁদা দিতে হবে. আজ হতেই এই সভার কাজ আরম্ভ হল মনে করা যাক, আশা করছি এতে আপনাদের কোনও আপত্তি হবে না।"

দলে দলে মেয়েরা অগ্রসর হইয়া আসিল, টেবিলের উপর পয়সা জমিয়া গেল বিস্তর।

বেহুলা বসু জিজ্ঞাসা করিল "কেউ যদি ব্যতিক্রম করে, অর্থাৎ বিয়ে করে ?"

মীরা বলিল, "তাকে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিতে হবে।"

হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে বেহুলা বলিল, "বহুত আচ্ছা. দাও, নামটা লিখে দিই।"

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড, যাহার দুঃখে মেয়েদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, সেই হিন্দোল সকলের প্রথমেই নিজের নাম লিখিয়া দিয়াছিল, এবং এক আনা চাঁদার জায়গায় একটা টাকা দিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রবল উৎসাহে সভার কাজ চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন হইতে লাগিল, মেয়েরা পুরুষদিগের বিপক্ষে যথেষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বিবাহিতা ছাত্রী নিবেদিতা, অভ্র রায়, নমিতা বসু বিবাহের অনুপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানাইল।

কলেজের সকল ছাত্রীই এই সভার মেম্বর হইয়া গেল। ছেলেরা মেয়েদের ব্যাপার দেখিয়া হাসিল, বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না।

নর্ম্মদা দুই দলের মধ্যবর্ত্তিনী, নাম দিয়াছে বটে, কোন দিন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ায় নাই।

একদিন একটু হাসিয়া সে বলিল "আমার শুধু ভয় হচ্ছে, চিরকুমার সভা যেরকম ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়েছিল আমাদের চিরকুমারী সভা সে রকম না হয়।"

কুবলয়া উষ্ণ স্বরে বলিল, "কখনই তা হতে পারে না। আজ সেদিন নেই নর্মি মেয়েরা নিজেদের অবস্থা বুঝতে শিখেছে তারা ভয়ে এখন পিছোবে না, রীতিমত ফাইটের দরকার হলে তাও করে জানিয়ে দেবে তারা দুর্ব্বল নয়।

নর্ম্মদা নরম সুরেই বলিল, "সকল ছেলেই তো মর্ম্মর মিটার নয় কুবলয়া; এই যে আমাদের কাজ করে দিচ্ছে কিশলয়, মঞ্জীর, ইন্দ্রজিত আরও অনেকে, সত্যি করে বল— এরা সত্যি আমাদের দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করে কি না?"

মঞ্জীরের নামটা হইতেই কুবলয়া লাল হইয়া গেল, দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "ছেড়ে দাও ওদের কাণ্ড, ওদের মত যদি সকলে হ'তো, তা হলে আজ হিন্দোলের কষ্ট পেতে হ'তো না।"

খুব চুপি চুপি নর্ম্মদা জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা সত্যি বল কুবলয়া, মঞ্জীর নাকি তোমায় খুব ভালোবাসে, আর তোমারই জন্যে সে নাকি এই কাজে এসেছে ?"

ধমক দিয়া কুবলয়া বলিল "থাক্ নমি, জান আমি চিরকুমারী সভার সম্পাদিকা, ওসব ভালোবাসা প্রেম বিয়ে আমার শোনাও মহা পাপ ? আশা করছি তোমরাও ওদের বর্জ্জন করে চলবে, কেউ ওদের দিকেও তাকাবে না।"

ঠিক ইহারই দিন পনের পরে কুবলয়া, একখানি বাস হইতে নামিবার মুখে হঠাৎ বাস ছাড়িয়া দেওয়ায় পড়িয়া যাইতে যাইতে যাহার উপরে গিয়া পড়িল, একটু সম্বিত পাইয়া চাহিয়া দেখিল সে মঞ্জীর ছাড়া আর কেহই নয়। হাতের বই পেনসিল ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, মঞ্জীর সেগুলো কুড়াইয়া তাহার হাতে দিল, ভদ্রতার খাতিরেও কুবলয়া তাহাকে একটা ধন্যবাদ দিল না, নিঃশব্দে পিছন ফিরিল।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় পথ দিয়া চলিতে তিনজন বদ লোক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। গলি পথে একখানা গাড়ী পর্য্যন্ত নাই, কুবলয়া সত্যিই ভীতা হইয়া উঠিয়াছিল। গলির মোড় ফিরিবার মুখে সেই তিনজন লোক একেবারে যখন তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল তখন একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটি একগাছি সরু লিখলিকে বেত হাতে আসিয়া দাঁড়াইল সেও সেই মঞ্জীর।

তাহার সুদীর্ঘ সুগঠিত মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই দুর্ব্বৃত্তেরা পলাইয়াছিল। মঞ্জীর বলিয়াছিল, "চলুন, আপনাকে বোর্ডিং পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, নইলে ওরা আবার পথে আপনাকে ধরতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিংয়ের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিবার সময় সে বলিয়াছিল, 'একটু করে ডাম্বেল টাম্বেল ভাঁজবেন মিস চৌধুরী, গায়ের জোরটা আগে দরকার কি না, সেই জন্যেই কথাটা বললুম ; এতে কিছু দোষ ভাববেন না যেন।"

কুবলয়া ভাবিয়া পায় না, সে যেখানেই যায় সেইখানেই মঞ্জীরকে দেখিতে পায় কেন ? লোকটার সঙ্গ এড়াইবার জন্য সে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

হঠাৎ সেদিন সঞ্চিতা রায় আসিয়া খবর দিল, "হিন্দোলের বিবাহ, পাত্র মর্ম্মর বসু—"

সেদিন সমিতির বিশেষ অধিবেশন ; সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ।

সকলেই স্তম্ভিত। এ-ও কি সম্ভব ? সেই নিষ্ঠুরহৃদয় লোকটাই, এই সমিতি যাহাকে লইয়া গঠিত সেই হিন্দোলকে বিবাহ করিতেছে।

সভা জমিল না।

পরদিন সকালে ফাইন পঞ্চাশ টাকা ও মর্ম্মরের এক পত্র আসিয়া পড়িল।

সম্পাদিকা কুবলয়া পত্রখানা পড়িল না, মুরার গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া রক্তচোখে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'তুমিই পড় মুরা, আমার পড়ে দরকার নেই।"

মুরা পত্র পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মর্ম্মর স্পষ্টই পত্রে লিখিয়াছে, এ সমিতি চলিতে পারে না কেন না মেয়ে এবং ছেলে—ইহারা পরস্পবের বিরুদ্ধে প্রতি সপ্তাহে এতখানি করিয়া গরল উদ্গীরণ করিয়া টিকিতে পারে না। চিরকুমার সভার প্রত্যেক সভ্য নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়া বাঁচিয়াছিল, চিরকুমারী সভার প্রত্যেক সভ্যারই অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দেওয়া দরকার।

মুরা ক্ষীণকণ্ঠে একবার কি বলিতে গেল, কুবলয়া ধমক দিয়া বলিল, "যাক্ মুরা, ওর হয়ে আর সাফাই গেয়ো না। এই পঞ্চাশ টাকা আমাদের জমা হোক, আশা করি এ রকম ফাইন নেওয়া আমাদের এই প্রথম আর শেষ।"

মুরা বলিল, "শুনছি আমাদের নমি, সঞ্চিতা এরাও নাকি ফাইনের টাকা যোগাড় করেছে।"

গর্জ্জন করিয়া কুবলয়া বলিল, "এইসব মেয়েগুলো নাম দিয়েছে কেন তাই ভেবে পাই নে! কিন্তু যাই হোক মুরা আমরা আমাদের আদর্শ নষ্ট করব না, যা নিজেদের হাতে গঠন করেছি তাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই।"

মুরা ভাবিয়া পায় না, সব মেয়ে চলিয়া গেলে কেমন করিয়া তাহারা এই সভাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

মাস সাতেক পরে দেখা গেল, পুরাতন মেয়ে অনেক বিদায় লইয়াছে, নূতন কয়েকটি মেয়ে তাহাদের স্থান দখল করিয়াছে।

কুবলয়ার উৎসাহ তাহাতে নষ্ট হয় না, কিন্তু বেচারা মুরা দিন দিন মলিন হইতেছিল। একদিন তাহার এই মলিন ভাবটা কুবলয়ার চোখে পড়িয়া গেল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় দিন দিন এ রকম বিমর্ষ দেখছি যে মুরা, ব্যাপারখানা কি ?"

দুষ্টা দীপালি বলিয়া দিল, "মুরার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। অসমঞ্জ চৌধুরীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্ত্তা অনেক দিন হল ঠিক হয়ে আছে। তিনি এতদিন জার্ম্মাণীতে ছিলেন, সম্প্রতি ফিরে এসে মুরাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছেন।

কুবলয়া যেন চমকিয়া উঠিল, "সে কি মুরা, শেষটায় তুমিও বিয়ে করবে ?"

মুরা মাথা নত করিল, "উপায় নেই।"

কুবলয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "উপায় নেই কি রকম ? তুমি জোর করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও চীৎকার করে বল, আমি বিয়ে করব না, পুরুষের হাতের পুতুল হব না।"

মুরা মুখ তুলিল, তাহার মুখে যে মৃদু হাসি ফুটিয়াছিল তাহার পানে তাকাইয়া কুবলয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ইহারই কয়েক দিন পরে যেদিন চিরকুমারী সভার সভানেত্রী মহাশয়ার শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণ আসিল, সেদিন

দারুণ ঘৃণায় লজ্জায় কুবলরা কলিকাতায় টিকিয়া থাকিতে পারে নাই, সকালেই দমদমায় সম্পর্কীয়া ভগিনীর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, চিরকুমারী সভার অগণ্য সভ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে মাত্র তিনজন, সম্পাদিকা নিজে ও আর দুইটি মেয়ে মাত্র।

কুবলয়া তবু এই সমিতির কঙ্কালটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।

সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়, যে-সব পুরুষ চিরদিন মেয়েদের অবহেলা করিয়া আসিতেছে, পুতুলের মত যাহাদের লইয়া খেলিতেছে, সব জানিয়া শুনিয়াও কেন মেয়েরা তাহাদেরই ভালোবাসে, তাহাদেরই বিবাহ করে, তাহাদেরই সন্তানের মা হয়।

বেচারা মঞ্জীর —

সে আজও চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়। তাহার মুখখানার পানে তাকাইয়া কুবলয়ার মনে অনেক কথাই জাগিয়া উঠে, কৃতজ্ঞতা জানাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখনই মনে হয় কৃতজ্ঞতারই আর একটা রূপ প্রেম—অর্থাৎ ভালোবাসা, আর তাহার পরিণতি হয় বিবাহে।

কুবলয়া সতর্ক হয়, থাক্, দরকার নাই কৃতজ্ঞতা জানানোতে, কখন পা পিছলাইবে কে জানে।

দুইটি সভ্যাকে লইয়াই সে জয়ের পথে চলিবে কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাহারাও খসিয়া পড়িল।

সত্যই সে দিন কুবলয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুদ্ধ রোষে সে গর্জ্জিতে লাগিল, মেয়েরা এইরূপ লতার মত পরাশ্রয়া বলিয়াই না পুরুষ তাহাদের লাঞ্ছিতা করে। ইহাদের সবল করিয়া তুলিবার উপায়ই বা কই, সবল হইতে চাহেই বা কে ?

নিজেকে লইয়া সে কি করিবে, কোন পথে চলিবে ? যখন সে তাহাই ভাবিতেছিল ঠিক সেই সময়ে মঞ্জীর আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল এবং মৃদু কণ্ঠে জানাইল, সে কুবলয়ার পিতার অনুমতি পাইয়াছে, এখন কেবলমাত্র তাহার মত পাইলে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

একটি উত্তর কুবলয়ার মুখে ফুটিল না, সে শুধু গভীর বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে এই ছেলেটির পানে অপলকদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

একদিনকার সন্ধ্যা।

একদিন যাহারা চিরকুমারী সভার সভ্যা ছিল সকলেই একত্র হইয়াছে !

মুরার কোলে তিনমাসের শিশু।

কুবলয়ার সিঁথিতে সিঁদুর, মুখখানা দৃপ্ত।

ছেলেটিকে কুবলয়ার কোলে ফেলিয়া দিয়া মুরা বলিল, "মাগো, আমরাই না হয় দল ছাড়লুম, তুই কি বলে ছাড়লি কুবলয়া ?"

কুবলয়া মৃদু হাসিল, বলিল, "পথটা দেখালে কে বল দেখি ? অনেক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই চিরকুমারী সভা গড়ে তুলেছিলুম, ভেবেছিলুম বাংলার সমস্ত মেয়েদের সহানুভূতি পাব, আমাদের সভার মঙ্গল উদ্দেশ্য সকলের কাণে গিয়ে পৌঁছোবে। হাতে গড়া জিনিষটা ভাঙ্গার জন্যে সত্যি তোমাদের 'পরে আমার এত রাগ হচ্ছে—যা বলতে পারি নে।"

সঞ্চিতা বলিল, "দোষ কিন্তু হিন্দোলের, ও যদি টিঁকে থাকত, আর কোন মেয়ে যেতে পারত না।"

নর্ম্মদা বলিল, "এ জন্যে হিন্দোলকে পেনালটি দেওয়া দরকার।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া হিন্দোল বলিল, "বেশ, কতবার করে পেনালটি নিতে হবে ?"

বৈজয়ন্তী বলিল, "যতবার দেবে ততবার।"

বেহুলা বলিল, "তা হলে সকলকেই দিতে হয়। আমাদের সভানেত্রী আর সম্পাদিকা মহাশয়াকে বেশী রকম পেনালটি দিতে হবে কেন না চিরকুমারী সভার পরিকল্পনা ওঁরাই করেছিলেন, আর ওঁরা যদি টিঁকে থাকতেন, তা হলে কোনদিন না কোনদিন চিরকুমারী সভার শাখা আমারা প্রতি সহরে, এমন কি প্রতি গ্রামে গ্রামে দেখতে পেতুম।"

মুরা হাসিয়া বলিল, "তাই বটে, যত দোষ নন্দ ঘোষ। তোমরা থাকলে তবে তো সভানেত্রী আর সম্পাদিকার অস্তিত্ব থাকবে? তোমরাই যদি না থাকলে আমরা থেকে কি করব?"

রাবীন্দ্রিকা মিত্র বলিল, "তবু তো কাঠামোখানা থাকে।"

কুবলয়া বলিল, "শুধু কাঠামোখানা থেকে লোকের মনে স্মৃতির বেদনা জাগিয়ে তুলত ভাই, সেইজন্যে আমিই আজ নিজের হাতে তৈরী কাঠামোখানা পুড়িয়ে ছাই করে ফেললুম।"

তাহার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, ছাদের উপর সকলের খাবার জায়গা হইয়া গিয়াছে।

মেয়েরা উঠিয়া পড়িল।

কুবলয়াকে টানিয়া লইয়া চলিতে চলিতে মুরা তাহার কাণের কাছে সুর করিয়া গাহিল—

প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি,
সেই তো আমার জয়—

কুবলয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল, "যাঃ!"

তাহার পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া মুরা বলিল, "আজ ঠেলে দিচ্ছিস, কিন্তু দুদিন বাদে নিজেই বলবি

নিতি তব পাশে মানি পরাভব,
সেই যে মোর জয়গরব,
অপরে ঘোষিলে জয়রব,
সে যে চিত্তে বিঁধি রয়।"

সকল মেয়ে হাসিয়া উঠিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

অনেক সনাতনধর্ম্মী আছেন যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাসী। আন্তরিক বিশ্বাস শ্রদ্ধার জিনিষ। তাহা যুক্তিতর্কের বাহিরে। কথা তাহাদের লইয়া নয়, কেন-না যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা নিতান্ত নৈষ্ঠিক হইলেও অপরের বিচারসম্মত সিদ্ধান্তে অথবা যুক্তিসম্মত মতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন না। নিজেদের নিষ্ঠা এবং আচারের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও তাঁহারা পরমতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। ধার্ম্মিক শাস্ত্রবিশ্বাসী এবং ধর্ম্মধ্বজীর মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। আমারা নৈষ্ঠিক সনাতন-ধর্ম্মীদের কথা বলিতেছি না, ধর্ম্মধ্বজীদের কথাই বলিতেছি।

*　　*　　*

সনাতনধর্ম্মধ্বজীরা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছেন। সারাদেশে বক্তৃতামঞ্চে কাগজে কলমে ও কার্য্যক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান চলিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় প্রবল এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই শাস্ত্রজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান ধর্ম্মধ্বজীদের চেয়ে বেশী, তাহার উপর এমন একটি লোক ছুঁৎমার্গের জড় মারিবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন, যাঁহাকে দুনিয়াশুদ্ধ লোকে শ্রদ্ধা করে এবং যাঁহাকে অহিন্দু বা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নয়।

*　　*　　*

এখন খোলাখুলিভাবে অস্পৃশ্যতার সমর্থন করিতে পারা যায় না, তবে অন্য উপায়ে প্রচারকার্য্য চালানো যায়।

মহাত্মা গান্ধীর দশ বারো বছর আগেকার লেখাগুলি আবশ্যক-মত কাটিয়া ছাঁটিয়া উদ্ধৃত করিয়া, তিনি যে বর্ণাশ্রম তথা জাতিভেদের উপর আস্থাবান ইহা সময়ে অসময়ে লোকের কাছে ঢাক পিটাইয়া জানানো যায়। এবং যেহেতু স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্যতা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেহেতু মহাত্মা গান্ধী পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতার সমর্থক ছিলেন এবং সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে মত বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন, পাঠকের মনে এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যাইতে পারে। তিনি যে একযুগ আগেও জোরালো এবং স্পষ্ট ভাষায় অস্পৃশ্যতার সমূলে উচ্ছেদ কামনা করিয়াছেন, সে কথা চাপিয়া গেলেই হইল।

* * *

গোঁড়া সনাতনপন্থীদের মুখপত্রস্বরূপ একখানা নামজাদা বাংলা খবরের কাগজ এই সকল অর্ব্বাচীন কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। সেজন্য আমরা ১৯২০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে মহাত্মা গান্ধীর লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সংকলন করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে বারো বছর আগেও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি ছিল তাহা পরিষ্কার জানা হইবে।

* * *

"ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজের মারফৎ আমি অনেকদিন হইতেই চতুর্ব্বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমার

ধারণা এই যে অস্পৃশ্যতা মানবতার পরিপন্থী একটি মহাপাপ। অস্পৃশ্যতা সংযমের প্রতীক নহে, বরং ইহা শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধাসূচক দাবী। ইহা দ্বারা দেশের কোন লাভ হয় নাই। হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে উচ্চবর্ণের যে কোন লোকের সমকক্ষ, এবং যাঁহারা সমাজের নানা বিভাগে অত্যাবশ্যক সেবা দিয়া আসিতেছেন—তাঁহাদিগকে এই পাপ বহুদিন হইতে দাবাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম যত শীঘ্র এই পাপ হইতে মুক্ত হয় ততই মঙ্গল। এমন কোন যুক্তির কথা আমি জানি না যাহা ইহার স্বপক্ষে দাঁড় করানো যাইতে পারে। যদি ইহার স্বপক্ষে কোন মনগড়া শাস্ত্রের বিধি খাড়া করা যায় তবে তাহা দ্বিধাহীনচিত্তে বর্জ্জন করিব। প্রমাণ শাস্ত্রসম্মত হইলেও যদি বুদ্ধি ও বিবেকের পরিপন্থী হয় তবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিব।”

* * *

অস্পৃশ্যতার প্রচ্ছন্ন সমর্থক অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন, অস্পৃশ্যতার মধ্যে ঘৃণার বা স্পর্দ্ধার ভাব নাই, ইহাতে সমাজের অনিষ্ট হয় না। যথা, বিধবা মা ছেলেমেয়ের হাতে খান না, তাহাতে ইহা বুঝায় না যে মা ছেলেমেয়েকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন। উদাহরণটি শুনিতে বেশ, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলেই ইহার অসঙ্গতি ধরা পড়িবে। মা ও ছেলেমেয়ে এক পরিবারভুক্ত, ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও

উপর সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন না। কাজেই এক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার কারণ ঘৃণা নয়, শুচিতা সম্বন্ধে সংযম, তাহা বেশ বুঝা যায়। পুত্র কন্যার হাতে খাইলে কোন প্রত্যবায় নাই, কেবল শুচিতা নষ্ট হয়, এই যা দোষ। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ চাঁড়ালের হাত খান না, তখন কারণটা অন্য রকম। চাঁড়ালের হাতে খাইলে পাতিত্য ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আছে একটা যুক্তি-নিরপেক্ষ শুচিতার সংস্কার মাত্র। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহা ত আছেই, উপরন্তু আছে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। পাতিত্য অর্থেই শ্রেষ্ঠস্থান হইতে পতিত বা ভ্রষ্ট হওয়া। এই ধারণা হইতে অবজ্ঞা, অবজ্ঞা হইতে ঘৃণা, ও ঘৃণা হইতে সামাজিক উৎপীড়নের উৎপত্তি।

* * *

সমাজের সেবার জন্য অনেক জাতিকে নোংরা কাজ করিতে হয়। তাহারা যখন নিজবৃত্তিরত থাকে তখন তাহাদিগকে ছুঁইতে প্রবৃত্তি না হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মেথর বা মুর্দ্দাফরাস যখন স্নান করিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিয়া আমার পাশে বসে, তখনও তাহাকে ছুঁইতে আপত্তি করাতে আমার যুক্তিহীন অন্ধসংস্কারের বা মজ্জাগত ঘৃণার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

* * *

অস্পৃশ্য জাতিদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালনের সূচনা মাত্র হইয়াছে, আসল কাজ এখনও সবই পড়িয়া আছে।

ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে আমরা এ কথা যেন ভুলিয়া না যাই যে আমাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাইয়া খাইতে দিলেই বা মন্দিরে ঢুকিতে দিলেই তাহারা কৃতার্থ হইবে না। এটুকু অধিকার ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাহাদের উপর যে পর্ব্বতপ্রমাণ অন্যায়ের বোঝা চাপাইয়াছিলাম তাহা হইতে দুইটা 'শাকের আটি' মাত্র নামাইয়া লইয়াছি! ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়তনে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা তাহাদের দাবীর ন্যায্যতা এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের সমকক্ষতা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত কিনা এ প্রশ্নের কাছে পংক্তি-ভোজন বা মন্দিরপ্রবেশের অধিকার দিবার কথাটা নিতান্তই গৌণ। ডাক্তার আম্বেদকারও সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন।

* * *

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই, বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে হিন্দু সমাজের অসংখ্য লোককে বর্ণাভিমানীরা এখনও মানুষের নিম্নতম অধিকারগুলিও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নন। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি যাহা বাংলা দেশের লোকের কাছে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে। এখনও মাদ্রাজ প্রদেশে অনেক গ্রামে কোন পঞ্চম বর্ণের লোককে সাধারণের রাস্তা দিয়া চলিবার সময় চীৎকার করিয়া জানাইতে হয়, "স্বামী, সরিয়া যান, এই রাস্তা দিয়া পঞ্চম আসিতেছে।" পাছে তাহারা রাস্তায় থুতু ফেলে ও সেই থুতু মাড়াইয়া উচ্চ

বর্ণের লোকের পাতিত্য ঘটে, সেইজন্য তাহাদের গলায় একটা ভাড় বাঁধিয়া চলিতে হয়! পঞ্চম বর্ণেরও আবার কতকগুলি শ্রেণী বিভাগ আছে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদার (?) তারতম্য আছে। এই সকল জায়গায় স্থানীয় স্মৃতিশাস্ত্রে কোন্ উচ্চ বর্ণের লোক পঞ্চম বর্ণের কোন্ শ্রেণীর লোকের দ্বারা কত হাত দূর হইতে অশুচি হইতে পারে তাহার লম্বা তালিকা দেওয়া আছে। মফঃস্বলের ছোট খাট আদালত বা পঞ্চায়তে কোন পঞ্চমের সাক্ষ্য লওয়া দরকার হইলে এবং হাকিম অথবা পঞ্চায়তের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ থাকিলে তাঁহাকে আদালত হইতে নিয়মানুযায়ী দূরত্বে দাঁড় করানো হয় এবং আদালত ও সাক্ষীর মধ্যে লোকের ডাক (relay) বসাইয়া তাহাদের মুখে মুখে জবানবন্দী সওয়াল ইত্যাদি আদান প্রদান করা হয়। এই পঞ্চম বর্ণের লোককেই শঙ্করাচার্য্য "চলমানঃ শ্মশানঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

* * *

অস্পৃশ্যতাবাদের মূলে আছে নিছক্ কুসংস্কার। যুক্তি বা বিবেক ইহাকে অনুমোদন করে না। শ্রুতিতে কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। কল্পসূত্রাদি স্মৃতি যাহা হইতে পরবর্ত্তী যুগে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে—তাহাতেও কোন উল্লেখ নাই।

* * *

স্ত্রী ও শূদ্র যে বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণাদির সহিত সমান অধিকার পাইতেন এবং কল্পসূত্রের যুগ হইতেই যে অবস্থার

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১২ ঋক্কের অনুবাদ :—

পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ শূদ্র হইল।

২। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের ২ ঋকের অনুবাদ :—

(বেদকর্ত্তা) আমি যেমন সর্ব্বলোকের জন্য এই পরম কল্যাণী বেদবাণী বলিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ, রাজন্য (ক্ষত্রিয়), অর্য্য (বৈশ্য) ও শূদ্রকে হিতকথা বলিবে। উব্বট ও মহীধর তাঁহাদের "মন্ত্র" ও "বেদদীপভাষ্যে" হিতকথার ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় চতুর্ব্বর্ণের বা জাতির সমঅধিকার আছে বলিয়া বুঝা যায়।

৩। স্ত্রী ও শূদ্র বেদের সূক্তের রচয়িতা। ঋক সংহিতার ৫ম মণ্ডলের ২য় অনুবাকের ২৮ সূক্ত বিশ্ববারার রচিত। ইনি অত্রিমুনির গোত্রোদ্ভব। অত্রিমুনি সঙ্করবর্ণ।

৪। ঋক সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের ৫টি ঋকের রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ।

৫। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋক সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮টি মন্ত্রের রচয়িত্রী।

৬। অপালা ব্রহ্মবাদিনী ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ৮টি ঋক্ রচনা করেন।

৭। পণ্ডিতমিত্রের কন্যা মৈত্রেয়ীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বহুস্থান মৈত্রেয়ীর জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বলীকৃত। মিত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের ইনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

৮। "দাসীপুত্র" কবষ ঋষিত্ব লাভ করিয়া ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩০—৩৪ সূক্তের রচয়িতা হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র তুর পরীক্ষিত পুত্র জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষেকের ক্রিয়া সম্পাদন করেন। (কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ১১১ দ্রষ্টব্য।)

৯। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকে রৈক্কঋষি জ্ঞানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র জানিয়াও তাহাকে বিদ্যা দান করেন। আরও বহু বহু প্রমাণ আছে যাহা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

ছুঁৎমার্গীর মনোবৃত্তি বুঝিতে হইলে আধুনিক মনো-বিজ্ঞানের গোটা কয়েক মূল তত্ত্বের আলোচনা করা দরকার। বারান্তরে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—বিদুর—

১ম বর্ষ] ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ [২০শ সংখ্যা

প্রহসন

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়]

মা-বাপ কি নাম রাখিয়াছিলেন, জানি না; মেশের সকলে তাকে বলিত, বৃকোদর!

চেহারায়, পৌরাণিক যুগের বীর-বৃকোদরের সহিত মিল আছে, এমন কথা কেহ বলিবে না। বীর-বৃকোদরের সহিত সাক্ষাৎ কাহারো না হইলেও তাঁর বর্ণনা তো পড়িয়াছি, এবং বাংলা ষ্টেজে যে-সব সাজা বৃকোদরের দেখা পাই, তাদের কাহারো সঙ্গে কোথাও শরীর-গত মিল নাই! বুদ্ধির ব্যাপার লইয়া খুব অনেকখানি প্রাচুর্য্যের সিম্বল-স্বরূপ একদা তার নাম রটিল, বৃকোদর। সেই অবধি তার বৃকোদর নামটাই বাহাল রহিয়া গেল।

এ-নাম সে অবশ্য স্বীকার করিত না। মাসিকে-সাপ্তাহিকে নিত্য সে কবিতা ছাপাইত, গল্প ছাপাইত, এবং কত-কি প্রবন্ধ ; সেগুলির নীচে দস্তখৎ করিত, পলাশ সেন।

আমি তখন দু'দুবার বি-এ ফেল করিয়া পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একটা মার্চ্চেন্ট অফিসে এপ্রেণ্টিশিতে ঢুকিয়াছি,—পলাশ আমার রুম-মেট্। কাগজে কাগজে রচনা ছাপাইবার ফলে বাতাসে যে ইমারৎ সে রচনা করিত, তার আদ্‌রা প্ল্যান আমার অবিদিত ছিল না—তার খুঁটিনাটী নানা বর্ণনায় আমাকে সে চকিত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত।

আমি নিঃশব্দে বিনা-তর্কে তার সে বর্ণনায় সায় দিয়া যাইতাম। বেচারী! সে যদি আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া আনন্দ পায়, আমার তাহাতে কি ক্ষতি! কাজ কি, বেচারীর কল্পনার সেই রঙীন ফানুশ নির্ম্মম আঘাতে ফাশাইয়া দিয়া! এই কারণেই আমার উপর তার বিশ্বাস ছিল অটল, এবং বহু সময়ে নির্ভরও যে না করিত, এমন নয়!

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অফিস হইতে ফিরিয়াছি—ফিরিয়া শেল্‌ফের উপর পলাশের জড়ো-করা এক রাশ্ বাংলা সাপ্তাহিকের মধ্য হইতে একখানা কাগজ টানিয়া পড়িতে বসিলাম। মেশের দাসী (সাবিত্রী নয়!) মানদা আসিয়া কাঁশিতে মুড়ি ও কচি শসা ধরিয়া দিয়া গেল ; মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে সাপ্তাহিক কাগজের দেশ-সমস্যা-সমাধানের

স্মরগর্ভ উপায়াদির গহনে মনকে ছাড়িয়া দিয়াছি এমন সময় পলাশ আসিয়া ডাকিল --নিতাই দা .....

আমি তার পানে চাহিলাম, কহিলাম—কি ?

পলাশ কহিল—তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলুম! তুমি আজ সকাল-সকাল এসেচো—ভালোই হয়েচে!

সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম,—কেন বলো তো ?

পলাশ কহিল —জাইগান্টিক থিয়েটারের দুখানা টিকিট পেয়েচি। পাঁচ টাকার শীট্—নতুন নাটক খুলচে, 'ঘটোৎকচ'—শুনেচি ভারি গ্র্যাণ্ড। ন্টু দত্ত সাজচে ঘটোৎকচ! যাবে ?

সাপ্তাহিক কাগজে এইমাত্র একালের হোমরা কবি উমাকান্ত তলাপাত্রের লেখা কবিতায় পড়িতেছিলাম—পুলকের প্লাবন! পলাশের মুখে-চোখে যেন সেই প্লাবন লাগিয়াছে! আমি কহিলাম, কটায় থিয়েটার ভাঙ্গবে ?

পলাশ কহিল—রাত একটায়। তার বেশী প্লে হবার নয় - জরিমানার ভয় আছে।

আমি কহিলাম—বেশ। যাবো।

পলাশ কহিল—আরো একটু কথা আছে .....

পলাশ তক্তাপোষে বসিল, বসিয়া পকেট হইতে একখানা সবুজ রঙের ছাপা 'প্রবেশ-পত্র' বাহির করিয়া কহিল—এই ত্যাখো দুটো শীট্ -'প্রথম শ্রেণী'।

তার আনন্দ-গদ্গদ ভাব তখনো কাটে নাই! আমি কহিলাম—কিন্তু ও কি বই? ঘটোৎকচ!

পলাশ কহিল,—বুঝচো না? এই যে democratic movement দেশে চলেছে—পৌরাণিক ঘটোৎকচকে একেবারে মডার্ণ ইভলিউশনের ছাঁচে ঢালা হয়েচে কি না! প্লে দেখলেই বুঝবে। এখন যে কথা বলছিলুম—

আমি কহিলাম—বলো।

পলাশ কহিল 'গম্বুজ' সাপ্তাহিক আছে, জানো তো! কাগজখানার আজকাল ভারী পশার। সেই গম্বুজের সম্পাদক হলেন নবকুমার রক্ষিত। নবকুমারবাবুর এক সাকরেদ বক্কেশ্বর প্রামাণিক—'গম্বুজে' সে-ই নাট্য-সমালোচনা লিখতো; তার সঙ্গে নবকুমার বাবুর একটু মনান্তর ঘটেচে—একটা সমালোচনা দিয়ে। সে এক মস্ত episode—আর এক সময়ে বলবো। কাজেই নাট্যসমালোচনা লেখবার লোক পাচ্ছে না। আমায় বলেচেন,—আমি ভার নিয়ে বসেচি। তাই এই টিকিট আমাকে নবকুমারবাবু পাঠিয়ে দেছেন।

আমি কহিলাম—ভালো। থিয়েটার দেখার সঙ্গে 'টু-পাইস' আসচে তাহলে?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পলাশ কহিল—পয়সা পাবো না—এ্যামেচার! তবে এর পরে সব থিয়েটারের দ্বার হবে অবারিত—ভালো শীট্, সেই সঙ্গে চা-চপ-কাটলেট্—একটা অন্তরঙ্গতা!

চাই কি, মস্ত একটা সুযোগ পাবো—যদি কখনো নাটক-টাটক লিখি—নয় ?

থিয়েটারী-পলিটিক্সের কোনো সংবাদ রাখি না, কহিলাম,—এমনি করেই নাট্যকারের পদে আজকাল প্রোমোশন হয় বুঝি ?

হাসিয়া পলাশ কহিল,—এক-রকম তাই বৈ কি ! ষ্টেজটাকে ষ্টাডি করবার সুযোগ মেলে ! ঐ যে মনসা মিত্তির—'গন্ধমাদন' নাটক লিখে সদ্য বেনিফিট-নাইট পেলে, সে তার প্রথম জীবনে ছিল, 'নাট্যামোদ' কাগজের সম্পাদক। তার কাজই ছিল, অক্টোপাশ থিয়েটারের নাট্য সমালোচনায় মধু বৃষ্টি করা। তার ফলে অক্টোপাশে আজ সে নাট্য-সম্রাট !

বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি নির্ব্বাক নেত্রে পলাশের পানে চাহিয়া রহিলাম।

পলাশ আরো অনেক কথা বকিয়া চলিল। সেদিকে আমার মন ছিল না। আমি শুধু ভাবিতেছিলাম, কাল সকালে অফিসের বড় বাবুর গৃহে যাইবার কথা আছে—তাঁর ছেলেটিকে খানিকক্ষণ অঙ্ক কষাইতে হইবে—টিউটরটা দেশে গিয়াছে ভালো নূতন টিউটর পাওয়া যাইতেছে না—তাই ! ভাবনা হইল, রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখার দরুণ যদি সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় ! তবু......

বিনা-পয়সায় পাঁচ টাকার শীটে বসিয়া থিয়েটার দেখা—সে লোভ সম্বরণ করা কত কঠিন, আমার মত দশায় যাঁরা পড়িয়াছেন তাঁরাই শুধু বুঝিবেন!

পলাশ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঝীকে ডাকিয়া বামুনকে ডাকিয়া নিমেষে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল। পাশের ঘরের ত্রিগুণাবাবু আসিয়া কহিলেন—কিহে বৃকোদর, আমরা কি এমন দুঃশাসন হয়ে উঠেচি যে আমাদের রক্তপানে লালায়িত হয়ে উঠলে!

পলাশ কহিল—ঘটোৎকচ দেখতে যাচ্ছি জাইগান্টিকে ঐ।

হাসিয়া ত্রিগুণাবাবু কহিলেন—ঘটোৎকচ! তাই বলো! তাই বীর বৃকোদর এমন উচ্ছ্বসিত!

কথাটার রস সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পলাশ বিস্ময়াবিষ্টের মত আমার পানে চাহিল। হাসিয়া আমি কহিলাম—তামাসা করচে। ঘটোৎকচের বাবা ছিলেন মধ্যম পাণ্ডব, বীর বৃকোদর কি না! তাই।

২

ঘটোৎকচ প্লে মন্দ লাগিল না। পুরাণকে ছাঁটিয়া-কাটিয়া যে মাল ধরিয়া দিয়াছে, বাহাদুরী আছে! অর্থাৎ হিড়িম্বা রাক্ষস-রাজের কন্যা—কিশোরী কন্যা। রাক্ষসগুলা জাতিচ্যুত, তাই মানুষের প্রতি তাদের বিদ্বেষের অন্ত নাই। মানুষ পাইলেই খাইয়া বসে। হিড়িম্বা তো সেই রাক্ষসেরই মেয়ে! সেও মানুষের যম!

বৃকোদর বনের পথে শ্রান্ত দেহ মেলিয়া এক বৃক্ষতলায় নিদ্রিত—মানুষের গন্ধ পাইয়া কিশোরী হিড়িম্বা সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু খাইবে কি! দশন মেলিবামাত্র ওষ্ঠ মুদিত হইল। হিড়িম্বা মজিল! বৃকোদরের মাথা ধূলায় লুটাইতেছে দেখিয়া নিজের কোলে সে-মাথা তুলিয়া এক তরুতলে সে বসিল—বসিয়া গজল সুরে একখানি গান যা গাহিল, সত্য সে গান, সে সুরের তুলনা নাই! কটা ছত্র মনে গাঁথিয়া আছে!

জাগ্ গো জাগ্ গো, এ দিল্ পাক্ গো
হরষ-বন্যার প্লাবন খুব-খুব!
এ বন-জঙ্গল, প্রণয়-মঙ্গল-
সায়র—তায় আজ দিই গো দিই ডুব!

গান থামিলে বীর বৃকোদর জাগিলেন, এবং জাগিয়া তিনিও একখানা গান ধরিয়া দিলেন। তারপর বাপের সঙ্গে বাধিল হিড়িম্বার দারুণ বিরোধ। ওদিকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভীমের তর্কও শেষ হয় না! এই তর্ক আর বিরোধ লইয়াই নাটক ফাঁপিয়া জমাট্ বাঁধিয়াছে।

যুধিষ্ঠির বলেন—সে যে রাক্ষসী!

ভীম বলে—তরুণী! তার প্রেম! তার ভালোবাসা! ভালোবাসার জাতি নাই, আইন নাই, নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই! চিত্ত যখন অপর চিত্তের দ্বারে কাঙাল হয়, তখন সে কাঙালকে ঘৃণা নয়, তার পাত্রটিকে পূর্ণ করিয়া দেওয়া চাই!

এমনি ভালো ভালো বেশ লাগসৈ কথা! একালের সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে গবেষণাত্মক যত কিছু জ্ঞানের কথা নিত্য পড়ি, সেগুলা নাট্যকার আশ্চর্য্য কৌশলে এই ভীম-হিড়িম্বার মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন!

পটক্ষেপ হইলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে পলাশ কহিল—একেই বলে আর্ট! পুরাণের ভীম-হিড়িম্বাকে সর্ব্বকালের নায়ক-নায়িকায় রূপান্তরিত করেচে! লেখকের অদ্ভুত শক্তি!

শক্তি-সম্বন্ধে আমারো সংশয় ছিল না শক্তি না থাকিলে 'ঘটোৎকচ' নাটকের অভিনয় দেখিতে এত লোকই বা এ-থিয়েটারে আসিয়া জুটিবে কেন?

ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়া রাখার ফলে পরের দিন বড় বাবুর গৃহে হাজিরা দিতে কোনো ত্রুটি ঘটে নাই। সেখান হইতে বাসায় ফিরিলাম, বেলা তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি, পলাশ তার তক্তাপোষের বিছানায় পড়িয়া বুকের নীচে বালিশ ঠাশিয়া কি লিখিতেছে। পাশে এক-রাশ লম্বা স্লিপ কাগজ। জুতা-জামা ছাড়িয়া একটা বিড়ি টানিয়া স্নান করিতে যাইতেছি, পলাশ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল; বসিয়া শ্লিপগুলা জড়ো করিয়া ডাকিল,—নিতাইদা—

থমকিয়া দাঁড়াইলাম; পলাশ কহিল—অভিনয়ের সমালোচনা লিখলুম—তোমাকে শোনাবো।

আমি কহিলাম—ও যে অনেকখানি। নেয়ে-খেয়ে বসে শুনলে চলবে না?

পলাশ কহিল,—না। মানে, এখনি এ কাপি প্রেশে দিয়ে আসতে হবে। ওদের কাগজ বেরোয় বুধবার প্রুফ দেখতে হবে, এইবেলা কাপি প্রেশে না দিলে এ-হপ্তায় ছেপে বার করা যাবে না।

নাছোড়বন্দা! আমারো একটা কৃতজ্ঞতা আছে তো! অগত্যা বসিতে হইল।

পলাশ বক্তৃতা সুরু করিল—প্রথম দিকে নাটকটাকে বুঝোবার চেষ্টা করেচি। হতভাগা দেশ! পুরোনো ভাবে মশগুল আজো! নবভাব, imagination কিছুই নেই! পৌরাণিক যুগকে মডার্ণ যুগে এনে এই রূপ দেওয়ায় লেখক কি আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়েচেন, সেটুকুর তারিফ না করলে লেখকের উপর অবিচার হবে। এই ব্যাখ্যার পর অভিনয়ের সমালোচনা করেচি।

শ্লিপ লইয়া সে পড়িতে যাইতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া তাহা রাখিয়া পলাশ কহিল আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় নিতাই দা ?

পলাশ থামিল। কি মনে হয়, না বুঝিয়া আমিও তদবস্থ!

পলাশ কহিল,—ঐ হিড়িম্বা! একালের বাণী যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেছিল হিড়িম্বায়—নয়?

আমি কহিলাম—ঐখানেই তো লেখকের শক্তি! প্রতিভা!

পলাশ যেন একটু মুষড়াইল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—লেখকের প্রতিভার ফলে তা ঘটে নি। এটুকু ঘটেচে শুধু তারিণীর গুণে। মিস তারিণী ছাড়া আর কেউ ও-পার্ট প্লে করতে পারতো না—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি এবং ঐ কথাই আমি এই সমালোচনায় বলেচি—অসঙ্কোচে!

তারিণী!—ও! হিড়িম্বার ভূমিকায় যিনি নামিয়াছিলেন, তাঁরই নাম তারিণী।

পলাশ কহিল—আচ্ছা নিতাই দা, ঐ তারিণীকে একদম্ কিশোর বয়সের দেখায় নি?

—তা দেখিয়েছিল।

পলাশ কহিল—অথচ ঐ জাইগাণ্টিকে তিনি প্লে করচেন আজ দশ বছর। তার আগে ব্যাবিলোনিয়ানে সাত বছর; তার আগে তাজ থিয়েটারে—না, না, তাজ নয়! মধ্যে একবার ক'মাসের জন্য মনুমেণ্টালে। ওঃ, ওঁর সমকক্ষ অভিনেত্রী বাঙলা ষ্টেজে আর নেই। এদেশের সারা বার্ণহার্ড। উনি আবার খুব ভালো নাচতে পারেন—তা জানো! An all-round আর্টিষ্ট!

সমালোচনা রাখিয়া পলাশ কত কি বকিয়া চলিল,—অনর্গল। উচ্ছ্বাসে সে এমন মত্ত যে, পড়ার কথা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছে! সহসা ঘড়িতে বারোটা বাজিতে তার হুঁশ হইল। তক্তাপোষ হইতে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া

নীচে নামিয়া চাদরখানা টানিয়া গলায় জড়াইয়া সে কহিল—প্রেশের বেলা হয়ে যাচ্ছে, পড়া এখন হলো না, নিতাই দা। প্রুফ এলে তোমায় শুনতে হবে মোদ্দা তুমিও তো প্লে দেখেচো! তোমারো দু'চারটে suggestions —মানে, যাতে এ সমালোচনা একটা literary gem হয়! গম্বুজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে এই সমালোচনার জোরে। বুঝলে তো?

বকিতে বকিতেই পলাশ বাহির হইয়া গেল। আমিও নিশ্বাস ফেলিয়া কলতলায় গিয়া মাথায় জল ঢালিলাম।

৩

বৃকোদর বলিয়া বিদ্রূপ করিলে কি হইবে, পলাশ ছোকরা বাহাদুর বটে! দু'মাসে নাট্যজগতে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। গম্বুজের সম্পাদক নবকুমার বাবু মেশের বাসায় যখন-তখন তার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; জাইগান্টিকের দেশপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নুটু দত্ত আসিয়া অভিনয়-সম্বন্ধে তার দু'চারিটা সদুপদেশও গ্রহণ করে। তাছাড়া থিয়েটারের টিকিটই সে শুধু পায় না নিজে চিঠি লিখিয়া ফ্রী পাশ্‌ দেয়।

অকস্মাৎ একদিন পলাশ আসিয়া আমায় বলিল—রিহার্শালে যাবে? জাইগান্টিকে 'কুমার-সম্ভব' নাটক হবে। আমি তাতে কিছু কিছু শিক্ষা দেবো—motions, expressions...

বিস্ময়ে আমি হতভম্ব রহিলাম। রিহার্সালে যাওয়ার লোভ—তাইতো! রাজা, রাণী, মন্ত্রী, নায়ক সাজিয়া যারা আমাদের সামনে একেবারে পূর্ণ মূর্ত্তিতে আসিয়া উদয় হয়, যবনিকার অন্তরালে তাদের আসল মূর্ত্তি কেমন, কি করিয়া ঘষা-মাজায় অমন অখণ্ড সৌন্দর্য্যে গড়িয়া অনবদ্য শ্রীতে বিভূষিত হয়, কার না দেখিবার সাধ হয়? কহিলাম যাবো।

পলাশ কহিল—ঠিক সাতটায় তৈরী হয়ে নেবে।

রিহার্শালে গেলাম। 'ঘটোৎকচ' দেখিয়া যেটুকু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম জাগিয়াছিল,—তাহা রক্ষা করা কঠিন হইল। সেদিনকার সেই ভাবময়ী কিশোরী হিড়িম্বা—স্বরূপে তাকে চেনা দায়। স্থূল দেহ! মুখে চোখে কদর্য্য ভঙ্গী, মলিন বর্ণ—একখানা বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল—পাশে একটা শালপাতার টোঙ্গায় ক'খানা কচুরি, ফুলুরি, ব্যঞ্জন প্রভৃতি।

পলাশের খুব খাতির দেখিলাম। ষ্টেজে চড়িবা মাত্র হিড়িম্বা উঠিয়া মস্তবাক্স খুলিয়া পান দিল, সঙ্গে জর্দ্দা। তাকে ঘিরিয়া ম্যানেজার প্রভৃতির নানা প্রশ্ন!

পলাশ ডাকিল রতি কোথায়? রতি? শুনে যাও।

হিড়িম্বা ওরফে তারিণী কহিল—যাচ্ছি মশাই। একটু সবুর।

মুখে সে একখানা বড় কচুরি পুরিয়া দিয়াছিল। কথাটা তাই অপূর্ব্ব সুরে ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইলাম। এই রতি! বিশ্বের ললামভূতা, চির-যুগের মানসী প্রতিমা রতি!

রতি আসিল। পলাশ তাকে বিবিধ ভঙ্গী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। আমি পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিনয়-রাত্রে পলাশের সঙ্গে জাইগান্টিকে হাজির হইলাম। আমায় ভালো শীটে বসাইয়া পলাশ চলিয়া গেল, বলিল—ব'সো। ভিতরে গিয়ে একবার দেখে আসি—বিশেষ রতির বেশ-ভূষাটুকু আমি না দেখলে চলবে না।

যথাসময়ে অভিনয় সুরু হইল। বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিলেও রতির দেহ আমার চোখে কদর্য্য ঠেকিতেছিল। পলাশকে সে-কথা বলিলাম।

পলাশ কহিল—তোমার ভুল। তারপর imagination, বিভ্রম, expression—সারা বার্ণহার্ড, নাজিমোভা, টেম্পো প্রভৃতি আরো বহু অসংলগ্ন কথার শেষে কহিল,—মনকে train করতে হবে। দেহের কথা ভুলে একেবারে তার মর্ম্মে প্রবেশ করতে হবে।

কিছু বুঝিলাম না! বিনা-পয়সায় অভিনয়ই দেখি, তার আর্ট কি বা কোথায়—বুঝি না; আদার ব্যাপারী, কাজেই নিঃশব্দে বসিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলাম।

অভিনয় ভাঙ্গিলে বাসায় ফিরিলাম। কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া পান করিলাম; পানান্তে শুইয়া পড়িব, দেখি, পলাশ গুম্ হইয়া বসিয়া আছে! কহিলাম শোবে না?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পলাশ ডাকিল—নিতাইদা ..

আমি কহিলাম—কেন?

পলাশ চুপ করিয়া রহিল—ক'সেকেণ্ড মাত্র! তার পর কহিল—একটা জিনিষ লক্ষ্য করেচো কি না জানি না! তাই জিজ্ঞাসা করচি...

কহিলাম—কি?

পলাশ আমার পানে চাহিল। যেন ভূত দেখিয়াছে, এমনি তার মুখের ভাব! পলাশ কহিল, যখন অভিনয় হচ্ছিল, তারিণীকে লক্ষ্য করেছিলে।

লক্ষ্য! প্রশ্নটা ঠিক বুঝিলাম না? কহিলাম—কি লক্ষ্য?

পলাশ মৃদু হাসিল। হাসিয়া কহিল—আমার পানে থেকে থেকে উদাস চোখে চাইছিল...

বুকের মধ্যে কি যেন ধ্বক্ করিয়া উঠিল! পলাশ এ বলে কি! ঐ চল্লিশ বৎসর বয়সের অভিনেত্রী ..

পলাশ কহিল—আমি expression বাৎলে না দিলে ও আর কোনো বইয়ে নামবে না, বলেচে! বলে যে, এত দিন

অভিনয়ের কিছুই জানতো না—আমার কৃপাতেই এখন শিখেচে। অর্থাৎ আমার কৃপায়—বুঝলে ?

একটা নিশ্বাস কোথা হইতে আসিয়া আমার বুকের মধ্যে ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল। দম্ যেন বন্ধ হইয়া যাইবে। শিহরিয়া আমি পলাশের পানে চাহিলাম।

পলাশ কহিল—বেচারী হতভাগিনী পতিতা! . পলাশ চুপ করিল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—এই রতির পার্টটা আমিই ওকে শিখিয়েচি। ভারী নম্র—এত বড় অ্যাকট্রেস—তা এতটুকু অহঙ্কার নেই—শিশুর মত সরল! আর শেখবার কি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা!...(পলাশ থামিল ; থামিয়া চকিতের জন্য কি ভাবিল, ভাবিয়া আবার কথা কহিল)—আমার 'বৃকোদর' নামটা কি রকম করে ও শুনেচে! একটু রহস্যচ্ছলে বলছিল,—আপনার কাছে শিক্ষা আদায় করবার দাবী আমার আছে, পলাশ বাবু! আমি বললুম—কেন ? তাতে একটু হেসে আমায় বললে—যেহেতু আমি হিড়িম্বা, আর আপনি বৃকোদর। বৃকোদরের সঙ্গে হিড়িম্বার কি সম্পর্ক ছিল, বলুন তো! কথাটা বুঝলুম। বুঝতে আমার ভারী লজ্জা হলো। তারিণীও এ-কথা বলে একতিল দাঁড়াতে পারলো না–ছুটে আমার সামনে থেকে সরে গেল।...

আমার বুকের মধ্যে রাজ্যের যত নীতি-কথা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। এমন প্রচণ্ড সে ভিড় যে কোনো কথা বাহির

হইবার পথ আর খুঁজিয়া পায় না! কাজেই আমার সেই যথাপূর্ব্ব ভাব—হতভম্ব!

আমার কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল না, তার অবসরও বোধ হয় মিলিত না। পরক্ষণেই পলাশ কহিল—তারপর যখন ফিরে এলো, যেন নতুন মানুষ! একটু আগে যে-কথা সহসা বলে ফেলেছিল, তার একটু ছায়াও যেন তার মনেরকোণে লুকানো নেই! আশ্চর্য্য সারল্য!

পলাশ উদাস নয়নে খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। দেখি সারা আকাশ তখন জোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে।

চাহিয়া চাহিয়া পলাশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কহিল—মানুষকে ঘৃণা করা পাপ—সকল অবস্থাতেই। মানুষমাত্রেই নারায়ণ—এ-কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। নয়?

কহিলাম—শাস্ত্রে ঐ কথাই আছে।

পলাশ চুপ করিয়া রহিল—আমিও। ঘুম পাইতেছিল; কিন্তু এ-সব কথায় এমন উত্তেজনা আছে, ভাবিলাম, না, এখন ঘুম নয়, ঘুমকে জয় করা চাই।

পলাশ আবার কথা কহিল, বলিল—ভালোবাসা পাপ নয়—এ-কথাও আমাদের শাস্ত্রে বলে!

আমি কহিলাম—তা বলে।

—তবে?...

ছোট্ট প্রশ্ন! প্রশ্নটা করিয়া পলাশ আবার ধ্যানস্থ না হোক্ ধ্যানীর মত স্তব্ধ হইল।

আমি বিস্মিত হইলাম,--পলাশের শাস্ত্র-জ্ঞান সহসা প্রবল হইতে দেখিয়া!

কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর—বিবাহ না করিলেও প্রেম, ভালোবাসা—এগুলার অর্থ বুঝি, কথাগুলা যেন কেমন বেমানান ঠেকিতেছিল! এ কালের সাহিত্য খুব মন দিয়া পড়ি—ইঁহাদের লেখায় কাপট্য নাই, মিথ্যাচার নাই—খাঁটী কথাই আগাগোড়া লেখেন! এঁদের রচনার প্রতি ছত্র পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত হই! সেই সঙ্গে মন চীৎকার করিতে চায় ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা! ভাঙ্গো প্রাচীর, কাটো বাঁধন!

নেহাৎ মার্চ্চেণ্ট অফিসের ক্ষুদ্র এ্যাপ্রেণ্টিশ্—কোথায় কার প্রাচীর ভাঙ্গিতে, বাঁধন কাটিতে গেলে কি অনর্থ ঘটিয়া যাইবে, এই আপ্‌শোষে মনের বেদনা মনের কোণে নির্জীব হইয়া মাথা গুঁজিয়া নুইয়া পড়ে, আর চোখের সামনে রাজ্যের বিভীষিকা সরীসৃপের মত কিলবিল করিতে থাকে।

৪

দু'চারিদিন পরে সারা আকাশের রঙটাই যেন বদলাইয়া গেল! বৃষ্টিতে কলিকাতার রাস্তাগুলা জলে জলময় হইয়া উঠিয়াছে। সদ্য একখানা মাসিক পত্রে কাশ্মীরের শ্রীনগরের

ছবি দেখিয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, এই কলিকাতা সহরটা সহসা যেন সেই শ্রীনগরে রূপান্তরিত হইয়াছে! জলের কোলে বাড়ীগুলা যেন সেই কাশ্মীরী হাউসবোট। পথের জল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া আসার ফলে মাথা টিপ্-টিপ্ করিতেছিল। মানদা দাসীর খোসামোদ করিয়া সামনের দোকান হইতে নগদ এক আনা মূল্যে দু'পেয়ালা চা আনাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া আপাদমস্তক মুড়িয়া তক্তাপোষে বসিয়া আছি, বাহিরে তখনো ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—এমন সময় চোরের মত ।পলাশ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—নিতাই দা...

—কে? নিতাই!

—বসে আছো যে!

হাঁ।

কহিলাম—শরীরটা ভালো নেই!

পলাশ কহিল—তাইতো......

পলাশ আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। আমি কহিলাম—কাল সন্ধ্যা থেকে ছিলে কোথায়?

আগের সন্ধ্যা হইতে পলাশের কোনো পাত্তা ছিল না! দু'চারিবার মনটায় কেমন অস্বস্তি জাগিয়াছিল—কিন্তু মিছা অস্বস্তি! কত দিকে তার কত কাজ—ভবিষ্যৎকে রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তুলি-হাতে চারিদিকে রঙ খুঁজিয়া ফিরিতেছে! আমি এক নগণ্য এপ্রেন্টিস!

তবু কহিলাম—কোথায় ছিলে কাল থেকে? দেখা নেই—খবর নেই!

মাথা নাড়িয়া পলাশ মৃদু হাসিল, কহিল—একটু episode হয়ে গেছে।

Episode! চমকিয়া তার পানে চাহিলাম।

পলাশ কহিল,—মানে, সেই একটা কথা আভাসে একদিন জানিয়েছিলুম না।

একটা কথা! পলাশ তো আভাসে আমায় একটা মাত্র কথা জানায় নাই। বহু, বহু কথা জানাইয়াছে। তার মধ্যে কোনটাকে ইঙ্গিত করিতেছে?

কহিলাম—কি কথা বলো তো? মনে পড়চে না।

মৃদু হাস্যে পলাশ কহিল—মানে, ঐ তারিণী-সুন্দরীর কথা।

তারিণী! বদ্ চেহারার ঐ অভিনেত্রীটা! আঃ—vulgar!

মুখের কথায় সে ভাব অবশ্য প্রকাশ করিলাম না—উৎকর্ণ বসিয়া রহিলাম।

পলাশ কহিল—আমার প্রতি তারিণীর সেই......

কি—পলাশও তা চট্ করিয়া বলিতে পারিল না। আমার অধীরতার সীমা নাই। সে-অধীরতা বুঝি চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সোৎসাহে পলাশ কহিল—সে আমায়

ভালোবাসে, নিতাই দা! বুঝেচো? আমায় সে পাশে চায় সাথী, বন্ধু-হিসাবে!

বিস্ময়ে আমার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম—ভালোবাসা?

পলাশ কহিল—আমায় বলছিল, অভিনয় যে কি বস্তু, তার ইঙ্গিত পেয়েচে সে আমার কাছে। তার আগে অভিনয়ের নামে যে-বস্তু ষ্টেজে চালিয়ে এসেচে,—তা ছেলেখেলা, নিছক প্রহসন!

অর্থাৎ? পলাশ নিজেই অর্থ বলিল,—বাঙলা ষ্টেজে renaissance এর যুগ চলিয়াছে—নূতনে-প্রাচীনে প্রবল সংঘর্ষ! এ সংঘর্ষে প্রাচীনের যত ফাঁকি, যত ধাপ্পা সব ভাঙ্গিবে। নূতন-দলের বিরাট শক্তি, বিপুল আর্টিষ্টিক জ্ঞান—

এমনি বড় বড় কথায় সে যেন ঝড় বহাইয়া দিল। ও-কথার ধারও ধারি না। পূর্ব্বে এক টাকার টিকিট কিনিয়া ক্বচিৎ কখনো থিয়েটার দেখিতাম—এপ্রেণ্টিসিতে ঢুকিতে সে-বালাই ঘুচিয়াছিল। নেহাৎ সখ জাগিলে চার-আনা ফেলিয়া সিনেমায় যাই—তাহাও নয়মাসে, ছয়মাসে। এখন পলাশের কল্যাণে ফ্রী-পাশ। আর্ট-রস-মস্কো-কাচালভ্—ও-সবের ধার ধারিতে চাহি নাই কোনোদিন!

পলাশের কথার মর্ম্ম এই—নূতন দলের জলদবরণী, ঘৃতাচীবালা, মন্দাকিনী অভিনেত্রীদের কীর্ত্তি রটাইতে কখানা সাপ্তাহিক আদা-জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে—নব-নব

সাপ্তাহিকের আবির্ভাবের অন্ত নাই। বেচারী তারিণী ভড়কাইয়া গিয়াছে, কোনোদিন সে কাগজের সমালোচনার ধারও ধারে নাই, এমনিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে! আজ তাকে অভিনয় শিখাইয়া, তার অভিনয়ের সূক্ষ্ম রসকে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া তাকে যশের মঞ্চে খাড়া রাখিতে হইবে......

তাই সে পলাশের সাহায্য চায়। এত বড় গুণী, নাট্য-রসে এমন সুরসিক বন্ধু একজন পাশে থাকিলে তারিণী আজও নাট্যজগতের একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী থাকিতে পারিবে! তার সিংহাসন কাড়িবার শক্তি জলদবরণী-দলের হইবে না। এমনি প্রকাণ্ড কাহিনী বিবৃত করিয়া পলাশ কহিল—কাল থিয়েটার ভাঙ্গলে তারিণী নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে! মনের যত কথা নিবেদন করে আমার পায়ে মাথা রাখলো......

বাধা দিয়া আমি কহিলাম—তুমি সেখানে গেছলে! তার বাড়ীতে?

একটা কটূ বিশেষণে তারিণীকে অভিহিত করিতে যাইতেছিলাম। পলাশ বুঝিয়াছিল, বুঝিয়াছিল বলিয়াই সে রুখিয়া উঠিল, কহিল—চুপ! সকলকে এক কোঠায় ফেলো না নিতাই দা! তুমি জানো না! তারিণী, -She has a great mind, an artistic refinement! তার culture......

বাধা দিয়া কহিলাম কিন্তু সে ....

পলাশ কহিল না, না, সে আর্টিষ্ট! তাছাড়া আমি তাকে ভালোবাসি।

ভালোবাসো ! ঐ huge uncouth body—একটা মাংসপিণ্ড......

পলাশ কহিল—দেহ অতি তুচ্ছ ! দুদিনে তা জরায় জীর্ণ হয় ! ঐ দেহের মধ্যে আছে—যে মন বিশেষ, তারিণীর অন্তর...তা ঠিক...তা...তা...

আমার মন কেমন ঝাঁজিয়া উঠিয়াছিল—নব-সাহিত্য-শিল্পের অত সাধনাতেও মনের আদিম বর্ব্বর সংস্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ! আমি কহিলাম—পাঁকের বুকে পদ্ম... বলতে চাও ?

পলাশ কহিল—তাই...তাই !

বৃথা তর্ক ! তবু পলাশকে বুঝাইলাম—নাট্য-শিল্পের উন্নতি চাও, ভালো কথা। উন্নতি করো। তাদের উপদেশ দাও, শিক্ষা দাও। তা বলিয়া অন্তরের গোপন কথা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ...

পলাশ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল ! কহিল, মাপ করো নিতাই দা—তুমি এ বুঝবে না। এ হলো intellectual companionship—এর অভাবে বাঙালী জাতটা যে-তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল ! হীন সংস্কারের বাঁধন আজো কেটে ঊর্দ্ধে উঠতে তুমি পারলে না ! এই দরদের অভাবেই বাঙলার ললিত-শিল্পকলা আজ রসাতলে যেতে বসেচে !

সেই পলাশ ! মেশের বীর বৃকোদর ! 'গম্বুজ' কাগজে দু'দিন নাট্য-সমালোচনা লিখিয়া উদারতায় মহাত্মাকেও

সে ছাপাইয়া যাইতে চায়! কাল্‌চারের এমন শক্তি! বিস্ময়, শ্রদ্ধা নানা বৃত্তির স্পর্শে মনটা কিম্ভূত একটা-কি হইয়া গেল!

পলাশ কহিল—আমি তারিণীকে সাহায্য করবো—কথা দিয়ে এসেচি!

কিছুক্ষণ নীরবে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম; তারপর কহিলাম—উত্তম।

পলাশ কহিল—যে ব্রত গ্রহণ করেচি, তাকে সফল করবোই। এর জন্য আত্মীয় বন্ধুর বিরাগ, ঘৃণা যদি শিরোধার্য্য করতে হয়—হঠবো না! রিফর্ম্মাররা চিরদিন বিরাগ সয়েচেন—তবু ব্রতভঙ্গ হয় নি! আমারো moral courageএর অভাব কখনো হবে না, আশা করি!

পলাশ উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে কখানা কাগজের শ্লিপ লইয়া ফাউন্টেন পেন হাতে করিল।

আমি ডাকিলাম—মানদা.....

মানদা আসিল। আমি কহিলাম—আদা আছে?

—আছে।

—কখানা কুচিয়ে দাও তো। সর্দ্দির মত হয়েচে! আদায় উপকার হবে।

মানদা কহিল—একখানা ঐ ঠ্যালা গাড়ীতে এলেই পারতে দাদাবাবু। তা নয়, হেঁটে জল ভেঙ্গে আসা! জ্বর হলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কে দেখবে, বলো তো? মায়ের বাছা! হুঁঃ!

মানদা এমন শাসন মাঝেমাঝে করে। দশ টাকা মাহিনা পায়, সত্য—কিন্তু বেইমান নয়!

৫

পলাশের সহিত অন্তরঙ্গতায় বাধা পড়িল। সন্ধ্যার পর আর তার দেখা মিলে না। পাঁচজনের মুখে শুনি, নাট্য-জগৎটায় উলট-পালট না ঘটাইয়া সে ছাড়িবে না—সেই কাজে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে।

তার সেল্‌ফে রাজ্যের কাগজ আসিয়া জড়ো হয়। টানিয়া তার একখানার পাতা খুলিয়া তাহাতে চক্ষু বুলাই। অন্য কাগজওয়ালারা গম্বুজকে গালি দেয়—বলে, 'গম্বুজ না জাম্বুবান'! এবং ইহা লইয়া পাঁচ ছ কলম গালি বিদ্রূপে ভরিয়া অসঙ্কোচে সে রচনা কাগজে ছাপায়—তাহাতে পলাশকেও নাম ধরিয়া যা-খুসী বলে—এ-সব পড়ি, অফিসের কলম-পেশা কাজের পর এ-সব গালি-কুৎসা পড়িয়া আরামও যে নাই, এমন নয়!

সেদিন দেখি, 'গম্বুজে' একটা সনেট বাহির হইয়াছে—লেখা পলাশের। জাইগান্টিকে নূতন অপেরা 'পরীরাণী'তে তারিণী নায়িকা সাজিয়াছিল; তাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা কবিতা। পলাশ লিখিয়াছে—

চেনে না জানে না যারা তোমার অন্তর—
তারা জানে শুধু তুমি স্থূল কলেবর!

কিন্তু তা হ'লে কি হয়? মনখানি তব
নাট্য-রসে ডুবু-ডুবু—ভাব নব-নব
বুদ্বুদের সমতায় নিত্য দেয় দেখা—
হীরা-চুণী-সমতুল জ্যোতিষ্কের রেখা!
দেখা দিলে সদ্য এই পরী-রাণী-বেশে—
চরণে চটুল নৃত্য, ছন্দ এলোকেশে,
অধরে হাসির ঝর্ণা—প্রবিনী লতা!
কেমনে বাখানি লীলা? না জুয়ায় কথা!
লোকে বলে, জন্ম তব গণিকার কুলে—
সে যে দৈব-ঘটনা গো, বিধাতার ভুলে!
মলিন যে পঙ্ক দেখি কুঞ্চনায় নাসা—
তাতে জন্মে পদ্মফুল—রূপে-বাসে খাশা!

সাহিত্যে একটা কথা দেখি, শিহরণ! আমার প্রাণে-মনে সাহিত্যের সেই শিহরণ জাগিল! নাট্যশিল্প এমনি সনেটে গৌরব-গর্ব্বে আকাশ স্পর্শ করিবে নিশ্চয়! 'গম্বুজ' ফেলিয়া 'নাটের হাট' কাগজ খুলিলাম। প্রথমেই 'নাট্য প্রসঙ্গ'—তাহাতে দেখি, সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছে পলাশের সহিত তারিণীর ঘনিষ্ঠতার কথা। আরো লিখিয়াছে, 'গুজব শুনিতেছি, শ্রীমতী তারিণী নাকি অপরাহ্ণ বেলায় বদ্ধ হইবেন এবং এ-বন্ধনে যাঁহাকে বাঁধিবেন, তিনি . . .' নামটা প্রকাশ করে নাই—নামের জায়গায় কটা ফুটকি বসাইয়া মন্তব্য করিয়াছে,—

'বাঙলার রূপবাণী যাঁর লেখনীর মুখে মূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাঁহাকে !

শরীরে সত্যই রোমাঞ্চ ঘটিল। দুনিয়া ঘুরিতেছে, ভূগোলে ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম—সে-ঘোরার কোনো পরিচয় এ যাবৎ পাই নাই! এখন এই 'নাট্য-হাটে' নাট্য-প্রসঙ্গ-পাঠে সে-ঘূর্ণন প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। বুঝিলাম ভূগোলের কথা মিথ্যা নয়, দুনিয়া সত্যই ঘুরিতেছে। নহিলে এই তক্তাপোষ, ওয়াল, জানালা-দরজা—এ-সব এমন দুলিবে কেন ?

কাগজ রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। চক্ষু মুদিয়া পলাশের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কোথায় গৃহ, সে গৃহে মা-বাপ, ভাই-বোন কে আছে জানি না! পয়সার স্বচ্ছলতা কেমন, তাহাও অবিদিত। সহরে আসিয়া কাগজ লিখিয়া বেড়ায়—থিয়েটারের ষ্টেজে জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ সঁপিয়া দিয়াছে! তা দিক্! কিন্তু ঐ তারিণী! সেই বিপুল-কলেবরা অভিনেত্রীর কথা মনে জাগিল। ষ্টেজে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল—পাশে ঠোঙায় কতকগুলা কচুরি আর ব্যঞ্জন! কচুরি খাওয়ায় অপরাধ হয় না, জানি! তবু সে কি কদর্য্যতা !

গা কেমন নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল। নিঃসঙ্গতা অসহ্য বোধ হইল। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ চকিতে সরিয়া তাকে এমন বিশ্রী কদর্য্যতায় ভরিয়া তুলিল! খোলা জানালার বাহিরে ঐ নীল নির্ম্মল আকাশ—সে আকাশে যেন কালো কালির

স্রোত বহিয়া চলিয়াছে! যে কালির মুখে আর্ট একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে!

ঘরের বাহিরে আসিলাম। দেখি, ত্রিগুণা বাবু! সজ্জিত বেশে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

কহিলাম, কোথায় চলেছেন ত্রিগুণা বাবু?

ত্রিগুণাবাবু কহিলেন—সিনেমায়।

কহিলাম—দাঁড়ান। আমি যাবো।

ত্রিগুণাবাবু কহিলেন—আমার সঙ্গে গেলে চার আনার শীট্ কিন্তু—

আমি কহিলাম—বটে! আমায় কি এমন গদিদার রাজ চক্রবর্ত্তী দেখলেন যে চার আনার শীটে বসতে কুণ্ঠিত হবো, ভাবচেন! আমার দৌড় ঐ চার আনা অবধি।

ত্রিগুণাবাবু কহিলেন—বৃকোদরের সঙ্গে গেলে পাঁচ টাকার শীট্ মেলে।

কহিলাম,—সে তো ভিক্ষার দান!

বায়োস্কোপ হইতে ফিরিলাম—রাত্রি প্রায় বারোটা।

ফিরিয়া দেখি, ষ্ট্যাচুর মত কে যেন বিছানায় বসিয়া! পলাশ!

বিস্মিত হইলাম। কহিলাম, আজ রিহার্শাল নেই?

পলাশ কহিল—না। তার স্বর তীব্র—রাজ্যের আক্রোশ যেন সে স্বরে মিশানো।

বিস্ময় বাড়িল। জামা খুলিয়া দড়ির আনলায় ঝুলাইয়া রাখিতেছিলাম।

পলাশ ডাকিল—নিতাই দা---

তার স্বর আর্দ্র। তার পানে ফিরিয়া চাহিলাম।

পলাশ কহিল,—এরা এত বড় বেইমান! এমন বিশ্বাসঘাতক! দেখচি তোমার কথাই ঠিক।

কহিলাম--কাদের কথা বলচো ?

পলাশ কহিল—ঐ তারিণী...

—কি হয়েচে ?

পলাশ কহিল—থিয়েটার থেকে ছুটী নিয়েছিল। তাও আমার চেষ্টায়। আমি একখানা নাটক লিখেচি—'সংযুক্তা'! সে বই জাইগাণ্টিকে প্লে হবার জন্য ওরা নিয়েচে। তাতে তারিণী সাজবে 'সংযুক্তা'। সে বই রিহার্শালে পড়বার আগে সে একমাস ছুটী নিয়েছিল—মানে, শরীর সারাতে।

পলাশ থামিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল - কথা ছিল আমার সঙ্গে রাঁচি যাবে। আমি যাবো - সেখানে খোলা জায়গায় নিরালার সংযুক্তার পার্টটা রীতিমত ষ্টাডি করবে, আমার কাছে expressions প্রভৃতি শিখবে। পরশু যাবার কথা। ডাকবাঙ্লার গিয়ে উঠবো—উঠে একখানা বাঙ্লো দেখে নেবো। লেখার মূল্য-হিসাবে আড়াইশো টাকা নগদ পেয়েছিলুম তার কাছেই গচ্ছিত রেখেছিলুম সে টাকা।

এইটুকু বলিয়া পলাশ যেন হাঁফাইয়া পড়িল। একটু থামিয়া দম্ লইয়া আবার সে বলিল,—আজ নিত্যকার মত থিয়েটারে গিয়েছিলুম। গিয়ে কি শুনলুম, জানো?

গভীর আগ্রহে প্রশ্ন করিলাম,—কি?

পলাশ একটা নিশ্বাস ফেলিল—সে নিশ্বাস নয়, ঝড়!

পলাশ কহিল—তারিণী গেছে ঘাটশীলা। থিয়েটারে কাজ করে হারাণ। চীফ্ গার্ড। একটা লক্কড় হতভাগা—মাতাল—চোর। তার সঙ্গে তারিণী চলে গেছে। মাসখানেক সেখানে থাকবে! অথচ—

পলাশের তুই চোখ জলে ছাপাইয়া আসিল। আমি কহিলাম—এতে তুঃখ কি?

পলাশ কহিল,—তুনিয়ায় প্রেম না থাক্—কৃতজ্ঞতাও নেই? ঐ তারিণী কত সেধে আমায় দিয়ে কত সুখ্যাতি লিখিয়েচে ঐ গম্বুজে। তামাসা করে অনেকে বলতো. কাগজের নাম পাল্টাও, পাল্‌টে নতুন নাম দাও,—'তারিণী', সে সব নিন্দা-বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্যও করিনি!

নৈরাশ্যের বেদনায় পলাশ যেন ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়িল! আমি ডাকিলাম—পলাশ—

ঝড়ের মত আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পলাশ কহিল, আমিও শোধ নেবো। ঐ সংযুক্তা নাটকে নায়িকার পার্ট দেওয়াবো—পার্ব্বতীকে! সখী সাজে—সাজুক। কুছ্ পরোয়া

নেই! তারিণীও দেখবে সে অভিনয়; আর দেখবে, আমার তৈরী করবার শক্তি কতখানি!

কথাটা বলিয়া পলাশ গুম হইয়া রহিল। আমি তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলাম, করিয়া ডাকিলাম—পলাশ...

পলাশ আমার পানে চাহিল।

আমি কহিলাম,—ও-সব ছেড়ে একটা চাকরি-বাকরি...

বাধা দিয়া পলাশ কহিল—পাগল! বাঙলার নাট্যজগৎটা তাহলে রসাতলে যাবে যে! তা হয় না নিতাইদা। আমার জীবনের যা ব্রত .

অপরাধ করিয়াছি, বুঝিলাম। প্রাণ যার এতখানি রস-শিল্প-সম্ভারে পরিপূর্ণ, তাকে বলি চাকরি করিতে! আমি একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসের নগণ্য এপ্রেণ্টিস্! স্পর্দ্ধা বটে!

কুজা হইতে জল গড়াইয়া পান করিলাম; তারপর বিছানায় দেহ-ভার গড়াইয়া দিলাম।

একবার শুধু পলাশের পানে চাহিলাম। দেখি সে চেতনা পাইয়াছে! পাইয়া কাগজ আর ফাউণ্টেন পেন লইয়া বসিয়াছে—নিশ্চয় কবিতা লিখিবে! নৈরাশ্যের এত বড় বেদনা,—বাঙলা দেশ ও বাঙালীকে সে বেদনার পরিচয় না দিয়া সে থাকিবে কি করিয়া? তার জীবনের ব্রত...

ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু মুদিলাম। কাল অফিস আছে, রোমান্সের চর্চ্চা আমার সাজে না!

সাময়িকী ও অসাময়িকী

প্রকৃতির প্রলয়-নৃত্যে কিউবা ধ্বংসপ্রায়। প্রবল জলোচ্ছ্বাস এবং ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা রূপে এই মৃত্যুকরাল বিপ্লব দ্বীপের উপর দিয়া বহিয়া গেছে। মায়া নাই, মমতা নাই। পরম আগ্রহে গড়িয়া তুলিয়া দুর্দ্দান্ত বালিকার মত প্রকৃতি তাহার খেলাঘর অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলে। ধ্বংসের হাত ধরিয়া নূতন সৃষ্টি আসে। নিয়তি হাসে।

*　　　　*　　　　*

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী আটলাণ্টিক মহাসাগর অসংখ্য দ্বীপে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপপুঞ্জকে সাধারণতঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ বলা হয়। অতি ক্ষুদ্র দ্বীপিকা হইতে কিউবার মত বৃহৎ দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত। ইহার মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ, ফরাসী, ডাচের অধীন, কয়েকটি মার্কিনের। কিউবা স্বাধীন। ইহার শাসনপ্রণালী স্বতন্ত্র। হাভানা এ দ্বীপের রাজধানী। হাভানার চুরুট জগদ্বিখ্যাত। মেক্সিকো উপসাগর হইতে প্রবাহিত 'গাল্‌ফ ষ্ট্রীমে'র উষ্ণ জলস্রোতের সহিত দক্ষিণ মেরু হইতে উত্তরাগত তুষারশীতল স্রোতোধারার মিলন-সংঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী সমুদ্র থাকিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। কিউবার ঘূর্ণিবাত্যা এমনি এক প্রাকৃতিক কারণের ফল। সমুদ্রের আলিঙ্গনে সাত ক্রোশ ব্যাপী স্থান প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। আড়াই হাজার লোক প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। পঞ্চাশ লক্ষ

ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট। সাণ্টাক্রুজ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধস্ত।

*   *   *

'বাংলার বাণী'র জন্মাষ্টমী সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। এই সাপ্তাহিকখানি ঢাকা হইতে প্রকাশিত। এই সংখ্যার পত্রিকাখানি আকারে সুবৃহৎ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬০। বহু চিত্র শোভিত। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিন্দু সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত' সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত লেখকের 'Hindu Culture and Greater India'র অনুবাদ। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর 'রামকৃষ্ণ জীবনী' হইতে অনূদিত একটি রচনা আছে। জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ আরো অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। বার্ষিক চাঁদার চারি টাকা হইতে প্রতি বৎসরে গ্রাহক প্রতি চারি আনা হিসাবে পৃথক রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ 'বাংলার বাণী'র সাবস্‌ক্রাইবার্‌স্ ফ্যামিলি রিলিফ ফাণ্ড নামে একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া টাকা বোর্ড-অব-ট্রাষ্টের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

*   *   *

আকাশ অভিমানে মুখ ভার করিয়া, গুম হইয়া, আগাপাশতলা মেঘ মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। কিছুতেই কথা শুনিবে না, কাহারও কথা শুনিবে না। শ্রান্তিহীন বৃষ্টির

ক্ষান্তি নাই। ম্লান আলো এবং ভিজা বাতাসের চাপে প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে। আকাশ মলিন, পৃথিবী অপরিচ্ছন্ন। বিশ্বের গৃহিণী বুঝি রাগ করিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছে। ভৃত্যতন্ত্রের আমলে তাই কাজের বদলে অকাজ বাড়িয়াছে। জল ঢালিয়া, কাদা করিয়া, পিছল করিয়া সারা পৃথিবীর মানুষকে একেবারে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মাঘের শেষে যে বর্ষণ হইলে দেশ পুণ্য হইত, কার্ত্তিক-শেষের তেমনি বৃষ্টিতে কৃষক প্রমাদ গণিল। নগরীর পথ কখনও ক্লিন্ন পঙ্কিল, কখনও বদ্ধ জলধারায় আবিল। শরৎ আসিয়াছিল, বর্ষা যেন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া নিজের পুরাতন অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। এ মেঘে মনের ময়ূর পেখম ধরে না। এ বৃষ্টিতে হৃদয় ভারি হইয়া ওঠে। এর গুরু গর্জ্জনে গৌরব নাই, এর বিদ্যুতে রূপ নাই। হেমন্ত-দিবসে স্থানভ্রষ্ট বর্ষা শোভা হারাইয়াছে।

* * *

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি প্রস্থে সঙ্কীর্ণ হইলেও উত্তর-দক্ষিণে দূর বিস্তৃত। উত্তরে সিন্ধু, নিম্নে মহীশূর। সিন্ধু বেলুচিস্থানের সংলগ্ন। শিক্ষা ও ঐশ্বর্য্যে হিন্দুরা অগ্রসর হইলেও এখানে মুসলমানেরা সংখ্যাধিক। এই সংখ্যাধিক্যতা হেতু সিন্ধুকে তাহারা একটি মুসলিম প্রদেশে পরিণত করিতে চায়। অথচ এ দেশ দরিদ্র। তাহার উপর বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে প্রাথমিক এবং বাৎসরিক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, তাহা বহন

করিবার ক্ষমতা ইহার আছে কি না সন্দেহ। এই সকল অর্থনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক কারণে এলাহাবাদে ঐক্য-সম্মিলনে সিন্ধুর প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু-সমস্যার সমাধান না হইলে ঐক্য-সম্মিলন ব্যর্থ হইয়া যাইত। সম্প্রতি শোনা গেল হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একটি সুমীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন। ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। মীমাংসার প্রথম সর্ত্তটিতে আছে, অপরাপর প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে যে-সকল রক্ষাকবচ দেওয়া হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সিন্ধুর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্যও অনুরূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১ম বর্ষ] ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ [২১শ সংখ্যা

বনহংসীর প্রেম

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, সুদীর্ঘজটাজুটধারী ভস্মভূষণ সাধু-সন্ন্যাসীর দল সমস্ত গ্রাম একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের কিম্ভূতকিমাকার রূপ দেখিয়া ছুটিয়া পলায়ন করে, শুধু-হাতে অতিথিকে ফিরাইতে নাই বলিয়া বাড়ীর মেয়েরা দয়া করিয়া একমুঠা চাল আনিয়া দেয়।

কিন্তু একজন যাইতে না যাইতেই আবার আর একজন আসিয়া দাঁড়ায়।

মেয়েরা বলে, 'কি জানি বাবা, চিনতে ত পারছিনি। তুমিই আবার ঘুরে ফিরে এলে কিনা তাই বা কে জানে।'

কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। গ্রামের বৃদ্ধ বনমালী চৌকিদার বলিয়া গেল, 'ঘটি-বাটি কাপড়-চোপড় একটু সাবধানে রাখবেন মা, ওরা সাধুও নয় সন্ন্যেসীও নয়,—ভ্রমণকারী শেয়ালমারার দল। জন-তিরিশেক ছেলেমেয়ে নিয়ে 'চটি'তে এসে তাঁবু ফেলেছে।'

তা এ রকম অতিথি অভ্যাগতের আগমন এ গ্রামে নূতন কিছু নয়। গ্রামের উত্তরদিক ঘেঁষিয়া সরকারী গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি সোজা চলিয়া গেছে। এই পথ ধরিয়া যে-সব ভ্রমণকারী ভবঘুরের দল পায়ে হাঁটিয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, এই গ্রামের প্রান্তে আসিয়া তাহারা একবার বিশ্রাম করিয়া লয়। দুপাশে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া লাল কাঁকর-বিছানো সরলরেখার মত সোজা এই পথ, বিশ্রাম করিবার মত উপযুক্ত স্থান যদিও নয়, তথাপি দেখা যায়—অজস্রচক্রলাঞ্ছিত সহস্রপদস্পৃষ্ট ধূলিধূসর এই নীরস পদরেখা খানিয়াখালি গ্রামপ্রান্তে আসিয়া একটুখানি সরস হইয়া উঠিয়াছে। পথের দু'ধারে বড় বড় বট দেবদারু শিশু ও শিরিশের গাছ মাথার উপরে শাখায় প্রশাখায় জড়াজড়ি করিয়া স্নিগ্ধ শ্যামল অগণিত পত্রপল্লব দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এমন একটি ছায়াশীতল মণ্ডপ তৈরি করিয়াছে যে, আকাশ দেখা যায় না, পথশ্রান্ত পথিককে সহসা গৃহের

কথা মনে করাইয়া দেয়। তাহার উপর এই গ্রামের কোন্ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বহু অর্থব্যয় করিয়া এই পথের পাশে প্রকাণ্ড একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইঁট পাথর দিয়া তাহার বাঁধানো ঘাট জায়গায় জায়গায় ধ্বসিয়া গেলেও গ্রামের ছেলেছোকরার দল এখনও তাহার পৈঠায় গিয়া বসে, দূরের সহর হইতে গরুর গাড়ীতে জিনিস বোঝাই করিয়া গাড়োয়ানেরা গান গাহিতে গাহিতে গাড়ী চালায়, পথের উপর প্রচুর ধূলা উড়িতে থাকে, গরুর গলার ঘণ্টা বাজে, অপরাহ্ণের মৃদুমন্দ বায়ু শিরিশফুলের গন্ধে ভারি হইয়া ওঠে, অস্ত সূর্য্যের রঙিল আলো পশ্চিমের আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রাঙাইয়া দিয়া গাছের পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে। গ্রামের অতিবৃদ্ধ প্রাচীনেরা বলেন, সড়ক্‌ধারে রায়েদের ওই দীঘির পাশে আগে একটি 'চটি' ছিল।

এখন আর সে 'চটি'র কোন চিহ্ন নাই। আছে মাত্র ওই দীঘির পাশে তৃণাচ্ছাদিত খানিকটা সমতল ক্ষেত্রের উপর উঁচু উঁচু কয়েকটা মাটির ঢিপি। শিয়ালমারা ভ্রমণকারীর দল ওইখানে আসিয়াই তাহাদের তাঁবু ফেলিয়াছে।

প্রথমদিন যাহারা সন্ন্যাসী সাজিয়া ছাই মাখিয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল, দ্বিতীয় দিন দেখা গেল, তাহাদের সে সন্ন্যাসীর বেশ আর নাই, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া হাতে লাঠি লইয়া ডুগডুগি বাজাইয়া কেহ-বা ভাল্লুক নাচাইতেছে, কেহ

বা বাঁদর, কেহ-বা সাপ। আর মেয়েরা বাহির হইয়াছে রঙ-বেরঙের ঘাগরা পরিয়া কাঁধে ঝুলি লইয়া ভানুমতীর খেলা ভেল্‌কী বাজি দেখাইতে। মেয়েদের অবাধ গতি। তাহারা আর দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগে না, সরাসর গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গিয়া বলে, 'আয় দিদি আয়, বোস্ এইখানে। ভানুমতীর খেলা বাজি দেখবি, না ওষুধ লিবি বল্।'

কম-বয়েসী মেয়েরা বাজি দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়, আর গৃহস্থের গৃহিণী যাঁহারা, ছেলেপুলের মা, তাঁহারা ঔষধির কথাই জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ-হেন ঔষধ এ পৃথিবীতে নাই যাহা তাহারা এই ঝুলির ভিতর হইতে বাহির করিতে পারে না। বলে, 'সোয়ামীকে বশ করতে চাস্ ত তারও দাওয়াই আছে, আবার কাটাকাটি ছাড়াছাড়ি করতে চাস্ ত তারও আছে।' বলিয়াই তাহার থলি হইতে গাছের শিকড়ের মত কি-একটা জিনিস বাহির করিয়া বলে, 'এই ওষুধ বেটে খেলে বাঁজা মেয়েরও ছেলে হয়। এক বরিষের মধ্যি না যদি হয় ত তুই আমাকে বেইমান্ খান্‌কী ব'লে ডাকিস্।'

এই বলিয়া সে চোখ-মুখের ইসারা করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া চুপি চুপি বলে, 'আবার এমন ওষুধও জানি দিদি, যে-ওষুধ খেলে ছেলেপুলে একদম্ হবে না। তবে তার দাম অনেক।'

এমনি করিয়া এই ভ্রমণকারী পুরুষরমণীর দল ধনিয়া-খালির আবালবৃদ্ধবনিতাকে যখন মাতাইয়া তুলিয়াছে, এমন দিনে একদা এক অপরাহ্নবেলায় শোনা গেল, টগ্‌রী বাগ্‌দিনীর উঠানে উহাদেরই দলের একটা লোক সাপ-খেলানো দেখাইতেছিল, হঠাৎ কেমন করিয়া না জানি একটা গোখ্‌রো সাপ সেই লোকটাকে এমন এক কামড় কামড়াইয়াছে যে, তাহার অবস্থা একেবারে সঙ্কটাপন্ন, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

শুনিবামাত্র দলে দলে লোকজন টগরীর বাড়ীর দিকে ছুটিতে লাগিল। দেখা গেল জনরব মিথ্যা নয়। বাগদি-পাড়ার একটেরে টগরীর সেই খড়ো ঘরখানির সুমুখে উঠানের চারিদিকে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে, আর তাহারই মাঝখানে লোকটা মাটির উপর শুইয়া পড়িয়াছে। টগরীও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তৎক্ষণাৎ সে তাহার পরণের নূতন শাড়ীটার চওড়া পাড় দুহাত দিয়া পড়্ পড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাই দিয়া তাহার হাতের দু'তিন জায়গায় কসিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং সেই নিতান্ত অপরিচিত ভবঘুরে ভ্রমণকারীর মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর বসাইয়া হাতটা তাহার দু'হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সজলচক্ষে সেইদিক পানে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়া আছে।

অনেকেই বলিতেছে, দোষ টগরীর। সে-ই তাহাকে রাস্তা হইতে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া সাপের খেলা দেখাইতে

বলে। আর টগরীও ত কম মেয়ে নয়! বাপ মা মরিয়া যাইবার পর হইতে, অমন সুন্দরী ওই যুবতী মেয়ে—গ্রামে বাস তাহার একরকম নাই বলিলেই হয়। একা একা কোথায় কোন্‌দিক দিয়া যে চলিয়া যায় কেহই বলিতে পারে না। ন'মাস ছ'মাস পরে হঠাৎ আবার একসময় গ্রামে ফিরিয়া আসে। বাগ্‌দিদের মেয়ে বলিয়া সহজে তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। গ্রামে ফিরিয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সে আশ-পাশের কয়লা-কুঠিতে কাজ করিতে যায়। সকালে যায় আবার সন্ধ্যায় মদ খাইয়া তাহাদেরই সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়া কাজ করিতে করিতে হঠাৎ সে আবার কোন্‌দিকে উধাও হইয়াছিল, দিন দশ-বারো হইল, এই সবে সে গ্রামে ফিরিয়াছে। গ্রামের মধ্যে ঘোর গুজব এবার সে কামরূপ কামাখ্যা গিয়াছিল। সেখান হইতে ওই সব বিদ্যা সে শিখিয়া আসিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে! হইতেও পারে বা। টগরকে বিশ্বাস নাই। হয়ত সে তাহার বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্যই লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া সাপটাকে বাণ মারিয়া বাণ-চাল্ করিয়া দিয়াছে।

যাই হোক্, খানিক্ পরেই তাহার হাত হইতে বিষ-পাথর পড়িয়া গেল। লোকটা ঝাড়াঝুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, 'বাস্, আর ভয় নাই। বিষ টেনে নিয়েছে।'

টগর বলিল, 'তুমি যেয়ো না। বোসো।'

এই বলিয়া সমবেত লোকগুলোকে টগর সেখান হইতে বিদায় করিয়া দিল।

সংবাদ পাইয়া বনমালী-চৌকিদার আসিয়াছিল সাপে-কাটা অপমৃত্যুর মড়া বলিয়া লাশ্‌টাকে টগরের জিম্মায় রাখিয়া থানায় খবর দিতে, কিন্তু তাহাকেও হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল, 'হাঁ তা টগরী বিদ্যে যে কিছু শিখে এসেছে সেকথা সত্যি।'

সুবোধ বলিল, 'আমি জানি যে! কাঁউর্‌-কামিখ্যে ও গিয়েছিল তা আমি জানি।'

তা সে যেখানেই যাক্‌ আর সে যে বিদ্যেই শিখিয়া আসুক্‌ তাহাতে কাহারও কিছুই আসে যায় না।

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, সাপুড়ে সেই ভ্রমণকারী শিয়ালমারা তাহাদের দলের সঙ্গে যায় নাই, টগরের বাড়ীতেই বাসা বাঁধিয়াছে।

ধনিয়াখালি 'চটি'র ডেরা উঠাইয়া শিয়ালমারার দল তাহাদের কাপড়ের ছোট ছোট তাম্বুগুলি তুলিয়া ফেলিল, প্রত্যেকটি সংসারের যাবতীয় আসবাবপত্র এক-একটি গাধার পিঠে চড়াইয়া শিকারী কুকুরগুলিকে সঙ্গে লইয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী এই যাযাবর সম্প্রদায় আবার তাহাদের পথের যাত্রা সুরু করিল, কোথায় কোন্‌ দূরদুরান্তের পথপ্রান্তে গিয়া মুক্ত

আকাশের তলে আবার তাহারা তাহাদের দু'দিনের ডেরা গাড়িবে তাহারাই জানে। পশ্চাতে যে পড়িয়া রহিল সে পড়িয়াই থাক্। তাহার জন্য বৃথা শোক তাহারা কখনও করে না। ঘরের মায়ায় ভুলিয়া পথের আনন্দকে যে বর্জ্জন করে সে বিধর্ম্মী, সে বেইমান।

সে যাই হোক্, ওই সাপুড়ে লোকটা যে টগরের বাড়ীতেই বাসা বাঁধিবে তাহাও নাকি গ্রামবাসীর জানা কথা। কারণ, কি মন্ত্র দিয়া কি কৌশলে মানুষকে ভেড়া বানাইতে হয় কামরূপ-কামাখ্যা হইতে টগরী তাহা শিখিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভেড়া সে সত্যই বনিয়াছে কিনা সে সংবাদ আমরা জানি না। আমরা জানি সে মানুষই রহিয়াছে। লম্বা চওড়া জোয়ান্, দেখিতে সুপুরুষ, টাঙ্গির মত গোঁফ, মাথায় বাবরি চুল, আর সেই চুলের উপর পাগ্ড়ি বাঁধা! এমন শুধু ধনিয়াখালি কেন, আশ-পাশের পাঁচ-দশটা গ্রামের লোক তাহাকে চেনে। আগে যখন সে শিয়ালমারাদের দলে ছিল তখন তাহার নাম ছিল গংটু, এখন তাহার নাম হইয়াছে গঙ্গারাম সাপুড়ে। পরিবর্ত্তন যদি তাহার কিছু হইয়া থাকে ত সে ওই নামে। নামটিও নাকি টগরীর দেওয়া।

গঙ্গারামকে কেহ সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসে। বলে, 'হাঁ মা-জি, টগরই আমার নাম রেখেছে গঙ্গারাম।'

নিজের দেশের লোক হইলে যে-সব কথা মেয়েরা তাহাকে প্রাণান্তেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না, বিদেশী বলিয়া গঙ্গারামকে তাহারা তাহাও জিজ্ঞাসা করে। গঙ্গারাম হাসিতে হাসিতে সব কথারই জবাব দেয়। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হাঁ মা-জি, ও আমাকে ভারি ভালবাসে।'

'আর তুমি বাসো না?'

স্পষ্ট সেকথা মুখ ফুটিয়া বলিতে বোধ হয় গঙ্গারাম একটু-খানি লজ্জা বোধ করে। হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কোনোরকমে বুঝাইয়া দেয় যে, হ্যাঁ সেও তাহাকে খুব ভালবাসে।

যাযাবর এই গঙ্গারামের মনে নীড় বাঁধিবার এত সাধ যে এতদিন ধরিয়া কেমন করিয়া লুকাইয়াছিল কে জানে। টগরীর বাড়ীখানি সে এমনভাবে সাজাইয়াছে যে, দেখিলে আর সহসা সে-বাড়ী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। নিজেই বাঁশ কাটিয়া আনিয়া উঠানের চারিদিকে বেড়া দিয়াছে, সুমুখে চমৎকার একটি ফটক তৈরি করিয়াছে, কোথা হইতে লতা-ফুলের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বেড়ার গায়ে এমন সযত্নে তাহাদের গাছ উঠাইয়াছে যে, আজকাল আর বাঁশের বেড়া দেখিতে পাওয়া যায় না, লাল লাল ফুলে-ভরা সবুজ লতা আঁকিয়া বাঁকিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উঠানে ফুলের বাগান। দিবারাত্রি নানারঙের ফুল ফুটিয়া থাকে।

টগর হয়ত হাসিয়া শুধায়, 'কি হবে ও-সব?'

গঙ্গারাম বলে, 'তোমাকে সাজাব।'

টগর বলে, 'আ-মর্! সাজিয়ে কি হবে রে মুখপোড়া? তার চেয়ে চল্ বরং আমরা চলে যাই কোনও দেশ দিকে। বহুৎ—বহুৎ দূরে চলে যাই চল্।'

বহুৎ দূরে চলিয়া যাইবার নামে গঙ্গারামের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া ওঠে। চলিয়া ত সে তাহার চিরজীবন ধরিয়াই আসিতেছে! শুধু সে নয়, তাহার বাপ-পিতামহ সকলেই চলিয়াছে। পথে পথে চলাই তাহাদের জীবন, পথেই জন্ম, পথেই মৃত্যু! কত নদ নদী প্রান্তর, কত গ্রাম, কত দেশ, কত নগর, কত অরণ্য, কত পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া তাহারা শুধু চলিয়াই যায়। এই অবারিত অবিশ্রান্ত চলা তাহার আর ভাল লাগে না। শ্যামা সুন্দরী এই ধরিত্রীর বুকে এমনি একটি শান্ত সুন্দর নীড় রচনা করিয়া সে একটুখানি বিশ্রাম করিতে চায়। কিন্তু টগরের মুখে এ কি কথা! পথশ্রান্ত নিতান্ত অসহায় পথিকের মত ক্লান্ত নয়নে গঙ্গারাম তাহার মুখের পানে অবাক হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

বহু দূর দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা যে কত বড় অন্যায়, পথের জীবন যে কি-রকম বিপদসঙ্কুল, ঘরের মেয়ে টগরকে তাহাই বুঝাইবার জন্য গঙ্গারাম তাহার বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিতে সুরু করে। ঘরের বাহিরে নিবিড় কালো অমাবস্যার

গভীর রাত্রি তখন ঝম্ ঝম্ করিতেছে। ঘরের মধ্যে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া একই শয্যায় দু'জনে শুইয়া আছে। দু'হাত দিয়া গঙ্গারামের গলা জড়াইয়া ধরিয়া টগর বলে, 'তার পর ?'

গঙ্গারাম হয়ত বলিয়া চলে,—কোথায় কোন্ দূরদুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের কোন্ গভীর অরণ্যের মধ্যে বুনো ভাল্লুকের বাচ্চা ধরিতে গিয়া তাহারা কি রকম বিপদে পড়িয়াছিল তাহারই গল্প। তারপর আর-একদিন। সেদিনও এক ঘন-ঘোর দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি পথ চলিতেছিল। বৃক্ষহীন লতাহীন তৃণহীন শুষ্ক বন্ধ্যা প্রান্তর—কোথাও এতটুকু আশ্রয় নাই, আঁকড়িয়া ধরিবার মত কোথাও কিছুই নাই, পশ্চাতে মরুপ্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, সম্মুখে অবারিত উন্মুক্ত অসীম বিস্তার, কোথা হইতে একেবারে অকস্মাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের মত মেঘ উঠিয়া সুমুখের আকাশটাকে অন্ধকার করিয়া দিল, বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল. নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম করিল, সহসা গোঁ গোঁ করিয়া বহুদূর দিগন্ত হইতে বাতাসের একটা ভীষণ গর্জ্জন তাহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল, এইবার আকাশ আড়াল করিয়া ধূসর ধূম্রবর্ণ ঘূর্ণী উঠিয়াছে, অগ্রসর হইবার আর উপায় নাই. বেতের ছিলা দিয়া তৈরি তাহাদের বড় তাঁবুটা সেইখানেই খাটাইতে হইবে। খটাখট্ শব্দে তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ শক্তিতে খুঁটি পোঁতা সুরু হইয়া গেল। তাঁবু খাটানো হইল। প্রকাণ্ড তাঁবু। তাহারই মধ্যে গাধা,

কুকুর, পুরুষ ও নারী—পশু ও মানুষ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কোনোরকমে তাঁবুর খুঁটি আঁক্‌ড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। হয় বাঁচিবে নয় মরিবে। তাই বলিয়া কাহারও বুকে এতটুকু ভয় নাই। দেখিতে দেখিতে ঝড় ঝঞ্ঝা শিলাবৃষ্টির ভীষণ গর্জ্জনের সঙ্গে তাহাদের সমবেত অট্টহাসির শব্দে প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

গঙ্গারামকে সজোরে আঁকড়িয়া ধরিয়া টগর চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বা! বেশ মজা ত! আমার খুব ভাল লাগে।'

কিন্তু গঙ্গারামের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রকৃতির সঙ্গে এমনি জীবন-মরণ খেলা সে অনেক খেলিয়াছে, এবার শান্ত শিশুটির মত প্রকৃতি-মাতার নিরাপদ পক্ষপুটের অন্তরালে নির্ভয়ে একটুখানি বিশ্রাম করিতে চায়। তাই সে এতদিন পরে টগরকে লইয়া এই লতাকুঞ্জের নীড় রচনা করিয়াছে! কাল-বৈশাখীর ঝড়ে ইহাকে সে আর উড়িয়া যাইতে দিবে না। ছোট্ট পাখীটির মত টগরকে গঙ্গারাম তাহার দুই বিশাল বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলে, 'দূর পাগলী! এই ত আমরা বেশ আছি। তুই জানিস না টগর, ঘুমো।'

বলিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকে।

ঝগড়া-ঝাঁটি তাহাদের প্রায়ই হয়। টগর বলে, তাহার ঘরে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না। কয়লাখাদে সে কাজ করিতে যাইবে।

কিন্তু গঙ্গারাম নারাজ। আশ-পাশের শহরে গিয়া গ্রামে গিয়া সাপের খেলা দেখাইয়া ভেল্‌কি বাজি দেখাইয়া যাহা কিছু সে রোজগার করে, বাড়ী ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে সবই সে টগরের হাতে তুলিয়া দেয়। বলে, 'দেখেছিস টগর, কি রকম রোজগার করেছি! তোকে কাজ করতে আমি দেবো কেন? ঘরদোর আগ্‌লে ফুলের মালা প'রে তুই শুধু বসে থাক্‌ আর রান্না কর।'

স্নিগ্ধ সুন্দর হাসি হাসিয়া টগর বলে, 'তোকে নিয়ে আমি এক ভারি বিপদে পড়লাম দেখছি। বাড়ী থেকে বেরোতে যদি না দিস্‌ ত আমি একদিন মরে যাব দেখিস্‌। মাথায় হাত দিয়ে তখন কাঁদবি বসে বসে।'

গঙ্গারাম তখন অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইতে সুরু করে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফল তাহাতে কিছু হয় বলিয়া ত মনে হয় না।

ফুরসুৎ পাইলেই টগর তাহার সেই চিরপুরাতন এক জেদ ধরিয়া বসে, 'চল্‌ আমরা চলে যাই দু'জনে।'

গঙ্গারাম বলে, 'কোথায় যাবি?'

'যেদিকে দু'চোখ যায়। আগে ছিলাম একা, এখন ত দু'জন! ভাবনা কিসের? চল্ না!'

গঙ্গারাম বলে, 'এই রে! আবার তোকে সেই মরণ-রোগে ধরেছে। এবার কিন্তু ও-কথা যদি বলিস ত তোকে আমি শাসন করব টগর।'

টগর হাসিয়া বলে, 'কর্ না! তোর শাসনকে আমি ডরাই নাকি?'

'ডরাস্ না? দেখবি?' বলিয়া একটা চ্যালা কাঠ তুলিয়া গঙ্গারাম তাহার দিকে তুলিয়া ধরে।

তাহার সেই বিশাল দেহ, রোষকষায়িত দুই চক্ষু, যৌবনদৃপ্ত পুরুষোচিত পরুষ ভঙ্গী দেখিয়া টগরের এবার সত্যই ভয় হয় ভয়ে সে চোখ বুজিয়া হাত আড়াল দেয়।

গঙ্গারাম তখন হো হো করিয়া হাসিয়া একেবারে ফাটিয়া পড়িয়া কাঠটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলে, 'এই ত সাহস! যাঃ, তুই আর কোনও কথা বলিস্ নি।'

কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন চলে!

টগর একদিন সত্যই তাহাকে লুকাইয়া কয়লা-খাদে খাটিতে গেল। ফিরিয়া যখন আসিল তখন সন্ধ্যা। গঙ্গারামের ভয়ে মদ খাইয়া একেবারে চুর্ হইয়া আসিয়াছে।

অন্ধকার বাগানের একপাশে বেড়ার ধারে সাপের ঝাঁপিকয়টি লইয়া গঙ্গারাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। টগরের সঙ্গে একটা কথাও বলিল না।

টগর প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। পরে দেখিবামাত্র খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'চুপ ক'রে রইলি যে? কিছু বলবি না?'

অভিমান করিয়া গঙ্গারাম বলিল, 'না।'

'না, তোকে বলতেই হবে।' বলিয়া বিস্রস্তবসনা টগর তাহার পরণের শাড়ীর আঁচলটা টানিতে টানিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নে, মার্ আমাকে। মেরে মরিয়ে দে, তবু কিছু বলব না।'

'বলবি না? পারবি মরতে?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া সে এক লীলায়িত ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া যেমন হাসিতে যাইবে, অমনি কিসের ভয়ে আচম্কা একেবারে চমকিয়া উঠিয়া 'বাপ্ রে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া টগর লাফাইয়া খানিকটা দূরে সরিয়া গেল।

দেখিল, গঙ্গারাম তাহার কেলে-গোখরোর ঝাঁপিটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বনাশ! আর একটু হইলেই সে মরিয়াছিল! টগরের নেশা ছুটিয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার ধড়্ ধড়্ করিতে লাগিল। সেইখান হইতেই বলিল, 'তুই কি আমাকে অমনি ক'রে মেরে ফেলতে চাস্ নাকি?

সাপটাকে টানিয়া আনিয়া আবার ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া গঙ্গারাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। কিন্তু ফের্ যদি যাস্ কোনোদিন......'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই টগর তাহার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

গঙ্গারামের জন্য রান্না চড়াইতে হইবে। সারাদিন কয়লাখাদে খাটিয়া আসিয়া রান্না চড়াইতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। অথচ না চড়াইলেও নয়। নিজেও সে দিনের বেলা ভাল করিয়া খায় নাই। উনান ধরাইয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া দেখিল, বাগান হইতে উঠিয়া গঙ্গারাম ঘরে আসিয়া বসিয়াছে।

উনানের কাছে বসিয়া বসিয়া টগর ভাবিতে লাগিল, সাপটা যদি আজ তাহাকে সত্যই কামড়াইয়া দিত? বিষ-পাথর দিয়া দিয়া গঙ্গারাম তাহাকে বাঁচাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু এমন কী অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য সাপের কামড়ে তাহাকে মরিতে হইবে?—আর সাপটাকে সে ছাড়িলই বা কি বলিয়া? তাহার উপর গঙ্গারামের মায়া-মমতা কি একটুও নাই? দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগে। একা-একাই ত সে কত জায়গা ঘুরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় নাই। মনে হয়—আরও দূরে—আরও দূরে সে চলিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গী অভাবে তাহা সে পারে না। তাহার এই রূপ-যৌবনই হইয়াছে কাল! তাহা না হইলে কাহারও সে ভরসা করিত না, একাই চলিয়া যাইত। সেবার ট্রেণে চড়িয়া সে হাজারীবাগ চলিয়া গিয়াছিল। খাটিয়া খাইবে তাহার জন্য আর ভয় কিসের? কিন্তু তিন-চারটা

পুরুষের জ্বালায় যে-কষ্ট সে পাইয়াছে সেকথা জীবনে ভুলিবে না। তাই সে গঙ্গারামকে পাইয়া অবধি প্রতিদিন ভাবিয়াছে, আর তাহার চিন্তা নাই। এবার সে ঠিক তাহার মনের মত সঙ্গী বাছিয়া লইয়াছে। পথে পথে ঘুরিয়াই যাহাদের জীবন কাটে সেই ভবঘুরের দল হইতেই যখন সে গঙ্গারামকে পাইয়াছে, তখন তাহার জীবনের সাধ এবার বোধহয় আর অপূর্ণ থাকিবে না, তাহারা দু'জনে এইবার পৃথিবীর এ প্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইবে, স্বামী তাহার সাপের খেলা দেখাইবে, আর নিজে সে দিনমজুরী করিবে। তাহার পর কুটীর যদি তাহাদের কোনোদিন বাঁধিতেই হয় ত সে কোনও বহু দূর দেশের কোনও পাহাড় পর্ব্বতের নীচে অচেনা অজানা বনের ধারে তাহাদের পাতার কুটীর বাঁধিয়া সেইখানেই জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

কিন্তু অদৃষ্ট তাহার নিতান্ত মন্দ। তাই আজ ভবঘুরে গঙ্গারামও বাড়ীর আরাম ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে চায় না। নিজেও নড়িবে না, তাহাকেও যাইতে দিবে না।

টগরের নেশা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গঙ্গারামকে সে আর-একবার জিজ্ঞাসা করিবে। তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'তুই সাপ কেনে ছাড়লি বল্ !'

গঙ্গারাম বলিল, 'বেশ করেছি! তুই আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবি, আর আমি চুপ ক'রে থাকব ?'

'ফাঁকি দিয়ে আবার পালালাম কোথায়? তোকে ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।'

গঙ্গারাম বলিল, 'আমি যাব না।'

'যাবি না?'

'না।'

'যাবি না?'

'না।'

'কিছুতেই না?'

'না, না।'

'আর আমি যদি যাই ত আমার গায়ে তুই সাপ ছেড়ে দিবি?'

'হ্যাঁ, দেবো।'

টগর বলিল, 'বা-রে! আমি যদি ম'রে যাই?'

গঙ্গারাম বলিল, 'তা মরে যাস্ ত যাবি। দুষ্টুমি করলেই মরতে হয়।'

টগর তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে একবার তাকাইল। বলিল, 'হুঁ, তাহ'লে এই তোর ভালবাসা?'

গঙ্গারাম বলিল, 'হাঁ, এই আমার ভালবাসা। বেইমান্ যে, তাকে আমরা ভালবাসি না।'

টগর রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'তোর সঙ্গে কি বেইমানী করলাম রে মুখপোড়া?'

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল।

টগর তাহার হাতে ধরিয়া জোরে জোরে নাড়া দিতে লাগিল।—'চুপ ক'রে রইলি যে? কি বেইমানী করেছি বল্।'

গঙ্গারাম তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'চেঁচাস্‌নে, চুপ কর্।'

টগর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। দেওয়ালের গায়ে মাথাটা তাহার সজোরে গিয়া লাগিল। উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'বেশ করব চেঁচাব, আমার নিজের বাড়ী, আমি যা খুসী তাই করব, তোর কি?'

গঙ্গারাম বলিল, 'যা খুশী তাই করলেই হ'লো কি না! খুন ক'রে ফেলব না?'

টগর বলিল, 'তা তুই পারিস্ বটে! তোকে রেখে আমি ভাল কাজ করিনি।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ।

আপন-মনেই কিয়ৎক্ষণ বিড় বিড় করিতে করিতে দেখা গেল, দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া নেশার ঝোঁকে টগর কোন্‌সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

উনানে ভাত ফুটিতেছে। গঙ্গারামকেই শেষে উঠিতে হইল। রান্না করিয়া নিজে খাইয়া টগরকে উঠাইতে গিয়া দেখিল সে আর কিছুতেই ওঠে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর মদ খাইয়া ঘুমাইয়াছে। তাহাকে উঠানো বড় সহজ কথা নয়।

গঙ্গারামের অনুনয় বিনয় বৃথাই হইল। টগরের ভাত তেমনি ঢাকা দেওয়াই পড়িয়া রহিল। গঙ্গারাম বলিল, 'তবে কাল খাস্।'

বলিয়া সে নিজেও শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া দেখে, টগর নাই।

নিশ্চয়ই সে আজও আবার খাদে খাটিতে গেছে। গঙ্গারাম রাগ করিল। আসুক্ সে, আজ তাহাকে রীতিমত তিরস্কার করিবে।

দূরের গ্রামে সাপ খেলাইয়া বাজি দেখাইয়া গঙ্গারাম সেদিন একটুখানি রাত্রি করিয়াই বাড়ী ফিরিল। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার। গ্রামের যে-সব মেয়েরা কয়লা-খাদে খাটিতে যায়, গঙ্গারাম তৎক্ষণাৎ তাহাদের কাছে ছুটিল। শুনিল, টগর সেদিন খাদেও খাটিতে যায় নাই।

তবে সে গেল কোথায়?

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর গঙ্গারাম নিজেই শেষে রান্না করিতে বসিল। কিন্তু রান্না আর শেষ পর্য্যন্ত তাহার হইয়া উঠিল না। খানিক পরে উনানে এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া সে দোকান হইতে চারটি মুড়ি কিনিয়া আনিয়া খাইল।

পরদিন হইতে রোজই গঙ্গারাম তাহার ঝুলি-প্যাঁট্রা কাঁধে লইয়া সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, কোনোদিন বৈকালে কোনোদিন-বা রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পথে সে রোজই ভাবে—হয়ত বাড়ী গিয়া দেখিবে তাহার টগর ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়া দেখে, সে ফিরে নাই!

গ্রামের লোকেও সকলেই আজকাল জানিয়াছে যে, গঙ্গারামকে একা ফেলিয়া রাখিয়া টগর কোথায় পলায়ন করিয়াছে।

তাই কেহ কেহ হয়ত রসিকতা করিয়া গঙ্গারামকে কাছে পাইলেই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে, 'বলি কি হে গঙ্গারাম, পাখী কি উড়েছে নাকি?'

কিন্তু গঙ্গারাম অত-সব রসিকতা ঠিক বুঝিতে পারে না। বলে, 'আজ্ঞে না, পাখী ত আমার ছিল না!'

কাজেই তাহাকে তখন আবার ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিতে হয়। বলে, 'যে-সে পাখী নয় হে, তোমার টগর-পাখী।'

ঈষৎ হাসিয়া গঙ্গারাম বলে, 'আজ্ঞে হাঁ।'

কিন্তু হাসিয়া জবাব দিতে গিয়া বড় বড় চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ করিয়া ওঠে।

মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, 'বলি হাঁ গঙ্গারাম, ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছিল?'

ঘাড় নাড়িয়া গঙ্গারাম বলে, 'হাঁ মা, হয়েছিল। তবে এমন কিছু নয়।'

মেয়েরা তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, 'ছুঁড়ী বরাবরই এম্‌নি। তা তুমি ভেবো না গঙ্গারাম, ও আবার ফিরে আসবে দেখো।'

গঙ্গারাম হঠাৎ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া ওঠে। বলে, 'হাঁ মা, আসবে বই-কি! ও যাবে কোথায়! আসবে ঠিক্।'

সেই আসার আশায় গঙ্গারাম বসিয়া থাকে। তাহার অমন সুন্দর চেহারা. দেখিলে আজকাল একটুখানি ম্লান বলিয়া মনে হয়। বাড়ীর সুমুখে ফুলের বাগানটি আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া গেছে।

পাছে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে বলিয়া দিনের বেলা গঙ্গারাম আর গ্রামের ভিতর বড় একটা প্রবেশ করে না।

দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস গড়াইয়া গড়াইয়া পার হইয়া যায়, তবু টগরের দেখা নাই!

মানুষ আর কতদিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গারাম আজকাল হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বলে, 'ক্ষেপেছ? আবার সে আসে কি না? এতদিন হয়ত সে আবার কোথায় ঘর-সংসার পেতেছে

'কিন্তু তুমি যে তার জন্যে ভেবে ভেবে মরতে বসেছ গঙ্গারাম?'

গঙ্গারাম বলে, 'মরব কি রকম? তাই আবার মরে নাকি কেউ? না এলো ত আমার ভারি বয়েই গেল।'

পাড়া-পড়শী উপদেশ দেয়। বলে, 'তুমি আবার বিয়ে কর গঙ্গারাম। মেয়ে একটি আমরা দেখেশুনে দিই জোগাড় ক'রে।'

গঙ্গারাম বলে, 'কাউকে জোগাড় করতে হবে না দাদা, মেয়ে আমার হাতেই আছে। আর দিনকতক্ দেখি।'

দিনকতক পরে, একদিন দেখা যায়, গঙ্গারামের দরজা আর খোলে না! বনমালী চৌকিদারের পাশেই বাড়ী। সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়া দরজার ফুটা দিয়া দেখে,—কেলে-গোখ্‌রের যে-ঝাঁপিটা খুলিয়া গঙ্গারাম তাহার টগরকে একদিন ভয় দেখাইয়াছিল, সেই ঝাঁপিটা খোলা, সাপটা কোথায় পালাইয়াছে কে জানে, আর তাহারই দংশনের বিষে বিষে একেবারে জের্‌বার্ হইয়া গিয়া ঘরের মেঝের উপর গঙ্গারাম মরিয়া পড়িয়া আছে।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

জীবনের আনন্দ বৈচিত্র্যে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যদি একটা বিচ্ছেদহীন সমরূপতা বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সে দৃশ্য হইত দুঃসহ। মানুষে মানুষে যদি প্রভেদ না থাকিত, সকলে যদি একই ধরণে ভাবিত, একরূপ কাজ করিত, এবং কাজ করিয়া একই রকমের ফল পাইত, তাহা হইলে সে জীবন হইত দুর্ব্বহ। নানা ধরণের, নানা গড়নের, নানা রুচির ব্যক্তি লইয়া সমাজ। সুপ্রজন-বিদ্যার বলে জগতের সব লোক যদি সমান হইয়া যাইত, যাহারা শারীরিক ভাবে দুর্ব্বল ধরাতল হইতে তাহারা যদি বিলুপ্ত হইত, যাহারা সংসার বা সমাজের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না, তাহারা যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলেই কি পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত? সংসার সম্পর্কে যাহাদের অযোগ্য বলিয়া মনে হয়, আমরা যাহাদের 'বেখাপ্পা বলিয়া ভাবি, তাহাদের ভিতরের শক্তির সকল সম্ভাবনা কি আমাদের পরিজ্ঞাত? বিজ্ঞান কতটুকুই বা জানে? কেম্ব্রিজের বায়োকেমিষ্ট্রির অধ্যাপক হ্যালডেন বলিতেছেন, I feel we do not at present know enough of the potentialities of a lot of people who, we say are failures now and should never have been born। উপযুক্ত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পাইলে এই-সব

অনুপযুক্ত ব্যক্তিই হয়ত ঐকান্তিক যোগ্যতা লাভ করিয়া সুখে জীবন যাপন করিত। The fact that they are misfits among us does not mean that you could have a society where they wouldn't be happy members। ব্যক্তিকে এক ছাঁচে গড়িয়া তোলা নহে, প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনা ফুটাইয়া তুলিবার মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করাই মানব সমাজের কাম্য হওয়া উচিত।

*   *   *

প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারকার্য্য সম্পর্কে ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ অনন্যসাধারণ পটুত্ব লাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি। এ-বিষয়ে ইংরেজের দক্ষতা বিগত মহাযুদ্ধের সময় পরিপূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যে যতই রেষারেষি এবং ঝগড়াঝাটি থাকুক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলাতী দল এবং কাগজগুলি মোটামুটি একমত। বিলাতী প্রোপাগাণ্ডার দুইটি অঙ্গ—সত্যগোপন এবং অসত্যের বিবৃতি। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল বৈঠকের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রেস-প্রতিনিধিদের নিকট অনুযোগ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সঠিক এবং সম্পূর্ণ খবর বিলাতের সংবাদপত্রে বাহির হয় না। অরণ্যে রোদন। যাহা পূর্ব্বে ঘটিতেছিল, পরেও তাহা ঘটিবার এতটকু ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের মত

বিশ্ব-বিখ্যাত কবির পত্র প্রকাশ না করা শুধু অসৌজন্য নহে, suppressio veri বা সত্যগোপনের অন্যতম উপায় মাত্র। মাসাধিক পূর্ব্বে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কন্‌সিলিয়েশন্ গ্রুপ বা ভারতবন্ধু সমিতির সভাপতি কার্ল হিথের অনুরোধে তাঁহাকে লিখিত শান্তি ও মিলনের বাণী নিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি, এ-দেশে বহু প্রচারিত হইলেও, দু'একখানি ছাড়া বিলাতী কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই।

* * *

......"মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দিবার সুযোগ ভারতবর্ষে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অগণিত বার গবর্ণমেণ্টের নিকট আসিয়াছে। এইরূপ এক আহ্বান আসিয়াছিল, যখন গোলটেবিল বৈঠক হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর ইঙ্গিত উপেক্ষিত হইল, তাঁহাকে সরাসরি কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। সেই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলিভাবে দমননীতি অবলম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার যুক্তিহীনতার উন্মত্ততায় কোটি কোটি নরনারীর চক্ষে নিজের মর্য্যাদাকে মসীলিপ্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক ভুল হইতে অন্য ভুলে গিয়াছেন এবং অবশেষে ভারতবর্ষকে এক আসন্ন বিগ্রহের অবস্থায় টানিয়া আনিতে সফলকাম হইয়াছেন।

......"সময় থাকিতে যদি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতীয় নীতি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চিতরূপে দুইটি জিনিষের সম্মুখীন হইতে হইবে।

(১) কোন দেশ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য দেশ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষকে আর জোর করিয়া শাসন করা চলিবে না, সে জোর যতই মমতাহীন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দক্ষতাপূর্ণ হউক না কেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টিমূলক যোগাযোগ বজায় রাখিতেই হইবে, কিন্তু শুধু বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের দ্বারাই উহা সম্ভব। এরূপ সহযোগিতার জন্য আমাদের দেশের লোক প্রস্তুত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করিতে হইবে. গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টভাবে ন্যায়বিচার এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশবাসীর অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

(২) আমাদের এবং ইংরেজদের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিশৃঙ্খলাকে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের প্রভাবই একমাত্র সত্যসত্য প্রতিরোধ করিতে পারে। অথচ, কংগ্রেসের সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহাদের অনুরক্তি. এবং যাহাদের

স্বার্থ তাঁহারা একাগ্রভাবে সমর্থন করিয়াছেন, সেই জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের একনিষ্ঠতা। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে বে-আইনি ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সকলকে গুপ্তভাবে এবং নির্ম্মমরূপে দমন করা হইয়াছে। অবশ্য লোকের মনের উপর কংগ্রেসের যে নৈতিক প্রভাব আছে তাহা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই. এবং উহার প্রতিষ্ঠান ক্ষীণবল হয় নাই. কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে এবং আমাদিগকে এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ নরনারীগণের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে অন্তরাল পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছেন। জনসাধারণের উপর গবর্ণমেণ্টের এখনও যদি কোন ন্যায়সঙ্গত প্রভাব থাকে, তাহা হইলে এইরূপে গবর্ণমেণ্ট তাহা হারাইতে বসিবার গুরুতর দায়িত্ব লইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিরপরাধ মনুষ্যের পক্ষে যে সকল প্রতিক্রিয়ামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফল সর্ব্বনাশকর সেই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে এইরূপে উৎসাহিত করিবার গুরুতর দায়িত্বও গবর্ণমেণ্ট স্কন্ধে লইয়াছেন।

"গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সদিচ্ছাব্যঞ্জক ইঙ্গিত, শান্তিপ্রদ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চাতুর্য্য দ্বারা সংরক্ষিত কৌশলপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিক্ষেপ করার সময় আর নাই, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার দমন এবং ভয়প্রদর্শনের দুর্ব্বল নীতি উল্টাইয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব সহ সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার সারবস্তু দিয়া ঐ প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করা যায়। প্রকৃত শাসন-সংস্কার দ্বারা এক বিবেচনাহীন গবর্ণমেণ্টের পুঞ্জীভূত নির্ব্বুদ্ধিতা অপসারিত করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের সভ্যগণকে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতে হইবে এবং বিনাসর্ত্তে সমস্ত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই সকল অর্ডিন্যান্স দ্বারাই স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকৃত হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট শাসন করিতে অপারগ।

······"আমাদের মনুষ্যত্বের মূল দাবীকে যদি গবর্ণমেণ্ট নির্ভীকভাবে স্বীকার করেন, তবেই শুধু ভারতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মাজী বিশ্বের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণিত কয়িরাছেন ; গবর্ণমেণ্ট কি সাড়া দিবেন ?"

ফ্রী প্রেস —আনন্দবাজার পত্রিকা।

* * *

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন সুরু করায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি আনন্দিত। এ আন্দোলন সরকার এবং ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভারও অনভিপ্রেত নহে। এই সামাজিক সংস্কার আমাদের কেন প্রয়োজন তাহা আমরা জানি। কিন্তু মহাত্মাজীর এ-কাজ ফিরিঙ্গি কাগজগুলির এত মনঃপুত কেন ? তাহারা চায় ভারতবাসীর উপচীয়মান শক্তি

একটি বিপুল আন্দোলনে ব্যয়িত হোক, কিন্তু সে আন্দোলন যেন রাজনৈতিক না হয়। ভারতবর্ষের দৃষ্টি যে লক্ষ্যে নিবদ্ধ, সেই লক্ষ্য হইতে অন্তরিত করিয়া দৃষ্টির দিগ্‌পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত করিতে পারিলে তাহারা সুখী হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ জানে সকল নদী এক মহাসাগরে মিলিয়াছে।

দিনপঞ্জী

১৭ই নভেম্বর ঐক্য-সম্মিলনের সাব-কমিটির সভায় সকল বিষয়ে আপোষ-নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলালকে তারযোগে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

১৭ই নভেম্বর—অদ্য লালা লাজপৎ রায়ের চতুর্থ মৃত্যু-স্মৃতিবার্ষিকী। চারি বৎসর পূর্ব্বে ঠিক যে-সময় লালাজীর মৃত্যু হয়, অদ্য প্রাতে সেই সময়ে তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স চৌষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

১৮ই নভেম্বর—সায়াহ্নকালে রাজসাহী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ল্যুক তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাসহ মোটর-ভ্রমণে বাহির হইলে জেনারেল পোষ্ট-অফিসের নিকট রাস্তায় তাঁহার উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি ঘাড়ে ও গালে তিনটি স্থানে জখম হইয়াছেন।

১৯শে নভেম্বর—যারবেদা জেলে কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী গত শুক্রবার দিন মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২২শে নভেম্বর—ডাবলিনের ইণ্ডো-আইরিশ স্বাধীনতা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জেনেভায় মিঃ ডি ভ্যালেরার নিকট এই মর্ম্মে এক তার করা হইয়াছে যে, তিনি যেন ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁহার

প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহারা ফ্রী ষ্টেট আইরিশ পার্লামেণ্টে এ সমস্যাটি তুলিবার জন্য পার্লামেণ্টের শাসন পরিষদকে অনুরোধ করিয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর—পণ্ডিত মালব্য ইংলণ্ডে তারযোগে একটি বিবরণ পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, যখনই হিন্দুগণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের তের দফা দাবীই মানিয়া লইয়াছেন, তখনই মুসলমানেরা পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এই চুক্তি মানিয়া না লইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমার ধারণা যে, সম্প্রতি এক দল মুসলমান দিল্লীতে সমস্ত বিষয় বিবেচনা না করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন করা হইবে, এবং ন্যায় নীতি ও মুসলমান সমাজের স্বার্থ—এই উভয় দিক হইতে তাঁহারা এলাহাবাদের চুক্তি স্বীকার করিবেন। যাঁহারা এইরূপ চুক্তি ও মিলন চাহে না, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হইবেন।

১ম বর্ষ] ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ [২২শ সংখ্যা

রাণী শান্তমণি

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

আমি একটা মেয়েকে জানি যার আঠারটা নাম। অনেক আরাধনা আর ধন্নার পর তার জন্ম হয়েছিল—তাই তার প্রথম নাম হ'ল আরাধনা, তারপর ধন্না—এবং তারপর খুড়ো খুড়ি পিসে পিসি প্রভৃতি যেখানে যে ছিল সবাই একটা ক'রে নাম রাখল...মোট দাঁড়াল আঠারটা।

যার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে এই গল্পের প্রস্ফুটন হবে তার নাম মাত্র দুটি—রাণী আর শান্তমণি। রাজমহিষী সে নয়, তবু কোন্ রাজ্যের সে রাণী, আর কেন সে রাণী তা পরে দেখা যাবে।

রাণী শান্তমণির দুগ্ধফেননিভ শুভ্র দেহ, অন্য রঙের কলঙ্ক কোথাও নাই।

বুড়ো আর বুড়ী তাকে মানুষ করে—কিন্তু বুড়ীর একদিন সজ্ঞানে নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। বুড়ো দাঁড়িয়ে কাঁদছিল—বুড়ী ইসারা ক'রে বললে, রাণীকে সামনে আনো।

বুড়ো রাণীকে দু'হাতে করে তুলে এনে আড়-কোলে তার সামনে দাঁড়াল...

সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুড়ীর চোখ ঘোলা হ'য়ে এল—দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে বালিশে পড়ল...বুড়োর কোলের ভেতর থেকে রাণী ডাকল—মিউ; ডেকে চোখ বুজল।

বুড়ী ম'ল—

রাণী বুড়ীর বুক থেকে খসে পড়ল বুড়োর বুকে। বুড়ী থাকতে রাণী শান্তমণি বুড়ো বুড়ী দু'জনারই ছিল---বুড়ী ডাকত, রাণী!...বুড়ো ডাকত, শান্তমণি!

রাণী শান্তমণি ছিল দু'জনার, হ'ল একজনের একার, আর একজনের একার দায়।...শান্তমণি শুয়ে থাকে, ছুটে বেড়ায়, আরশোলার সাথে লুকোচুরি খেলে, ওৎ পাতে, চড়ুই ধরতে চায়, চড়ুই উড়ে গেলেও তাকিয়ে থাকে—

অক্ষয় নিস্তেজ দৃষ্টি প্রাণপণে বিস্ফারিত ক'রে তা দেখে—আহ্লাদে তার প্রাণ, আর চোখে তার জল, টল্‌টল্ করে...

কিন্তু ভয়ও খুব, শত্রুও অনেক—

রাণীর স্বজাতিরা আসে—বদসঙ্গ ব'লে তাদের তাড়িয়ে দিতে হয়, দস্যুর মত দুর্দ্দান্ত আর হিংস্র কুকুর একটা থাকে—তখন শান্তকে নিয়ে শশব্যস্ত হ'তে হয়...

অক্ষয় খোঁজ নিয়ে জেনেছে, খোঁয়াড়ে কুকুর নেয় না।...এদিকে অক্ষয়ের পাঁজরে তেমন জোর নেই—চেঁচিয়ে ডাকতে গেলে পাঁজরের হাড়ে খিল ধরে...রাত্তিরে হাতড়ে তাকে ধরতে গেলে গায়ে পায়ে কাঠের লোহার ধাক্কা লাগে।

প্রাণ কেবলই বুকের ভেতর আট্‌কা পড়ে আছে, এ-কথা যে বলে সে নিজের প্রাণের কথা জানে না; প্রাণ ছড়িয়ে আছে—ছুটে বেড়ায়; গুটিয়ে এসে বুকের ভেতর জড়ো হওয়ার নামই মৃত্যু।

বুড়োর প্রাণ শান্তমণির পিছু পিছু ছোটে—বুড়ো মরতে চায় না। আফিমের ঘোরে বুড়োর মনে হয়, শান্তমণি বিড়াল নয়—তাদের সন্তান: গুণবতী যেমন চক্রপাণি আর বিমলার সন্তান, কুসুম যেমন বলরাম আর কৌশল্যার সন্তান, তেমনি। মায়ের স্তন ছেড়ে সে বুড়ীর কাছে ঝিনুক ধরেছিল—এখন নিজেই জিব দিয়ে তুলে তুলে খেতে পারে; মাছের কাঁটা বেছে দিতে হ'ত—এখন তার কাঁটার ভয় নেই ..

ভাবতে ভাবতে অক্ষয়ের স্তিমিত চক্ষু আনন্দে আরো স্তিমিত হ'য়ে আসে...দেখে, শান্তমণি এক হাতে একটা তিন-সেরী বাটির একবাটি ইলিশ মাছ ভাজা, অন্য হাতে পাঁচ-

সেরী বাটির একবাটি সরসমেত ঘন-আওটা দুধ নিয়ে সুমুখে দাঁড়িয়ে—"কে এসেছে দেখ" বলে হাসছে...

"শান্ত!" বলে চেঁচিয়ে উঠেই অক্ষয়ের ঘোর ভেঙ্গে যায় —চোখ মেলে চেয়ে দেখে শান্তমণি পাশেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অক্ষয় তাকে তখন, কল্পিত ইলিশমাছ আর দুধ আনার কৃতজ্ঞতায় বিভোর হ'য়ে, দু'হাতে করে আল্‌গোছে কোলে তুলে নেয়।

বুড়ো বুড়ো হয়েছে; তার মনে হয়, প্রাণটা যেন বুকের ভেতর গুটিয়ে আস্‌ছে...সময় সময় সব ভুলে গিয়ে সে অজ্ঞাত যাত্রার পথের যেখানে সুরু সেখানে এসে ঝিমিয়ে পড়ে—

সজাগ হয়েই মনে পড়ে—শান্তমণি?

কিন্তু শান্তমণি কোথাও যায় নাই—এখানেই আছে।

সে অভাবে শান্তমণি কার হবে, এই হয়েছে অক্ষয়ের ভাবনা। রতির ইচ্ছে ছিল রাণীকে বোন মতির হাতের দিয়ে যাবে; কিন্তু মতি রতির মোটে তিন বছরের ছোট—তার দিনও ত নিকটবর্ত্তী...কাজেই মনঃস্থির করে রতির মরা হয় নাই।

মতি পাশেই থাকে; তার তিনটি ছেলে বর্ত্তমান; বড় চারটি বড় হ'য়ে মারা যেয়ে এখন যে বড়য় দাঁড়িয়েছে তার নাম বোনা আর বয়স ষোলো। বোনা ছেলেটি আদৌ ভাল নয়। তাকে নিয়ে মুস্কিল এই যে রাগলে সে কি করবে তা বোঝা

যায়; কিন্তু তার রকম দেখে মনে হয় ঠাণ্ডা মেজাজে সে সব পারে—হাঁড়ি ভেঙে চুরমার করা থেকে চ্যালা কাঠে করে পিটিয়ে গর্ভধারিণীকে হত্যা করা পর্যন্ত. অথচ বোমার কথা-বার্তা ভালমানুষের মত—অবাধ্য যে বেশী তা-ও নয়। এই সব কারণে ধাঁধায় পড়ে রতি তাকে ভয় করে চলত—অক্ষয় তাকে বিশ্বাস করে না।

আর আছে একজন—অক্ষয়ের ছোট ভাই অনন্ত। অনন্ত থাকে ভিন্ন গ্রামে, পোয়াটেক্ মাঠ পেরিয়েই বক্সীপুরে—ও-পাড়া বললেই চলে।...শান্তমণিকে নিয়ে অক্ষয়ের মন এই দুই স্থানে যেন দোলায় চেপে যাতায়াত করে।

তারপরও একটা কাছে; কথাটা দামী এবং যজ্ঞেশ্বরের অনুকূলে; তা এই যে, মতি আর যজ্ঞেশ্বর পাশেই থাকে...মৃত্যুর পর আত্মা জানতে পেরে সুস্থ থাকবে যে, শান্তমণি যেন এই বাড়ীতেই আছে...আগের মতই ঘুরছে ফিরছে, চোখ বুজে আরাম করছে।. অনন্ত থাকে দূরে—এ-বাড়ীর উপর তার মায়া নাই বোধ হয়।

...অক্ষয় বলল, কিন্তু পারবি তুই যত্ন করতে?...মাছ কড়া ভাজা হলে খায় না; দুধ আউটে সর পড়িয়ে তাকে দেবার সময় আবার কুসুম কুসুম গরম করে দিতে হয়। পারবি?...বলে অক্ষয় যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে আশা করে চেয়ে রইল।

—সব পারব, দাদা। বলে অক্ষয়ের ভায়রা-ভাই যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

অক্ষয় বিমর্ষ হ'য়ে বলল,—কিন্তু তোর ছেলে সোনাকে যে বিশ্বেস নাই—সে যদি বিরক্ত করে কি মারধোর করে?

—হাড় গুঁড়িয়ে দেব তার। আমায় ত তুমি চেন।

—চিনি ভাই তোমাকে।...এই কথাই রইল তা হ'লে—আমি অবর্তমানে এই ঘর-দুয়োর তোমার; সিন্দুক প্যাঁটরা থালা বাসন ঘটি বাটি খাটিয়া যা দেখছ সব তোমার—কিন্তু যতদিন শান্তমণি জীবিত থাকবে ঠিক ততদিন—তারপর এসব আমার ছোট ভাই অনন্তের হবে।

—কিন্তু সে যে উড়নচণ্ডে লক্ষ্মীছাড়া!

—তা-ই বলেইত' তাকে পরে দিচ্ছি।...অনন্তকে ও আমি বলে যাব আমার শেষ ইচ্ছেটা দশজনের সামনে...সে এসে খোঁজ খবর নেবে—যদি শান্তমণির অযত্ন হচ্ছে দেখে তবে সে ঘর বাড়ী সব কেড়ে নেবে—এ-ক্ষমতা আমি তাকে দিয়ে যাব। আমার উইলে এ-সবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।...কি বল?

শান্তমণি মাথা তুলে একবার হাই তুলে পা ছড়িয়ে সটান্ হয়ে রইল..

সেইদিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর বলেল, সে তোমার ইচ্ছে, দাদা। তোমাকে বড় ভাই ছাড়া আর কিছু কোনোদিন ত ভাবি নাই। কিন্তু তোমার ছোট ছেলে মোনার উপর আমি ভারি বিরক্ত হয়ে আছি।

—কেন, কেন ; কেন, দাদা ?

—সেদিন দেখলাম, আমার বাড়ীতে এসে সে শান্তমণির লেজ ধরে টানছে। আমায় দেখতে পেয়েই পালিয়ে গেল।

—কে, মোনা ? বটে ?—বলে যজ্ঞেশ্বর নিজের বাড়ীর দিকে মুখ করে "মোনা, মোনা" করে দুবার হুঙ্কার ছাড়ল...

মোনা তার মায়ের কাছে বসে উকুন বাছাচ্ছিল—ও বাড়ী থেকে যজ্ঞেশ্বরের ডাক আসছে শুনে মোনার মা মোনার মুখ আঁচল দিয়ে মুছে সুন্দর করে দিল ; বলল—যা, ডাকছে।

মোনা লাফিয়ে এসে দাঁড়াতেই মোনার বাবা তার মাথায় হাতের মুঠোর তিনটি ঠোক্কর ঘন ঘন লাগিয়ে দিল...

'কি বলছ ?' বলে যে প্রশ্নটা মোনা মুখে করে এনেছিল তা সে গিলে ফেলল...

যজ্ঞেশ্বর চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর টানবি বেড়া —শান্তমণির লেজ ধরে ?

মোনা বলল—না।...আর তার পরিচ্ছন্ন মুখখানা চোখের জলে ভেসে গেল।

যজ্ঞেশ্বর তাকে যেতে বলে তাকিয়ে দেখল অক্ষয় খুশী হয়েছে।...বলল, আসি দাদা, এখন।

—আচ্ছা।

মোনাকে মারা নিয়ে মতি আর যজ্ঞেশ্বরের সমস্তটা দিন ঝগড়ায় কাটল...স্বামীর লোভ আর বুদ্ধিকে মতি বিঁধল যত বিড়ালের উদ্দেশে পিণ্ডদান করল তার চতুর্গুণ...

মতি চুপ করে ত যজ্ঞেশ্বর বাধায়, যজ্ঞেকর চুপ করে ত মতি সুরু করে...দু'জনেই নূতন নূতন সুর ধরে—নূতন ভঙ্গী নেয়...পুরাণো কথা তোলে...

শান্তমণি অতশত জানত না—

সে এই বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল—

যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ শান্তমণিকে সামনে পেয়ে তাদেরই ঝগড়ার রাগে তার পেটে এক লাথি মেরে তাকে শূন্যে তুলে দিল... শান্তমণি শূন্যে শূন্যে উঠোনে পার হচ্ছে—ভ্রূকুটিভীষণ যজ্ঞেশ্বরের পা তোলাই আছে...বোনা আর মোনা হাসছে...এমন সময় সেই পড়ন্ত রোদে এসে দাঁড়াল শান্তমণি যার সে-ই . অক্ষয় থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে থ হ'য়ে পরে লাল হয়ে উঠল—যজ্ঞেশ্বর পা নামিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে রইল

এবং তারপর অক্ষয়ের মুখ দিয়ে যে কথা বেরুতে লাগল তা বলবে বলে সে এ বাড়ীতে আসে নাই—তা কটু—আর তার জবাব নাই।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে যজ্ঞেশ্বর সেই যে বসে পড়েছিল, মাথা নামিয়ে সে তেমনি বসে রইল...

অক্ষয় কখন চলে গেছে—

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বসেই আছে দেখে বোনা বলল, দাদা, মেসো মশায় চলে গেছে। ওঠো। ...আধমরা যজ্ঞেশ্বর উঠল বটে, কিন্তু মৃত্যু কেন ষোল আনাই হল না এই আক্ষেপ নিয়ে।

রাত্রে যজ্ঞেশ্বর স্বপ্ন দেখল, শান্তমণি যেন তার কোলে শুয়ে আছে; সে তার লেজটা আলগোছে মুঠোর ভিতর ধরে টেনে টেনে ছেড়ে দিচ্ছে—কিন্তু লেজটা সোজা হ'চ্ছে না—গুটিয়ে পড়ছে।

সকালবেলা রাগ পড়েছে মনে করে যজ্ঞেশ্বর দাদার সমীপস্থ হল বটে, কিন্তু রাগ অক্ষয়ের পড়ে নাই—ফল হল না—

অক্ষয় বলিল, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। বলে যজ্ঞেশ্বরকে বার করে দিয়ে সে বা'র-দরজায় দিল এঁটে খিল।

ক্ষুদ্র কর্ম্মের বৃহৎ ফল প্রায়ই হয়—

শান্তমণিকে লাঠিমারায় ফলে অক্ষয়ের সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক বলে ধার্য্য হল, যজ্ঞেশ্বরের পরিবর্ত্তে, অক্ষয়ের ভাই অনন্ত। দু'কাঠা ভূমির উপর দু'খানা ঘর, তদন্তর্গত দ্রব্যাদি; ভিতরে তুলসী মঞ্চ আর বাইরে বার বিঘা জমি, পাঁচ ঝাড় কলাগাছ, আর শান্তমণি—সবই অনন্ত পাবে। শান্তমণি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন ভোগ করবে অনন্ত; শান্তমণির মৃত্যুর পর প্রবেশ করবে যজ্ঞেশ্বর; এবং যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর পর এই

বাড়ী কোনো সাধু বৈরাগীর আস্তানা যেন হয়। যজ্ঞেশ্বরের লোকান্তর আগে ঘটলেও এই ব্যবস্থা—শান্তমণি আস্তানারই সম্পত্তি হবে—

পঞ্চায়তের সম্মুখে এই উইল করে তার ভায়রাভাইয়ের উপর যে রাগের ঝাল ছিল অক্ষয় তা মিটাল—শান্তমণিকে লাথি মারা ক্ষমার্হ অপরাধ নয়।

অক্ষয় মারা গেল—

তার আগেই নিজের কুটীরখানা ভেঙে ফেলে দিয়ে অনন্ত এই বাড়ীতে উঠে এসেছে।

এই বাড়ী ঘর প্রভৃতি যজ্ঞেশ্বরেরই পাওয়ার কথা—পেয়েই ছিল...গাছের ফলটির দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকেই, কিন্তু তা পড়ে এসে এক জনের সামনে—লোকে বলে অদৃষ্ট... অদৃষ্টের দোষেই যজ্ঞেশ্বর পাওয়া জিনিষ পেল না—পেয়ে দখল করে বসল এসে অনন্ত—মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়াই হল...

এমন অবস্থায় যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে অনন্তের ভাব হবার কথা নয়, কিন্তু সবাই দেখল, ভাব হ'ল। যজ্ঞেশ্বর এতবড় ক্ষতির আঘাতটা হাসিমুখে বহন করছে দেখে লোকে তার স্থৈর্য্যগুণে অবাক হয়ে গেল...

কিন্তু তার ব্যবহারে লজ্জা পেল ভূষণ দাস। ভূষণ তাকে গোপনে ডেকে বলল, ছি, ছি, তুই কি ?

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

—বাহাত্তুরে বুড়ো অক্ষয় এমন অবিচার করে গেল, আর তুই হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস্! আমি হলে কি করতাম দেখতিস !...বলে ভূষণ দাস দাঁতে নখে হিংস্র হয়ে উঠল।

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর ভূষণের কথা যেন ভাল করে বুঝতেই পারল না ; চোখ বড় করে বলল, কিসের কথা বলছ ?

শুনে ভূষণ রেগে জবাব দিল না।

যজ্ঞেশ্বর আবার বলল, ভাই, অনন্ত দীর্ঘজীবী হোক্, শান্তমণি চিরকাল বেঁচে থাকুক—আমি এই প্রার্থনা দিনরাত করছি।...আমি ত কাটিয়ে গেলাম, বোনা বড় হয়ে...

কিন্তু রাগ আরো বেড়ে ভূষণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল—

খানিক গিয়েই দেখল, অনন্ত তার কলাবাগানে হেঁটে হেঁটে মাটিতে কি খুঁজছে !

ভূষণ দাঁড়িয়ে গেল—

জিজ্ঞাসা করল, কি হারাল ?

অনন্ত বলল, হারায়নি কিছু, যাচ্ছি। ব'লে সে কি একটা জিনিষ মাটি থেকে খুঁটে তুলল...বলল—কিসের গুঁড়ো মাখানো মাছের টুক্‌রো চার-পাঁচটা পেয়েছি...এই আর একটা। ...বলে আরও গুঁড়ো-মাখানো মাছের টুক্‌রো ভূষণকে দেখাল—

দেখে ভূষণ হেসে অস্থির হয়ে গেল—

দৌড়ে গেল যজ্ঞেশ্বরের কাছে...বলল ভাই, আমাকে ক্ষমা ক'রো।

যজ্ঞেশ্বর ভুরু তুলে রইল—

ভূষণ হেসে হেসে বলল, আমরা তোমার পাদ্দোক্ পাবার যুগ্যি নই, দাদা!—বলে ভূষণ গুঁড়ো-মাখানো মাছের টুকরোর কথাটা বলল।...

শুনে যজ্ঞেশ্বর রাগে লাল হ'য়ে উঠল; বলল, খবদ্দার, ভূষণ; আমি বিষ খাইয়ে বিড়াল মারতে গিছি এমন কথা ফের বললে তোমার ভাল হবে না।..

শুনে ভূষণ হাসতে হাসতে পাড়ায় গেল, এবং পাড়ায় বনবেহারীর বাংলায় বসে শান্তমণির আয়ুষ্কাল নিয়ে তাদের বহু কথা হ'ল...

কেউ বলল, এক সপ্তাহ—

কেউ বলল, এক পক্ষ—

কিন্তু একমাসের উর্দ্ধকাল তাকে কেউ দিল না; এবং বিনে বাউরী বেড়াল মারবার এত ফন্দি বাৎলে গেল যা শুনতেই চমৎকার।

তারপর নানা প্রকারের গুজব কানে পৌছে শান্তমণির মালিক অনন্ত চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগল—যেন হত্যার ষড়যন্ত্র সত্যই হচ্ছে।

একজন কেবল ভয় দেখাতেই অনন্তকে বলে গেল, মহেশ্বর খড়্গ শানাচ্ছে দেখে এলাম—অনন্ত, সাবধান।

অনন্ত তার বহু পূর্ব্ব থেকেই সাবধান হয়ে আছে—চব্বিশ ঘণ্টার বার ঘণ্টা সে শান্তমণিকে ঘরে পুরে দরজা জানালা বন্ধ করে রাখে; আর বার ঘণ্টা তাকে তার পিছনে ছুটতে হয়।...হ'তে হ'তে শান্তমণির সে দু'চক্ষের বিষ হয়ে উঠল—তাকে দেখলেই শান্তমণি মুখে ফ্যাঁস্ করে একটা শব্দ করে আর গা ফুলায় আর পিছু হাঁটে। অনন্তের খাটুনি বাড়ল যত, তার জ্বালা হল তত...বাইরে থেকে না পেয়ে আড্ডার কথা মনে প'ড়ে তার প্রাণ আইঢাই করে—হজম ভাল হয় না; এদিকে ঘরের ভিতর, যার জন্য এত ক্লেশ, সে-ই মনে করে পরম শত্রু!

এই দুর্ব্বিষহ জ্বালার কথা শোনাতেই অনন্ত একদিন, অন্য লোকের অভাবে, ভূষণ দাসকেই রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এল—

দুঃখের কথা বলা শেষ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অনন্ত বলল, ভাই ম'লাম। ঠায় ব'সে রাত জাগতে হচ্ছে!

ভূষণ বলল, তা বটে; কিন্তু তোমার বেড়াল মরবে তোমার আগে। অষ্টপহর ঘরে পোরা থাকলে বেড়াল বাঁচে! বেড়ালের প্রাণ খেলায়।

অক্ষয়ের আমলে শান্তমণিকে বেড়াল বলবার উপায় ছিল না; কিন্তু অনন্ত এই অসম্মানে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, তা না ক'রে কি করব। শত্রু যে চারিদিকে! বলে অনন্ত

চারিদিকের তিনটা দিক ত্যাগ করে কেবল উত্তরদিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গী করে রইল...উত্তরদিকেই যজ্ঞেশ্বরের বাড়ী।

—তা হ'লে দু'দিকেই বিপদ। ব'লে ভূষণ কলকে নামিয়ে রেখে নিঃস্পৃহ ব্যক্তির মত চলে গেল। মনে হয়, তার যেন যজ্ঞেশ্বরের দিকেই টান প্রবল।

অনন্ত ভেবে দেখল, দু'দিক বজায় রাখা যায়—অর্থাৎ এমন কৌশল করা যায় যাতে শান্তমণি বাইরের হাওয়া খেতে পারে অথচ শত্রুর ভয় থাকে না...

ভেবে সেইদিনই বগলোস আর শিকল কিনে শান্তমণির গলায় পরিয়ে তাকে নিজের আয়ত্তে রেখে অনন্ত তাকে হাওয়া খাওয়াতে বার করল...কিন্তু এমন বিপত্তি যে ঘটতে পারে অনন্ত তা আগে ভাবে নাই—

শান্তমণিকে নিয়ে বার হতেই দেশের কুকুর আর ছেলেপিলে তা-ই দেখতে এমন চীৎকার করে দৌড়ে এল যে, শান্তমণি ভয়ে কুঁকড়ে যায় যায় হয়ে উঠল...আর অনন্ত একবার চোখ তুলে দেখতে পারল না, ওদের কেউ বা অন্য কেউ তাকেও লক্ষ্য করছে কি না...

মুখ লাল করে অনন্ত শান্তমণিকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকল যেন চোরাই মাল সামলাতে; কিন্তু শান্তমণির দেহের আর মনের উপর এ-পীড়ন সইল না—টেনে তাকে আনতেই দরজার কাছে তার হঠাৎ মূর্চ্ছা এসে গেল...

মানুষের মূর্চ্ছা হলে ঠাণ্ডা জলে আর হাওয়ায় তার মূর্চ্ছা সারে; কিন্তু বিড়ালের বেলায় গরম জল আর বদ্ধ বাতাস ব্যবস্থা—অনন্ত তা জানত।

অনন্ত তাকে দু'হাতের উপর শুইয়ে ঘরে তুলল—গলার বাঁধন খুলে দিল...তারপর গরম জলে নাইয়ে তার মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে অনন্ত যখন গামছা দিয়ে তার গায়ের জল মুছে দিচ্ছে তখন সে উঠে দাঁড়াল—তারপর পিঠ বেঁকিয়ে হাই তুলল...এবং তারপরই যেন ক্ষেপে গেল—অনন্তের হাতের ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়েই সে তীরের মত বেগে ঘর জুড়ে এমন ছুটতে সুরু করে দিল যে অনন্তের এমন সাহস হ'ল না, তার কাছে এগোয়।...দরজা একটুখানি খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে অনন্ত বেরিয়ে এল—কোথায় যাচ্ছিল কে জানে; কিন্তু কলাবাগান পর্য্যন্ত গিয়েই ছোট একটা হাঁচির শব্দ শুনে সে থম্‌কে দাঁড়াল...দাঁড়িয়ে সে ভাবছে ফিরি কি না—এমন সময় আর একটা হাঁচির শব্দ শুনে অনন্ত না ফিরে পারল না।...এসে দরজা খুলে দেখল, শান্তমণি রুগীর মত চুপটি করে এক কোণে শুয়ে আছে—আর তার নাক দিয়ে জলো সর্দ্দি ঝরছে...গা ঝাড়া দিয়ে যে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলবে এমন চেষ্টাই তার নাই। অনন্তের ভয় হ'ল, বিড়ালের শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হ'লে তার বোধ হয় চিকিৎসাই নাই...

কিন্তু নিধি বাউরী এদিক্‌কার বিশেষজ্ঞ—জড়্ শিকড়ের গুণাগুণ সে অনেক জানে। তার কথা মনে পড়ে অনন্ত

আবার ঘরের শিকল তুলে দিয়ে তাতে কুলুপ লাগিয়ে বেরুল...

নিধিরাম ঘরেই ছিল—

অবস্থা শুনে সে চিন্তিতই হ'ল ; বলল, তাই ত ! বলে মাথা নাড়তে লাগল...তারপর অনন্তের শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে নিধিরাম বলল,—এক ড্যালা মাখন নিয়ে ঘরে যাও—আমি ওষুধ নিয়ে এলাম বলে ·

—আমার সঙ্গেই এস—

—তুমি যাও, আমি আসছি।

—দেরী কোরো না, ভাই তোমার হাতেই তাকে আমি দিলাম।...সারবে ত ?

—না সারে ত আমি এই বিত্তে ত্যাগ করব। বলে নিধি একটু হেসে হাত নেড়ে বিত্তে ত্যাগ করার রকমটা দেখাল...বলল,—ভয় কি তোমার আমি থাকতে ? শান্তমণি বেঁচে থাকলে তুমি বত্তে যাবে তা কি আমি জানিনে !

শুনে অনন্তের আর সন্দেহ রইল না।

অনন্ত মাখন এনেছিল—

নিধিরাম সর্দ্দির ওষুধ নিয়ে এল—

বলল, মাখনের সঙ্গে দিব্যি করে মাখিয়ে এই গুঁড়ো বিড়ালের গায়ে মাখিয়ে দাও—অল্প অল্প করে নিজেই সে চেটে খাবে ! বলে নিধিরাম নিজেই হলদে গুঁড়োর ওষুধ মাখনে

মিশিয়ে নিল—শান্তিমণির গায়ে সে তা মাখাতে যাব এমন সময় অনন্ত তার হাত চেপে ধরল; বলল,—আমি কেমন করে জানব এ বিষ নয়!

নিধি হাত টেনে নিল না...

বলল, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। বিশ্বাস করিবা নয় সে হয় চতুর। বলে নিধিরাম মিটিমিটি দুষ্টু হাসি হাসতে লাগল...বলল,—তোমার বিড়াল মেরে আমার লাভ? বলে সে পরম দুঃখিত হয়ে রইল।

—তোমার সঙ্গে ও বাড়ীর যজ্ঞেশ্বরের নাকি খুব প্রণয়?

—প্রণয় আমার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর সবারই সঙ্গে। পানের বরজ, সুপুরির গাছ আর তামাকের ক্ষেত যতদিন আমার থাকবে, অপ্রণয় আমার কারু সঙ্গে হবে না।...আর, আমি খুব সরল লোক।...ওদিকে জল ঝরছে খুব। বলে নিধিরাম শান্তমণির দিকে কণ্ঠের ইঙ্গিত করল...

কিন্তু অনন্তের প্রাণে তখনও সর্দ্দির চাইতে বিষের ভয় বেশী। খানিক কি ভেবে সে বলল, মাখনের এই ড্যালাটা তুমি খেতে পারো?

—নিধি বলল, না।

—কেন?...জিজ্ঞাসা করেই অনন্ত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল...বলে বসল, খাও।

নিধিরাম ঘাড় নেড়ে বলল, উহুঁ।

—কি চাও তুমি?

—কিছুই না—চাইব আবার কি? তুমি খেতে বলছ; আমি বলছি, না। বলে নিধিরাম এতক্ষণে অনন্তের হাতের ভিতর থেকে হাত বার করে নিল।

—আট আনা?

—না।

—এক টাকা?

—তা-ও না।

—দুটো?

দুটো টাকাকেও সামান্য জ্ঞানে নিধিরাম ঠোঁট বাঁকাল।

পাপিষ্ঠকে হাতে-নাতে ধরে তাকে জব্দ করতে অনন্তের যেন জিদ বসে গেল...ফস করে বলে বসল, পাঁচটা?

—দাও। বলে মাখনের গুলি তুলে নিয়ে নিধিরাম হাত পাতল...

অনন্ত বাক্স খুলে পাঁচটা টাকা বের করে এনে নিধিরামের প্রসারিত হাতের উপর রাখতেই, নিধিরাম বোধ হয় ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে চোখ বুজে সেই বিষাক্ত মাখনের গুলি টপ করে মুখে ফেলে আর কোঁৎ করে গিলে ফেলে স্তব্ধ হয়ে থাকল...গলা দিয়ে গুলি নেমে গেল তা দেখা গেল।

পাপিষ্ঠ ভেবে দেখল না, সে যদি মরে তবে টাকা পাঁচটা কোন্ কাজে লাগবে।

অনন্ত তার দিকে খানিক চেয়ে রইল...

তারপর ভয়ে ভয়ে ডাকল, নিধিরাম?

নিধিরাম সাড়া দিল না—মাখন পেটে গিয়ে কি করছে কে জানে !...অনন্তের মনে হল নিধিরামের মুখ সাদা আর দেহ নিস্পন্দ হয়ে আসছে ; হয়তো সেটা তার ক্রোধের কল্পনা—কিন্তু নিধিরামের মুখের মাংস যে পাকযন্ত্রের আক্ষেপে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে তা ত পরিষ্কার !

নিধিরামের গায়ে একটা ঠ্যালা দিয়ে অনন্ত আবার ডাকল, নিধিরাম ?

—কি ।

—অমন করছ যে ? কেমন লাগছে ?

—ভাল না, ভাই...বুঝি বাঁচব না ।—বলেই নিধিরাম হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে ছুটে বাইরে উঠোনে উবু হয়ে বসতেই তার গলা দিয়ে সেই মাখন উঠে এসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল...

নিধিরাম সেখানে বসেই কষ্টের সঙ্গে একটু হেসে বলল,—ঐ আমার রোগ—পেটে কিছু দাঁড়ায় না। কিন্তু শান্তমণির চিকিচ্ছা ত হল না ।—যেন নিজের চাইতে বিড়ালের ভাবনাই তার বড় !

কিন্তু নিধিরামের উপর অনন্তের আর শ্রদ্ধা রইল না... পাঁচ টাকার লোভে যে নিজের হাতে বিষ ভক্ষণ করে ; আর কেবল পাকযন্ত্র দুর্ব্বল বলেই যার পেটে বিষ দাঁড়ায় না—তাকে আর বিশ্বাস নাই ।

অনন্ত বললে,—না হোক ; আয়ু থাকে ত শান্ত আপনি বাঁচবে ।...তুমি এস এখন ।

—সে ইচ্ছে তোমার। বলে নিধিরাম লজ্জিত হয়ে চলে গেলে অনন্ত বারকতক শিউরে উঠল...

যাই হোক, শান্তমণির স্নানের অসুখ ততক্ষণে আপনি সেরে গেছে—সে উঠে—হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অনন্ত খুব সজাগ হয়ে থাকল।

বিকাল বেলায় কলা বাগানের ধারেই অনন্তের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়ে গেল—বেড়ার এ-পিঠে ছিল অনন্ত, ও-পিঠে এসে, বোধ হয় না জেনেই দাঁড়াল যজ্ঞেশ্বর...

অনন্তের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল—

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল—অনন্ত তাকে পুলকিতকণ্ঠে ডেকে বলল, দাদা এদিকে কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর প্রত্যুত্তরে বলল, কেন, এদিকটা তোমার মাটি নাকি?

—না, দাদা, তা বলছিনে। অন্য একটা কথা আছে—বলি শোনো।

—কি কথা?

—শোনোই এদিকে। বলে অনন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ যজ্ঞেশ্বরের হাত টেনে নিয়ে তার হাতের ভিতর দুটো পয়সা গুঁজে দিয়ে বলল, পয়সা দুটো মোনাকে দিও। বলে সে যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে সকৃতজ্ঞ উৎফুল্ল মুখে চেয়ে থাকল...

—বাবদ ?

—বড় সৎ ছেলে তোমার ঐ মোনা ছেলেটি।...দেখা হলেই শুদোয়, শান্তমণি কেমন আছে ?...দুদিন এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েও গেছে। বলতে বলতে মোনার সাধু প্রবৃত্তির স্মৃতিতে অনন্ত বিগলিত হয়ে উঠল...

যজ্ঞেশ্বর উচ্চারণ করল, আচ্ছা দেব। ব'লে খানিক নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যখন সে চলতে সুরু করল তখন তার মনের অবস্থা কেমন তা জানিনে, কিন্তু তার চলন দেখে মনে হল, তাকে ধরে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলেই যেন ভাল হয়...

পথেই দেখা ভূষণের সঙ্গে—

ভূষণ উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলল,—ভাই, বড় ম্রিয়মাণ দেখছি !

বাঁশ ঝাড়ের দিকে চেয়ে যজ্ঞেশ্বর বলল—ঐ পাকা কঞ্চি-খানা ভেঙ্গে দিতে পার ?

—খুব পারি। কি করবে ?

—মোনাটা ছড়ি ছড়ি করছে বহুদিন থেকে ; মনেই থাকে না !

কঞ্চির ছড়িখানা হাতে করে যজ্ঞেশ্বরের জ্বলুনি কিছু কমল।

একটি বছর গেছে। শান্তমণির দৌলতে অনন্ত ধান অনেক গুলো আর অন্যান্য ফসল কিছু কিছু যজ্ঞেশ্বরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে এসে ঘরে তুলেছে।

শান্তমণি এখন তাকে ভালই বাসে—আর গোঁফ ফুলায় না। শান্ত এখন অনন্তের কোলে কোলে বেড়ায়...রোজ তিন পোয়া দুধ সে খায়—কিন্তু অনন্ত কেনে দেড় সের...ছোট-লোকের দুটো ছেলেকে সে মাইনে করে রেখেছে—তারা দুধ খেয়ে দেখায় যে দুধে বিষ নাই।

দ্বিতীয় বছরে শান্তমণির ঘন ঘনই দুবার গা ম্যাস্ ম্যাস্ করল, কিন্তু সে কিছু নয়—একবেলা উপোস দেয়াতেই তা ভাল হয়ে গেল...কিন্তু অনন্তের দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ গেল না। হঠাৎ অসুখ করছে—ডাক্তার দেখানোই ভাল; এই মনে করে সে শান্তমণিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এল—

ডাক্তার দুটি টাকা নিয়ে বললেন, খোলা হাওয়ায় খেলে বেড়ালে বেড়াল পঁচিশ বছর বাঁচে, বদ্ধ বাতাসে...

কিন্তু অনন্ত তাঁকে বুঝিয়ে দিল, শান্তমণির স্বাধীনভাবে খোলা হাওয়ায় বিচরণ করার বিঘ্ন কত।...ডাক্তার তখন মত বদলে নিলেন, শান্তমণির শুভ্র ললাটে স্নেহভরে তর্জ্জনীর দুটি মৃদু আঘাত করে বললেন, ঘরের ভেতরেও না বাঁচে এমন নয়, যদি ভগবান রাখেন তবে চাই কি তিরিশ বছরও বাঁচতে পারে।

অনন্ত খুসী হয়ে চলে এল...এবং খুসীর সঙ্গেই তার সে বছরটা কাটল।

কিন্তু তৃতীয় বছরের সুরুতেই—

যা ঘটল তা বলছি।

দুটি বছর কোলে কাঁখে করে মানুষ করে অনন্তের মনে হয়েছিল, শান্তমণির হৃদয় জয় সে করেছে—এ বাড়ী ছেড়ে তার নিরুদ্দেশ হবার ভয় আর নাই। তার উপর, জানালা দরজা বন্ধ করে দিনের পর দিন দিন রাত থাকা সুখের কথা নয়—অনন্ত মনের অসুখে হাঁপিয়ে উঠে মানুষ যে শত্রু তা ভুলতে বসেছে...

এখন সে জানালাটা একটুখানি খোলে—শান্তমণির উপর লক্ষ্য রাখে, তারপর 'কে-জানে-অদৃষ্টের-কথা' মনে করে সে তাড়াতাড়ি খোলা জানালা বন্ধ করে দেয়...

এমনি বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে দোল খেতে খেতে অনন্ত হঠাৎ একদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল...জানালটা খুলে রেখেই একটু সরে এদিকে এয়েছে—খুট্ করে একটা শব্দ হতেই চম্‌কে উঠে সে দেখলে, শান্তমণির শুভ্রদেহ জানালা দিয়ে গলে বাইরের দিকে অর্দ্ধেক বেরিয়ে গেছে...জানালার কপাটটা তখনও নড়ছে—

অনন্ত ছুটে যেতেই শান্তমণির নিষ্কলঙ্ক দেহের সর্ব্বাঙ্গ বাইরে বেরিয়ে গেল...

পরক্ষণেই জানালা দিয়েই দেখা গেল, শান্তমণি কলা বাগানের বেড়ার ধারে এবং তারপর, গরাদে ভেঙে কি তার ফাঁক দিয়ে গ'লে বেরুবার উপায় ছিল না বলে, অনন্ত

যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোন ঘুরে কলাবাগানে এল তখন পলাতকা শান্তমণি সোজা রাস্তা আর প্রচুর সময় পেয়ে ছুটছে...

অনন্ত তার পিছু নিল...

বিদ্যুতের আলোকপাত আঁকড়ে ধরা যায় কি না জানিনে, কিন্তু মুক্তি-আনন্দে পাগল সেই শান্তমণিকে ধরা গেল না... চোখের সামনে সে চক্ষের পলকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ..

অনন্তের চোখের সম্মুখটা অন্ধকারে ভরে এল—তার ভেতর মানুষের একটা কলরব উঠল—এবং সেই কলরবের ভেতরে হতচেতনের মত সে ঘুরতে লাগল...

অনন্ত একবার বলে—হায় হায় !....একবার বলে—আয়, আয় !

ব্যাকুল আত্মার "আয় আয়" ডাক কাহারো না কাহারো উদ্দেশে নিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে—কিন্তু পলাতক তাতে কেরে কি ?

শান্তমণি ফিরল না।

* * * সূর্য্য ডুবল, সন্ধ্যা হল—

অনন্ত তার দীপহীন অন্ধকার ঘরে ফিরল কেবল এইটুকু নিয়ে যে, সে ক্ষুধা সইতে পারে না—খাওয়ার ঘণ্টায় সে আসবে।

খাওয়ার ঘণ্টা অর্থাৎ আটটা বেজে গেল—শান্তমণির 'কুসুম কুসুম গরম দুধ' জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—শান্তমণি এল না !...তার আসার আশায় অনন্ত দরজা খুলে বসে থাকল....

ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগল, তবু বিছানায় গেল না...ঘুমের নিমেষটা পার হয়েই তার মনে হতে লাগল, সেই অবসরে সে এসে বসে আছে বুঝি!...ঘুমে তার চোখের পাতা টেনে তুলে সে ভাল করে চারিদিক নিজের পাশটা একোণ সেকোণ চেয়ে চেয়ে দেখে—কিন্তু শান্তমণি আসে নাই।

'মিউ মিউ' মিথ্যে ডাক শুনে সে চম্‌কে উঠল শতবার... এমনি করে সে তিমির রাত্রি প্রভাত হ'ল। দেখা গেল, একরাত্রেই অনন্তের চোখ বসে গেছে।

অনন্ত ভেবেছিল, নিজেই খুঁজে তাকে উদ্ধার করবে, কিন্তু শক্তিতে কুলিয়ে উঠল না; অভিমান আর চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে তাকে সুহৃদ্‌গণের দ্বারস্থ হ'তে হল...

আগুন লাগলে ভূষণই দৌড়ে যায় আগে—এই খ্যাতির দরুণ অনন্ত ভূষণের সঙ্গে দেখা করে কথাটা পাড়ল, কিন্তু ভূষণ বলল, কে তোমার বেগার দিতে যাবে ভাই, বন জঙ্গল আর আস্তাকুঁড় ঘেঁটে! কাজের ক্ষতি করে আমরা তা পারিনে।

ভূষণ ভুল বুঝেছে দেখে অনন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, বাঃ... আমি কি তা বুঝিনে! অমনি অমনি কে আমার হয়ে খাটবে? আমি তা বলবই বা কোন্ মুখে! তবে বিশ পঁচিশ খরচ করবার সাধ্য আমার নাই। দশটি টাকা আমি এনেছি— আলাদা করে রাখলাম।...বলে সে দশটি টাকা ভূষণকে দেখিয়ে

ডান হাতে করে কপালে ঠেকিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে সত্যিই, যেন নরনারায়ণের সিন্নির জন্যে, আলাদা করে রাখল।

ভূষণ সুর টেনে বলল, দেখি।

অনন্ত চলে এল ; এবং দেখতে দেখতে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে অনন্ত দশটি টাকা কপালে ঠেকিয়ে আলাদা করে রেখেছে... শান্তমণিকে এনে দিলেই—ইত্যাদি।

ফল হ'ল এক পলকেই—

পিল পিল করে ছেলে বুড়ো সব বেরিয়ে এল...মেয়েরা বাড়ীর ভিতরটা আর ঘর-গোয়াল একবার ভাল করে দেখে নিয়ে চারিদিকে চোখ রাখল...

সবারই মুখে একই প্রশ্ন আর একই উত্তর—আর, সবারই এক হয়রাণী।

—পাওয়া গেল ?

—না।

—তুমি ?

—উঁ হুঁ।

তারপর দু'জনে ভিন্ন দিকে খুঁজতে যায়।

সাতকড়িরা পাঁচজনে একদল বেঁধে দু'টাকার লোভেই প্রত্যেকে এমন স্থানে খুঁজতে গেল যেখানে যেতে হলে মাশুল দিতে হয়।

ক্রমশঃ শান্তমণি ভ্রমে এমন সব বিড়াল এনে অনন্তকে ক্রমাগত দেখানো হতে লাগল, যারা শান্তমণির নখস্পর্শের

যোগ্যতা রাখে না।...অনন্ত মানুষের উপর রাগের বশে পুরস্কার পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিল--

শুনে যক্ষ্মারোগী পাঁচকড়িও সুস্থ বোধ করে রাস্তার ধারে এসে বসল—দেখলেই শান্তমণিকে ছোঁ মেরে তুলে নেবে।

যেখানে যে কোপ ছিল তার একটি গাছ খাড়া রইল না—লোকে চটকে শুইয়ে দিল; গাছের ওপর আছে কি না, ঘাড় তুলে তা দেখতে দেখতে রামনাথের ঘাড়ে ফিক্ ধরে মালিশের দরকার হ'ল...

কিন্তু না গেল শান্তমণিকে পাওয়া, না গেল তাকে চোখে দেখা...মানুষ নিজের ঘর ভাল করে খুঁজতে গিয়ে নিজেরই কত লোকসান করল তার ঠিক নাই—কেউ ভাঙল ওষুধের শিশি, কেউ ভাঙল ভাতের হাঁড়ি, কেউ ভাঙল জলের কলসী—

নবীন কর্ম্মকার তার কুয়লার গাদায় খুঁজতে গিয়ে একটা পয়সাই পেল।

বোনা আর মোনাকে দুদিকে পাঠিয়ে যজ্ঞেশ্বর নিজেও বেরিয়ে এল। কিন্তু দুটি লোক একেবারে গা করল না—প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর নিধিরাম। বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আচরণের অর্থ হয়, কিন্তু লোকে নিধিরামের নির্লোভের অর্থ পেল না। লোকের চাল ছেয়ে যায় টাকায় তিন দিন হিসাবে —তার পনর টাকার প্রতি এমন নিস্পৃহা কেন, ভূষণ সময় করে নিয়ে তা-ই শুনতে গেল...

নিধিরাম তার পেট্‌কাটা ঘরে ছিল—ভূষণকে দেখে বলল,—খুঁজেছ সব জায়গা ?

ভূষণ বলল—খুঁজছি।

—এখনো খুঁজছ ?

—হ্যাঁ। তুই যে চুপচাপ রয়েছিস ?

নিধি বলল—আরো খোঁজো, চোখ পড়বেই : বলে নিধি এমন করে হাসতে লাগল যেন এই খোঁজাখুঁজি যে নিরর্থক তা সে জানে।

—না-ও পড়তে পারে।...তুই যে বেরুস্‌নি ?

—যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু কিনা, উপকারী লোক...আর সে-বেড়াল এখন কোথায় তা আমি কিছু কিছু জানি।...তবে তোমারাই খুঁজে পেতে দেখ—পাও ভালই ; পনরটা টাকা ত তুচ্ছ নয়...টাকার উপর লোভ আমার কোনো কালেই নাই।...বলে সে হেসে উঠল ; তারপর বলল, বস, তামাক খাও।

—খাই।..কিন্তু তুই যে বললি, 'সে. বেড়াল এখন কোথায় তা আমি কিছু কিছু জানি'—তার মানে কি ?

—মানে আবার আমার কথার কবে থাকে!..তবে আঁকুবাকুর কাজ নয়—মন স্থির করে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে।

হঠাৎ ভূষণের একটা ছট্‌ফটানি ধরে গেল ; বলল, তোকে নগদ একটা টাকা জল খেতে দেব যদি তোর বাড়ীর ভেতরটা একবার দেখতে দিস্‌, নিধি !

নিধি রাম ক্রুদ্ধ হ'ল, বলল, 'খবদ্দার, মানুষকে বে-ইজ্জতের কথা ব'লো না।...আমি মজুর বটে, কিন্তু আমার মানসম্ভ্রম আছে। বলে নিধিরাম মানের মাত্রায় গম্ভীর হয়ে রইল।

ভূষণ ত্বর্বার একটা সন্দেহ নিয়ে আর তামাক না খেয়েই ফিরে এল...কথাটা ত্ব'কান থেকে তখনই দশ কানে গেল... লোকে বেড়াল খোঁজা ক্রমশঃ ছেড়ে দিল।

যজ্ঞেশ্বরও কথাটা শুনল--

শুনে তার আনন্দ হ'ল কি না বলা যায় না; কিন্তু বাড়ীতে সে প্রকাশ করল যে, অক্ষয়ের ঘরবাড়ী প্রভৃতি—যা তারই হ'ত, কিন্তু হয়ে গেছে অনন্তের—তা' আবার তারই হবে। শুনে মতি আনন্দাশ্রু মোচন করল।

সন্ধ্যা লাগতেই যজ্ঞেশ্বর গোপনে এসে নিধিরামের পেট্‌কাটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল...

কে এসেছে তা না দেখেই নিধি শুধোল, পেয়েছ?

যজ্ঞেশ্বর বলল, আমি যজ্ঞেশ্বর। সেই কথাই কইতে এসেছি। দরজা খোলো।

দরজা খুলে আর আসন পেতে নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরকে বসাল; বলল, আমার ত্বয়োরে পায়ের ধূলো পড়ছে ঢের।... কথাটা কি শুনি?'

যজ্ঞেশ্বর বলল, কথাটা তোমাকে, ভাই, গোপনেই বলি। আমার মনে হয় শান্তমণি নেই।

—নেই তা ত সবাই দেখছে ; খুঁজছেও কেউ কেউ।

—সে না-থাকা নয় ; একেবারেই...

ঐ পর্য্যন্ত বলেই যজ্ঞেশ্বর নিধিরামের মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল...বলল, তবে সম্পত্তি দখল করতে যাওয়ার আগে খুব নিশ্চয় হওয়ার দরকার।

নিধি বললে, তা ত বটেই।

—তুমি তার কি জানো তা বললেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

নিধি অবাক হয়ে গেল, বলল, অবাক করলে আমাকে ! আমি তার কি জানি যে তোমাকে বলব ?

—শুনছি, তুমি নাকি কিছু জানো।

—তোমারা যা জানো, আমিও তা-ই জানি—মানে, অনুমানে জানি। যখন কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কারো ঘরে সে আটকা পড়েছে, কিম্বা ···

—দেহটা ত পাওয়া যেত যদি...সে কথা যাক—তুমি কি চাও বলো।

—কিসের দরুণ চাইব আমি !

—আমার হাতে তাকে দিয়ে দিতে।

নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে কথাটি যেন বুঝে নিল...তারপর বলল, শান্তমণি মরলে তোমার সুবিধে, কিন্তু সে বেঁচে থাক্‌লে অনন্তের সুবিধে। কার সুবিধের দাম বেশী কে জানে !...বলে নিধিরাম অন্য দিকে চেয়ে যেন হিসাব করতে লাগল।

যজ্ঞেশ্বর বলল, তোমার সুবিধে বেশী, মরলেই।

—কেমন করে তা জানব ?

তা জানবার উপায় তেমন নাই, ভাই; কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করে অর্থাৎ বিশ্বাসের উপর কথা।

—কিন্তু আমার ধারের চেয়ে নগদের উপর বিশ্বাস বেশী।

শুনে যজ্ঞেশ্বর চুপ করে রইল—

সে ভেবেছিল, পনরর উপর দু-এক টাকা বাড়ালেই নিধিরামকে হাত করা যাবে—কিন্তু নগদ দেবার উপায় তার নাই—

যজ্ঞেশ্বর দুঃখিত হয়ে বলল, আমি সবটা দিতে পারি পরে, সম্পত্তি পেলে, কিন্তু তোমাকে তাতে রাজি হতে বলতে পারি নে। বলে যজ্ঞেশ্বর ভালো মানুষ সাজল।

—কেন পারবে না! যার যা সাধ্য দরদস্তুর করবে, তাতে সঙ্কোচ করা নেহাৎ অন্যায়।

—তা তুমি বলতে পারো; ভাল লোকের কথাই ঐ।... আচ্ছা, আমি যদি লিখে দি ?

—কি লিখে দেবে ?

—যে, তোমার মারফৎ মৃত বেড়াল পেলে আর সম্পত্তি দখলে এলে তোমাকে আমি—

কথায় বাধা দিয়ে নিধিরাম হেসে উঠল, বলল, ভাই, লিখিত্ পড়িত্ কাজ এ-সব কাজে তেমন সাজে না, আমি সোজা সাপটা মানুষ; কিন্তু যথার্থ কথা হচ্ছে এই—তুমি

তখন মাথা নেড়ে দিলেই সে কাগজ নিয়ে আমায় ধুনো দিতে হবে।...ব'লে নিধিরাম খুব হাসতে লাগল...তারপর বলল; কিন্তু তুমি আমাকে এ-সব কথা কেন বলছ বলো দেখি?

মাথা চুলকে যজ্ঞেশ্বর বলল—না, কিছু বলিনি। তুমি কিছু মনে করবে তা জানতাম না। তবে, শান্তমণি যদি তোমার ঘরে এসে ঢুকে থাকে, আর যদি বেরিয়ে না থাকে...

মাথা নেড়ে নিধিরাম উৎসাহ দিল—

যজ্ঞেশ্বর তাতে ভরসা পেয়ে বলতে লাগল, আমার কাছে কিছু ছাপি নেই, ভাই; আমি জানি।—তার পরই খপ করে নিধিরামের হাতখানা ধরে ফেলে যজ্ঞেশ্বর বলতে লাগল, ভাই, আমি বড় গরীব, ছা-পোষা মানুষ...এই বায়না ধরো পাঁচ টাকা'...

'কর কি, কর কি!' ব'লে নিধিরাম অত্যন্ত চেঁচিয়ে উঠে আপত্তি করল—

কিন্তু যজ্ঞেশ্বর জোর করে তার হাতের ভেতর টাকা পাঁচটি গুঁজে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল...

টাকা পাঁচটা ট্যাকে গুঁজে নিধিরাম বলল, আমি প্রাণপণে দেহপাত করে খুঁজতে পারি—এই পর্য্যন্ত আমি করতে পারি তোমার খাতিরে...এখন আমার হাতযশ, আর তোমার কপাল।

কিন্তু অন্য রকম বুঝে যজ্ঞেশ্বরের মনে হল, লোকটা এত চালাকি ও জানে!...বলল, বেশ, বেশ।

তারপর ঘণ্টাখানেক বসে দুজনায় অনেক কথাই হল ; এবং যখন বিদায়ের সময় এল তখন বন্ধুত্ব এমন নিঃস্বার্থ আর এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে, ছেড়ে দিতে আর ছেড়ে যেতে কষ্ট হতে লাগল—

—চললাম। বলে যজ্ঞেশ্বর পা বাড়াল—

এবং দরজার পাশ থেকে ভূষণ দাস নিঃশব্দে সরে গেল।

ভূষণ শুনলেই অনন্তের শোনা হল—

শান্তমণির প্রাণহত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে অনন্ত মার মার করে উঠতেই ভূষণ তার ডানা চেপে ধরে বলল, সবুর।

—সবুর কি ? শান্তমণির গায়ের একটি রোঁয়া খসিয়েছে কি যজ্ঞেশ্বরকে আমি খুন করব...সবুর কি ?—বলে শোকোন্মত্ত অনন্ত ভূষণের হাতের ভিতর থেকে ডানা ছাড়িয়ে নিল।

ভূষণ বলল, সবুর ; ঠাণ্ডা হও ; কথা শোনো। তেড়ে মেড়ে গেলেই কি তোমার কাজ হাসিল হবে ?...তোমার সাক্ষী প্রমাণ কই ?

ভূষণের মেসো আদালতের পদাতিক।

অনন্ত বললে, চলো তবে নিধির কাছে—তার কি বলবার আছে, আমায় সে তা বলুক...তারপর আমি বুঝব।

ভূষণ বলল, এটা সঙ্গত কথা। বলে ভূষণ অনেক সুবচনে অনন্তকে শান্ত রেখে নিধিরামের কাছে নিয়ে এল...

কিন্তু অনন্তের মুখের কথা বন্ধ হয়ে থাকলেও তার চোখের চেহারা বদলাল না।

ভূষণ কথাটা তুলতেই নিধিরাম তাকে ধিক্কার দিল, বলল, ছি, ভূষণ!...আজও তোমরা আমায় চিনলে না!... অনন্ত, তোমার পক্ষেও এটা লজ্জার কথা, ভাই—তোমার বেড়াল আমি লুকিয়ে রেখেছি! ছিঃ। বলে প্রথমে ব্যথিত হয়ে পরে খরদৃষ্টিতে সে অনন্তের চোখের দিকে চেয়ে রইল...

অনন্ত বলল, তা হলে আমার এই কথাটার জবাব তুমি দাও—যজ্ঞেশ্বর তোমায় টাকা দিয়েছে কি না?

—দিয়েছে...এই যে সে-টাকা। বলে নিধিরাম ট্যাঁক খুলে পাঁচটা টাকা সত্যিই দেখিয়ে দিল।

—কেন দিয়েছে?

—কেন দিয়েছে জিজ্ঞাসা করছ? খুঁজে দেখব বলে!.... আমাদের বখরা বন্দোবস্ত হয়েছে ..তুমি যে-পনর টাকা দেবে বলেছ তার অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তার...আমরা দুজনেই একসঙ্গে খুঁজছি কিনা।

—খুঁজতে না মারতে দিয়েছে?

শুনে নিধি একটু নির্য্যাতিত হাসি হাসল; বলল, 'আমার সম্বন্ধে তোমার এই খারাপ ধারণা কেমন করে হল তা-ই আমি ভাবছি।...কিন্তু এ ধারণা থাকবে না—বেড়াল তুমি পাবেই—পেলে কিন্তু ক্ষমা চেয়ে যেও!...হয় তো—

খানিক অপেক্ষা করে থেকে অনন্ত বলল, হয় তো কি?

—হয় তো যে পেয়েছে সে চেপে রেখেছে, ভাবছে, টাকা দেবে কিনা তার নাই ঠিক !

—ঠিক নাই কি রকম ? টাকা মজুত ! হাতে হাতে নেয় যেন সে ।...বলতে বলতে অনন্ত আকুল হয়ে বলে উঠল, বল, ভাই, শান্তমণি বেঁচে আছে ?

—কি করে জানব বলো ! তবে আশা করতে দোষ কি !...আমার কেমন একটা ইয়ে আছে দেখেছি, যার যা হারায় আমি খুঁজলেই পাই । সেবার ভটচাযের বাছুর—

—আমিই কেবল মিথ্যাবাদী ফাঁকিবাজ,—নয় ?... শান্তমণিকে যে এনে দেবে তাকে যদি টাকা আমি না দিই তবে সে টাকা গোরক্ত তুল্য হয়ে—

—কিন্তু তুমি যদি তখন বলো, তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে—টাকা কিসের ? দিব্যি কাটা গেছে—তখন ?

—চলো কালীতলায়, মায়ের আসন ছুঁয়ে বলছি, তা আমি বলব না ।

ভূষণ বলল, আর কিছু নয়, কালীর আসন ! বলে ভয় দেখাল ।

নিধিরাম বলল,—টাকাটা নগদ দিতে দোষ কি । বলে নিধিরাম ফস করে একটু হাসল ।

—তারপর ?

—তারপর খুঁজে দেখব, আর পাবো নিশ্চয়ই । অনন্ত চুপ করে থাকল—

নিধিরাম বলল,—তুমি যদি আমায় বিশ্বাস না করো, আর, আমি যদি তোমায় অবিশ্বাস করি, তবে কি কথার শেষ হবে ?...বেড়াল বজায় থাকলেই বা আমার কি, মরলেই বা আমার কি—আমি যে ঠুঁটো জগন্নাথ সেই ঠুঁটো জগন্নাথই।... তবে যজ্ঞেশ্বর লোক ভাল—এক কথায় তার সঙ্গে মিটে গেছে।...বলে নিধিরাম ও-পক্ষের প্রতি প্রীতিবশতঃ এ-পক্ষের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—আচ্ছা, দেখি। বলে অনন্ত ভূষণের হাত ধরে উঠে এল...

কিন্তু বাড়ীতে এসে সে স্থির হয়ে বসতে পারল না... তার কেবলি মনে হতে লাগল, যজ্ঞেশ্বর এতক্ষণ সেখানে গিয়ে টাকা কটি নগদ দিয়ে মরা বেড়াল সামনে রেখে হেসে হেসে উঠছে...অনন্তের গায়ে কাঁটা দিল...

তাড়াতাড়ির দরুণ পথে দুবার হোঁচট খেয়ে নিধিরামের বাড়ীতে পৌছে অনন্ত দেখল, যজ্ঞেশ্বর সেখানে নাই—চার পাঁচটি বাজে লোক বসে নিধির সঙ্গে বাজে কথা কইছে...

অনন্ত ঝপ করে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের চমকে দিল, এবং আচমকা নিধির হাতে ঝম করে টাকা ফেলতেই নিধিও চমকে উঠে বলল, এ কি ব্যাপার ?

—তোমার টাকা।

—তোমার বেড়াল কোথা তা আমি কি জানি.

—কোথায় তা দেখবে বলেই ত দিলাম।

—উত্তম।...বলে মুঠো বেঁধে নিধিরাম বলল, তুমি আমার অপমান কর নাই নিশ্চয়ই—সে-লোক তুমি নও।... আমি গরীব বটে কিন্তু কাঙাল নই। তবে যদি পরিশ্রমের দাম বলে দিতে চাও তবে আমি অক্লেশে নিতে পারি। নতুবা—বলে নিধি এমন একটু হাসল যার মত নির্দ্দোষ আর কিছু হতে পারে না।

অনন্ত আশান্বিত হল, বলল, তা-ই ত দিচ্ছি!

—বেশ। আমি এক্ষণে খুঁজতে বেরুই—পিছু ডেক না।...বলে সেখানে বসেই নিধিরাম ঘাড় তুলে ডাকল, পুসি, আয়।

অনন্ত চকিত হয়ে চারিদিকে চাইতে লাগল—শান্তমণি বুঝি আসছে!

তারপর নিধি বলল, উঠি তবে—টাকা পেয়েছি। বলে সে হুঁকো রেখে লাঠি নিয়ে উঠল...বলল, 'বাড়ীর ভেতরটা আগে দেখি।'

সে রাত্রিটা নিধিরাম নিজের বাড়ীর ভিতরটা দেখল, আর অনন্তের শেষ রাত্রে একটু ঘুম হল—

তার পরদিন নিধিরাম বাড়ীর বাইরে এল—

লোকের বাড়ীর আর বেড়ার ধারে গিয়ে সে ডাকে, পুসি, আয়।...গাছের দিকে তাকিয়ে ডাকে, তু তু, পুসি, আয়।।...মানুষের বেগুণের ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা

করে পুসি, আছিস এখানে?...লোক দেখলেই তাকে দাঁড় করিয়ে জানতে চায় শান্তমণিকে দেখেছ তোমরা? ফিট্‌ সাদা একটা বেড়াল—লক্ষ্মীর মত সুশ্রী—ল্যাজটা খ্যাঁক-শেয়ালীর ল্যাজের মত ঝাঁকড়া—দেখেছ কেউ?

যে বলে দেখি নাই, নিধি তাকে বলে, কি আশ্চর্য্য; দেখ নাই? দেখেছ বই কি!...যদি সে তখন বলে, দেখেছি—নিধি তখন তাকে বলে, তুমি মিথ্যেবাদী; দেখ নাই।

কিছুক্ষণ পরেই লোকে নিধিকে দেখে পালাতে লাগল।...

অনন্ত ঘোরে ফেরে আর নিধিরামের তল্লাস করে, কই হে?

নিধি বলে, একটু সবুর।

নিধিরাম শান্তমণিকে খুঁজছে—

আর অনন্ত তার কলাবাগানে দাঁড়িয়ে আছে এবং যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়—

অনন্ত যজ্ঞেশ্বরকে বলছে, তোমার নরকের ভয় নাই—

যজ্ঞেশ্বর প্রত্যুত্তরে বলছে, পেটে খেলে পিঠে সয়—

এমন সময় দেখা গেল, অচেনা একটা লোক তাদের দিকে আসছে—তার হাতে মুখ-ঢাকা একটা সাজি—

লোকটা সাজি নিয়ে তাদের কাছেই এসে দাঁড়াল, এবং কেউ কিছু বলবার আগেই মুখ-ঢাকা সাজির ভেতর থেকে শব্দ এল—মিউ...যেন কান ঘেঁসে তীর গেল, এমনি ভয়ানক চমকে উঠল অনন্ত আর যজ্ঞেশ্বর দুজনাই।

নিধি বলল, শান্তমণি এসেছে, অমন মিঠে গলা তারই।

লোকটি বলল, অনন্ত কার নাম এখানকার ?

অনন্ত বলল, আমার।

লোকটি হেসে বলল, আমার কাছে এসে আছে আজ তিন দিন। তাড়াই তা-ও যায় না...আমি কি জানি এর এত দাম ! মায়ের মালিক আমার পনর টাকা বখ্‌শিস নিয়ে বসে আছেন ! আসুন দেখি।...বলে সে সাজি নামিয়ে হাত বাড়াল...

অনন্ত বলল, কি ?

—টাকা।

যজ্ঞেশ্বর ঢোক্ গিলছিল—তার দিকে তাকিয়ে নিধি লোকটাকে বলল, তোমারই পাওয়ার হক্ বটে। বলে সে আর একটু এগিয়ে এল।

কিন্তু অনন্তের তখন মেজাজের ঠিক নাই—যজ্ঞেশ্বর পুড়ছে...

সুতরাং অনন্ত চেঁচিয়ে নিধিরামকে আর লোকটাকে যা বলল এবং যজ্ঞেশ্বর অনন্তকে আর লোকটাকে যা বলল, আর

লোকটা আর নিধিরাম যজ্ঞেশ্বরকে আর অনন্তকে যা বলল, তা সব একসঙ্গে বলায় কারো কথা কারো কানে গেল না...

গোল একটু কমলে শোনা গেল সেই লোকটা বলছে, তুমি তাকে কি দিয়েছ, কে তোমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করেছে তা আমায় শুনিয়ে কি হবে ?...আমার পাওনা আমি চাই...ফেল কড়ি, মাখো তেল...

নিধি বললে, তা তুমি বলতে পারো।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পর্য্যন্ত যে কয়জন শ্রেষ্ঠ নট বাংলার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দানীবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এক অগ্রহায়ণে জন্মগ্রহণ করিয়া চৌষট্টি বৎসর পরে আর এক অগ্রহায়ণে বিয়োগান্ত নাটকের যে কুশলী নায়ক-অভিনেতা সংসার রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, তাহার স্থান শূন্য হইয়া থাকিবে। রঙ্গালয়ের পুরাতন ও নূতন যুগের সন্ধিস্থলে প্রাচীন পন্থী যে একমাত্র অভিনেতা সুদূরপ্রসার সমতলভূমে নিঃসঙ্গ গিরিশৃঙ্গের মত মস্তক উন্নত করিয়াছিল, আজ সেই চূড়া অন্তর্হিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ পিতা গিরীশচন্দ্রের, নাট্যরচনাশক্তির না হইলেও, নট-প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন। নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয়ে তাঁহার নব নব অভিনয়ে লোক মুগ্ধ হইত। কণ্ঠস্বরের যে ঈষৎ গদ্‌গদধ্বনি অন্যের পক্ষে দোষাবহ হইয়া উঠিত—নিজের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করিয়া সেই দোষকে তিনি আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন। একাধারে গম্ভীর এবং হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে পটু, এমন অভিনেতা সাধারণতঃ দুর্লভ। এই সুদুর্লভ শক্তির অধিকারী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ অভিনয় বৈচিত্র্যে দর্শকের কল্পনাকে উত্তেজিত এবং মনকে নানা রসে অভিষিক্ত করিতেন। তাঁহার আবির্ভাবে প্রেক্ষাগৃহে সাড়া পড়িয়া যাইত। অভিনয় তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। সিদ্ধিলাভ করিয়াও তিনি সাধনাকে ত্যাগ করেন নাই। শেষ বয়সের রোগজীর্ণ দেহ তাঁহার অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করিতে পারে

নাই। তাঁহার সহিত রঙ্গালয়ের পুরাতন যুগের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অন্তর্হিত হইল।

দিনপঞ্জী

২৫শে নভেম্বর—সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, লর্ড স্যাঙ্কির পীড়াপীড়িতে পড়িয়া ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তিদানে সম্মত হইয়াছেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন উহার পক্ষে মত দিয়াছেন। জানা গেল যে, ঐ সংবাদের কোন ভিত্তি নাই।

২৩শে নভেম্বর, লণ্ডন—মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল কমন্স সভায় একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গোল টেবিল সম্পর্কে তাঁহার অতি সামান্যই বলিবার আছে, কারণ তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহা কেবলমাত্র একটি পরামর্শ সভা। ইহার সিদ্ধান্তের দ্বারা পার্লামেণ্টের উপর কোন বাধ্য বাধকতার সৃষ্টি হইবে না।

২৮শে নভেম্বর—গত সোমবার বেলা প্রায় ১১টার সময় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নট সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানীবাবু) পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর হইয়াছিল।

১ম বর্ষ] ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ [২৩শ সংখ্যা

দ্রব্যগুণ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

বড় দিনের বাজার করিতে এটা-ওটা-সেটায় বোঝাটা বেজায় ভারী হইয়া গেল। এই দুঃখে বাজারে বড় একটা আসি না। সবার টানাটানিতে পড়িয়া কিছু কিছু করিতে করিতে বিষম হইয়া পড়ে।

সব শেষে পড়িয়াছিলাম মুদীর পাল্লায়। আমার প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছোট বড় নানা রকম পুলিন্দা বাঁধিয়া ঝুড়ির ফাঁকটাকে বুজাইয়া দিতেছিল। শেষ হইলে ঝুড়ির চারিদিক একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া

হাত দুটো সশব্দে ঝাড়িয়া বলিল, "এই কপির পাশটা খালি রয়েছে...বাঃ, কপি বটে একখানি—জিনিষ কেনেন তো শৈলেন বাবু...সেই কাপড়-কাচা সাবান একটা বের কর্ তো রে।"

বলিলাম, "সাবান আর চাই না এখন।"

"নাঃ, চাই না! বড়দিন—ব'লে বসলেন কিনা কাপড়কাচা সাবান চাই না,—হাসালেন আপনি!"

আমি ইহাতে হাসির কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তবুও আমার অজ্ঞতাবশতঃ মুদীপুঙ্গবকে আরও বেশী হাসাইয়া ফেলিবার ভয়ে চুপ করিয়া গেলাম।

একটা হাত খানেকের ওপর চৌকো সাবান বাহির হইল।

বাচ্চা চাকর ছোঁড়াটা একটু দূরে অশ্বত্থ তলায় হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া এক একবার পরিবর্দ্ধমান মোটখানার পানে আড়চোখে চাহিয়া অসহায়ভাবে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সাবানটা গুঁজিতে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাপরে, হামরা জান্ লি সব!"

মুদী তাড়াতাড়ি তাহার হাতে দুইটা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "নেঃ, পুরণো খদ্দের বাবু—লাভ তো নিতে পারলামই না; উল্টে ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা...তা হোক গিয়ে, বাবুর চাকর তুই খুসী থাক্..."

যাহারা পরার্থে প্রাণ দান করে তাহাদের মত মহৎ ঔদাসিন্যের সহিত মোটটা তুলিয়া দিল। চাকরটা ডান হাতে

চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীমুখো হইতে বলিলাম, "দাঁড়া একটু, এই বোতল দুটো হাতে ঝুলিয়ে নে।"

পাজি তাড়াতাড়ি দুই একবার টলমল করিয়া ডান হাতটাও ঝুড়িতে লাগাইয়া নাকি সুরে বলিল, "দুনো হাত তো বঝল্ বা" অর্থাৎ দুটো হাতই তো জোড়া।

রাগে গা-টা রি রি করিয়া উঠিল; কিন্তু চটাইতে গেলে আবার টলিতে পারে—চাই কি আরও জোরে টলিতে পারে—এই আশঙ্কায় আর আপাততঃ কিছু বলিলাম না।

নিরুপায় হইয়া ছড়িটা কাঁধে চাপিয়া বোতল দুইটা দুই হাতে তুলিয়া লইলাম।—সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তিকরভাব যেন বোতল দুইটার মসৃণ অঙ্গ বাহিয়া, আমার হাত দুখানা বাহিয়া, আমার সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কেমন যেন মনে হইল—এ ঠিক হইতেছে না—সন্ধ্যার এই গা-ঢাকা অন্ধকারে দুই হাতে দুইটা বোতল, বগলে ছড়ি,—এ যেন কি রকম কি রকম বলিয়া বোধ হয়।...বাজারের সব লোকের চোখের মধ্যে দিয়া নিজের দিকে চাহিলাম।—এ কী হইয়া গিয়াছি!...মনটা যেন নিজের প্রতি নিজেই ইয়ারকির ঢঙে বলিয়া উঠিল, "আরে, কে ও!..."

ছড়িটা বোতলের সঙ্গে ডান হাতে লইলাম,—দৃশ্যটা কিন্তু বেশ শোধরাইল বলিয়া বোধ হইল না। তখন দুইটা বোতলই বাম কাঁখে পুরিলাম, ডান হাতে ছড়ি। এ যেন আরও মারাত্মক হইয়া উঠিল! মাথা ক্রমেই গুলাইয়া আসিতেছিল।

র‍্যাপারটা জড়াইয়া লইলাম, ঠিক সেই সময় পিছনে গা ঘেঁসিয়া একটা লোক চলিয়া যাওয়ায় বোতল জোড়ায় একটু ঠোকাঠুকি হইয়া একটা প্রচ্ছন্ন তরল শব্দ হইল।—মনে হইল যেন র‍্যাপারের মধ্যে আত্মগোপন করিতে গিয়া অপরাধী, হীনচরিত্র বোতল দুইটি হাটের মাঝখানে জাহির হইয়া গেল।

আমি ঘামিয়া উঠিতেছিলাম, চাকর ছোঁড়াটার তাগাদায় হুঁস হইল। ভাবিলাম—আচ্ছা দুর্ব্বলচিত্ত লোক তো আমি!—একটা সরবতের খালি বোতল আর একটা ফেনাইলের বোতল রাস্তা দিয়া বেপরোয়াভাবে লইয়া যাইবার সৎসাহসটুকু নাই?...অন্ধকার?—তাহা হইলে কোন সাধু ব্যক্তিই অন্ধকারে আর নিজের গৃহস্থালির কাজ করিবে না? শিশি কিম্বা বোতল না হইলে একদণ্ড চলে?...

বেশ সচ্ছন্দভাবে বোতল-দুইটার লেবেল সামনে করিয়া দুই হাতে ধরিলাম এবং সমস্ত জড়তা দূর করিয়া মুখে একটা সহজ প্রসন্নতার ভাব ফুটাইয়া তুলিলাম।

একটুর মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম—অত প্রসন্নতার ভাবটা ফুটাইয়া তোলা সমীচান হয় নাই।...বাজারের নীচেই বিদ্যুদালোকিত প্রশস্ত চৌমাথা রাস্তা, সেখানে নামিয়া অবিলম্বেই বেশ টের পাওয়া গেল সে এই পাপ-পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নাই যাহারা চাকরের মাথায় ভোজের গুরু আয়োজন এবং মনিবের হাতে বোতল ও তৎসঙ্গে প্রচুর

প্রসন্নতার ভাব দেখিলে একেবারে উল্টা রকম মীমাংসা করিয়া বসে—

একজন আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া গেল। আর একটু যাইতে এক ছোকরা তাহার বন্ধুর গা ঠেলিয়া আমায় দেখাইয়া দিল। একটু দূরে পানের দোকানের সামনে কয়েকজন হিন্দুস্থানি দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, একজন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, "আলবৎ বড়াদিন হ্যায় ইয়ার; বড়ে খুস্‌মেজাজমে হ্যায়..."

ইচ্ছা হইল ব্যাটার মাথার উপর বোতল দুইটা আছড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দি যে তাহার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার নাই যাহাতে তাহাদের অর্থে 'খুস্‌মেজাজ' হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন রকমে রাগটা চাপিয়া চৌমাথাটা ছাড়াইয়া গেলাম। মুখের প্রসন্ন ভাবটা আর টানিয়া রাখা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না; বেশ সহজে মিলাইয়াও গিয়াছিল। বোতল দুইটা কিন্তু সেই-ভাবেই রহিল। দুর্ব্বল মনের সঙ্গে যে তর্কটা হইতে লাগিল তাহাতে এই কথাটাই আমি ধরিয়া রহিলাম—কেন, আমার ভেতরে যখন কোন রকম কু নাই,—বিশেষ করিয়া যখন বোতলের ভেতরেও কোন রকম কু নাই তখন ভয় পাইতে যাইব কেন? কাল এই সময় এই পথ দিয়াই এক হাতে একটা পশমের বাণ্ডিল আর অন্য হাতে সাবানের বাক্স লইয়া গিয়াছি। তফাৎটা কি হইল এমন?...আমায় যারা

চেনে না তাহারা যা ইচ্ছা মনে করুক—চেনে যাহারা তাহারা তো আর......"

চেনা লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়াও গেল, আর বেশ ভাল লোকের সঙ্গেই। করুণাময় বাবু, জেলা বোর্ড আফিসে কাজ করেন। বয়স হইয়াছে, অথচ খুব আমুদে আর মিশুক। এইজন্য, আর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য সবাই চায় তাঁহাকে। বেহারে চার পুরুষ আছেন,—এইটি প্রয়োজন ভেদে কখন সগৌরবে, কখনও বা দুঃখের সহিত জাহির করিবার একটি বাতিক আছে; ভাষার মধ্যে দিয়া বেহারও মাঝে মাঝে উঁকি মারে।

একটু দূর থেকেই দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, "এই যে শৈলেন বাবু, ভাল তো?...আরে, এ যে বড় কা-ভোজের আয়োজন! কি কপি মশায়! বেহারে চারপুস্ত্ কেটে গেল কিন্তু এমন্ কপি তো দেখিনি—বাঃ, সঙ্গ নোব নাকি?......"

একটু কম দেখেন, কাছে আসিতে বোতল দুটিতে নজর পড়িল। আমি হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার মুখের হঠাৎ নিষ্প্রভভাব দেখিয়া আর রা সরিল না; কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও দুটো? .."

আমি একটা ঢোঁক গিলিয়া হাসির সঙ্গে সহজ ভাবে বলিবার চেষ্টা করিলাম, "কিছু নয়; বোতল দুটো,—একটাতে ফেনাইল আছে, একটা খালি, নারকোল তেল রাখবার জন্যে..."

করুণাবাবু খুব আগ্রহের সহিত এবং অতি সহজে বিশ্বাস করিয়া লইলেন ; আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—সেকি কথা, রাম কহো...ঐ তো সাফ্ লেখা রয়েচে—'ফেনাইল' ; আমি কাণা মানুষ পড়তে পারচি, আর কার সন্দেহ হবে ?...ছি, ছি—সে কথা-কি ভাবতে আচে ?......"

শীতেও আমার কপালে ঘাম জমিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ সঙ্গ নেবেন বললেন—চলুন না,—আজ বড়দিনের রাতটা পাঁচজনে একসঙ্গে বসে একটু আমোদ প্রমোদ......"

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, ভাষা আমায় এ কোন্‌দিকে লইয়া যাইতেছে ? সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আজ আপনার মত আমুদে-আহ্লাদে লোকই তো......"

আরও সাংঘাতিক হইয়া যায় দেখিয়া থামিয়া তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আন্তরিকতা ও সৌজন্যের হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলাম এবং বেশ অনুভব করিলাম সেটা মৃতের হাসির মত মুখটাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

করুণাবাবুও কেমন এক অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি বাজ আসচি, আমায় আজ মাফ্ করবেন—বেতুয় নিশ্চয়—আপনার বাড়ী যাবো তাতে আর...তবে কথা হচ্চে—কি-রকম শীত পড়েচে

দেখেচেন ? বেহারে চারপুস্ত্‌ কেটে গেল মশায়, কিন্তু এবারের মত শীত—একেবারে যাকে বলে ঠাড় ....”

বলিলাম, “শীতেই তো বড়দিনের খাওয়া দাওয়ার যুত বেশী করুণাবাবু, একটু গান-বাজনার বন্দোবস্তও করেচি... যখন পাওয়া গেছে ভাগ্যক্রমে আপনাকে তখন আর...”

করুণাবাবুর চোখ দু'টা আর একবার বোতলের ওপর গিয়া পড়িল, তাহারপর নাছোড়বান্দা মাতালের হাতে পড়িলে লোকে যেমন বিব্রত হইয়া পড়ে অনেকটা সেইভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “না, না, শৈলেনবাবু, শীত এমনি কথায় বলছিলাম ! চারপুস্ত্‌ বেহারের জান্-নেক্‌লানো শীতের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল, আর এতো...একটা কাজ আছে এইদিকে—আচ্ছা তবে আসি ।”

হঠাৎ নমস্কার করিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম । এ কি বিষম ফাঁফরে পড়া গেল ! আমি যেন অপরিচিত একজন কে । এই দশ মিনিট পূর্ব্বে যে-আমি ছিলাম যেন সে নয় ।...বোতল দুইটার পানে চাহিলাম ; ইচ্ছা হইল সামনের লোহার পোষ্টে ঘা দিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলি ।—এই হতভাগা দুইটার জন্য নিতান্ত সহজ, শাদা কথা যাহা বলিয়াছি তাহারও মানে একধার থেকে বিগড়াইয়া গিয়াছে ।

ছোড়াটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হ্যারে ধনিয়া, পৌটলার মধ্যে গুঁজেগাঁজে দিলে বোতল দু'টো নিয়ে যেতে পারবি নি ?”

বলিল, "কাহে না?...উতার দি মোটরি ঠো" অর্থাৎ কেন পারব না? মোটটা নামিয়ে দাও।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি মোটটা নামাইয়া দিলাম। বনিয়া ঘাড়ে গোটা তিনচার ঝাঁকানি দিয়া এবং হাত দুটো কয়েকবার ঝাড়িয়া দুই তিনবার পায়চারি করিয়া লইল।

গোটাকতক চ্যাংড়া জুটিয়া হাজার রকম আন্দাজ করিয়া তর্কবিতর্ক জুড়িয়া দিল। একটা বলিল, "শাদি হ্যায়।"—মানে, বিয়ে আছে।

একটা বলিল, "কভি নেহি, বাঙ্গালীলোক সাদিমে পীতা হ্যায় নেহি" বলিয়া ইসারা করিয়া বোতলের দিকে দেখাইয়া দিল।

"ভাগো হারামজাদা সব" বলিয়া খেদাইয়া দিয়া বোতল দুটো খুঁজিবার জন্য একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেই চাকরটা নাকিসুরে বলিয়া উঠিল, "মোটরি গিরেসে হাম্‌নিকে না কহব।"

চোখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে কহিলাম, "মোট পড়ে গেলে তোকে কিছু বলতে পারব না? বটে! এই দু'টো বোতলের চাপেই তোর মোট পড়ে যাবে?—বেয়াকুব পেয়েছিস্ আমায়?"

—তাহারপর আমার কাছে ওপরচাল দিয়া, খানিকটা ওরকম আরাম করিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত রাগ হওয়ায় বোতল দুইটি জবরদস্তি পোঁটলার মধ্যে ঠুসিতে ঠুসিতে বলিলাম

"ফ্যাল্ পুঁটলি, তোর যদি সাহস থাকে, বেটা হারামজাদা কোথাকার—যত কিছু বলি না..."

বোতল বহাইতামই, সেও কিছু ফেলিতে সাহস করিত না, আর এইখানেই আমার বোতল-বিড়ম্বনার অবসানও হইত ; কিন্তু ঠিক এই মোহাড়ায় হঠাৎ অনাথ আসিয়া আমায় moral courage, কিনা সৎসাহসে উৎসাহিত করিবার জন্য একবারে মরণবাঁচন জিদ্ করিয়া পড়িল।

২

অনাথের সঙ্গে আজকের পরিচয় নয়,—সে আমার বাল্যবন্ধু। তাহার কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে খুব ছেলে-বেলার একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। রেলের পুলের নীচে দুই পা ফাঁক করিয়া, বুক চিতাইয়া অনাথ নাকের মধ্যে দিয়া দু'টি সিরেট গোছের ধোঁয়ার স্রোত ছাড়িতেছে ; ডান হাতে একটি দগ্ধপ্রান্ত সিগারেট, সামনে আমরা হাঁ করিয়া সপ্রশংস বিস্ময়ে চাহিয়া আছি।

এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম, তাহারপর কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ি। আবার কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা দুজনে এক জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি। অনাথের পক্ষে 'সুরার স্রোতে'ও বলা চলে। শুনা যায় এক দিন নাকি খুব গুলজার আড্ডা হইতে রাত করিয়া টলিতে টলিতে ফিরিবার সময়ে তাহার মনে এই কথাটা হঠাৎ গাঁথিয়া

যায় যে টাকাই যত অনিষ্টের মূল। মাতিনার টাকাটা পকেটে ছিল; কোন রকমে পাপ বিদায় করিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল।...কিছু ষ্টেশনের হোটেলে দিল; দিয়া সদ্য বৈরাগ্যের তাড়নায় ৺পুরীধামের একখানি টিকিট কাটাইয়া ফেলিল। তাহারপর দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়িয়া কেমন করিয়া পাটনার গঙ্গা পার হইয়া একেবারে এখানে!..তাহারই মুখে শোনা গল্প; বলে—"ভাই, ভুলটা বুঝতে পেরে সারাদিন সারারাত যতই গাড়ী বদলাতে যাই, যতই হাঁকুপাঁকু করি, ততই দেখি উল্টো পথে চলেচি—রেলগাড়ীকে কখনও বিশ্বাস করিস নি শৈলেন...তবে এও একটা কথা...মহাপ্রভু রথের কাছি দিয়ে না টানলে তো হবার জো নেই কি না..."

এখানে এক জমিদার-জহুরী এই মাণিকটিকে চিনিতে পারিয়া মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছেন। অনাথ বলে, "যাক্ ভাই, নেপালের পশুপতিনাথের খুব কাছেই রইলাম—বুড়ো একটা ডাক্ দিলেই গাড়ীতে গিয়ে উঠব।" একটা বোতল পোঁটলায় পুরিয়ায় আর একটা তুলিয়াছি, অনাথ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। পা দু'টা একটু একটু টলিতেছে, চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত। গাঢ়, জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের শৈলেন না? ব্যাপার কি রাজা?

বলিলাম, "অনাথ যে!...ব্যাপার কিছু নয়, দু'টো বোতল ছোঁড়াকে নিয়ে যেতে বলচি, তা নানান রকম ছুতো লাগিয়েচে, তাই..."

চক্ষু দুটিকে যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া অনাথ বলিল, "বোতল!—দু'টো বোতল!...কবে থেকে তোর এ সুমতি "

চাকরটা বোধ হয় তাহার মনিবের মান বাঁচাইবার জন্য বলিল, "ফিনাইল তো বা।"

অনাথ আমার পানে চাহিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহারপর কৃত্রিম রাগের সহিত চাকরটাকে ধমক দিয়া বলিল "ফিনাইল নেহি তো ক্যা রহেগা? হাম্ জান্তা নেহি?— আলবৎ ফেনাইল হায়...চোপ্ রাও..."

তাহার পর আমার প্ল্যান তাহার বুঝিতে বাকী নাই, আর সে চাকরের কাছে ফাঁস করিবার ছেলে নয়, আমায় চতুর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই কথা জানাইয়া প্রশ্ন করিল, "আর এই সরবতের বোতলটা—এতে দিশী সরবৎ না বিলিতী সরবৎ ভাই?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আঃ, কি পাগলামি করিস? —এই দেখ্ না বাপু কি রকম বিলিতী সরবৎ নিয়ে যাচ্চি"— বলিয়া খালি বোতলটা উল্টাইয়া দেখাইতে যাইব, অনাথ খপ করিয়া হাতটা ধরিয়া বলিল, "আমি তোকে অবিশ্বাস করতে পারি শৈলেন? —তোকে আজ দেখচি? ..."

বিব্রত হইয়া বলিলাম, "তা'হ'লে পথ ছাড়্, এখন যাই; রাস্তার মাঝে একটা..."

অনাথ আমার ডান হাতটা দুই মুঠায় ধরিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া সুরাদ্রব আবেগের সরু মোটা নানান সুরে বলিল,

"ছাড়চি পথ—আর কখনও আড়াল ক'রে দাঁড়াব না...কিন্তু আজ প্রাণে যে কি চোট্ দিলি শৈলেন...ও—ফ্!"

কি গেরো, আজ কাহার মুখ দেখিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম! জিজ্ঞাসা করিলাম "দেখ' দিকিন্!—কি আবার চোট দিলাম প্রাণে তোর?"

অনাথ 'ও-ফ্' করিয়া আর একটা বুকভাঙা শব্দ করিয়া গদ্গদ স্বরে বলিল, "আজ অনাথ এতই পর হ'ল?—ধরেচিস্ তো তাকেও লুকোতে হয়?"

বলিলাম, "ভ্যালা বিপদ; পর হতে যাবি কেন; কিন্তু ধরেচি তোকে কে বল্লে?"

অনাথ অভিমানভরে বলিল, "কেউ না; তুই নিজেই যখন লুকোচ্ছিস্ তো অন্য আর কে বলতে যাবে ভাই?"

বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য; লুকোবার কোন কথাই নেই তো লুকোতে যাব কেন?"

আমার হাত দু'টা চাপিয়া ধরিয়া অনাথ বলিল, "এই কথাই তো শুনতে চাই ভাই।—আমার কাছে,—তোর সেই ছেলেবেলার অনাথের কাছে এ কোন্ একটা লুকোবার কথা শৈলেন?"

একি ভাষার প্যাঁচে পড়া গেল মাতালের হাতে! এখন ইহাকে বোঝাই কি করিয়া? ...এর মুখ দিয়াই কথাটার জোট খুলিয়ে লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম—"কি 'কোন্ একটা লুকুবার কথা' বলচিস্ বলদিকিন?"

"যেটা লুকুচ্ছিলি।"

"কিছুই তো লুকুই নি; তুই বিশ্বাস না করলে কি করব?"

"বিশ্বাস তো করেচি ভাই।"

অনেকটা আশ্বাস্বিত হইয়া বলিলাম, "কি বিশ্বাস করেছিস্ বল তো?"

"যা আর লুকুচ্চিস্ না।"

একেবারে হতাশ হইয়া গেলাম! আপাততঃ নিস্তার পাইবার জন্য বলিলাম, "এমন ক্যাসাদে মনিষ্যি পড়ে?...আচ্ছা ভাই, স্বীকার ক'রচি—ধরেচি; এখন পথ ছাড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে...ঐ দেখ, চাকরটা আবার মোড়লি ক'রে ছোঁড়াগুলোর সামনে পরিচয় দিতে লাগিয়েচে...বানরা! —এদিকে আয় হারামজাদা..."

অনাথের কাঁদ-কাঁদ ভাবটা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, প্রায় তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার হাতটা ছাড়িয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল, এবং আমার মুখের উপর স্বরালস চক্ষুদুটি খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "ছাড়চি পথ; তোমার পথ রোখবার আমি কে? সুধু একটি কথা জিগ্যেস করব, দয়া ক'রে উত্তর দেবে কি শৈলেন?"

এ আর এক ভাব! অত দুঃখেও হাসি রাখিতে পারিলাম না; বলিলাম, "না দয়া করলে তো উদ্ধার নেই, বল্।"

"আমরা না স্বরাজ চাই?"

উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিলাম, "তা চাই বই কি।"

"—আর এমন মর্য়াল কারেজ নেই যে রাস্তা দিয়ে নিজের জিনিষ দু'টো বুকে ঝুলিয়ে হাতে লট্‌কে নিয়ে যাব? —ধিক্, কোন্ মুখে..."

রাগ সামলাইতে পারিলাম না; বিশেষ করিয়া এই জাতীয় একজনের উপর ঝাল ঝাড়িবার দরকারও ছিল; বলিলাম, "দোষ কি?—জিনিষটা তোমাদের হাতে পড়ে এমন সুযশ লাভ করেচে যে একটু আবছাওয়া হ'লে গঙ্গাজল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে যেতেও পা ওঠে না। এইটুকু আসতেই যে কি দুর্ভোগ হয়েচে .."

অনাথ ত্রিভঙ্গ হইয়া টলিতে টলিতে আমার মুখের দিয়ে চাহিয়া বলিল, "দুর্ভোগ!—এই আমি বোতল নিয়ে যাচ্চি, একটি কথা সে বলবে তার দুসারি দাঁতের উপর এই দুগাছি বোতল ভাঙব।"

একটা মতলব ঠাহর করলাম। নিস্থ হইয়া কহিলাম, "হ্যাঁ, তা'হলে আর দুর্ভোগের মোটেই ভয় থাকে না। কিন্তু তোর অত হাঙ্গাম ক'রে কাজ কি অনাথ? আমি এইটুকু পথ কাটিয়ে যাব'খন।...তোকে দেখেই বোধ হচ্চে যেন বিশেষ একটা দরকারি কাজে যাচ্ছিস্; তোকে আর আটকে রাখতে চাই না।"

"দরকারি কাজে"র কথায় অনাথের মনটা যেন একটু ভিজিল ; ভারিক্কে হইয়া বলিল, "দরকারি ?—এত দরকারি যে..."

ঔষধ ধরিয়াছে আশা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় ব'লতে হবে না, আমি বুঝি না ? তাহ'লে আয় গিয়ে ।...নে, বনিয়া, তোল্ ।"

বনিয়া পা বাড়াইতেই অনাথ হাত উঠাইয়া বারণ করিল। আমার পানে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু খুব দরকারি বলেই আরও যাব না ; তা না হ'লে আর স্যাক্রিফাইস্ হ'ল কি ?—আমি মর্‍্যাল কারেজের জন্য আজ সব দরকারি কাজ ত্যাগ করতে চাই।—এই দরকারি জীবনটা পর্য্যন্ত।"

বুদ্ধিমান মাতালের ওপর বেশী রাগ ধরে ; ও যে আমার কথাটাই এরকম কাজে লাগাইবে তাহা ভাবি নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "নে ছাড়্, রাস্তার মাঝখানে এক কেলেঙ্কারি।"

—চাকরটারে ধমকাইয়া বলিলাম, "আয় না বেটা বদমাইস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখচে তখন থেকে।"

অনাথ বোতলদুটা বগলে করিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িল। বলিল, "সত্যাগ্রহ করলাম—আমি গান্ধীর চেলা—মাড়িয়ে যাও।"

—বোতল দুইটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "জান যায়, নিমক্ নেহি দেগা।"

বেশ ভীড় দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এমন কি একটা ঝাল-চানাওয়ালা তাহার খঞ্চে নামাইয়া বেশ দু'পয়সা করিয়া লইতেছে। নানা রকম টিপ্পনি পরামর্শ উৎসাহবাণী...

লজ্জায় অপমানে আমি সত্যই ধৈর্য্য হারাইতেছিলাম। অনাথ বোধ হয় সেটা একটু একটু বুঝিল। বলিল, "আচ্ছা, এসো, রফা করা যাক্—গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট; হয় আমায় নিয়ে যেতে দাও, না হয় তুমি বুক ফুলিয়ে নিয়ে যাও,... ইস্ মাফিক্...চাকরকে দিতে পারবে না—আমি চাই মর‍্যাল কারেজ—নিজের মাল নিজে নিয়ে যাবো তার আবার..."

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আচ্ছা দে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি"—বলিয়া বোতল দুইটা তাহার হস্ত হইতে লইলাম; এবং এই সুযোগ হারাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি চাকরটার মাথায় মোটটা তুলিয়া দিয়া দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম।

কাণে গেল অনাথ সমবেত দর্শকদের বোঝাইতেছে, "লঙ্গোটিয়া ইয়ার হ্যায়,—নয়া সুরু কিয়া—ডরতা হ্যায়..."

ইহার পর কলেজের একদল ছাত্র রাস্তায় পড়ে। তাহাদের অনেকেই আমার সহিত পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হইল তাহারা যেন আমার যথেষ্ট পরিচয় এতদিন পায় নাই বলিয়া ঠাহর করিয়া ফেলিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম—আচ্ছা অভিশপ্ত জিনিষ তো এই বোতল যুগল!—সূর্য্যাস্তের পরে যেন মানেই বদলাইয়া যায়; তখন সঙ্গে লইয়া আর রাস্তা চলিবার জো নাই!

প্রসন্ন মুখে চলিলে বলিবে—ফূর্ত্তি আর ধরে না; লজ্জিত ভাবে চলিলে বলিবে—এখনও আনাড়ি; যদি সহজভাবে চল, বলিবে—বোঝে কার সাধ্য, একেবারে ঝানু। খোলাখুলি লইয়া গেলে বলিবে—ধাঁঘি, বেপরোয়া; একটু পর্দ্দার মধ্যে লইয়া গেলে বলিবে—চোখে ধূলো দিচ্চে। রাগিলে বলিবে—বেহেড, না রাগিলে বলিবে—পাঁড়, বেমালুম হজম ক'রে ফেলেচে...

সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে বুঝাইতে গেলে এত গভীর বিশ্বাসে এত সহজে বুঝিয়া বসিবে সে প্রমাণ দিয়া যে ধারণাটা মন থেকে একেবারে নির্ম্মূল করিব তাহার অবসরই পাওয়া যাইবে না!

বলা বাহুল্য অত আড়ম্বর করিয়া বাজার করাই সার হইল; মনের সে-অবস্থায় আর বড়দিন জমিতে পাইল না।

সমস্ত রাত ভাল ঘুমও হইল না।—কেবল এলোমেলো স্বপ্ন—বোতলগুলোর যেন হাত পা গজাইয়াছে...তাদের নানা ভঙ্গীতে নাচ...এদিকে গৃহস্থালির বাকী তৈজসপত্র যে অতবড় মিটিং করিয়া তাহাদের হুঁকা তামাক বন্ধ করিয়া জাতে ঠেলিল

ফুর্ত্তির চোটে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই...স্বপ্নের না আছে মাথা না আছে মুণ্ড!

৩

পরদিন সকাল হইতেই ইহার জের চলিল এবং সমস্ত দিন মনে হইল সবাই অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া আমার চরিত্র-সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।—

সকালেই প্রতিবেশী বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু লাঠি হাতে ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া হাজির হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কথাটি পাড়িলেন, "শুনলাম নাকি কাল রাত্রে তুমি..."

আমি কথাটা কাড়িয়া লইয়া মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, তিনি নিজেই মাথা নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, আমায় সে বলতে হবে না;—আমি কি তোমায় জানি না যে লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে বসব?...হেঁ-হেঁ—তবে কথা হচ্চে কাজ কি ও বিলিতী ফেনাইল-টেনাইলে—দিব্যি শুদ্ধ গোবরজল রয়েচে..."

আমি শেষ কথাটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মুখ তুলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুড়ো, সেকেলে লোক আমরা;—একটু হেঁয়ালিতেই কথা কওয়া অব্যেস...তা তুমি বুঝবে বৈকি...তা ঐ যা বললাম বাবা—শরীর-টরির একটু খারাপ হৈল নেহাৎ—একদলা সিদ্ধি চালিয়ে দিলে—দিশী

শুদ্ধ জিনিষ—শিবের ভোগে লাগে...আর ওসব ?—না ; ছি-ছি—ও বোতল-টোতলের ধার দিয়েও যেও না ..একটা বিশেষ কাজ ছিল যদু ডাক্তারের কাছে, তা ভাবলাম—আগে শৈলেনের সঙ্গে দেখাটাই ক'রে যাই—ছেলে মানুষ..."

প্রসাদের ঔষধের দোকানে একটা কাজ ছিল। যাইতে বলিল, "হ্যাঁরে, কাল কি কাণ্ড ক'রেচিস্ ?—করুণাবাবু মুখ গম্ভীর ক'রে ক্রমাগত বলে বেড়াচ্চে, "বেহারে চারপুস্ত্ হ'য়ে গেলো মশায়, এমন চাপা মাতাল তো একটাও চোখে পড়্ল না..."

বিরক্তভাবে চাহিতে বলিল, "বিশ্রী রকম ঠাণ্ডা পড়েচে, যদি শরীর খারাপ হয়েছিল তো আমায় বললেই হোত—একটা মেডিসিন্ ডোজ দিয়ে দিতাম...এই আমিই তো কখন কখন..."

মনটা তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, মরিয়া হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আমার আর মেডিসিন্ ডোজে পোষায় না।"

আফিসে বড় বাবু বলিলেন, "ছিঃ শৈলেন বাবু, এখন কোথায় লোকে ছাড়চে—আপনি এতদিন মতিস্থির রেখে..."

"মতিস্থির আর রইল না মশায়"—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলাম।

কথাটা এক হিসাবে ঠিকই ছিল...কাল সন্ধ্যা হইতে যা অবস্থা চলিয়াছে ইহাতে মতিস্থির থাকা দুষ্কর। অন্যে পরে কা কথা, এমন কি অনাথ পর্য্যন্ত আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিয়াছে। দেখা করিয়া আগ্রহভরে কহিল, "না; তোকে ছাড়তেই হবে। এযে কী পাপ জিনিষ...আর একবার যদি ধরেচিস্..."

আমি বলিলাম, "কাল লাল চোখে না হয় বিশ্বাস করতে পারিস্ নি; কিন্তু আজ শাদা চোখে কেন বিশ্বাস করতে চাইচিস্ না যে আমি ধরিনি?"

"সেই কথাই তো বলচি—শাদা চোখে তো আর ভুল হবে না...কিন্তু যাক্, আর ধরিস্ নি, মাইরি..."

ওর সেই গোলমেলে তর্ক! উত্যক্ত হইয়া বলিলাম, "না, ছাড়তে আমি পারব না, যা, আর ত্যক্ত করিস্ নি।"

মনটা লজ্জা, রাগ, বিরক্তি প্রভৃতি নানান খানায় এমন খিচড়াইয়া রহিল যে বিকাল বেলায় আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। বলা বাহুল্য তাহাতে ফল ভাল হইল না, কেন না আমার দরদীর দল কাল্পনিক মূর্ত্তিতে আমার শূন্য মনের মধ্যে আসিয়াই ভিড় জমাইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বে আমার মাথাটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একেবারে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম—এ কাজের কথা নয়—মাঠের দিকে দিয়া মাথায় একটু পরিষ্কার হাওয়া লাগানো দরকার।—পাগল করিয়া দিবে না কি!

হায়, সন্দেহও করি নাই যে শেষ চোপটি, আর সবচেয়ে মক্ষম চোপটি তখনও বাকী, আর তা বাড়ীর বাহিরেই আমার মস্তকের প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।—

জুতা জামা পরিয়া বাহির হইতেই দেখি—খদ্দর আর গান্ধীটুপি পরিহিত কতকগুলি ছেলের একটি মাঝারি গোছের দল দুয়ারগোড়ায় দাঁড়াইয়া ; —কালকের কয়েকজন কলেজের ছেলেও তাহাদের মধ্যে ! দেখা হইতেই অত্যন্ত বিনীতভাবে সবাই কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া অভিনন্দন করিল।

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, পূর্ব্বাহ্নেই জাতীয় প্রতাকধারী একটি যুবক অগ্রসর হইয়া আর একটি অধিকতর বিনীত অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাদের কর্ত্তব্য অতি কঠিন, মাফ করবেন—আপনাকে আজ বেরুতে দিতে পারি না আমরা।"

বুঝিতে বাকী রহিল না শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে—এ বাড়ী বহিয়া লিকার পিকেটিং। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল, তবুও শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ রকম কঠিন কর্ত্তব্য করার আপনাদের উদ্দেশ্য ?"

যুবক যুক্তকরেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "উদ্দেশ্য দেশ-মাতাকে বন্ধনমুক্ত করা।"

প্রশ্ন করিলাম, "তার সঙ্গে আমায় আপাততঃ বন্ধনে ফেলার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি ?"

সেই রকম বিনীত উত্তর হইল, "আপনি শিক্ষিত—আপনার সঙ্গে কি তর্ক করব ? তবে একবার ভেবে দেখুন, জিনিষটা কতই গর্হিত। আমেরিকা সেই জন্যেই স্পেশাল ল ক'রে জিনিষটাকে দেশছাড়া করেচে।"

বলিলাম, "আচ্ছা, আপনারা সত্যিই কি সন্দেহ করেন যে আমি বাজার থেকে বোতলে ক'রে..."

যুবক সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, সন্দেহ আমরা কি কখন ..."

"তা'হলে কি আপনারা এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ? ...দেখুন, কাল থেকে এই ধরণের তর্ক শুনতে শুনতে আমার মাথার ঠিক নেই। অথচ ব্যাপারটা..."

দলের মধ্যে আর একটি যুবক সামনে আগাইয়া আসিল এবং মাথা নীচু করিয়া গভীর বিনয়ের স্মিতহাস্যের সহিত বলিল, "আমার অপরাধ নেবেন না;—আপনি মাথা ঠিক না থাকায় প্রকৃত কারণটা বোধ হয় ধরতে পারেন নি; তবে মাথাটা যে ঠিক নেই এইটুকু স্বীকার ক'রে আমাদের কাজটা অনেক হালকা ক'রে দিয়েচেন, এবং সেই জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

হাঁ করিয়া রহিলাম,—এর ওপর আবার 'ধন্যবাদ' চাপায়!

প্রথম যুবকটি বলিল, "অনেকে এইটুকুও লুকোতে চান কিনা ..."

আর একটি যুবক শীলতায় ইহাদেরও উপর গিয়া বলিল—"অথচ লুকোবার জো নেই—কথাবার্ত্তায়, হাত-পা'র ভঙ্গিতে আপনি বেরিয়ে আসবে। আশা করি আমাদের কথায় অফেন্স নেবেন না আপনি।...আসলে আপনার এখনও কালকের ব্যাপারের আফ্‌টার এফেক্ট চলচে।"

এরকম বিনয়ের অত্যাচারের কখনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অস্বস্তির চোটে মনে হইতেছিল হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া একটা কিছু করি। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলাম, "দেখুন, আপনারা সকলেই ভদ্রসন্তান, সহজেই বিশ্বাস করতে পারবেন। ব্যাপারটা হচ্চে—কাল সন্ধ্যার সময় চাকরের মাথায় কিছু তরিতরকারি আর অন্য দু'একটা জিনিষ দিয়ে নিজে একটা ফেনাইলের বোতল আর একটা খালি বোতল নিয়ে আসছিলাম। শীতের কনকনানিতে বোতল দু'টো র‍্যাপারের মধ্যে..."

পতকাধারী যুবকটি বলিল, "আমাদের অত কষ্ট ক'রে কিছুই বলতে হবে না আপনাকে। সুধু অনুরোধ আপনি অব্যেসটা ছাড়ুন "

মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মুখের চেহারাতেও তা'র উত্তাপ অনেকটা প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। তবুও ধীর কণ্ঠেই বলিলাম, "বেশ ছাড়ব;—মাসে একটা করে ফেনাইলের বোতল আনলে এমন কিছু অব্যেসও হয়ে যায় না।...এখন অনুগ্রহ ক'রে আমায় একটু পথ ছেড়ে দিন; একটু ঘুরে আসা নিতান্ত দরকার হ'য়ে পড়েচে।"

পতকাধারী অন্য সবাইয়ের দিকে চাহিয়া ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দরকার হয়ে পড়াটা স্বীকার করি। কিন্তু যেতে দেওয়ার আমাদের অধিকার নেই; ক্ষমা ক'রবেন।"

আর একজন কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল, "সন্ধ্যার সময়েই আমাদের বেশী সাবধান থাকতে হয় কি না।"

ইহাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ; গালাগালও ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। অগ্রণী যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিলাম— "আপনাদের অধিকার আমার মাথায় ঢুকবে না; আমি জানি আমার যাবার অধিকার আছে—" বলিয়া পা বাড়াইলাম।

যুবক আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তা'হলে তোমাদের এইবার আত্মিক বল প্রয়োগ করতে হ'লো।"

সেটা আবার কি আকৃতিতে দেখা দিবে ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই দলের সব যুবকগুলি সটাং রাস্তার এ-মুড়ো ও-মুড়ো জুড়িয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল ; সামনে এতটুকু আর পা ফেলিবার জায়গা রহিল না।

আমার কান্না আসিতেছিল। রাস্তার লোক জড় হইতেছিল ; আমি কিছুক্ষণ একটা কথাও কহিতে পারিলাম না। অত অত্যাচারের মধ্যেও এইটুকু বুদ্ধি ছিল যে আর এ লইয়া ধাঁটাধাঁটি করিতে গেলেই সমস্ত পাড়া জাগাইয়া একটা গুলতান হইবে। অনেক চেষ্টায় মনটাকে সাধ্যমত গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আপনারা যদি তাইতেই সন্তুষ্ট হন্ তো আমি আর বা'র হব না, আপনারা যান।"

যুবক কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চলভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সবাই সেই অবস্থায় পড়িয়া। রাস্তার ওদিক হইতে দর্শকদের প্রশংসাবাণী আমার কাণে আসিয়া ধিক্কারের মত বাজিতে লাগিল।

বলিলাম, "যান আপনারা, কেন আর কষ্ট করবেন; আমি বেরুব না তো বলচি।"

"শুধু বাইরের শত্রুকে না আনলেই তো হ'লো না, ঘরের শত্রুকেও বিদেয় ক'রতে হবে। আমরা এই জন্যে আপনার মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁর কাছে ধন্না দিয়ে রইলাম।"

আমি আর রাগ চাপিতে পারিলাম না। গলা একটু চড়াইয়া বলিলাম "দেখুন আমার মধ্যেকার দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দানবকে চটাচ্ছেন মাত্র। আচ্ছা আপনারা কি বলতে চান যে আমি বাড়ীর মধ্যে বোতল ভরে..."

"আমাদের কেন লজ্জা দিচ্ছেন?"

"ও!—আর আমার বুঝি লজ্জা ব'লে জিনিষ নেই? ইঙ্গিতে কিছুই বলতে তো বাকী রাখলেন না—। আর এদিকে বাইরেও যেতে দেবেন না বাড়ীতেও স্থির হয়ে থাকতে দেবেন না, যেন কতবড় অপরাধ করেছি...তাও ছাই যদি স্পষ্ট ক'রে বলেন কি করলে আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারি...কি প্রমাণ দিলে...আচ্ছা বেশ—থামুন...এর চেয়ে তো আর বড় প্রমাণ হ'তে পারে না?..." —বলিয়া রাগে মাথা গোঁজ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম এবং তখনই যেখানে ফেনাইল

প্রভৃতির বোতল থাকে সেই কুলুঙ্গি হইতে ভরা বোতল একটা লইয়া বাহিরে আসিয়া তুলিয়া ধরিলাম এবং দলটির পানে চাহিয়া বলিলাম, "এই দেখুন, কাল যা নিয়ে এসেছিলাম; না বিশ্বাস হয় কেউ এসে শুঁকে দেখুন ফেনাইল কিনা..."

সবাই অনড়; মুখে অমায়িক অবিশ্বাসের হাসি!

উদ্ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "তবুও বিশ্বাস ক'রবেন না?—এ যে মহা জ্বালা!...আচ্ছা মশায়, আমি স্বীকার ক'রচি—আমি অপরাধী—এটা ফেনাইল নয়, এটা এক্সা নম্বর ওয়ান—আমায় মার্জ্জনা করুন—আর অমন কর্ম্ম করব না...এইবার যান।

—একি!—এতেও নিস্তার নেই?—আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবেন না? আচ্ছা নিন্, আমায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিসে এতটা মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন ক'রে তুলেচে এই আপনারাই বিচার করুন।"

—সমস্ত শক্তি দিয়া সামনের দেওয়ালে হাতের বোতলটা আছড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, "বুঝুন কিসের গন্ধ; এইবার তো আর অবিশ্বাস রইল না যে..."

* * *

ক্রোধান্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কিসের বোতল যে বাহির করিয়া আনিলাম, খেয়াল হয় নাই। ...আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মেথিলেটেড স্পিরিটের উগ্র সুরাগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দলটি ভূমি শয্যা ত্যাগ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "একবার বোলো ভাই গান্ধীজিকি জয়!—ত্যাগী শৈলেন বাবুকি জয়!..."

তাহার পর ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় আমায় একটি নম্র অভিবাদন করিয়া সামরিক প্রথায় কুইক মার্চ্চ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি মূঢ়ের মত শূন্য দৃষ্টিতে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

* * *

যাক্, সহৃদয় বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে আমার নষ্ট চরিত্র পুনরায় পাইয়াছি। প্রমাণস্বরূপ আটাশে ডিসেম্বরের 'বজ্রবাণী' পত্রিকা হইতে "—পুরে সুরা পিকেটিং" শীর্ষক সমাচার হইতে খানিকটা তুলিয়া দিলাম—

"...এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি একদল স্বেচ্ছাসেবককে শৈলেনবাবুর গৃহে সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শৈলেনবাবু প্রথমত দারুণ উগ্রভাব ধারণ করেন, ভৃত্য দিয়া সবিশেষ অপমান করান, এমনকি শেষে পুলিসের সাহায্য পর্য্যন্ত লইবার ভয় দেখান; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের অটুট সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম সৌজন্য এবং নম্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সমক্ষে সুরার বোতল, পানপাত্র, সোডার আধার প্রভৃতি যাবতীয়

আনুষঙ্গিক দ্রব্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভবিষ্যতে সুরাত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের সাধনা, ধৈর্য্য এবং শৈলেনবাবুর হৃদয়ের বল—এই উভয়েরই প্রশংসা করি এবং সুরসেবী মাত্রকেই শৈলেনবাবুর মহনীয় দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে মিনতি করি।”

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আমি সকল যুগের সকল সাহিত্য ভালবাসি। সাহিত্যের চারিদিকে যুগের গণ্ডী কাটিয়া আমরা মাঝে মাঝে সেই গণ্ডীর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ি। এই সীমারেখা কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতার মোহ যে কাটাইতে না পারিয়াছে, সে প্রকৃত সাহিত্য উপভোগ করিতে পারে না।

* * *

আধুনিক বলিলে সাহিত্যকে বড়ও করা হয় না, ছোটও করা হয় না। ইহাতে শুধু বুঝায় যে এ সাহিত্যে যুগধর্ম্ম জয়ী হইয়াছে। যুগধর্ম্মের মূল্য আছে। কিন্তু রসের দিক দিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে যুগধর্ম্মকে বড় করা চলে না।

* * *

'কপালকুণ্ডলা'র কথা ধরা যাক্। কপালকুণ্ডলার আখ্যানভাগে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সংসারে তাহা সচরাচর ঘটে না। ঘটে না বলিয়া ঘটিতে পারে না এমন নহে, ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। অর্থাৎ এ উপন্যাসের ঘটনাবস্তু সাধারণ নহে। পরিকল্পনা অসাধারণ বলিয়াই 'কপালকুণ্ডলা' রোমাণ্টিক। কল্পনা না হইয়া বাস্তবও উপন্যাসখানির উপাদান হইতে পারিত। কিন্তু উপাদান ত নিজে নয়, সেই উপাদান হইতে রস কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সাহিত্যের বিচারের বস্তু।

* * *

জগতের চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীকে কামনা করিতেছে। পুরুষ যখন নারীকে লাভ করে সংসার তখন সফল হয়। এই কামনার অচরিতার্থতাই জীবনের ট্র্যাজেডি। নবকুমার পুরুষ, কপালকুণ্ডলা নারী। কিন্তু নারীর প্রকৃতি

উদাসীন। কপালকুণ্ডলা অরণ্যপালিতা লোকসমাজ হইতে দূরে বর্দ্ধিতা বলিয়া যে তাহার নারীপ্রকৃতি সংসারের আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, তাহা নহে; কপালকুণ্ডলার বৈরাগ্য তাহার স্বভাব-সিদ্ধ। এই উদাসিনী নারীকে আপনার করিবার জন্য নবকুমারের অশ্রান্ত চেষ্টার মধ্যে জীবনের ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র চেষ্টায় নারী যখন কিছুতেই ধরা পরিল না, পুরুষের পৌরুষ এবং কামনা একান্তভাবে ব্যর্থ করিয়া জীবনের লক্ষ্যপথ হইতে সে যখন অকস্মাৎ কে-জানে-কোথায় সরিয়া গেল, কোন্ দুর্ব্বার দুরতিক্রম্য রহস্যময় কালস্রোতে বিলীন হইয়া গেল, পুরুষের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি তখনই সাহিত্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

* * *

এই চিরদিনের অতৃপ্ত কামনার মধ্যে যে করুণ রসের সাক্ষাৎ পাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঘটনাবস্তু কল্পনাগত হইলেও তাহার প্রয়োগ, ব্যবহার ও সংস্থানে কোন বিরোধ, কোন অসঙ্গতি নাই। রূপের দিক দিয়া কপালকুণ্ডলা একটি নিখুঁত মুক্তার মত উজ্জ্বল সুন্দর সুডৌল। সে মুক্তা কিন্তু অশ্রুর মুক্তা, জীবনের বেদনা জমাট বাঁধিয়া কাব্যে পরিণত হইয়াছে। রূপের দিক দিয়া যেমন ইহার কলাগত কমনীয়তায় কোন ত্রুটি নাই, রসের দিক দিয়া তেমনি ইহা পরিপূর্ণ, গভীর, অব্যাহত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা হইলেও রস-সাহিত্যে এই রোমান্টিক উপন্যাসের স্থান অনেক উচ্চে।

দিনপঞ্জী

২রা ডিসেম্বর—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আরও কয়েকটি সদস্যপদ ছাড়িয়া দিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইউরোপীয়ানদিগকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের কলিকাতা শাখার চেয়ারম্যান মিঃ এইচ-ক্যারি মরগ্যান গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক জলযোগ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, "প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তে আমাদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিছুই আমরা পরিত্যাগ করিতে রাজী নহি।"

৩রা ডিসেম্বর—সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ গুরুভায়ুর মন্দির সম্পর্কে জামোরিণের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহাকে মানবতার নামে জাতির দীনতম সম্প্রদায়কে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়া বিশ্বের কৃতজ্ঞতা ও সম্মানভাজন হইবার এবং মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, যাহা সত্য ও ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা রক্ষা করিতে আজ যদি আমরা বিমুখ হই, তবে দুরপনেয় লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা আমাদিগকে মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে।

১ম বর্ষ]　　২রা পৌষ ১৩৩৯　　[২৪শ সংখ্যা

যুগ-প্রবর্ত্তক

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

শিবশঙ্কর গাড়ী হইতে নামিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ষ্টেশনে তাদের গাঁয়ের একপাল ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, তাকে দেখিয়া সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, "এই যে শিবশঙ্কর," কেহ বলিল, "এই যে শিবু-দা।" শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা দল বেঁধে কোথায় চলেছ? সকলের হইয়া কেদার জবাব দিল,—কোথাও না, তোমায় নিতে এয়েছি। ভূতনাথ আগাইয়া আসিয়া একটু কাশিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,

—থ্রি চিয়ার্‌স্ ফর ....

কেদার তৎক্ষণাৎ তাকে এক ধমকে থামাইয়া দিল,—এই ভূতো, আবার ইংরেজি !

অপ্রস্তুত ভূতনাথ আবার একটু কাশিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তবে কি "জয়" বলব ?

ফটিক পিছন হইতে তাকে কনুইয়ের গুঁতো লাগাইয়া ভেঙ্গাইয়া বলিল,—তবে কি "জয়" বলব ? মুখ্যু গেঁয়োভূত, সব মার্ডার করলে !

শিবশঙ্কর এতক্ষণে বুঝিল এরা সত্যই তাকে স্বাগত করিতে আসিয়াছে। সে মনে মনে খুশী হইয়া গেল। বাহিরে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,

—কোন ব্যক্তি বিশেষের "জয়" বলা সেকেলে হয়ে গিয়েছে। এটা আইডিয়ার যুগ, যদি "জয়" বলতে চাও তাহলে আইডিয়ার "জয়" বল। বল—"জয় চাষী-মজুর রাজের !"

কয়েকজন চাষী ছেলের দলের কাছে দাঁড়াইয়া সকৌতূহলে তাদের দেখিতেছিল, তাদের কথাবার্ত্তা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। এদের মধ্যে সকলের আগে ছিল এক দীর্ঘপকশ্মশ্রু বৃদ্ধ। তার পরণে একখানি আটহাতি কোরা লাটুমার্কা ধুতি, গায়ে ময়লা মার্কিণ চাদর, কাঁধে একখানি রঙীন গামছা। এক কাণে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি, অন্য কাণে একটি বিড়ি গোঁজা। শিবশঙ্কর হঠাৎ তার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল,

—ভাই তোমার ম্যাচিস্‌টা।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে বাবুদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, হঠাৎ সম্ভাষিত হইয়া সচকিতভাবে একটি সেলাম ঠুকিয়া বলিল,

—এজ্ঞে কর্ত্তা?

শিবশঙ্কর পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ম্যাচিস্‌ জ্বালাইয়া তাহা ধরাইবার অভিনয় করিল। তখন বৃদ্ধ গামছায় হাত মুছিয়া ট্যাঁক হইতে ম্যাচবাক্সটি বাহির করিয়া আলগোছে শিবশঙ্করের হাতে দিল, যাতে ছোঁয়া না যায় এইভাবে। শিবশঙ্কর নিজে বিড়ি ধরাইল, পকেট হইতে আর একটি বিড়ি বাহির করিয়া ম্যাচবাক্সের সঙ্গে তাহা বৃদ্ধের প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিল।

তারপর বিড়িতে একটান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ছেলেদের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,

—এরাই দেশের প্রাণ!

শিবশঙ্করকে ঘিরিয়া হল্লা করিতে করিতে ছেলের দল ষ্টেশন হইতে প্রস্থান করিলে বৃদ্ধ তার এক সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল,

—বাবুরা কারা? স্বদেশীওয়ালা?

তার এক অল্পবয়সী সঙ্গী জবাব দিল,

—আমার মনে লেয় ঐ সোন্দরপানা বাবুটি গাঁধি রাজার লোক, চট্‌পরা নজর কল্লে না?

আর একজন বলিল,

—গাঁথি রাজার লোক হবি ক্যান, তিনি কেষ্টপুরের পাঁচ-আনি সরিকের বড় কত্তার ছাবাল, সহরে ল্যাখে পড়ে ভারি এলেম হইছে।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল,—হুঁ। তারপর কৃষ্ণপুরের পাঁচ-আনি সরিকের বড় কর্ত্তার ছেলের দেওয়া বিড়িটি ধরাইল,—একটা চুরোট দিলে না-ক।

ছেলের দলের সঙ্গে হাঁটিয়া শিবশঙ্কর গাঁয়ের দিকে চলিল। মাঠের মাঝ দিয়া বাঁধানো পথ। দুই দিকে যতদূর চোখ যায় সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠে কেবল লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বাবলা গাছ. মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথের পাশে নীচু জমিতে তখনও জল দাঁড়াইয়া আছে। জলে গাঢ় হরিৎবর্ণের সমারোহ করিয়া কচুরী পানার জঙ্গল আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে।

চলিতে চলিতে শিবশঙ্কর ছেলেদের সম্বোধন করিয়া বলিল,

—এই ত বাংলার রূপ ; না আছে বৈশিষ্ট্য, না আছে কিছু। এই বাংলার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বঙ্কিম রবীন্দ্র ইত্যাদি লেখকের দল কি ন্যাকামি না করিয়াছেন !

পিছন হইতে ভূতনাথ বলিয়া উঠিল,

—'নম নম নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'—

শিবশঙ্কর ভূতনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল,

—বঙ্গভূমি রবিঠাকুরের জন্মভূমি নয়, রবিঠাকুর জন্মেছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়। আবৃত্তি ভুলিয়া ভূতনাথ সাশ্চর্য্যে বলিল,

—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া? নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক?

—হ্যাঁ, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক। আর কিছুদিন পরে বুঝতে পারবে।

ক্রমে সকলে কৃষ্ণপুরে পৌঁছিল। কৃষ্ণপুর গাঁটি এককালে খুব বড়ই ছিল, হাজার ঘরের উপর লোক সেখানে বাস করিত। এখন তার ভগ্নদশা। কণ্টকাকীর্ণ পতিত ভিটা, বড় বড় মজাপুকুর, ভাঙ্গা মন্দির ও বেতবন—দেখিবার মধ্যে আর বিশেষ কিছু ছিল না।

শিবশঙ্করকে পাইয়া কৃষ্ণপুরের ছেলের দল মাতিয়া উঠিল।

২

এখানে শিবশঙ্করের পরিচয় দেওয়া দরকার।

শিবশঙ্কর বনেদী বংশের ছেলে, পৈত্রিক পেশা জমিদারী। জমিদারীর বার আনা নীলামে চড়িলেও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতি শিবশঙ্করদের পরিবারের কুলগত তাচ্ছিল্য এখনও দূর হয় নাই, খানদানীর অঙ্গহিসাবে এখনও সযত্নে উহার অনুশীলন হয়। কিন্তু এইরূপ পরিবারে জন্মিয়াও যুগধর্ম্মের

প্রভাবে শিবশঙ্কর কুলগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণপুর একাডেমী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া শিবশঙ্কর যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল, তার পূজনীয় পিতৃদেব দুঃখ করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণপুরের রায় চৌধুরীদের বংশে এইবার শনি রন্ধ্রগত হইল।

কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া শিবশঙ্কর সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল যে কৃষ্ণপুরের রায় চৌধুরীদের ছেলে হইলেও তার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে ও একটু আলো ও বাতাস পাইলেই সে বুদ্ধি পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বিকাশোন্মুখ বুদ্ধির তাগিদে শিবশঙ্কর ব্যাকুল হইল,—একটা কিছু করিয়া দেশে রায় চৌধুরীদের লুপ্ত গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাকে পাইয়া বসিল। এই নূতন প্রেরণা অনুভব করিয়া শিবশঙ্কর আপনার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল।

শাস্ত্রে বলে সাধনমার্গে উপযুক্ত গুরুকরণ সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপান। অতএব গুরু চাই। বিকাশলাভেচ্ছু শিবশঙ্কর অধ্যবসায় সহকারে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পরে, সংশয় দোলায় বহুবার দোদুল্যমান হইবার পরে শিবশঙ্করের ঐকান্তিক কামনা সিদ্ধ হইল, এক শুভ মুহূর্ত্তে সদ্‌গুরু আবির্ভূত হইয়া কৃপাদানে তাকে ধন্য করিলেন। তারপরে আরম্ভ হইল যোগমার্গের কৃচ্ছ্রসাধন,—কঠোর, নিগূঢ়, সুদীর্ঘ সাধনা।

অবশেষে গুরুকৃপায় শিবশঙ্করের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইল, সে দেখিল সিদ্ধিলাভের পথ তার সন্মুখে চৌরঙ্গী রাস্তার মত প্রসারিত, প্রশস্ত, মসৃণ, সরল।

প্রথম বার্ষিক (ক) শ্রেণীর ছাত্র হইলেও গুরুকৃপালব্ধ দিব্যদৃষ্টিবলে সেই অল্প বয়সেই শিবশঙ্কর বুঝিতে পারিল যে এ যুগের সার কথা লোকের নজরে পড়া। এ যুগে জন্মিয়াও উদ্ভাবনী বুদ্ধির অভাবে যে সকলের নজরে পড়িবার আর্ট আয়ত্ত করিতে পারে না, তার তুল্য দুর্ভাগ্য জীব জগতে আর নাই। অনন্যমনা হইয়া শিবশঙ্কর এই আর্টের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল।

৩

শিবশঙ্করের চেহারা ছিল সুন্দর, জমিদারবাড়ীর ছেলের উপযুক্ত। নধর কোমল দেহ, ফর্সা রং, তীক্ষ্ণ নাসিকা, বড় বড় ভাসা চোখ, আভিজাত্যের মার্জ্জিত চলন,—এ সকল ছিল তার পৈতৃক সম্পত্তি। কৃষ্ণপুরের রায় চৌধুরী পরিবার দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাত। মেয়ে দিবার সময় তাঁরা বরের বিত্তের খবর লইতেন, রূপ দেখিতেন না, কিন্তু বৌ আনিবার সময় সকলের আগে দেখিতেন কন্যার রূপ। ফলে রায় চৌধুরী পরিবারের দৌহিত্র দৌহিত্রী ও পৌত্র পৌত্রীর মধ্যে চেহারার, বিশেষ করিয়া রংয়ের তারতম্য এত বেশী দেখা যাইত যে তাহা সকলের চোখে না পড়িয়া পারিত না।

শিবশঙ্করের সুন্দর, সুশ্রী চেহারা একটা বিশিষ্ট রূপ পাইল যখন দেখা গেল যে ছুটি কাটাইয়া বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় তার দীর্ঘ, কাল, উজ্জ্বল, কুঞ্চিত কেশ থরে থরে সযত্নে বিন্যস্ত হইয়া তার কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। শিবশঙ্করদের পরিবারে সেকালে বাব্‌রী রাখিবার রীতি ছিল, সুতরাং গৃহে তার বাবরী রাখা কৌলিক ধর্ম্মের আচরণ বলিয়াই গণ্য হইল। কিন্তু এযুগে ভদ্র সমাজে বাবরীর তেমন চল না থাকিলেও দেশের লোকে ভুলে নাই যে রবীন্দ্রনাথের বাবরী আছে। শিবশঙ্করের বাবরী দেখিয়া তার বন্ধুবান্ধবেরা স্বভাবতঃই অনুমান করিল যে সে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হইয়াছে। তাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল যখন দেখা গেল যে ছুটির দিনে সুদৃশ্য attache case বগলে করিয়া সে বাহির হইয়া যায়, কেহ নস্য চাহিলে রূপোর কৌটা খুলিয়া দেখায় যে তাতে জাফ্রাণ দেওয়া সুগন্ধি জর্দ্দা রহিয়াছে, প্রায়ই গুণ গুণ করিয়া গান করে,—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি—ই-ই-ই—
হতভাগিনী" ইত্যাদি।

একদিন বিকালের দিকে attache case বগলে, মাথায় এক মখমলের টুপী আটিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় তার বন্ধু অমর মিত্তির আসিয়া উপস্থিত। অমর মিত্তির বন্ধু মহলে সুকবি বলিয়া পরিচিত। সজল, কাজল, শ্যাম সমারোহ, তরুণ

কাঁচা, চঞ্চল, সুদুর, পিয়াসী ইত্যাদি শব্দ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন মসৃণ ছন্দে সে বাঁধিয়া দিতে পারিত যে ওস্তাদ রবীন্দ্র ক্রিটিকদেরও সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত যে তাঁদের না জানাইয়া কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কবি ঐ সকল কবিতা অমর মিত্তিরের হাতে দিয়া ফেলিয়াছেন কি না। এজন্য তাঁকে বহুবার জবাবদিহি করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বের সাধনায় অমর ছিল শিবশঙ্করের পথনির্দ্দেশক। বিচিত্রার অধিবেশনে সে-ই তাকে লইয়া গিয়া কবির সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেয়। জোড়াসাঁকোর প্রতি, ছাতিম বৃক্ষের প্রতি ইত্যাদি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া শিবশঙ্কব কবিপ্রসিদ্ধি লাভের ভিত্তি পত্তন করিয়াছে, সে সকল কবিতার সংশোধনে অমর মিত্তিরের কতখানি হাত আছে সেটা বাহিরের লোকে জানে না।

বন্ধুকে দেখিয়া শিবশঙ্কর উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—ওরে, বেনাভ্যেন্তের চিঠির জবাব এয়েছে, সম্বোধন করেছে Illustre Senor, 'হা-হা-হা! সেটা আগামী সংখ্যা "পদ্মা"তে ছাপবার জন্য পাঠিয়ে দেব ভাবছি।

অমর বলিল,

—তা দিস্। "চক্রে" ওয়েল্‌সের চিঠিটা বেরিয়েছে. আমার মন্তব্যও ছাপিয়েছে। ঘণ্টাকর্ণ নাম দিয়ে একটা হতভাগা আবার টিপ্পনী কেটেছে যে বড় বড় লোকের কাছে ভণিতা করে চিঠি লিখে জবাব আদায় করে

ছাপানো সস্তার নাম কেনবার হাল ফিকির। "চক্র" আবার সেটা ছেপেছে। সম্পাদককে একটু হুম্‌কী দিতে হচ্ছে, আবার এ রকম জিনিস ছাপ্‌লে তোমার "চক্র" ঘুরিয়ে ছাড়ব।

শিবশঙ্কর বলিল,

—অতসী-জয়ন্তীতে পাঠাবার জন্য একঠা কবিতা লিখেছি, একটু দেখে দিস্।

—পরাগ-বন্দনার অভ্যর্থনা-সমিতিতে নাম দিবি? খুব তোড়জোড় হচ্ছে। তারা নাকি "বন্দিনীর নৃত্য" দেখাবে।

—দেখাক্, আমি ও-তে নাই। বেটা ছোট লোক। পেটে আমার পয়সায় কেনা চপ কাট্‌লেট গজগজ করছে, কিন্তু আমার উল্লেখ ক'রে একদিন নাকি হেসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা।

—যাক্, তাহ'লে আমিও যাচ্ছি না। কর্ত্তারা আবার আমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন। আরে বন্দনা ফন্দনায় যদি চাঁদাই দেবো তবে সাহিত্যিক হয়েছি কিসের জন্যে?

—তাহ'লে বেশ হবে। দু'দিন বাদে আমরাই অমর-প্রশস্তির অনুষ্ঠান করব, তখন দেখে নেবো। আজ আবার "কবি-চক্রের" পাক্ষিক অধিবেশনে "রবীন্দ্রকাব্যে শাল্মলীতরু" প্রবন্ধ পড়তে হবে,—তোর হাতে কি কোন কাজ আছে?

—মিসেস চোঙদারের বাড়ীতে "তরুণ-পথিক সংঘের" কথা ভুলে গেছিস নাকি?

—ওহো! আজ আর হয়ে উঠবে না। তুই যা, আমার হয়ে মিসেস চোঙদারের কাছে এপোলজি চাস্।

দুইবন্ধু দুই পথে প্রস্থান করিল।

উপরের কথাবার্ত্তা হইতে শিবশঙ্করের সাধনার একটি দিক লক্ষ্য করা যাইবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধনায় বৈষ্ণবত্ব বড় না ভেক বড় এ সমস্যা লইয়া শিবশঙ্কর মস্তিষ্কের অপব্যয়ে করে নাই কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবকেও ভেক ছাড়া বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারিবে না। যদি মুখ্য উদ্দেশ্য আপনকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করাই হয় তবে তাহা করিবার একমাত্র উপায় ভেক। কাজেই উদীয়মান কবি বলিয়া পরিচিত হইবার বহিরঙ্গ সাধনায় শিবশঙ্কর আপনার তনু-মন-ধন সমর্পণ করিয়াছিল।

শিবশঙ্করের গৃহে প্রায়ই সাহিত্যিক মজলিস বসিত। যে-সকল বন্ধু তার সাহিত্যিক ক্যান্‌ভাসারের কাজ করিত তারাই এই মজলিসে নিমন্ত্রিত হইত। যে-সকল লেখকের বিরুদ্ধ-বাদী হইবার সম্ভাবনা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিচার করিয়া তাদের দুইচারজনকেও নিমন্ত্রণ করা হইত। দলভুক্ত কাগজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকদের অবারিত-দ্বার ছিল। মহিলা লেখক ও লেখকযশঃপ্রার্থিনীগণ মাঝে মাঝে এ মজলিস অলঙ্কৃত করিতেন। মহিলা সভ্যাগণের প্রতি শিবশঙ্করের আদর-আপ্যায়নের অন্ত ছিল না। এ-কথা শুনিয়া অনেকে উৎকর্ণ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু আমরা জানি

শিবশঙ্করের চোখে এঁরা কেহই গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী অপেক্ষা ছোট ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের শান্ত তপোবন, যেখানে বৃহৎ অশ্বকর্ণ বৃক্ষের ছায়ায় হোমাগ্নির পাশে বসিয়া দীর্ঘপক্কশ্মশ্রু ও দীর্ঘপক্ককেশ ঋষিগণ প্রসন্ন উদার হাস্যের সহিত নীবারকণাভোজনরত বন্য-কুক্কুটদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উজ্জ্বল কান্তি শিষ্যগণকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতেন, বিংশ-শতাব্দীর নব্যযুবক হইলেও সেই তপোবনের চিত্র সর্ব্বদা শিবশঙ্করের চোখে ভাসিত। ইহার ফলে সমাজ ও দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া তার দৃষ্টি সমগ্র বিশ্বের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। প্রতিমাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মণিঅর্ডার পিয়নের আবির্ভাবের ব্যতিক্রম না হইলে চারিপাশের ক্ষুদ্র জগতের অকিঞ্চিৎকর কোলাহল সাহিত্য-ধ্যানমগ্ন শিবশঙ্করের কর্ণে পৌঁছিত না। এ-সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শিবশঙ্করের মধ্যে আধুনিক মেয়ে-ক্যাঙলামির লেশমাত্র ছিল না, যদিও সে ছিল একজন অবিবাহিত যুবক ও সাহিত্যরসিক। বন্ধু অমর মিত্তির এ-বিষয়ে একটু বস্তুতান্ত্রিক ছিল, শিবশঙ্করকে সে Sir Galahad, Le Chevalier Sans reproche ইত্যাদি বলিয়া মৃদু উপহাস করিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আদর্শ-বাদী ও বিশ্বমানবতার উপাসক শিবশঙ্করের সুদর্শন চেহারা ও রূপোর জর্দ্দার কৌটা থাকা সত্ত্বেও নারীকে সে কেবল কাব্যপ্রেরণার উৎস বলিয়াই দেখিত। "চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা" আবৃত্তি করিবার সময়ে তার মুখের

গদগদ ভাব নবদ্বীপে যে-কোন গোস্বামীর ঈর্ষার বিষয় ছিল, কিন্তু দু'দিনের বেশী একখানি সেফ্‌টি রেজর-এর ব্লেড যার যায় না সেই-শিবশঙ্কর একটি চতুর্দ্দশ বসন্তের মূর্ত্তিমতী মালাকে দেখিলে স-সম্ভ্রমে চোখ না নীচু করিয়া পারিত না।

সে যাই হোক, সাহিত্যিক মজলিসের সভ্যগণের জলযোগের জন্য তার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইত; জয়ন্তী, বন্দনা, অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা, প্রশস্তি ইত্যাদি ব্যাপারেও সে মুক্তহস্তে চাঁদা দিত। শিবশঙ্কর এই সকল খরচকে অবশ্য investment বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু হয়ত আদর্শবাদী বলিয়াই এ জ্ঞান তখনও তার লাভ হয় নাই যে বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর লোকের জন্য এই ধরণের অর্থব্যয় একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা, যথা—কন্যা দেখিবার জন্য আগত বরপক্ষীয় লোক ও সাহিত্যিক আড্ডাধারী। খাওয়াইবার উৎসাহ শিবশঙ্করের কুলগত, কিন্তু ডিপ্লোমেটিক চা খাওয়াইবার বিদ্যা-যে—শ্রেণীর প্রতিনিধি সে সে-শ্রেণী বিংশ শতাব্দীতেও আয়ত্ত করিতে পারিবে না। শিবশঙ্করের ধীরে ধীরে উপলব্ধি হইতে লাগিল যে তার বাবরী চুল, মখমলের টুপী, attache case, জর্দ্দার কৌটা, সাহিত্যিক মজলিসের আয়োজন, চাঁদা দান, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, অনুসন্ধিৎসু-বেশে বড়লোককে চিঠিলেখা, cubistic art এর পরিকল্পনাযুক্ত জ্যাকেট দিয়া বই ছাপানো, প্রাচীন ভারত ও বিশ্বমানবতার গৌরব প্রচার, নারীমহিমাকীর্ত্তন ইত্যাদি বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও সে সাহিত্য জগতে শিক্ষানবীশের অধিক

মর্য্যাদা পাইতেছে না। সাহিত্য জগতের রথিগণ দেঁতোহাসি ও আফিসের বাবুদের প্রতি বড় সাহেবের শিরঃকম্পনের অধিক আর কিছু তাকে দিতে চান না। বড় জোর কেহ 'এই যে' এ পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিয়া যান, 'আসুন, নমস্কার' টুকু বলাও প্রয়োজন মনে করেন না। ব্যাপার দেখিয়া অতি দুঃখের মধ্যেও শিবশঙ্করের হাসি পাইল। বাঃ! এই নাকি সাহিত্য জগৎ, এঁরাই নাকি সাহিত্য-রস সৃষ্টি করেন, জাতির মনকে গড়িয়া তোলেন, জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন! প্রবল উষ্মার বশীভূত হইয়া শিবশঙ্কর বলিয়া ফেলিল—দুত্তোর!

৪

যূথভ্রষ্ট, দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া শিবশঙ্কর কিছুকাল ঘুরিয়া বেড়াইল। একবার ভাবিল কলেজের পড়ায় মন দিবে, কিন্তু সে থার্ড ইয়ারের ছাত্র, পড়াশুনার চাপ নাই, কাজেই পাঠ্যপুস্তকে মন বসিল না। বাবরী গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া, জর্দ্দার কৌটা বন্ধু অমর মিত্তিরকে দান করিয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরের ধারে গিয়া সে ভাবিতে বসিল। ঘাসের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, মাথায় হাত দিয়া, দুই চোখ বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিল। ভাবনার আতিশয্যে তার চোখ কর্‌কর্‌ করিতে লাগিল, মাথা কন্‌কন্‌ করিতে লাগিল, তবু সে কোন কুল-কিনারা পাইল না। তখন যেমন করিয়া প্রান্তর মধ্যে ঝটিকাবিপর্য্যস্ত, পথভ্রান্ত জগৎ

সিংহকে বন্ধুবৎসল বিদ্যুৎ চমকিয়া মন্দিরের চূড়া দেখাইয়া তাঁর জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী আশ্রয়ের সন্ধান বলিয়া দিয়া বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিয়াছিল, তেমনি করিয়া শিবশঙ্করের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যপ্ত ভাবনার ঘনকৃষ্ণ মেঘ চিরিয়া সেই পুরাতন বন্ধুবৎসল বিদ্যুত ঝলসিত হইল,—সেই আলোকে শিবশঙ্কর দেখিতে পাইল শৈলবিহার-আনন্দে মগ্ন তার বিস্মৃতপ্রায় গুরুদেবের মসৃণ, ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত বিস্তৃত টাক্ ও প্রসন্ন গম্ভীর হাস্যবিমণ্ডিত দুইটি স্থুল, তাম্বুলরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধর !

নবজীবনপ্রাপ্তের ন্যায় ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া শিবশঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিল। গুরুর জন্য তখন তার মন উতলা, মনে মনে সে টিকিট কিনিয়া রেলগাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছে, ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়িতেছে, অধৈর্য্য হইয়া সুতীব্র চীৎকারে আকাশ বাতাস চিরিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু কিসে যেন তার চাকা আটকাইয়া গিয়াছে। বিরক্ত হইয়া শিবশঙ্কর চোখ তুলিয়া দেখে অন্ধের মত চলিতে চলিতে সে একটি মনুষ্যমূর্ত্তির ঘাড়ে পড়িবার মত হইয়াছে। তার বাহ্যজগতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, লজ্জিত হইয়া সে পাশ কাটাইল। ততক্ষণে মুর্ত্তিটি সচকিত হইয়া তার দিকে চোখ ফিরাইল, শিবশঙ্কর দেখিল একটি নারী,—তরুণী বটেন, সুন্দরী বটেন, সুবেশা বটেন, সুসভ্যাও বটেন। শিবশঙ্করের ভাব দেখিয়া পর্য্যাপ্ত কৌতুক হাসিতে তাঁর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইল। হাসিতে হাসিতে

শিবশঙ্করের দিকে একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিলেন। তার অর্থ—হাউ ইডিয়টিক! তারপর বাম হস্তের দুই আঙুলে ধৃত সিগারেটটি মুখে তুলিলেন, একটু টান দিয়া নির্লিপ্তভাবে নাকমুখ দিয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন। শিবশঙ্কর প্রাচীন ভারতকে ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন ভারত তখনও তাকে ত্যাগ করে নাই। তার পিঠে যেন চাবুক পড়িল, মনে মনে সে বলিয়া ফেলিল,—হায় গার্গী, তুমিও সিগারেট ধরিলে! উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে শিবশঙ্কর হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া গেল, তার মন গুরুর জন্য আরও ব্যাকুল হইল।

৫

নাগরা ও খদ্দর পরিয়া, আমেরিকান কায়দায় চুল ফিরাইয়া, দাড়ি গোঁফ কামাইয়া পাঁস-নে চশমা চোখে দিয়া যে সুদর্শন যুবকটি daisএর উপর জলধর দাদার পাশে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল তাকে চিনেন না বলিতেছেন? মশাই, একটু সাবধান হইয়া কথা বলিবেন, কারণ Not to know him argues yourself unknown। মশাই, আপনার কাঁচা পাকা গোঁফ আছে, দিব্য একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ি আছে দেখিতেছি, দৈনিকে আর্টিকেল লিখেন বলিয়া একটু গুমোর হইয়াছে তাহাও জানি, কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করি ঐ দিকের, দেশের আশাস্থল ও জাতির গৌরব ঐ

ছাত্র-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া একটু সাবধান হইয়া কথা বলিলেন। যাকে চিনেন না বলিতেছেন তরুণ সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক সেই শিবশঙ্কর রায় চৌধুরীর একটু ইঙ্গিতে আপনার ক্রমোন্নতিশীল নেয়াপাতি ভুঁড়িটি ফাঁসাইয়া দিতে তাদের কিছুমাত্র বাধিবে না। দেখিতেছেন কি জলধর দাদা কেমন মোলায়েম করিয়া শিবশঙ্কর বাবুর পৃষ্ঠদেশে স্থুল, কৃষ্ণবর্ণ হস্তটি বুলাইয়া দিতেছেন! ঐ দেখুন, শিবশঙ্কর বাবু দাঁড়াইতেছেন, বোধ হয় কিছু বলিবেন। বাপরে কি ভীষণ হাততালি, কানে যে তালা লাগিবার যোগাড় হইল! অবহিত হইশা শুনুন মশাই,—এ অমিট্-রে'র হেঁয়ালি নয়, নিবারণ চক্কোত্তির রোডোডেনড্রেন-গুচ্ছ নয়, তরুণ বাংলা-সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তকের বজ্রগর্ভ বাণী -"বন্ধুগণ আপনাদের দুর্ভাগ্য যে বাংলা সাহিত্যে এতদিনেও শৈশবের ছেলেখেলা ছাড়িয়া বেশীদুর আগাইতে পারে নাই। পারে নাই তার কারণ, এপর্য্যন্ত একজনও যথার্থ শক্তিমান লেখক বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চায় মন দেন নাই। কতকগুলি বিকৃতমস্তিষ্ক সরকারী চাকুরিয়া ও প্রজাশোষণকারী, গব্যরস ও স্যানাটোজেন-পুষ্ট জমিদার-নন্দন সাহিত্য-সৃষ্টির নাম করিয়া বাংলা দেশের পাঠক-মণ্ডলীর সঙ্গে প্রচণ্ড রসিকতা করিয়াছেন মাত্র। সাহিত্যের কারবার জীবনের নির্ম্মল উলঙ্গ সত্য লইয়া। সে-সত্য লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সাহস ও শক্তি এই সকল হতভাগ্য কোথায় পাইবে? আজ ধ্বংস হইয়া যাক্ এইসকল

দীন অকিঞ্চনের কষ্ট-চেষ্টা, শুদ্ধ হইয়া যাক্ এই সকল বাতুলের অসার প্রলাপ। তরুণের দল আজ বাংলা সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িবে, সুন্দর করিয়া গড়িবে। সত্যং কসুন্দরম্।" (হাততালি)।

শিবশঙ্কর আজ বাংলা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল পুরুষ। তার কলমের খোঁচাকে ভয় করেন না, তার হাতের মুরুব্বীয়ানা-সূচক পিঠ-চাপড়ানি খান নাই বাংলা দেশের এমন লেখক বিরল। যেমন তার প্রতিপত্তি তেমনি তার বইয়ের কাটতি। দেশের তরুণ-তরুণীরা তার জন্য পাগল, তার প্রশংসাময় উচ্চ-কণ্ঠ। বাংলা দেশের কোন সবজান্তা সঙ্গীত-বিশারদ একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় আগে স্থান পাইবার জন্য তরুণেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এ কথা সত্য হইতে বা না-হইতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় প্রবীণদের ঠেঙ্গাইবার জন্য তরুণদের হাত নিস্‌পিস্ করিতে থাকে,—একটা বে-ফাঁস কথা আর একেবারে দক্ষ-যজ্ঞের পুনরভিনয়!

শিবশঙ্করের এ প্রতিষ্ঠার মূল তার সাহস,—দুর্জ্জয়, নির্লজ্জ সাহস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও বাংলা রচনারীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তার একটু বাধে না, পিঠ চাপড়াইতে হাত একটু কাঁপে না। দেশের লোক এ অভিনব দৃশ্য দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া যায়,—দিকে দিকে ধন্য ধন্য রব

উঠে। সন্ত্রস্ত কবিগুরু তাঁর দাড়িতে হাত পড়ে নাই এই ভাগ্য মনে করিয়া পিটটা হাতের কাছে আরও একটু আগাইয়া দেন। শিবশঙ্কর মডার্ন্—আস্তেলা, আনকোরা মডার্ন্। সেকেলে ভাব, সেকেলে রীতি, সেকেলে সাহিত্য, সেকেলে মানুষের প্রতি তার তীব্র উপহাসের হাসি সদাই উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ফলে বয়স যাদের ভাটির দিকে, রক্ত যাদের ঠাণ্ডা হইতেছে উপহাসের ভয়ে একেলে হইবার দুশ্চর তপস্থায় তারা একেরারে গলদ্‌ঘর্ম্ম। শিবশঙ্কর বস্তুতান্ত্রিক, Freud ও Jungএর মাপ কাঠিতে সে মানুষের চিন্তা, ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার বিচার করে। শ্রদ্ধাহীন মানুষকে শ্রদ্ধা করিবার লোকের অভাব কি? শিবশঙ্কর original—তার প্রতিভার স্বকীয়তায় তার কলেজের Ph. D. (Lond), Docteur-es-Letters (Paris) অধ্যাপক মহাশয় পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পনের পাতা আর্টিকেল লিখিয়াছেন। তুমি বলিবে সুন্দরী তরুণী দেখিলে তোমার ভাল লাগে, শিবশঙ্কর বলিবে তার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। তুমি বলিবে কলিকাতার ট্রামের ঘর্‌ঘর্‌-শব্দে তোমার মাথা ধরে, শিবশঙ্কর বলিবে ট্রামের ঘর্‌ঘর্‌-সঙ্গীতের উগ্র মাদকতা বীঠোফেনের নাইনস্থ সিম্ফনির মত তার মনকে নিয়ত আকর্ষণ করে।

ধন্য সেই গুরু যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতার প্রতি, মানুষের সহজে প্রতারিত হইবার প্রবণতার প্রতি শিবশঙ্করের দুটি চক্ষু এমন করিয়া উন্মীলিত করিয়া

দিয়াছিলেন! আর ধন্য সেই শিষ্য প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত গুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া এত অল্প আয়াসে যে সিদ্ধি করতলগত করিয়াছে!

৬

বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি এ-হেন শিবশঙ্কর যখন কলেজের ছুটির অবকাশে স্বগ্রাম কৃষ্ণপুরে ফিরিয়া গেল কৃষ্ণপুরের ছেলেরা যে তাকে লইয়া মাতিয়া উঠিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এ কথা বলাই বাহুল্য যে শিবশঙ্করের যশোগাথা দেশের লোকের বহির্ব্বাটির সীমানা ছাড়াইয়া অন্দরেও প্রবেশ করিয়াছিল। এ প্রশ্ন মনে উঠিতে পারে যে পল্লীগ্রামের অন্দরে শিবশঙ্করের উগ্র প্রতিভার উপযুক্ত সমাজদারের আবির্ভাব কি করিয়া সম্ভব হইল? কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব শিবশঙ্করের দীন চরিত-আখ্যায়কের উপর ন্যস্ত নাই, কাজেই যাহা সত্য সত্য ঘটিয়াছিল মাত্র তাহাই আমরা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

বস্তুতান্ত্রিক শিবশঙ্কর প্রত্যেক জিনিষ ও প্রতিটি লোকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিত তার নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির দিক দিয়া। কাজেই তার মত যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যস্রষ্টার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য সমাগত নানা বয়সের কৌতূহলী মেয়ের ভীড়ের মধ্যে বোসপাড়ার সুনীতি যখন অন্য মেয়েদের দেখাইয়া তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে অগ্রসর হইল,

শিবশঙ্কর এই ভাবিয়া খুশী হইল যে অতঃপর পল্লীগ্রামেও তাকে একঘেয়ে দিন কাটাইতে হইবে না।

সুনীতি মেয়েটি ভালই,—নজরে পড়িবার মত রূপ তার আছে, বয়সও হইয়াছে। তাছাড়া তার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা সঙ্কোচলেশহীন। কেহ বলিবেন একটু প্রগল্‌ভা, কিন্তু শিবশঙ্কর বিশেষ এ য়সের মেয়েদের প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত যদি তারা দেখিতে ভাল হয়। সুনীতি খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র পড়ে, যাহা পড়ে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে। ফলে মতামতে সে যথেষ্ট স্বাধীনা, পল্লীগ্রামের পক্ষে। শিবশঙ্করের দুই চারিটা লেখা সে পড়িয়াছে, বোঝে নাই অনেক জায়গাতেই। কিন্তু সে লেখার ভিতরে আত্মপ্রকাশের যে নির্লজ্জ ভঙ্গী, স্ত্রীজাতির প্রতি বাহ্যিক রূঢ়তার ছদ্মবেশে যে ভোগলোলেপুতা, প্রচলিত রীতি. নীতি বিশ্বাসের প্রতি যে উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গহাস্য আছে, তার অপরিণত মনকে তাহা উত্তেজিত করিত। তার মনে হইত কিসের এক বৃহৎ সম্ভাবনা তার অন্তরে সুষুপ্ত থাকিয়া আত্মপ্রকাশের উপায়ের অভাবে তার সারা অন্তর পীড়িত করিতেছে। ঠিক সেই পুরাতন কাহিনী আর কি—

'কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে।'

শিবশঙ্করের মত বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকের মত এই যে এ প্রকার চিত্তাকর্ষক কেস্ হাতে পাইলে কদাচ ছাড়িবে না। সুতরাং সে সানন্দে সুনীতির পথ-নির্দ্দেশ কবিবার ভার হাতে তুলিয়া লইল! শিবশঙ্কর সুদর্শন তরুণ যুবক. বংশ-মর্য্যাদা, বিষয়-গৌরব ও সাহিত্যিক যশ তার সহায়। সুনীতির মত সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত, অপরিণত-বুদ্ধির মেয়ের মনকে প্রভাবিত করিতে তাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না। শিবশঙ্করের সাহায্যে নব নব তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিতেছে এই উল্লাসে তার হৃদয় যখন ভাবাবেশে ফুলিয়া উঠিত, শিবশঙ্কর তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে বন্দী করিয়া তাকে বুঝাইত যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে দুর্নিবার সাহস চাই। সাধারণ মানুষের সে সাহস থাকে না। যারা অসাধারণ, জীবনকে নানাভাবে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিবার জন্য যারা আসিয়াছে, পৃথিবীকে নবছন্দে গড়িয়া তুলিবার ভার যাদের উপর আছে কেবল তাদেরই সেই দুর্নিবার সাহস থাকে। সাহস চাই শুভ মুহূর্ত্তকে সার্থক করিবার জন্য দুঃসাহস চাই। শুনিতে শুনিতে সুনীতি উত্তেজিত হইয়া উঠিত, একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া শিবশঙ্করকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া দিবার আগ্রহে সে ব্যাকুল হইত।

শিক্ষাদানকার্য্য এইভাবে অগ্রসর হইতেছিল। শিবশঙ্কর সুযোগ বুঝিয়া সুনীতির অধীর উন্মুখ মন, তার স্বভাব ও

বয়সসুলভ ভাবপ্রবণতাকে নানা উপায়ে নিজের অভীষ্টসিদ্ধির পথে চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এ মৃগয়া-বৃত্তি নূতন নয়, কিন্তু নূতন এই ধরণের মৃগয়ায় এখনকার ব্যবহৃত অস্ত্র। লুকোচুরি নাই, খেলা নাই, কবিতা নাই, উচ্ছ্বাস নাই, হা হতোস্মি নাই। সম্ভবতঃ মদনভস্ম হইবার পরে পুনর্জ্জীবন লাভের চুক্তি-নামার সর্ত্তানুযায়ী রতিপতিকে ফুলধনুর মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যাধবৃত্তির মধ্যে দয়া মায়ার স্থান পর্য্যন্ত নাই। তরুণ মনের অনভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নিপুণ বাক্যচ্ছটায় বিশ্বাস ও চরিত্রের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরাইয়া তার সর্ব্বনাশ সাধন করা—বিংশ-শতাব্দীর নূতন ব্যাধবৃত্তির লক্ষণ ইহাই।

কিন্তু শিবশঙ্কর হিসাবে একটু ভুল করিয়াছিল। ফলে যে অভিজ্ঞতা তার লাভ হইল যে-কোনও বস্তুতান্ত্রিকের পক্ষে তাহা চমকপ্রদ। সেই কথাই বলিতেছি।

সুনীতি বাতিকগ্রস্ত ভাবপ্রবণ মেয়ে, কিন্তু পল্লীগ্রামের সমাজে ও সংসারে সে বড় হইয়াছে। সে-সংসারে ও সমাজে সহরের ব্যস্ততার যেমন অভাব, সহুরে সভ্যতার পালিসের তেমনি অভাব। মন্থরগতি সুলভ-অবসর জীবনে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ শুধু প্রচুর নয়, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবার অবকাশও যথেষ্ট। সুনীতিকে নবজীবনের দীক্ষাদানের উৎসাহে শিবশঙ্কর কথা বলিতে বলিতে প্রায়ই তার গায়ে হাত দিত। অবশ্য সুনীতি ইহাতে তেমন আপত্তি

করে নাই। ক্রমে ইহার বাড়াবাড়ি হইতে এদিকে তার দৃষ্টি পড়িল। তার মত বয়সের মেয়ের গায়ে হাত দিবার কিছু বিশিষ্ট অর্থ আছে এ জ্ঞান সুনীতি সবে মাত্র লাভ করিয়াছে। এইদিক দিয়া তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাববিহ্বলতা কাটিয়া গেল,—তীব্র কৌতূহল লইয়া শিবশঙ্কর কি করে তাহা দেখিবার জন্য সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া গোপনে বকুল-ফুল সুরমার কাছে মনের সন্দেহ ব্যক্ত করিয়া বলিল,

—শিবেটার কিছু মতলব আছে ভাই, নইলে আমাকে এত ভজাচ্ছে কেন ?

শিবশঙ্কর এ সকল তথ্য অবগত ছিল না। বয়সে সে তরুণ, যে-খেলায় মাতিয়াছিল সে-খেলায় সে নিজেই পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

একদিন দুপুর বেলা। ঘরের পাশে একটা বাতাবী লেবুর গাছ সেখান হইতে বাতাবী ফুলের মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। নিকটে বাঁশবনে লুকাইয়া থাকিয়া একটা ঘুঘু উদাস স্বরে ডাকিতেছিল ঘু-উ-উ। উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা দিতে দিতে শিবশঙ্কর সুনীতির একখানি হাত ধরিয়া নিজের দিকে টানিল। সুনীতি রাগিল না, চীৎকারও করিল না। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

শিবশঙ্কর তখন পাগল। বস্তুতান্ত্রিকের ধীরবুদ্ধি, ব্যঙ্গ হাসি সব লোপ পাইয়াছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে ছুটিল। বোসপাড়া যাইতে শিবশঙ্করদের প্রকাণ্ড আম-বাগান, গাছে অজস্র আম-বউল, গন্ধে বাতাস ভার হইয়া আছে। সে দেখিল আম-বাগানের পাশ দিয়া সুনীতি চলিতেছে। ছুটিয়া গিয়া তার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া শিবশঙ্কর ডাকিল—সুনীতি! সুনীদি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, বোধহয় সে যুযুৎসু জানিত, বোধহয় সে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখিয়াছিল। ঠিক জানি না। তবে এটা ঠিক যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে দুই হাত দিয়া শিবশঙ্করকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। বিস্মিত শিবশঙ্কর পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। সামলাইরা লইয়া সে দেখিল, "ওগো কে আছ, রক্ষা কর" কিংবা 'ও মা, ও বাবা শীঘ্র এস" ইত্যাদি বলিয়া সুনীতি চীৎকার করিল না। শুশ্রূষায় চরিতার্থ হইবার আশায় ছাই ঢালিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল না। দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে গিয়া সে ঠোক্কর খাইল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কেবল একটু হাঁফাইতে লাগিল। তবে—? শিবশঙ্কর তখন কাতর স্বরে আবার ডাকিল,

—সুনীতি! কি নিষ্ঠুর তুমি!

সুনীতির অত্যন্ত হাসি পাইল। হাসি চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে। অঞ্চলের গিট্ খুলিয়া শিবশঙ্করের

সম্মুখে এক টুক্‌রা কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে বাড়ীর দিকে দৌড়াইল।

হতবুদ্ধি শিবশঙ্করের অন্তরাকাশে এই সঙ্কটকালে আবার বিদ্যুত চমকিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,

—গ্রেটা গার্ব্বো!

তারপর কৌতূহলী হইয়া কাগজখানা তুলিয়া দেখিল বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"শিবুদা, জ্যেঠামশায়ের কাছে আগে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠাও।"

তরুণ সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ-ব্যাদান করিয়া আমবাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

উনবিংশ শতাব্দীর শুভ সপ্তম দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কয়জন কবি ও মনীষী বাংলার নামকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-দীপের জ্যোতি আজও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; বাঙালীর পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দর্শনের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠায় বাঙালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একাধারে কর্ম্মী ও মনীষী। বিজ্ঞান-সেবা, জন-সেবা ও দেশ-হিতৈষণার সুদুর্লভ সমন্বয়ে তাঁহার জীবন অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। আত্মজীবনের আবেগ এবং উৎসাহ তিনি দেশজীবনের সঞ্চারিত করিয়াছেন। গত বৎসর কবিকে অর্চ্চিত করিতে পারিয়া বাঙালী ধন্য হইয়াছে। আজ কর্ম্মী ও বৈজ্ঞানিক দেশনেতার সম্বর্দ্ধনার অনুষ্ঠান করিতে করিতে পারিয়া সে কৃতার্থ হইল।

* * *

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেই আচার্য্য ক্ষান্ত হন নাই, তিনি মানুষ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিষ্যদের মধ্যে নিজেকে এমন নিঃশেষে দান করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। আজ তাই প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে পারিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে শিষ্যগণের প্রতিভাবিকাশ দ্বারা তাঁহার যশ পরিম্লান হইতে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরিতেছে না।

* * *

রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্ল্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বল্‌লেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভব হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি

এ দৈবশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

প্রথম বয়সে তাঁর প্রতিভা বিদ্যাবিতানে মুকুলিত হয়েছিল; আজ তাঁর সেই প্রতিভার প্রফুল্লতা নানা দল বিকাশ করে দেশের হৃদয়ের মধ্যে উদ্ঘারিত হোলো। সেই লোককান্ত প্রতিভা আজ অর্ঘ্যরূপে ভারতের বেদীমূলে নিবেদিত। ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেচেন, সে তাঁর কণ্ঠমালায় ভূষণরূপে নিত্য হ'য়ে রইল। ভারতের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে আজ আমাদের সাধুবাদ মিলিত হয়ে তাঁর মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষণ করুক।

* * * *

কল্পনার বিপুলতায় অথবা আবেগের তীব্রতায় ভবভূতি কোন-কোন স্থানে কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্রের সুষমায় ভবভূতি কোন দিন কালিদাসের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

> বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
> প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষ-বিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি।

এমন একটি আবেগস্পন্দিত শ্লোক সারা মেঘদূতখানা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। কিন্তু মেঘদূতের সমগ্রতার ভিতর দিয়া বিরহীজনের উৎকণ্ঠার যে অনুপম অনুভূতি প্রকাশ পাইতেছে সুষমা এবং সৌকুমার্য্যে তাহা চিরমধুর।

* * *

কল্পনা সুন্দর ও অসুন্দরের ভেদ করে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—কাব্যের সম্পর্কে আসিয়া কল্পনা সৌন্দর্য্যচর্চ্চারই বিশেষ অবসর পাইয়াছে। কেননা কাব্য একদিকে যেমন সৃষ্টি আর একদিকে তেমনি আর্ট, এবং মানবমনের সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে চরিতার্থ করাই সমস্ত আর্টের উদ্দেশ্য। এই-হেতু কল্পনার দিব্যদৃষ্টি কাব্য-সম্পর্কে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিয়াই ফিরে। কিন্তু সত্য এবং সত্যকেই সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিয়া দেখা এবং দেখানো কল্পনার চিরদিবসের কাজ। কাব্যের দিক দিয়া কল্পনা শুধু সৌন্দর্য্যের ভিতর সত্যের সন্ধান করে এই মাত্র। তাই বলিয়া সত্য যাহা তাহাই সুন্দর এবং সুন্দর যাহা তাহাই সত্য, একথা বলিলে হয়ত ভুল করা হইবে। সত্য স্বয়ম্ভূ স্বাধীনভাবে বর্ত্তমান, স্বপ্রকাশ; সে জ্ঞাত, কর্ত্তা বা বিষয়ীর অপেক্ষা রাখে না। নিতান্ত আধ্যাত্মিকভাবে না ধরিলে সৌন্দর্য্য কিন্তু দ্রষ্টা বা বিষয়ীর মনের উপর নির্ভর করে।

* * *

আগামী পঞ্চবিংশ সংখ্যাখানি হইবে— বিশেষ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির গল্প থাকিবে। ষড়্‌বিংশ সংখ্যা হইতে 'ছোট গল্প' আকারে বাড়িবে। প্রতি সংখ্যায় কুশলী আর্টিষ্টের আঁকা কোন-না-কোন বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি (স্কেচ্) থাকিবে, এবং অল্প-পরিসরে তাঁহার জীবনকথাও ব্যক্ত হইবে। 'প্রসঙ্গ' নামক আর একটি বিভাগে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞগণের লেখা ছোট ছোট প্রসঙ্গ থাকিবে। কাগজ সাধারণতঃ তিন ফর্ম্মা হইবে। মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

দিনপঞ্জী

৭ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লী

পরিষদে অর্ডিন্যান্স বিলের মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। ইহার পক্ষে ৪ টি এবং বিপক্ষে ৩১টি ভোট হওয়ায় তাহা যথারীতি পাশ হইয়া গিয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ

রাজ-মহেন্দ্রী জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসামীগণ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন, অদ্য অনশনের পঞ্চত্রিংশ দিবস।

লণ্ডন--জানা গিয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকাকে স্বর্ণদ্বারা সমর-ঋণের কিস্তি পরিশোধ করিবেন, এজন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

১০ই ডিসেম্বর—লণ্ডন

—চীনের লণ্ডনস্থিত দূতাবাস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে জাপানীরা কুসান জেলার সমগ্র চীনা কৃষি সম্প্রদায়কে হত্যা করিয়াছে। এই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের ফলে তত্রত্য ২৭০০ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে।

১ম বর্ষ] ৯ই পৌষ ১৩৩৯ [২৮শ সংখ্যা

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীজলধর সেন

কোন্ স্থান থেকে কথাটা আরম্ভ করব, তাই এতক্ষণ ভাবলাম। পিতৃ-পরিচয়ই আগে দিই, নইলে যা বলব মনে করেছি, তা পরিস্ফুট হবে না।

আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামজয় ঘোষ মহাশয়। 'শ্রীযুক্ত' দেখেই বুঝতে পেরেছেন তিনি এখন সশরীরে বর্ত্তমান আছেন; এবং তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হলেও শরীর এমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ যে, আরও পনর কুড়ি বৎসর তিনি বাঁচবেন বলে আশা করা যায়। পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম বলা নিতান্তই অনাবশ্যক, শ্রাদ্ধ-শান্তি ব্যতীত ও-সব নামের মাহাত্ম্য আর নেই। আমার মা বেঁচে আছেন। আমি মা-বাপের

একমাত্র সন্তান। আমার নাম বিশ্বেশ্বর ঘোষ। নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বলা বা লেখা এখন শিক্ষিত সমাজ থেকে উঠে গেছে। আমিও যখন শিক্ষিত দলেরই একজন, তখন 'শ্রী' ত্যাগ করে বিশ্রী হবার অধিকারও আমার হয়েছে। সত্যিসত্যি শিক্ষালাভ করেছি কি না, তা ভগবান জানেন; কিন্তু যখন এম-এ উপাধি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই লাভ করেছি, এবং সেই উপাধির জোরেই ইংরেজী ভাল না জেনেও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকগিরি করতে বাধছে না, তখন শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করবার আমার দাবী আছে।

আমার পিতা কাঞ্চননগরের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় জমিদারদিগের ম্যানেজার। সামান্য গোমস্তাগিরিতে প্রথম প্রবেশ ক'রে পনর বৎসর পরেই তিনি ম্যানেজার হন এবং এই পনর বৎসর সেই চাকরীই করছেন। এর থেকেই সকলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, এই ত্রিশ বৎসর চাকরী করে তিনি নগদ টাকায় ও বিষয়-সম্পত্তিতে দেশের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হয়েছেন। মাসে আড়াই-শ টাকা বেতন পান। জমিদারের চাকরী বিনা বেতনে ক'রেও সেকালে নাকি অনেকে যথেষ্ট সঞ্চয় করেছিলেন। এখন তত না হলেও বিশেয-কিছু প্রাপ্তি যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, আমার পিতৃদেবের একটা সুনাম আছে যে, তাঁর মিতব্যয়িতা সীমা লঙ্ঘন করেছে; তিনি যা নইলে নয়, তারও কম ব্যয় করেন। লোকে তাঁকে অতি কৃপণ বলে থাকে,

তিনি কিন্তু সে কথা গায়েই মাখেন না, সুধু বলেন, যে-বেটারা অমন কথা বলে তারা কি অসময়ে আমাকে সাহায্য করতে আসবে। তাঁর যে অসময় আসবে না, তাঁর ব্যাঙ্কের খাতা যে উত্তরোত্তর পরিপুষ্টই হবে, এ-কথা আমি বলতে পারি। নতুবা, বিলক্ষণ দু-পয়সা সঙ্গতি থাকতেও তিনি কি এই বছর দুইয়ের আগে আমার বিবাহে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে নগদ তিনটি হাজার টাকা গ্রহণ করতেন এবং ফাউ স্বরূপ আমার স্ত্রীর জন্য দু-হাজার টাকার অলঙ্কার এবং বরসজ্জা হিসাবে আরও হাজারখানি মুদ্রা নিতেন। অথচ, আমিই তাঁর একমাত্র পুত্র তাঁর আত্মপ্রবঞ্চিত সম্পত্তির আমিই একমাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আমিও এখন উপার্জ্জন ক'রি; মাসে দুই-শত টাকা লাহোর কলেজ থেকে বেতন পাই এবং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ছেলেকে পড়িয়েও মাসে এক-শত টাকা পাই। এই টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েই পিতার সঙ্গে আমার বিরোধ! শাস্ত্রে বলে, 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ'। আমাকে নিতান্তই বাধ্য হয়ে সর্ব্বদেবতার বিরাগভাজন হতে হয়েছে, 'পিতরি প্রীতিমাপন্নে' ত হয়ই নাই।

এইবার ব্যাপারটা খুলে বলতে হচ্চে। এই বছর দুয়েক আগে আমি যখন এম-এ পাশ করলাম, তখন বাবার জিদে পড়ে আমাকে বিবাহ করতে হয়েছিল। বি-এ পাশ করবার সময় থেকেই কন্যাদায়গ্রস্ত বেচারারা বাবার কাছে আনাগোনা

করতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু বাবা কাউকে তখন আমল দেন নাই; ছেলের শিক্ষা সমাপ্ত না হলে তিনি বিবাহ দেবেন না, এই কথা বলেই সকলকে বিদায় দিয়েছেন। আসল কথা কিন্তু তা নয়, ছেলে হয়েও আমি এ-কথা গোপন করতে পারছি নে। তিনি জানতেন, আমার পাশ যত বাড়বে, বিয়ের বাজারে আমার দরও তত বেশী হবে। তাই এম-এ পাশ করবার পর আমার মামা যখন বললেন, বি-এল পড়ে কাজ নেই, তখন বাবা অগত্যা বিয়ের বাজারে নামলেন, কারণ আমার দর বৃদ্ধির আর সম্ভাবনা ছিল না।

তখন তিনি আমাকে নিলামে তুললেন। দশ হাজার, আট হাজার দর দিলেন। অত দরে কোন খরিদ্দার রাজি হোলো না। বাবার মন কি জানি কেন একটু নরম হোলো; তিনি আমার শ্বশুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্রের ছয় হাজার বুঝ দেবার ডাকেই সম্মত হলেন। তিনি আমার শ্বশুরকে বললেন, দেখুন আশুবাবু, আমার এ ছেলে আট দশ হাজারের কমে ছাড়তাম না। অপনি ভদ্রলোক, বড়ই বিপন্ন হয়েছেন, তাই সর্ব্বশুদ্ধ ছ-হাজারেই স্বীকার করলাম। জানেন ত, আজকাল ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে কত ব্যয় হয়।

এইখানেই বলে রাখি, বাবার এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়; কাঞ্চননগর স্কুলে ম্যাট্রিক পড়া পর্য্যন্ত স্কুলের মাইনে, বই প্রভৃতির খরচ তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। তারপর কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সময় থেকে এম-এ পাশ

করা পর্য্যন্ত আমার পড়াশুনার জন্য বাবাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হয় নাই। আমার মামার বাড়ী কলকাতায়। তিনি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে বড় চাকরী করেন। তাঁর ছেলে নেই; দুটি মাত্র মেয়ে। আমি যখন কলকাতায় পড়বার জন্য মামার বাড়ীতে গেলাম, তার বছর তিনেক পূর্ব্বেই তাঁর বড় মেয়ের বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। আমি যে বৎসর কলকাতায় গেলাম. তখন মামার ছোট মেয়ে বেথুনে থার্ডক্লাসে পড়ছিল।

কলকাতায় পড়তে যাবার সময় বাবা বললেন, কলকাতায় তুই ত তোর মামার ওখানেই থাকবি, খরচপত্র লাগবে না; কলেজের মাইনে, তা আমি যেমন ক'রে পারি, মাসে দশটি টাকা দেব। ছ টাকা মাইনে লাগবে ত; আর চার টাকা তোর হাতখরচ। দেখিস্ কিন্তু, বেশী খরচ করিস্‌নে।

কলকাতায় গিয়ে মামাকে সেই কথা বলতে তিনি রেগে বললেন, তোর সেই ফলনা ঘোষ বাবাকে লিখে দিস্. তোর পড়ার জন্য একটি পয়সাও তাকে দিতে হবে না। তোর সব খরচ আমি দেব; তোর বাবাকে কিছু দিতে হবে না। আর দিতে চাইলেই কি আমি নিতাম। আমার ছেলে নেই। তুই আমার ছেলের অভাব পূরণ করবি।

সত্য সত্যই আমার মামা শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মল্লিক তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন, কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার দিন থেকে এ

পর্য্যন্ত বাবার কাছ থেকে আমাকে একটি পয়সাও নিতে হয় নি ; প্রেসিডেন্সি কলেজের মাইনে, কাপড় চোপড়, হাত খরচ সমস্ত মামাই দিয়েছেন ; এমন-কি ছুটীতে যখন বাড়ী যেতাম, তখনও মামা আমার পাথেয় দিতেন ; যাতে বাবার কাছে কোন কারণে হাত পাত্‌তে না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতেন। সুতরাং বলেছি যে, বাবার কথাটা ঠিক নয়, আমার পড়াশুনার জন্য তাঁকে এক কপর্দ্দকও খরচ করতে হয় নি। আর সেইজন্যই, মামা যখন বললেন, বিশু, বি-এল্ পড়ে কি করবি। আলিপুরে হাজার খানেকের উপর উকিল বটতলা সার করেছে। তোর আইন প'ড়ে কাজ নেই ; তখন বাবা অন্যমত করতে পারেন নাই।

সুতরাং, সত্য হোক, আর মিথ্যে হোক, এম-এ পর্য্যন্ত পড়াবার খরচ বাবদ বাবা নগদ তিন হাজার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন ; আর ফাউ স্বরূপ আবার স্ত্রীর জন্য দু-হাজার টাকার অলঙ্কার ও আমার সজ্জার জন্য হাজার টাকা আদায় করলেন। তিনি দশজনের কাছে অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বল্‌লেন, এম-এ পাশ ছেলে, ছ হাজার টাকা—ড্যাম চিপ—একেবারে মাটীর দর।

আমিও 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ' মনে ক'রে নিতান্ত অপদার্থের মত নত মস্তকে এই ডাকাতির অভিনয় দেখলাম ; একটি কথা, একটু আপত্তিও তখন করলাম না।

যথাসময়ে বিবাহ হয়ে গেল। মামার বাড়ী থেকেই বিবাহ হোলো। মামা কিন্তু এ বিবাহ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন; বরযাত্রী পর্য্যন্ত গেলেন না. বাবা অনুরোধ করতে গেলে বল্লেন, এমন কশাইয়ের ছেলের বিয়েতে দেবপ্রসাদ মল্লিক যায় না। বাবা একটু হেসে, মুরুব্বীয়ানা চালে বললেন, কেরাণীগিরি কর, মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে পাও, কত ধানে কত চা'ল হয় সে খবর ত রাখ না ভায়া।

আমার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল; বেশী ব্যয় হবার ভয়ে বাবা অনেক বরযাত্রী নিয়ে যান নাই; নিতান্ত যাদের না বললে নয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাদেরই বলেছিলেন। শুনেছিলাম, সম্প্রদানের পূর্ব্বেই তিনি তিন হাজার টাকা নিয়েছিলেন। আরও শুনেছিলাম. গয়নাগুলিও তিনি সেকরা ডাকিয়ে যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মেয়ের বাপেরা এত অপমান যে কেমন করে সহ্য করেন, এ আমি ভেবেই পাইনে।

থাক্ সে কথা। আমি এম-এ পাশ করবার পর থেকেই আমার মামা আমার একটা চাকরীর জন্য নানাস্থানে চেষ্টা করছিলেন। তিনি কেরাণী হ'লেও ছোট-খাটো ব্যক্তি ছিলেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; সরকারী চাকরীতেও এখন সাতশত টাকা বেতন পান। অনেক লোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বান্ধবতা আছে। তাঁর সতীর্থেরা নানা স্থানে

সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং আমার একটি চাকরী সংগ্রহের জন্য তাঁর ক্ষেত্র বিস্তৃতই ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে আমাকে তিনি কলকাতেই একটা চাকরী জুটিয়ে দেন ; সেই চেষ্টাই তিনি করছিলেন।

আমরা বিবাহের পরদিনই বাড়ী চ'লে গিয়েছিলাম। আট দিনের মধ্যেই বর-কনেকে ফিরে আস্‌তে হয়, এ প্রথা বাবা রক্ষা করেন নাই ; কাজেই আমাকে কয়েক দিন বাড়ীতেই থাকৃতে হয়েছিল।

এই সময় মামার এক পত্র পেলাম তিনি লিখেছেন, আমার জন্য তিনি লাহোর কলেজে একটি অধ্যাপকের কাজ জুটিয়েছেন। বেতন আপাততঃ দুই শত টাকা ; ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও লিখেছেন যে, কলকাতায় কোন একটা কাজ ঠিক করবার চেষ্টা তিনি ত্যাগ করেন নাই। তবে আপাততঃ যেটা পাওয়া গেল, তা ছাড়া উচিত নয়। তাই তিনি লাহোরের কাজে সম্মতি জানিয়েছেন এবং পনর দিনের মধ্যেই আমাকে লাহোর পাঠাবেন বলে স্বীকার করেছেন। অতএব আমি যেন শীঘ্রই কলকাতায় যাই।

আমার এই চাকরীর সংবাদ পেয়ে বাবা খুব আনন্দিত হলেন। লাহোর অনেক দূরের পথ বলে মা আপত্তি করায় বাবা তাঁকে বোঝালেন, আরে গিন্নি, এখন কি আর দূর কিছু

আছে। কলকাতা থেকে এই কাঞ্চননগরে আসতে যে সময় লাগে, লাহোরে যেতেও ততটা সময়ই লাগে।

তার পর আমাকে বললেন, তোমার এ বেশ ভাল কাজ হয়েছে। কেরাণী গিরির চাইতে প্রোফেসারী অনেক অধিক সম্মানের কাজ। আর মাইনেও কম নয়, প্রথমেই দুই শত টাকা। ভ'বষ্যতে উন্নতিরও আশা আছে। কাল ভাল দিন আছে ; আর বিলম্ব না করে কালই চলে যাও। বৌমাকে কালই নিয়ে যাও। তাঁকে এখন কিছুদিনের জন্য তাঁর বাপের বাড়ীতেই থাকতে হবে ; তার পর যে ব্যবস্থা করা হয় করব। আরও একটা কথা এখনই বলে দিই। মাসে দু-শো টাকা মাইনে পাবে। লাহোরে গিয়ে আলাদা বাসা করে অকারণ খরচ বাড়িও না। একটা মেস কি কলেজের বোর্ডিংয়ে থেকো। তাতে আর এমন বেশী খরচ কি হবে -- বড় বেশী হয়ত মাসে ত্রিশ টাকা। ও সব দেশের খবর ত আমার অজানা কিছু নেই ; আমি বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত গিয়েই পশ্চিম দেশের হালচাল সব জেনে এসেছি। তা তুমি এক কাজ কোরো, মাসে পঞ্চাশ টাকাই রেখো। যদিও অত খরচ হবে না, তা হলেও বিদেশ জায়গায় কিছু হাতে থাকা ভাল। তা বলে একেবারে পঞ্চাশ টাকা খরচ কোরো না ; ওর থেকে যা বাঁচবে, তা পোষ্ট আফিসে রেখে দিও। বাকী দেড়-শ টাকা মাইনে পাওয়া মাত্রই আমাকে পাঠিয়ে দিও। মণিঅর্ডার কোরো না, তাতে খরচ বেশী পড়বে, ইনসিওর

রেজেষ্ট্রী ডাকে পাঠিও। তুমি ত কিছু জান না, তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হচ্চে। একটা কথা মনে রেখো, এখন তোমাদের সঞ্চয়ের সময়। এখন যদি না গুছিয়ে নেও, পরে কষ্ট পেতে হবে। আমার আর কি বল? যা রাখতে পারবে সবই তোমার থাকবে। এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রেখো।

বাবার এ উপদেশ সম্বন্ধে আমি আর কি বলব, তাঁর কথাগুলো অবনত মস্তকে, সুশীল ও সুবোধ বালকের মত শুনে গেলাম, কোন জবাবই দিলাম না।

এমন একটা মামা ছিল বলে এই বাজারে দু-শো-টাকার চাকরী পাওয়া গেল; নইলে আমার মত ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এর ভাগ্যে বেগমগঞ্জ কি দক্ষিণ সাবাজপুর স্কুলে ষাট সত্তর টাকা মাইনের হেড মাষ্টারীও জুটতো কি না সন্দেহ।

পরদিনই কলকাতায় পৌঁছে আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী দরজিপাড়ায় রেখে মামার বাড়ীতে গেলাম; আমার শ্বশুর মহাশয় সেদিন তাঁর ওখানেই থাকবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু কলতাতায় এসে প্রথমেই মামার বাড়ীতে না যাওয়া ঠিক হবে না বলে এবং পরদিন বিকেলে তাঁর বাড়ীতে যাব বলে প্রতিশ্রুত হয়ে সেদিনের মত অব্যাহতি পেয়েছিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই আশুবাবুর বাড়ীতে গেলাম। তিনি সেদিন একটু সকাল-সকালই আফিস থেকে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন—বাড়ীতে পুরুষ মানুষ ত আর নেই।

সেই বিবাহের রাত্রে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম; তার পরদিনও কয়েক ঘণ্টা ছিলাম। তখন বিবাহ বাড়ীর কোলাহলে আশুবাবুর প্রকৃত অবস্থাও জানতে পারবার সম্ভাবনা ছিল না, তাঁর বাড়ীখানি যে কেমন তাও ভাল করে দেখবার অবকাশ হয় নি। এ দিনে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, বাড়ীখানি খুব বড় নয়; ছোট বললেই হয়। উপরে আড়াইখানি ঘর, নীচে রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর নিয়ে চারখানি ঘর। বাড়ীটা নূতন নয়. আবার একেবারে পুরাতনও নয়; দেখে মনে হোলো. বাড়ীখানির উপর দিয়ে পনর-ষোলটা শীত গ্রীষ্ম গিয়েছে। সদর রাস্তার উপরে বাড়ী; ভিতরে একটু উঠানও আছে।

আশুবাবু আমাকে নিয়ে উপরের ঘরে গেলেন; সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, নীচে একঠা বৈঠকখানার মত আছে; তা প্রায়ই খোলা হয় না। আফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে এসে আর বৈঠকখানায় বসতে ইচ্ছা হয় না। ওটা প্রায় বন্ধই থাকে। তাই তোমাকে উপরেই নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ীতে ত বেশী লোক নেই, চাকর বামুন রাখবারও অবস্থা নয়। থাকবার মধ্যে আছেন আমার স্ত্রী, আর একমাত্র মেয়ে সুষমা।

উপরের একটি ঘরে নিয়ে বসিয়ে তিনি বললেন, বাবা তুমি একটু বিশ্রাম কর, জলটল খাও। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব। এই বলে

তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই আমার শাশুড়ী জলখাবার নিয়ে এসে বললেন, তুমি আমার ছেলে বাবা, তোমাকে লজ্জা করা ত চলে না। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে. তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প করে। উনি এখনই আসবেন। তুমি গরীবের সামান্য আয়োজন এই খাবারটুকু খাও। আমি নীচে গিয়ে সুষমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ সুষমাই তোমার কাছে বসে থাকবে।

কিন্তু সুষমাকে আর আসতে হেলো না, আশুবাবুই ফিরে এলেন। আমার তখন জলযোগ শেষ হয়েছে। তিনি একখানি চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন।

এরই মধ্যে একটু অবকাশ পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ বাড়ীখানি আপনার নিজের ?

আশুবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, বাড়ীখানি এতদিন আমারই ছিল, মাসখানেক হোলো আর আমার নেই।

আমি বললাম, তার মানে ?

তিনি বললেন, সে কথা আর নাই শুনলে বাবা! তোমার মত ছেলে যে আমি পেয়েছি, এই আমার সৌভাগ্য, এই আমার সুষমার সৌভাগ্য!

তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই; তাঁর এই কথাগুলিও যে কেমন বিষাদপূর্ণ, তাও বুঝিতে আমার

বিলম্ব হোলো না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বাড়ীখানি বেচে ফেলেছেন ?

আশুবাবু বললেন, ঠিক বেচি নাই, তবে বেচবারই সামিল, বাড়ীখানি আমি মর্টগেজ দিয়েছি।

তাঁর কথা শুনে আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়লাম, বললাম, আপনার যদি কোন আপত্তি না-থাকে, তা-হ'লে সব কথা আমাকে খুলে বলুন না, আমি যে এখন আপনার ছেলে।

আমার কথা শুনে তিনি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, বাবা বিশ্বেশ্বর, আমার আর কোন কষ্ট নেই। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ শীতল হয়ে গেল বাবা !

আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম, এ ত আমার কথার উত্তর হোলো না। তিনি বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও আমার সুষমাকে সুপাত্রে দেব ; আমার সে প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে, এই আমার সান্ত্বনা। আমার অবস্থার কথা শুনতে চাচ্ছ বাবা ! আমি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরী করি। আঠাশ বছর আগে চল্লিশ টাকা মাইনে প্রবেশ করেছিলাম। এই আঠাশ বছরে এক-শ টাকা মাইনে হয়েছিল। এই সেদিন, মাস পাঁচেক আগে সাহেবদের দয়ায় আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে। এখন আমি দেড়-শো টাকা মাইনে পাই। এতকাল এক-শো টাকাতেই সংসার চালিয়েছি। অবশ্য আমার সংসার বড় নয়,

তা-তুমি দেখতেই পাচ্ছ। আমার শাশুড়ী প্রায় কুড়ি বছর আমার কাছেই ছিলেন ; গেল বছর তাঁর গঙ্গালাভ হয়েছে। এই এক-শো টাকা থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য আর কতই বা জমিয়েছিলাম। খুব টানাটানি করে খরচ করেও দু-হাজার টাকার বেশী আমি জমাতে পারিনি। কিন্তু বলেছি ত, সুষমার বিয়ে আমি ভাল ছেলের সঙ্গে দেব, তার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয় হবে। আমি তাই করেছি। এই বিয়েতে তোমাদের ছ-হাজার টাকার বুঝ দিয়েছি ; আমারও বাড়ীর খরচ হাজার টাকা লেগেছে। এই সাত হাজার টাকা কেমন করে সংগ্রহ করেছি শুন্‌বে। ব্যাঙ্কে ত দু-হাজার ছিলই ; একটি বন্ধু দয়া করে এক হাজার টাকা বিনা সুদে আমাকে ধার দিয়েছেন ; এক বছরের মধ্যে তাঁর টাকা শোধ করে দিতে হবে। আর চার হাজার টাকা এই বাড়ীখানি মর্টগেজ দিয়ে একজনের কাছ থেকে নিয়েছি ; তাকে শতকরা বার্ষিক বারো টাকা সুদ দিতে হবে। সেই জন্যই একটু আগে তোমাকে বলছিলাম, বাড়ীটা এক রকম বেচেই ফেলেছি। অত টাকা আর শোধ দিতে পারব না, বাড়ীও খালাস হবে না। কিন্তু, তাই ব'লে আমি একেবারে বিপন্ন হইনি বাবা! যিনি হাজার টাকা দিয়েছেন, তাঁকে মাসে মাসে এক-শো টাকা দেব স্থির করেছি ; যে ক'রেই হোক বছরের মধ্যে তার টাকা শোধ করতে পারব। বাড়ীখানি যার কাছে মর্টগেজ রেখেছি, সে দু-তিন বছর কথাও বল্‌বে

না ; বাড়ীখানি বেচলে যে দশবারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে, এ কথা সে জানে। সে চুপ করেই থাকবে। তুটি বছর কোন রকমে আমাকে এখানে কাটাতেই হবে, কারণ তু-বছর পরেই আমার রিটায়ার করবার সময় হবে। তখন বাড়ীখানি বেচে ফেলব ; মর্টগেজওয়ালার টাকা শোধ দিয়েও তু-চার হাজার টাকা হাতে আসবে ; প্রভিডেণ্ট ফণ্ড থেকেও কিছু পাব, পেন্সনও কিছু পাব। নগদ যা-পাব, তা-তোমার শাশুড়ীর নামে ব্যাঙ্কে জমা দেব, আর আমার পেন্সনের টাকায় তুজন মানুষের কাশীবাস চ'লে যাবে। সুতরাং তুমি দেখত পাচ্ছ, আমি মোটেই বিপন্ন হইনি। অবশ্য এই বছর-খানেক পঞ্চাশ টাকাতেই সব চালাতে হবে। তার পর আর কি? চল্লিশ টাকা মাইনেতেও ত এক সময় চলেছিল, এখন কি আর পঞ্চাশ টাকায় চলবে না। খুব চলবে, মনের আনন্দে চলবে বাবা! কোন কষ্ট হবে না। আমার সুষমা যে সুখে থাকবে, এই ভেবেই আমরা আনন্দে দিন কাটাব।

আশুবাবুর এই শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুশোচনায় আমাকে অভিভূত করে ফেলল। এর জন্য অপরাধী কে? বাবার স্কন্ধে অপরাধের ভার চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করতে আমার মত কাপুরুষেরও মন চাইল না। আমি যদি তখন এই নির্দ্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদ করতাম, যদি বলতাম, টাকা আপনারা

নিতে পারবেন না, টাকা নিলে আমি বিবাহ করব না, তা-হ'লে কি এই গরীব ভদ্রলোক এমন করে সর্ব্বস্বান্ত হতেন। কিন্তু, এখন যা উপায় আছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যা করা দরকার, আমি তা করব বলে তখনই প্রতিজ্ঞা করলাম। বাবার বিরাগভাজন হবার ভয়ে আমি সঙ্কুচিত হব না; আর আমার বিশ্বাস আছে মামা আমার সহায় হবেন।

কিন্তু, আমি তখনই আশুবাবুকে কোন কথা বললাম না, বলা কর্ত্তব্য ব'লে আমার মনে হোলো না; আমি নতমুখে নীরবে ব'সে রইলাম।

তিনি বললেন, বাবা, আমার কথা শুনে মনে কষ্ট কোরো না। আমি আপন ইচ্ছায় এ কাজ করেছি; আমার আত্মার তৃপ্তির জন্য এ কাজ আমি করেছি। তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার প্রার্থনা।

এ কথার আর কি উত্তর দেব। রাত্রিতে সুষমার কাছেও আমার সঙ্কল্প প্রকাশ করলাম না। নানা কথায় তার কাছ থেকে দুটি সংবাদ জেনে নিলাম। সে আমার উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পারল না। যাঁর কাছ থেকে আশুবাবু এক হাজার টাকা বিনা সুদে ধার নিয়েছেন, আর যাঁর কাছে বাড়ী মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে, এই দুটি নাম সে আমাকে বলল। তাদের প্রতিবাসী দুই ঘর বড়মানুষ আছেন। তাঁরা দুই ভাই; দুইজনই পৃথক অন্নে বাস করেন, কারবারও

পৃথক। বড় জনের নাম প্রহ্লাদ বসাক; তিনিই চার হাজার টাকায় বাড়ী মর্টগেজ রেখেছেন; আর ছোট ভাইয়ের নাম নৃসিংহ বসাক; তিনিই আশুবাবুকে বিনা সুদে হাজার টাকা ধার দিয়েছেন। বড় দয়ালু তিনি। ছোট জনের বাড়ীর নম্বর ১৩, বড় জনের নম্বর ১৪। এই দুইটি কথাই আমার জানবার দরকার ছিল। সুষমাকে যে কিছুদিন বাপের বাড়ীতেই থাকতে হবে, মধ্যে মধ্যে মামার ওখানেও যেতে হবে, এ কথা সে শুনেছিল। দেশে আমাদের বাড়ীতে যাওয়ার পথ যে আমি বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা লাহোর যাওয়ার পূর্ব্বে কাউকেই বলিনি।

যথাসময়ে লাহোরে গিয়ে কলেজে যোগ দিলাম। মাসখানেকের মধ্যেই অধ্যাপক, ছাত্র ও কলেজের অধ্যক্ষগণ আমার অধ্যাপনায বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবার উপদেশ-মত কলেজ হষ্টেলেই একটা পৃথক ঘর নিয়ে আড্ডা গাড়লাম। বাবা যে বলেছিলেন, ত্রিশ টাকাতেই কুলিয়ে যাবে, তা-হোলো না; প্রথম মাস গেলে দেখলাম ৪৫৲ টাকার কমে চলবে না। তা হোক!

যে দিন প্রথম বেতন পেলাম, সেই দিনই কলকাতায় নৃসিংহ বসাক মহাশয়কে মণিঅর্ডার করে এক শত টাকা পাঠালাম, এবং তাঁকে লিখে দিলাম, আমার শ্বশুর তাঁর কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছেন, আমি প্রতি মাসে এক-শত টাকা হিসাবে পাঠিয়ে তা শোধ করে দেব। তিনি

যেন আশুবাবুর কাছ থেকে একটা পয়সাও না নেন ; যদি তিনি কিছু ইতিমধ্যেই দিয়ে থাকেন, তা যেন দয়া করে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিশটি টাকা সুষমাকে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাকে এইবার সব কথা লিখে দিলাম ; সে যেন তার বাবাকে আমার অভিপ্রায় জানায়, আমি তাঁকে কিছু লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি।

বাবার পত্র ঠিক সময়ে পেলাম, অর্থাৎ আমার বেতন পাবার দিন দুই আগে। তিনি বেতন পাওয়া মাত্র, দেড়-শত টাকা তাঁকে পঠাতে লিখেছেন, বিদেশ যায়গায় বেশী টাকা হাতে থাকা ভাল নয় বলে আমাকে সতর্ক করছেন।

তাঁর আশীর্ব্বাদ-পত্রেব যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলাম, তার নকল রেখেছিলাম। সে পত্রখানি এই -

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,—

আপনার আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইলাম। বেতনের টাকা আপনাকে পাঠানো আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। যে ভদ্রলোককে আপনি সর্ব্বস্বান্ত, পথের ভিখারী করে আমাকে মহাপাপী করেছেন, তাঁর সমস্ত ঋণভার আমি মাথায় নিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। যতদিন তাঁর ঋণ শোধ না হবে, ততদিন আপনাকে একটিও পয়সাও পাঠাতে পারব না। আমি জানি, আপনার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আপাততঃ কেন, কোনদিনই আমার সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন আপনার হবে না। ইতি —

সেবক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ

এই পত্রের উত্তরে বাবা যে সকল অভিধান-বহির্ভুত বিশেষণ আমার উপর প্রয়োগ করেছিলেন, তা-না বলাই বিদ্রোহী পুত্রের পক্ষে সঙ্গত। শেষকথা এই তিনি আমাকে তাঁর বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন।

মাস কয়েক পরে গ্রীষ্মের অবকাশে কলকাতায় গিয়ে মামার কাছে সব কথা বললাম। তিনি ভৎসনা করে বললেন, ষ্টুপিড্. এ সব কথা আগে আমাকে জানাসনি কেন? যাক, তোর সে পেল্লাদ না আল্লাদ বসাকের সব টাকা আমি কালই দিয়ে মর্টগেজ খালাস করে তোর শ্বশুরকে দেব। কি, অমন করছিস্ কেন রে পাজী! তোর বিয়ে যদি আমার মত নিয়ে হোতো, তা হলে সে বিয়েতে যে আমিই চারপাঁচ হাজার টাকা খরচ করতাম রে উল্লু! সেই টাকা দিয়ে এখন তোর শ্বশুরের মর্টগেজ খালাস করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন জেঠামী রাখ। বেশ ত, তুই আমার ধার যখন পারিস, শোধ দিস। আর দেখ্ তোর ঐ পেল্লাদের ভাইয়ের ধার ও পাঁচ-শো তুই শোধ দিয়েছিস। বলিস ত অবশিষ্ট টাকাটা আমিই দিয়ে দিই। না, থাক্, তোকেও ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—তুই-ই বাকী টাকাটা দিস! চুপ ব্লকহেড! ওরে পাজী, আমার এই মেয়েটার বিয়ে দিলেই ত হোলো। তারপর—আমার মেয়ে আর দিদির ছেলে যে আমার কাছে এক। শাস্ত্রে তাই ভাগনেকে মামার বিয়ের উত্তরাধিকারী করেছে। তোর বাবা তোকে ভয় দেখিয়েছে,

তোকে বিষয় দেবে না—'জেণ্টল্‌ম্যান' করি তোর বাবার বিষয়ে! দেবপ্রসাদ দত্ত first personal pronoun—অহং!

এমন মামার এ-হেন কাপুরুষ ভাগনে হোলো কেমন করে, আপনারা বলতে পারেন?

তুলসী-গন্ধ

বুদ্ধদেব বসু

ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে অনেকগুলো অজ্ঞাত পদক্ষেপ, অনেক অচেতন মুহূর্ত্ত ; ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে স্বপ্নের সেতু, যে স্বপ্ন শেষের দিকে বাস্তবের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়। মিহিরকুমার সোমের পক্ষে, শীতের সেই সকাল-বেলায়, সেই স্বপ্ন গড়ে উঠ্‌তে লাগলো সঙ্গীতের ধ্বনিতে ; ঘুমের সমুদ্রে ঢেউয়ের মত এক-একটা সুরময় শব্দের ওঠা-পড়া ; তারপর সেই ঢেউ এসে লাগ্‌লো তার চেতন মনে ; স্বপ্নের সেতু জাগরণের প্রান্তে এসে ঠেক্‌লো। ঢেউয়ের পর ঢেউ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিক্ষিপ্ত, প্রতি মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া শব্দের আশ্চর্য্য সমাবেশ, সুর, সুরময় শব্দ। ঢেউয়ের পর ঢেউ, অর্গ্যানের মৃদু, নরম স্বর ঘরের আবহাওয়াকে আদর করে চলেছে। জেগে-ওঠার অনেকটা পরে মিহির বুঝ্‌তে পার্‌লো, সে জেগে উঠেছে। অর্গ্যানের স্বর আরো স্পষ্ট হ'লো ; এতক্ষণে যেন সঙ্গীত হ'লো সম্পূর্ণ সরব। তবু, মিহিরের মনের ওপর তা আদরের মত, বিছানার যে-অংশ থেকে তার স্ত্রী একটু আগে উঠে গেছে, তার উষ্ণতার মত। একটুও নাড়াচাড়া না ক'রে মিহির সে-উষ্ণতা অনুভব

কর্‌তে পার্‌ছিলো। যেন কমলা তার শরীরের সারবস্তু ওখানে ফেলে রেখে গেছে। চোখ না খুলেও মিহির স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কমলার বালিশটা যেখানে গর্ত্ত হ'য়ে গেছে। যেখানে কমলা সমস্ত রাত ভরে তার মাথা রেখেছিলো ; তার ছড়ানো, কালো চুল একটা ইসারার মত, আহ্বানের মত। সেই চুল নিয়ে সে আদর করেছিলো, একটা গোছা তুলে নিয়ে জড়িয়েছিলো তার আঙুলে। এ-কথা মনে কর্‌তেই এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে মিহিরের মন যেন সোনালি-উষ্ণ হয়ে পেকে উঠ্‌লো, দক্ষিণপক্ক সোনালি আঙুরের মত সোনালি—তার অন্তর্নিহিত রস, তার উত্তাপ, তার প্রাণ কমলার সত্তার সচেতনতা, কমলার উপর তার পরিপূর্ণ অধিকারের অনুভব। সোনালি আঙুর থেকে নিষ্কাষিত সোনালিতরো মদের মত মিহিরের আত্মায় প্রবহমান এই চিন্তা ; কমলা তার, তার সমস্ত কালো চুল, তার সমস্ত উষ্ণ-নরম শরীর নিয়ে কমলা তার। এই চিন্তা একটা দীপ্তি, যা তারই ভেতর থেকে উত্থিত হ'য়ে তাকে আচ্ছন্ন করছে ; সেই দীপ্তিতে স্নাত, নিশ্চল সে শুয়ে রইলো, পক্ক-সোনালি। ঘুমের মোহ সে তার মন থেকে কেটে যেতে দিলে না ; তার স্বেচ্ছাবৃত তন্দ্রায়, সদ্য-পরিত্যক্ত স্বপ্নে অর্গ্যানের সুর-স্বর ঝরে পড়্‌ছে। সে শুনতে লাগ্‌লো, বরং—তার একটা অংশ শুনতে লাগ্‌লো, অন্য অংশ দিয়ে সে যতক্ষণ নিজের মধ্যে অনুভব কর্‌ছে কমলাকে ; নিজের মধ্যে, নিজের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত

কমলার ঐশ্বর্য্যময় চেতনা, সেই চেতনার বিলাস। আর শান্তি তার মনের মধ্যে গভীর। কমলায় আচ্ছন্ন, সে ভুলে গেলো, এখনো কত জিনিষপত্র খোলা বাকি রয়েছে, কতগুলো মাল আনাতে হবে ইষ্টিশান থেকে, তারপর সেগুলো গুছোনো—নতুন জায়গায় নতুন বাড়ীতে এসে প্রথমটায় কত যে হাঙ্গাম, তার দুশ্চিন্তা, গেলো কয়েক দিন ধ'রে তাকে যা অবিশ্রান্ত পীড়া দিয়েছে, এই সময়ে, ঘুম আর জাগরণের ক্ষণিক রামধনু-সঙ্গমে, তা সে বিস্মৃত হয়ে রইলো। অর্গ্যান বেজে চলেছে, ধ্বনির পর ধ্বনি, সাতটা শব্দের অফুরন্ত লীলা। কী বল্‌ছে সে, এই অশরীরী সুর, শূন্য বায়ুমণ্ডলে এই গীত-উৎসারী রন্ধ্রের পর্য্যায়? সে জানে না, জান্‌তে চায় না। সে শুধু স্তব্ধ শুয়ে থাক্‌বে, তার চৈতন্যের ওপর দিয়ে এই শব্দের স্রোত! সে চোখ খুল্‌বে না—না, অযত্নে বাঁধা শিথিল খোঁপার নীচে কমলার সাদা ঘাড় দেখবার জন্যেও নয়, তার পিঠের নরম বাঁকা রেখা, তার শাড়ির এলায়িত আঁচলের স্মৃতিঘন অবিন্যস্ততা। বোজা চোখেই মিহির টের পেলো, রোদে ঘর ভরে যাচ্ছে। এতক্ষণে তার ঘুমের আবেশও একেবারে ছুটে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু সে উঠ্‌বে না।

হঠাৎ অর্গ্যান থেমে গেলো। যেন একটা আলো নিবে গেলো—কিম্বা প্রেক্ষাগৃহের রহস্য-নিবিড় অন্ধকারে জ্বলে উঠ্‌লো অতি স্পষ্ট, অতি সাংসারিক, নেহাৎই প্রয়োজনীয় আলো, রঙ্গমঞ্চের নাট্যের পর দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে

নেমে আস্‌ছে বিচিত্র বিজ্ঞাপন-অঙ্কিত পর্দা। স্বপ্নের আধো-অন্ধকার থেকে উজ্জল দিনের আলোয় মিহির চোখ মেল্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো কমলার সঙ্গে, যে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলো তার স্বামীর দিকে, তার ঘুম এখনো ভাঙ্‌লো কিনা, দেখবার জন্য।

'ঘুম ভাঙ্‌লো এতক্ষণে?'

স্ত্রীর চোখে তাকিয়ে মিহির একটু হাস্‌লো, কোনা কথা বল্‌লে না। আর, কমলার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে-থাক্‌তে হঠাৎ তার জন্ম ভালোবাসা হঠাৎ একটা ঢেউয়ের মত মিহিরের হৃৎপিণ্ডের ওপর আছাড় খেয়ে পড়্‌লো; একটা অন্ধ শক্তি, যার চাপে, তার মনে হ'লো, সে চূর্ণ হয়ে যাবে।

'ওঠো না,' মৃদুস্বরে কমলা বল্‌লে, 'বেলা যে বাড়্‌ছে, খেয়াল আছে? শেষটায় যে আপিসের তাড়ায় আর নাকে মুখে পথ দেখ্‌বে না।'

মিহির লেপের নীচে থেকে একটা হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, 'এখানে এসো।'

অর্গ্যানের ধার থেকে উঠে কমলা আস্তে-আস্তে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মিহির এক হাত দিয়ে তাকে নিজের বুকের ওপর টেনে এনে তার মুখে নিবিড় চুম্বন কর্‌লে। আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে তার মস্বণ ঘাড়ের ওপর আঁচড় কাট্‌তে-কাট্‌তে বল্‌লে, 'থাকো, থাকো এখানে।'

এলায়িত, শান্ত, একটু সময় কমলা চুপ করে রইলো; তারপর বল্‌লে, 'ছাড়ো এখন, চায়ের ব্যবস্থা করি গে।'

দিন আরম্ভ হয়ে গেলো, কাজে উৎকণ্ঠায় বিরক্তিতে অশান্তিতে ভরা দিন: পড়ে রইলো স্বপ্ন, মিলিয়ে গেলো তন্দ্রার অন্তর্লীনা প্রেত-সঙ্গীত। তার কাছারি-ঘরের কথা মনে প'ড়ে মিহিরের যেন ঈষৎ হৃক্কারের উদ্রেক হ'লো—সেই দলিল আর ধূলোর গন্ধ, উড়নোন্মুখ সবুজ পাখীর মত গাউন-পরা ক্ষীণদেহ উকীলের দল, আর কোলাহল, সেই বিরামহীন কোলাহল। যেন এক বিশাল পতঙ্গবাহিনীর মত তার মস্তিষ্কের ভেতর খেয়ে যাচ্ছে। আর বাড়ি ফের্‌বার সময় সেই ক্লান্তি, যেন সে একটা বিষ-বাষ্পের ভেতর দিয়ে হাঁট্‌ছে—সে ঠিক সে-ই আছে কিনা, বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। সেই ক্লান্তির খানিকটা মিহিরের মধ্যে তখনই যেন সঞ্চারিত হ'লো, সেই সদ্য-নিদ্রোত্থিত শীতের রোদে উজ্জ্বল সকালবেলায়।

বিছানা থেকে উঠে সে পূবের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে তাকিয়ে এক নতুন সহর, প্রাদেশিক সহরের শান্তি, মন্থরতা যেন সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গাছের ঘন সারি, রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলে গেলো, ছোট এক মুসলমান ছেলে গোল লোহার চাকার পেছন-পেছন দৌড়চ্ছে। হেঁটে যারা যাচ্ছে, তাদের তাড়া নেই; এই সাধারণ মন্থরতার মধ্যে অদ্ভুতরকম দ্রুত মনে হচ্ছে। যতটা খারাপ হবে সে ভেবেছিলো, ততটা

নয়। অন্তত, সকালবেলার এই আলোয়, গাঢ়-নীল আকাশের নীচে ততটা খারাপ লাগ্‌লো না।

কিন্তু তার মত বদ্‌লে গেলো, চায়ে ব'সে যখন সে খবরের কাগজ পেলো না। এখানে যে বিকেলে খবরের কাগজ আসে, এই ব্যাপারে সে এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। বিকেলবেলা খবরের কাগজ! এমন আজগুবি কাণ্ড কে কবে শুনেছে! ঢাকা সম্বন্ধে মিহির একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর মন্তব্য কর্‌লে।

'তা আর কী হয়েছে,' কমলা বল্‌লে, 'কাগজটার ভাঁজ না খুলে পরদিন সকালের জন্য রেখে দিলেই তো হয়।'

মিহির নিজের মনে গর্জ্জাতে লাগ্‌লো, 'এ-রকম জায়গায় ভদ্দরলোক কী ক'রে বাস কর্‌তে পারে! আমি আগেই জান্‌তাম। বদ্‌লির খবর যেদিন এলো, সেদিনই তো বলেছিলাম—'

'কী আর কর্‌বে। তোমার আপত্তি সর্‌কার তো শুন্‌বে না।'

আর তুমি বলেছিলে, 'বেশ হবে, চলো, ঢাকা বেশ জায়গা।—বেশ!'

'আমার তো ভালোই লাগে। সত্যি।'

'পৃথিবীতে কার যে কী ভালো লাগে, বোঝা মুস্কিল।' যেন একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে তাদের মনান্তর হয়ে গেছে, এইভাবে মিহির চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে। তার মুখ লক্ষ্য ক'রে কমলা মনে-মনে হাস্‌লো। অদ্ভুত, তার স্বামীর এই

একগুঁয়েমি, যে-কোনো বিষয়ে এতটুকু মতদ্বৈধ সহ্য করতে না পারা, তার এই আশা করা যে-কোনো বিষয়ে অন্য-সবাই ঠিক তার মত করেই ভাববে। তাকে তোয়াজ করবার জন্য সে বল্লে, 'ছেলেবেলায় এখানেই ছিলুম কিনা, অনেকদিন পর হারানো জায়গায় এলে ভালো লাগে না ?'

মিহির অন্যমনস্কভাবে বল্লে, 'হুঁ।'

বরাবর কমলার মনে এ-ইচ্ছে ছিলো, আর-একবার ঢাকায় আসবার, একবার অন্তত। মনে-মনে সে জানতোও যে এই ইচ্ছা তার পরিপূর্ণ হবে। আর তা-ই তো হ'লো, দুপুর-বেলাকার ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে সে বল্লে, তা-ই তো হ'লো। তার মুর্শিদাবাদ সিল্কের নক্সা-আঁকা শাড়ি আর রঙীন ছাতা নিয়ে প্রাদেশিক সহরের দুপুরবেলাকার শান্ত রাস্তায় সে সুন্দর এক ছবি : রাস্তা দিয়ে আর যে-দু'চার জন লোক যাচ্ছিলো, তাকে ভালো করে দেখবার জন্য একটু থমকে দাঁড়াচ্ছিলো। কিন্তু ও-সব কিছুই তার চোখে পড়ছিলো না, সে শুধু ভাবছিলো, এ কী অদ্ভুত, কী অদ্ভুত যে সে এখানে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে, ছ' বছর পরে ; আকাশ যেমন তার সমস্ত নীলিমা দিয়ে সূর্য্যের আলোকে পান করছে, কমলার মন তখনি সবগুলো তন্তু দিয়ে, প্রতি তন্তুর প্রতিটি সূক্ষ্ম অণু দিয়ে শুধু শোষণ করছে এই চিন্তা। সে একবার ভাবলো না, কোথায় যাচ্ছে, আর কেনই বা যাচ্ছে। কিন্তু যেন আগে থেকে কারো সঙ্গে সব ঠিক হয়ে আছে, স্বামী

আপিসে চলে যাবার খানিক পরে সে-ও বেরিয়ে এসেছে। কিছুই এসে যাবে না, স্বামীর অনেক আগেই সে ফির্‌তে পার্‌বে। একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি প্রচুর শব্দ কর্‌তে-কর্‌তে চলে গেলো, ধূলোয় চারদিক প্রায় অন্ধকার ক'রে দিয়ে। চারটে চাকার ঘূর্ণনের ফলে এত ধুলো হতে পারে, না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তা-ও কমলার মনের সুর কেটে দিলে না; এই ধূলো, এর গন্ধও তার পরিচিত, একে তার প্রত্যাবর্ত্তনের একটা অংশ ব'লে সে অনুভব কর্‌লো। এখানকার ওপর তা'র অধিকারের এটা একটা স্বীকৃতি। পথ সংক্ষেপ কর্‌বার জন্য রাস্তা ছেড়ে সে যখন মাঠে নাব্‌লো নিজেকে তার আশ্চর্য্যরকম সুখী মনে হতে লাগ্‌লো, যে-সময়ে সে ইস্কুলে পড়তো, প্রায় সেই সময়কার মত। সত্যি বল্‌তে, হঠাৎ তার মনে হলো, সত্যি বল্‌তে সে ভুলে গিয়েছিলো, সুখ কী জিনিষ। সে বেঁচে ছিলো, এ-পর্য্যন্ত; আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, তার স্বামীর, অন্য-সবার এবং কখনো-কখনো তার নিজেরও মতে সুখে বেঁচে ছিলো। কিন্তু একটা উপলব্ধি তার হয়েছিলো: তা এই যে, আসলে সুখ কি দুঃখ বলে কিছু নেই, আছে শুধু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের বিরোধ কি সামঞ্জস্য, দিন থেকে দিন নিজের মধ্যে নিজের আচ্ছাদন কি উন্মীলন। সুখ আর দুঃখ, নিজেকে সে বল্‌তে ভালোবাস্‌তো, হচ্ছে ইস্কুলে-পড়ুয়া অবস্থার কুসংস্কার। সেই কুসংস্কারের মোহে আজ আবার সে পড়েছে; তার মনে হতে

লাগ্‌লো, নিজের থেকে আলাদা যেন কিছু-একটা আছে, যাকে কতদিন সে খুঁজেছে, এবং খুঁজেছে ব'লে বুঝ্‌তে পারে নি। উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে লঘু তার পদক্ষেপ; তার শরীর মুক্ত, শূন্য মাঠ আর অজস্র আকাশের মাঝখানে একটি রঙীন পালকের মত উজ্জ্বল, অনায়াসবিহারী তার শরীর।

যে-জায়গায় সে যাবে, তা কাছে এসে পড়্‌লো। হঠাৎ তাকিয়ে সে পাড়াটাকে চিনতে পার্‌লো না; পাড়ার ঠিক প্রান্তবর্ত্তী প্রকাণ্ড এক বটগাছ ছিলো, সেখানটা এখন খাঁ-খাঁ কর্‌ছে। মনের মধ্যে সে একটা আঘাত পেলো, কিন্তু এ-রকম না হ'য়ে উপায় নেই। প্রগতি থাম্‌তে পারে না। ছাখো না, দালানে-দালানে পাড়াটা ছেয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত নগরোপকণ্ঠ—যেখান থেকে সাপ্তাহিক পত্রে নারী-অধিকার সম্বন্ধে চিঠি যায়, যেখানে সরস্বতী পূজো ও নববর্ষে ছোট-ছোট মেয়েদের নৃত্যাভিনয় হয়, যেখানকার ছেলেরা দস্তুরমত এইচ্-জি-ওয়েল্‌সের বই পড়ে। পেনসনপ্রাপ্ত ডেপুটি-মুন্সুফদের এক উপনিবেশঃ নিখুঁত-রকম ভদ্রোচিত, অতিরিক্ত মাত্রায় সাজানো-গুছোনো, পালিশ-করা। আশ্চর্য্য নয়, বটগাছকে যে ওখানে টিঁক্‌তে দেবে না, কে জানে কত দীর্ঘ বছর ধরে যা আস্তে-আস্তে মাটির গভীর অন্ধকারের মধ্যে মূল বিস্তার ক'রে আকাশের নীচে অগণ্য পাতায় বিকশিত তার ঝির্‌ঝিরে প্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

এখন আর এখানে, কমলা মনে-মনে ভাবলে, গভীর রাত্রে শকুন-শিশুর ডাকে গা-ছম্‌ছম্‌ করবে না; জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে না জমাট-কালো সেই অন্ধকার, বর্ষার দিনে জল দাঁড়াবে না মাঠে। এই পাড়ার ওপর পড়েছে সভ্যতার লৌহ-মুষ্টি, শকুন-পরিবারের অন্য বাড়ি খুঁজতে হয়েছে, গজিয়ে উঠেছে কয়েক গজ পর-পর লোহার থাম, বিদ্যুদ্বহ যুগ্ম তারকে যা ধারণ করছে। অবাক হবার কিছু নেই; এ-রকম যে হবে, তা আশাই করা যায়। তবু দু'পাশে জানালায়-রঙীন-পর্দ্দা-খাটানো বাড়ির সারির মাঝখানে পাকা সড়ক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কমলা একবার সে-সময়ের কথা মনে না করে পারলে না, যখন বর্ষার দিনে সেই বড় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জল-কাদা ভেঙে কত কষ্টে এসে বাড়ি পৌঁছতে হ'তো—নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে দু'চারখানা মাত্র বাড়ির একটি। চৈত্রমাসে কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়তো, বটের শুক্‌নো ঝরা পাতার রাশিতে সমস্ত রাস্তা যেতো গেরুয়া হ'য়ে। বৃষ্টির জল যেখানেই একটু জমতো, হল্‌দে-সবুজ রঙের স্ফীতদেহ ব্যাঙের দল স্ফীততরো কণ্ঠনালী প্রদর্শন ক'রে উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি করতো; মাঠ দিয়ে হাঁটতে গেলেই কাপড়ে বিঁধে যেতো অগুন্‌তি চোরকাঁটা; শ্রাবণের সকালবেলায় ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বর্ষাপ্রকৃতি যেন আলোর ভিক্ষায় তার নীল হাতের অঞ্জলি বাড়িয়ে ধরতো। আর রাত্রিতে—কী নির্জ্জনতা, কী অন্ধকার। রহস্যে আর ভয়ে ভরা বটগাছের বিশাল

আবছায়া-মূর্ত্তি। একদিন এই সমস্ত জায়গাটা ছিলো বন; সহর থেকে দুঃসাহসী ইস্কুলের ছেলেরা এখানে বেড়াতে এসে সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি ফিরে যেতো। সেই সময় থেকে —আরো, কত, কত আগে থেকে!—সেই বটগাছ রাজত্ব করেছে এখানে: পাখীতে পতঙ্গে পাতায় বিচিত্র প্রাণময় এক জগৎ, আকাশের দিকে বিশাল ডালপালা মেলে দিয়ে সূর্য্যকে সে পান করেছে আর বৃষ্টিকে, সূর্য্যের শক্তিকে সে প্রেরণ করেছে তা'র দেহের অন্ধকারে লীন লক্ষ-লক্ষ তন্তুতে, বৃষ্টির উজ্জীবনকে সে প্রস্ফুটিত করেছে নতুন সবুজ পাতার ঐশ্বর্য্যে। সেই সমস্ত প্রাণ, প্রাণের ক্ষান্তিহীন, ক্লান্তিহীন লীলা হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেলো। এই বনদেবতার পতনের সঙ্গে কী ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হয়ে থাকবে। কমলা যেন নিজের মধ্যে সেই শব্দ শুনতে পেলো—আকাশ-ফাটানো মৃত্যু-চীৎকার।...কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা, মন-খারাপ করা বৃথা; এ-রকম যে হতেই হবে। প্রজাসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, নতুন জায়গা চাই। মানুষ এলো তা'র সভ্যতার যন্ত্রপাতি নিয়ে। দেখা গেলো, এতখানি জায়গা জুড়ে এই যে গাছটা রয়েছে, সেটা বাহুল্য। যে-শক্তি রাস্তার ধারে বসিয়েছে জলের কল, ইলেকট্রিক আলোর থাম, তারি একটা প্রশাখা উপড়ে ফেল্‌লো গাছটাকে। সেই শক্তিকে কে বাধা দেবে? তার আশ্রয়ের বাইরে কমলার নিজেরও যে এক মুহূর্ত্ত চলে না। না, প্রতিবাদ করা বৃথা।

পাড়াটা একেবারে চুপচাপ ; বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ ; সমস্ত আবহাওয়ায় মধ্যাহ্ন-আহার-পরবর্তী বুর্জোয়া বিশ্রাম। কমলার সময়ে বেশির ভাগ বাড়িই ছিলো না, পাড়াটার চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। তার চোখে, তবু, কিছুই নতুন লাগছিলো না ; বরং, নতুন যা-কিছু তার চোখ কিছুই গ্রহণ করছিলো না, বরং শুধু চোখই গ্রহণ করছিলো। তার মনের মধ্যে সারাক্ষণ যে-ছবি ছিলো, তা ছ'বছর আগেকার, শীতকালে তখন এখানকার রাস্তা শাদা ধুলোয় ছেয়ে যেতো। যেন সেই সময়কার কোনো স্মরণচিহ্ন, কোনো অভিজ্ঞান সে বহন করছিলো তার নিজের মধ্যে, এই জায়গার আত্মা তা চিন্‌তে পেরেছে। যেন, বয়ঃক্রম-অনুসারে বর্তমানে উপস্থিত থেকেও, তারই ভেতর থেকে উৎসারিত ছ'বছর আগেকার এক অনুভব তা'কে আচ্ছন্ন করেছে ; তারই ভেতর দিয়ে সে হাঁটছে। হঠাৎ একটা বাড়ি তার চোখে পড়লো—সেটা পুরোনো। এ-বাড়ির লোকের সঙ্গে তার অল্প জানাশোনা ছিলো। কী অদ্ভুত হয়, সে যদি এখন ঢুকে পড়ে। বিধবা ভদ্রমহিলা প্রথমে তাকে চিনতে পারবেন না, তারপর চিনতে যখন পারবেন—সেই কঠিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রতা, লোহার জামা পরা সৌজন্য, অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্র আলাপ, সবসুদ্ধ তার প্রতি এমন মনোযোগ দেখানো, যাতে সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে, সে যত শীগ্‌গির চলে যায়, ততই ভালো।...কমলা ও-সব ভালো করেই জানে, তার বাড়িতে কেউ এলে সে-ও ঐ রকমই

করে। এরই মধ্যে তার প্রতিবেশীরা সচেতন হ'য়ে উঠেছে, কাল একজন এসেছিলেন। ঘরদোরের নিরাসবাব অবস্থার জন্য সে প্রচুরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো—পরে নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছিলো, ওটা করতে গেলো কেন? কারণ, সত্যি বলতে, যেমন ছিলো, তাকেই আস্‌বাবের বাড়াবাড়ি বলা যেতে পারে। তাদের যে আরো অনেক জিনিষপত্তর আছে, প্রতিবেশীকে পরোক্ষে তা জানিয়ে দেয়া ছাড়া এ আর কী? সে যাক্, পারিপার্শ্বিককে একেবারে ছাড়িয়ে ওঠবার আশা কোনোরকমেই করা যায় না। তা ছাড়া, একজনের কাছ থেকে লোকে যেমন আশা করে, তেমনি করতে হয়। মহিলাটি বলেছিলেন, 'ঢাকায় বড় মশা।' সে বলেছিলো, 'হ্যাঁ, তা-ই দেখছি।' 'মশারি খাটিয়ে শুলে মশা লাগে না।' 'মশারির ফাঁক দিয়েও অনেক সময় এসে ঢোকে,' এ-কথার উত্তরে সে বলেছিলো। আশ্চর্য্য, সে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে নি। এতে যে হাস্যকর কিছু আছে, তাও তার মনে হয় নি। এ-সব ব্যাপারে হেসে উঠলে তার চলতো না; একজনের কাছ থেকে যা আশা করা হয়, তা-ই সে করে।

একটা বাড়ির সামনে ছোট বাগানে অজস্র গাঁদা ফুল আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, এক্ কোণে ফুটে রয়েছে প্রকাণ্ড এক সূর্য্যমুখী। কিন্তু গতি মন্থর করে এনেও সে থাম্‌লে না; আবার চলতে লাগলো। ইটের দেয়ালে ঘেরা খড়ের ছাউনি দেয়া সেই ঘর দেখা যাচ্ছে; দূর থেকে তা প্রায় আগেকার

মতই দেখালো—কোনোকালেই ঘরটা খুব ঝকঝকে, ফিটফাট ছিলো না। তার কাছে আস্‌তে কমলার পদক্ষেপ স্বতঃই মন্থর হয়ে এলো, তার শরীরের সলীল লঘুতা গেলো হারিয়ে। এতক্ষণ সে নিজেই আস্‌ছিলো; এখন একটা ইচ্ছা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যা তার নয়। দেয়ালের ঠিক বাইরে এসে সে দাঁড়ালো। ইটগুলো এখানে ওখানে খ'সে পড়েছে। স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ততার মধ্যে এই জীর্ণ গৃহ একটা অশোভনতা, ঔদ্ধত্য; এতদিন যে এটাকে টিকতে দেয়া হয়েছে, তা-ই আশ্চর্য্য। দেয়ালের গায়ে কাঠের একটা দরজা খোলাই রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে সে তাকালো; উঠোনটা আগাছায় ছেয়ে গেছে; একটা লাল গোরু আর কয়েকটা ছাগল সেখানে চ'রে বেড়াচ্ছে। এক পাশে ঘরের ছায়ায় একটা কুকুর সামনের দু'পা সোজা বাড়িয়ে দিয়ে তার ফাঁকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে। কমলা তাকালো, তাকালো। সে যে বিশেষ কিছু ভাবছিলো, তা নয়; তখনকার মত তার মন যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। আস্তে আস্তে দরজা পার হ'য়ে সে ভেতরে ঢুকলো। তার পায়ের শব্দে কুকুরটা চম্‌কে চোখ মেললো। তার দিকে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে কয়েক পা হেঁটে একটু দূরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। উদাসীন গোরুটা সশব্দে দাঁত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছে; তার লেজের প্রান্তদেশের ঝুঁটি অলসভাবে অল্প অল্প নড়ছে। ঘরের বারান্দা ছাগলের পরিত্যাগে ও

বিবিধ আবর্জ্জনায় নোঙরা ; তীব্র দুর্গন্ধ যেন কমলার মস্তিষ্কে হঠাৎ এক বাড়ি মারলো। স্পষ্টত, বহুদিন এ-বাড়িতে কেউ বাস করে নি, বহুদিন ধ'রে এ-বাড়িকে নিজের মনে ফেলে রাখা হচ্ছে। ঘরে ঢোকবার দুটো দরজাতেই তালা লাগানো রয়েছে, বাড়িটা চুরির উপযুক্ত বলেও বিবেচিত হয় নি। বেড়ার গা থেকে পেলেস্তরা উঠে আসছে। কমলা ঘরটার চারিদিক একবার ঘুরে দেখলো। পেছনের দিকে একটা পেয়ারা গাছ ছিলো, এখন একেবারে শুকিয়ে যাওয়া, এখানে ওখানে তার দু'টি-একটি ক'রে পাতা ছড়ানো। বাইরের দরজার দিকে দেয়ালের কাছে তুলসীমঞ্চের কাছে সে একটু দাঁড়ালো। সে-জায়গাটা রীতিমত তুলসীর জঙ্গল হ'য়ে গেছে। মঞ্জরীগুলো পেকে লাল হ'য়ে এসেছে। বর্ষার দিনে এই মঞ্চ বেয়ে উঠতো একটা অপরাজিতার লতা, ফুটতো গভীর নীল ছোট-ছোট ফুল—তার চোখের মত। তার চোখের মত! সে নিজে কখনো বুঝতে পারে নি, তার চোখ সত্যি-সত্যি নীল কিনা। এখন কয়েকটা ফুল ফুটে থাকতে দেখলে সে খুসী হ'তো। নীচু হয়ে একটা তুলসীর পাতা ছিঁড়ে সে তার আঙুলের মধ্যে চট্‌কালো, গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে। তার সামনের হাওয়াটাকে সে কয়েকবার শুঁক্‌লো, তুলসীর গন্ধ লেগে রইলো তার ঘ্রাণে। আর তা-ই, তা-ই হচ্ছে সব, যা সে এখান থেকে নিয়ে যাবে ; আর ওরই জন্য সে এসেছিলো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে দেখলো, একটা লোক কী কতগুলো জিনিষ নিয়ে সাইকেলে করে তার দিকে আসছে। তার মনে হলো, লোকটা তার চেনা। সে কাছে আসতে কমলা তাকে ইসারা করে ডাকলো। লোকটা সসম্ভ্রমে সাইকেল থেকে নেবে মাথার একটা অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমার এ দোকান?' কমলা জিজ্ঞেস করিলে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', লোকটা তার সাধ্যমত পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলে। কমলা ঠিকই ধরেছিলো, লোকটা হচ্ছে পাড়ার মুদি। কিন্তু, তার মুখ থেকে এমন মনে হ'লো না, সে কখনো কমলাকে আগে দেখেছে বলে বুঝতে পারছে।

'শোনো, এই বাড়ি—এতে কেউ থাকে না আজকাল?'

'আজ্ঞে এ-বাড়ি তো অনেকদিন খালি প'ড়ে রয়েছে।'

'কোথায় গেলো—ছিলো যারা? একজন ছোক্‌রামত বাবু আর তাঁর মা—'

'হ্যাঁ, মা-ঠাক্‌রুন বড় ভালো লোক ছিলেন—সব সওদা নিতেন আমার কাছ থেকে।' মুদির আস্তে আস্তে সাহস বাড়ছিলো, চ্যাপ্টা কপালের নীচে তার ছোট-ছোট চোখ উঠছিলো উজ্জ্বল হয়ে। 'এখানে তাঁরা যখন এসে বাড়ি করলেন, আমি সবে দোকান খুলেছি। সেই থেকে মা-ঠাকরুন—'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা এ-বাড়ি তাঁরা কবে ছেড়ে গেছেন, জানো ?'

'এই—', মুদির চ্যাপ্টা কপালে কয়েকটা রেখা পড়লো, 'আজ্ঞে সে তো অনেকদিন।'

'কতদিন ?'

'চার বছর হবে', একটু ভেবে মুদি জবাব দিলে, 'কি কিছু বেশিও হ'তে পারি।'

'কোথায় গেছেন জানো ?'

'কলকাতায়।'

'না, না, কলকাতায় নয়', কমলা নিজকে বলতে শুনলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতাতেই', এ-খবরটা নিশ্চিতরূপে দিতে পেরে মুদি খুব খুসি হ'লো, 'যাবার আগের দিন মা-ঠাকরুনের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর তাঁরা কেউ এখানে আসেন নি আর ?'

'আজ্ঞে না। মা-ঠাকরুনকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম; তিনি বললেন, "আর বোধ হয় আমরা ফিরবো না।"

'হুঁ। আর বাড়িটা ?'

'বাড়িটা সেই থেকে খালি প'ড়ে আছে তো আছেই। এমন সুন্দর জায়গাটা, কী ছিরি ক'রে ফেলে রেখেছেন। পাড়ার পাঁচজন বলাবলি করেন। এখানে নতুন একটা বাড়ি তুললে—'

'আচ্ছা—'

মুদি মাঝপথে তার কথা থামিয়ে মাথায় আর একটা অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী করে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো, কমলা পেছন ফিরে ডাকলে, 'এই, শোনো—'

'আজ্ঞে ?'

'এই নাও,' কমলা তার হাতব্যাগ থেকে একটা আধুলি বার করলে।

মুদির মুখ অনেক হাসিতে ভেঙে গেলো। 'আজ্ঞে আপনি এ-পাড়ায় থাকেন নাকি ?' সাইকেলের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু কমলা ততক্ষণে উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

তুলসীর গন্ধ তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলো, যে পাতাটা সে আঙুলের মধ্যে চট্‌কেছিলো। একবার সে তার চোখের সামনে তার হাত মেলে ধরলো ; বুড়ো আঙুল আর তর্জ্জনীতে হলদে দাগ লেগে রয়েছে। তার দু'আঙুলে অল্প একটু দাগ—এ-ই সব। এ-রকম যে হবে সে জানতো। সে জানতো, তবু এই সমস্ত পথ সে হেঁটে এসোছিলো। যতক্ষণ আসছিলো, সে কিছু ভাবে নি, ভাবতে পারে নি। কিন্তু সেই তুলসী-গন্ধ যেন তাকে একটু একটু করে জাগিয়ে তুলছিলো মোহ থেকে, যে মোহ এতক্ষণ তাকে ঘিরে ছিলো। এতক্ষণে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে সচেতন হলো : অনুভব করলো এই মধ্যবিত্ত পাড়ার দূর, বিচ্ছিন্ন বৈপরীত্য, আর তার মাঝখানে

সেই পরিত্যক্ত গৃহের তীব্র, তিক্ত শূন্যতা। তিক্ত, যেন তার হৃৎপিণ্ড তিক্ত আর কঠিন হ'য়ে গেছে। শুধু একবার তাকে দেখতে! যাতে চোখে জল এসে না পড়ে, কমলা শক্ত করে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো; তার নিজেরই অজান্তে তার পদক্ষেপ দ্রুত থেকে দ্রুততরো হয়ে উঠতে লাগলো। শুধু একবার, এই সব দীর্ঘ বছরের সব তিক্ততা আর সংগ্রাম, প্রার্থনা আর প্রত্যাশার পরে, শুধু একবার তাকে দেখতে! কিন্তু সময় ক্লান্তিহীন, তা বয়ে চলে আর বয়ে চলে; তা ধূলো ছিটিয়ে যায়, আর যা ধূলো নয় তাকে ধূলো বানিয়ে যায়। কিন্তু এখনো নয়, কমলা প্রায় সশব্দে বলে উঠলো, এখনো নয়। ধূলো যখন ছিটিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক তারই আগে শুধু আর-একবার তাকে দেখতে! এই বাসনা কমলার মধ্যে ব্যাধির মত হয়ে উঠলো, তার মাংসের মধ্যে অদৃশ্য এক ক্ষতের মত। তার গালের ওপর সে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অনুভব করলো। সে তার রুমালের জন্য ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকালো, কিন্তু হঠাৎ তার সমস্ত দৃষ্টি এলো ঝাপ্‌সা হয়ে, শীতের উজ্জ্বল আকাশ বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে একটুও অপেক্ষা করলো না, হেঁটে চললো। চোখের জল আপনিই থেমে গেলো; রুমাল দিয়ে সে সযত্নে চোখের কোণ আর গাল মুছে ফেললো।

কী করে কোন পথে সে বাড়ি ফিরে এলো, কমলা নিজেই টের পেলো না। ঘরে ঢুকে দেখলো, তার স্বামী খাটের ওপর

চিৎ হয়ে শুয়ে টানছে চুরুট আর পড়্‌ছে কাগজের মলাটের এক ইংরিজি নভেল। মিহির মই থেকে চোখ সরিয়ে কমলার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। এটা তার একটা অভ্যেসের মধ্যে, কমলাকে কোনো কথা বলবার আগে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকা। যেন দৃষ্টি দিয়ে তার শরীরকে চাটছে, কমলার হঠাৎ মনে হ'লো। ঠিক এই মুহূর্ত্তে তার দিকে অমন করে তাকাবার জন্য মিহির বাড়িতে না-ও থাকতে পারতো। 'এত শীগ্‌গিরই ফিরে এলে?' সে জিজ্ঞেস না করে পারলে না।

'হ্যাঁ, একটা মামলার শুনানি আজ হঠাৎ অ্যাড্‌জোরন্‌ড্‌ হয়ে গেলো কিনা—শীগ্‌গিরই চলে আসতে পারলাম। বাঁচলাম। শুয়ে থাক্‌তে কী যে আরাম লাগছে।' আরামের বিলাসিতায় মিহির একটু নড়ে-চড়ে কাৎ হয়ে শুলো। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'এই একটু ঘুরে এলাম।'

'তোমার মুখ বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে কিন্তু।'

'যে ধুলো রাস্তায়।'

পাশের ঘর থেকে জামাকাপড় বদ্‌লে একটু পরে কমলা এসে বল্‌লে, 'তিনটে বাজে। চা খাবে নাকি এখনই।'

'মন্দ কী।' তারপর, 'চলো না', একটু চুপ করে থেকে মিহির বল্‌লে, 'আজ একটা বায়োস্কোপ দেখে আসি।'

'না আমি আজ না গেলাম।'

'কেন ? বেশ তো—একটা দিন দৈবাৎ একটু ছুটী পাওয়া গেছে—'

'আমার তো আর ছুটীর অভাব নেই।'

'সারাটা দুপুর,' মিহিরের চোখে অত্যন্ত সস্নেহ, প্রায় করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌লো, 'তোমার পক্ষে একা-একা কাটানো সত্যি বিশ্রী। নয় ?'

'তা আর কী, আমাদের জন্যেই তো বাঙ্‌লা মাসিকপত্র রয়েছে।'

'চলো আজ বায়স্কোপেই যাওয়া যাক্। আমাদের কাছারির সাম্‌নে একটা সিনেমায় জ্যানেট গেনর দিচ্ছে, দেখলাম। অনেকদিন এ-সব দেখি-টেকি নে; আজ ইচ্ছে কর্‌ছে।'

'বেশ তো, যাও না তুমি।'

'তুমিও চলো।'

'আমার ইচ্ছে করছে না।'

'না, না, সে কী হয়। তুমি না গেলে আমার যে ভালোই লাগবে না।'

'কিন্তু আমার যে গেলেই ভালো লাগবে না।'

'গেলেই, দেখবে, ভালো লাগবে।' ব্যাপারটার যেন মীমাংসা হ'য়ে গেছে, মিহির বললে, 'তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো।'

চায়ের ব্যবস্থা কমলা করলো। স্বামীর মুখোমুখি কমলা বসলো চেয়ারে, তা'কে চা ঢেলে দিয়ে নিজেও নিলে। নীরব চা-সেবন। মিহিরের মেজাজ খুব ভালো ছিলো, সে দাঁত বা'র করে অবিশ্রান্ত হাস্‌তে লাগলো, যেন একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা তাকে অবিশ্রান্ত সুড়্‌সুড়ি দিচ্ছে। কমলা আত্ম-বিস্মৃত, স্তব্ধ, যেন সে সত্যি-সত্যি ওখানে নেই।

'ওঃ হো,' রুটির টুক্‌রোয় কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে মিহির বলে উঠ্‌লো, 'ইষ্টিশান থেকে জিনিষ-পত্তরগুলো তো আজো আনা হ'লো না।'

কমলার কাণে ও-কথা ঢুকেছে, তার কোনো পরিচয় পাওয়া গেলো না। 'বস্‌বার ঘরটাই এখনো পর্য্যন্ত অগোছাল হ'য়ে পড়ে রইলো—অথচ নতুন এসেছি ব'লে কেউ না কেউ যে দেখা কর্‌তে না আস্‌ছে, এমন নয়। নাঃ, এরই মধ্যে এক দিন সময় করে নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেল্‌তে হবে। কী বলো? আজ দুপুরেই তো চাকরটাকে দিয়ে তুমি খানিকটা করিয়ে রাখতে পার্‌তে।' মিহির চায়ে আর এক চামচে চিনি ঢাল্‌লে।

'আচ্ছা দ্যাখো, বড় আয়নাটা শোবার ঘরে না রেখে বস্‌বার ঘরে রাখলে কেমন হয়? আর আজ আমার হঠাৎ মনে হ'লো, অ্যান্টিম্যাকাসারগুলো পুরোণো হয়ে যাচ্ছে—বদলানো দরকার। কল্‌কাতায় থাক্‌তে মনে হ'লেই ভালো হ'তো;

এখানে কি ভালো ক্রেটোন-করা কাপড় পাওয়া যাবে ?...কী, চুপ করে আছো কেন ?'

'চুপ করেও কি থাকতে পারি নে ?'

'কিন্তু কাজের কথা বলছি যে, অত্যন্ত দরকারি কথা। শোনো : বড় আয়নাটা বস্‌বার ঘরে নিয়ে রাখলে—'

'কাল হবে ও-সব কথা। আজ থাক্।'

এতক্ষণে মিহির যেন তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্‌লে। 'কী হয়েছে ?'

'কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি ? তা হ'লে তুমি ও-রকম চুপ করে আছো কেন ? তোমার মন-খারাপ হয়েছে ?'

'যদি হয়েই থাকে, ধরো ? মাঝে-মাঝে কি মানুষের মন-খারাপও হ'তে নেই ?'

'যদিও আমি তো সম্প্রতি তার কোনো কারণ দেখছি নে', মিহির মন্তব্য করলে, বেশ একটু ঝাঁঝ দিয়েই। তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলো। একেবারে শিশুর মত, অন্যের সম্বন্ধে তার এই অসহিষ্ণুতা। তার আশে-পাশে যা কিছু, সব সময় ঠিক তারি মত হ'তে হবে, এক চুল এদিক-ওদিক হ'লে সে সহ্য করতে পারে না। এ এক কঠিন অন্ধতা, প্রবৃত্তিগত এক-মুখিতা, যা এমন-কোনো জিনিষকে কিছুতেই গ্রহণ করবে না, যার সঙ্গে তার নিজের কিছুমাত্র গরমিল হয়। গ্রহণ না করুক, তাকে স্বীকারও করবে না ; ভাণ করবে—বোধ হয় বিশ্বাসও

করবে—যে তাদের অস্তিত্বই নেই। 'আমি হচ্ছি গিয়ে চরমপন্থী,' নিজের সম্বন্ধে সে বল্‌তে ভালোবাসতো, 'হয় আমি ঘৃণা করি, নয় ভালোবাসি।' সত্যি বল্‌তে, অবিশ্যি, ঘৃণাতেই সে বিশেষত্ব অর্জ্জন করেছিলো। যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'তো, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই সে শেষ পর্য্যন্ত ঘৃণা করতো, তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন-কোনো জিনিষ সে পেতোই যা তার ভালো লাগতো না, এবং সেই একটুখানি ভালো-না-লাগাই তার চরমপন্থী মনে ঘনীভূত হয়ে উঠতো ঘৃণায়। এবং সেটা সে তীব্র, স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করতো, তার সেই মুহূর্ত্তের প্রিয় বন্ধুর কাছে কি অন্যের অভাবে কমলার কাছে। যে-কোনো পরিচিত-সম্বন্ধে সে জাঁক ক'রে বল্‌তো, 'I hate him,' কি 'That loathesome man!' কি 'He's simply detestable'। বিশেষণ যত বেশি কড়া হ'তো, তার মুখ দাঁত-বার-করা হাসিতে ঠিক সেই অনুপাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, মিহির চরমপন্থী লোক। আর ভালোবাসা—হ্যাঁ, ভালোবাসা। তার মানে কমলা। কমলাকে সে ভালোবাসে; প্রবলভাবে, উচ্চ-সরবে ভালোবাসে। কথায়-কথায় তার ঘোষণা। কোন বাড়ীতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেলে এটা সে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে দেয় যে সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। সকলের দেখবার জন্য, দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সে সেটা যেমন ক'রে পারে সবখানে জাহির করে বেড়ায়। অতি পবিত্র, সুন্দর ভালোবাসা। তার গৌরব, তার মুক্তি।

বাকিটা চা নীরবে সম্পন্ন হ'লো। চাকর এসে পেয়ালাগুলো সরিয়ে নিলে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মিহির চুরুট ধরালে। 'তা হলে বায়োস্কোপে যাবে না?'

'তুমি যাও না,' কমলা বল্‌লে।

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে—'

'Oh don't,' কমলা বলে ফেল্‌লো।

'Don't—what ?'

কমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার স্বামীর মুখে। ক্ষীণ হাসিতে তার ঠোঁট একটু বেঁকে গেলো। মৃদুস্বরে সে বললে, 'তুমি যাও, জ্যানেট গেনরকে দেখে এসো গে। আমার কেমন-যেন ক্লান্ত লাগছে।'

'বাজে কথা,' মিহির তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, 'ক্লান্ত লাগবার তোমার কী হয়েছে?'

কমলার চোখে হঠাৎ লুকানো আগুন ঝলসে গেলো।— 'না, ক্লান্ত লাগা, মন-খারাপ হওয়া, চুপ করে থাকা ইত্যাদি সবই তোমার একচেটে ব্যাপার।'

কেউ তাকে ঠাট্টা করছে, এমন সন্দেহও মিহিরের পক্ষে বিষের মত। সে কালো হয়ে গিয়ে বললে, 'মেয়েমানুষের ন্যাকামি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

'তা যাতে বেশিক্ষণ আর দেখতে না হয়, সেইজন্যই তো আমি তোমাকে বলছি বায়োস্কোপে চলে যেতে।'

আমার সঙ্গ তোমার আর ভালো লাগছে না, মনে হচ্ছে।' রাগে মিহির তার শাদা বড় দাঁত প্রদর্শন করলো।

'সব মানুষেরই কখনো-কখনো একা থাকবার অধিকার আছে।'

'আর সুতরাং, তুমি যাতে একা থাকতে পারো, আমাকে দু' ঘণ্টা বায়োস্কোপে গিয়ে বসে থাকতে হবে!'

'তোমার ইচ্ছে,' বলে কমলা উঠে দাঁড়ালো। সে বেরোবার জন্য দরজার কাছে যেতেই মিহির ডাকলে, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'এখানেই সারাদিন বসে থাকতে হবে—না, কী?'

'হঠাৎ একেবারে বাদশাজাদী হ'য়ে উঠলে যে? ব্যাপার কী?'

'তুমি কি কখনোই চুপ করে থাকতে পারো না?'

'না। আমি জানবো—আমাকে জানতেই হবে, তোমার কী হয়েছে।' সশব্দে চেয়ারটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি আমার কাছ থেকে কি লুকোচ্ছো—তা আমাকে বলবে।' মিহির কয়েক পা হেঁটে এসে কমলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

কমলার শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু শক্ত আর টান হয়ে উঠলো। যেন অন্য কারো কণ্ঠস্বরে সে বললে, 'কিন্তু তা তোমার না জানাই ভালো।'

'বলো, বলো,' মিহির প্রায় চীৎকার করে উঠলো, 'আমাকে জানতেই হবে।'

'শোনো তবে,' অত্যন্ত শান্তভাবে, মিহিরের চোখের ওপর চোখ রেখে কমলা বললে, 'আমি একজনকে ভালোবাসতাম —আজ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' বলেই মিহিরকে এক মুহূর্ত সময়ও না দিয়ে কমলা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এটে দিলে।

মিনিট দুই পরেই দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা পড়তে লাগলো। 'কমলা, লক্ষ্মী, একটু দরজাটা খোলো, একবারটি খোলো।' ধাক্কার শব্দ আর মিহিরের চীৎকার সমস্ত বাড়িতে ধ্বনিত হলো। চাকর-বাকররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

'খোলো, দরজা খোলো—কমলা, কমলা!'

খানিক পরে মিহির কমলার গলা শুনতে পেলো, 'একটু দাঁড়াও।' চুপ করে, মিহির অপেক্ষা করলো।

'দরজা খোলা আছে, এসো।'

মিহির ঘরে ঢুকে দেখলো; কমলা খাটের ওপর বসে আছে। সে অত্যন্ত নরম সুরে আরম্ভ করলে 'সত্যি—তুমি যা বলেছো?'

'হঁ্যা।'

'কে সে?' মিহিরের কণ্ঠস্বর যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে গেলো।

কমলা চুপ করে রইলো।

'কে সে? কোথায় থাকে সে?'

'যদি বলি,' কমলা বললে, 'যদি বলি, তা হলে তুমি কী করবে?'

'আমার কী করতে হবে, তা আমি জানি। তুমি শুধু আমাকে বলো,' খপ করে মিহির কমলার এক মণিবন্ধ জোরে চেপে ধরলে। 'বলো শীগ্‌গির।' মিহির আরো জোরে চাপ দিলে, আরো জোরে। কষ্টে কমলার চোখে জল এসে পড়লো।

আর হঠাৎ ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলে উঠলো, 'সে কোথায় আমি কী করে বলবো? সে কোথায়, আমি যদি তা জানতাম্‌!'

'তার মানে?' কমলার মণিবন্ধের ওপর মিহিরের হাতের মুঠি শ্লথ হয়ে এলো। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছিলে?'

'You fool,' একটানে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমলা বলে উঠলো, 'You fool, সে মরে গেছে—মরে গেছে, তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কখনো কখনো নয়।' বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে কমলা কান্নায় ভেঙে পড়লো। কান্না থামাবার জন্য সে দাঁতের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে; তুলসীপাতার ক্ষীণ গন্ধ সেখানে তখনো লেগে ছিলো।

সাময়িকী ও অসাময়িকী

আমরা অনেক সময় মনকে চোখ ঠারিয়া চলি। নেতারাও। হিন্দু-মুসলমানের মিলন লইয়া এলাহাবাদে মহা সোরগোল লাগিয়া গেছে। ঐক্য-সম্মিলন। জিনিষটি ভাল। নামটিও বেশ। কিন্তু ভাবি, হৃদয়ের মিলন যেখানে নাই, সেখানে মিলন হইবে কেমন করিয়া? একপক্ষ উদ্‌গ্রীব, আর একপক্ষ উদাসীন। উদাসীন বলিলে ঠিক বলা হয় না, লোভের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। যেখানে আগ্রহ নাই, উন্মুখীনতা নাই, দেশপ্রেম নাই, শুধু আছে এক নির্ব্বিকার সাম্প্রদায়িকতা, সেখানে কি ঐক্য সম্ভব? কোন পক্ষেরই দোষ নয়, দোষ অবস্থার। আমরা কি তৃতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের মুখ চাহিয়া এই ঐক্য-সম্মিলন বসাইয়াছি? না হইলে, এ অশোভন ব্যস্ততার প্রয়োজন কি? এ যেন সাক্ষীকে ঘুস দেওয়া। ও-পক্ষ দিয়াছে এই, আমি তোমাকে দিলাম এত, তুমি আমার দিকে হও। লোভ যেখানে অন্য দিক হইতে ইন্ধন পাইতেছে, সেখানে আকাঙ্খা-পূরণ অসম্ভব। লোভ সর্ব্বগ্রাসী। অবস্থান্তরে সাম্প্রদায়িকদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ দেখা দিবে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় রহিলাম।

* * *

এ-বারের বিশেষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখা দিবার কথা ছিল। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গল্পটি শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসমাপ্ত গল্পটি সম্পূর্ণ হইলেই, আমরা যতশীঘ্র পারি তাহা প্রকাশ করিব। আমাদের ঘোষণা-অনুযায়ী এবার গল্পটি প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

*　　*　　*

আগামী শনিবার, ১৬ই পৌষ বড়দিনের ছুটি। অতএব 'ছোটগল্পে'র পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ২৩শে পৌষ। পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে 'ছোট গল্পে'র কলেবর বৃদ্ধি হইবে। ছবি থাকিবে, নূতন 'প্রসঙ্গ' থাকিবে।

দিনপঞ্জী

১৭ই ডিসেম্বর, লণ্ডন—'ফ্রী-প্রেসের' নিকট বিশেষ প্রতিনিধি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের বিশিষ্ট ভারতীয় ডেলিগেটগণ স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

১৯শে ডিসেম্বর,—গতকল্য এলাহাবাদ হইতে ডাঃ বি-এস-মুঞ্জে ও শ্রীযুত বিজয়রাঘব আচারিয়া বাংলার মুসলমানদের আসনের স্বল্পতা পূরণের হেতু, হিন্দুদিগকে তাঁহাদের আসন সমষ্টি হইতে আরও দুইটি আসন মুসলমানদিগকে প্রদান করিবার জন্য বাংলার হিন্দুদিগকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর, ওয়াসিংটন—১২ বৎসরের মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে—এই মর্ম্মে একটি বিল সিনেটে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হুভার উহা নিজের বিশেষ ক্ষমতা বলে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

১৮ই ডিসেম্বর—পাটনা কলেজের ব্যায়ামাগারে পাটনা কলেজ বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশন হয়। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।